অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০১৭

গবেষক
সোহানা মাহবুব
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৯৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বেগম আকতার কামাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক

সোহানা মাহবুব
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি, সোহানা মাহবুব, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামালের তত্ত্বাবধানে সম্পন্নকৃত এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

সোহানা মাহবুব
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোহানা মাহবুব, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচ. ডি. গবেষক হিসেবে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি অনুসারে গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বেগম আকতার কামাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

'অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ' আমার পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. বেগম আকতার কামাল-এর তত্ত্বাবধানে আমি আমার গবেষণাপত্রটি রচনা করেছি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপরেখা নির্মাণে আমার তত্ত্বাবধায়কের নিরন্তর অনুপ্রেরণা, সস্নেহ উপদেশ এবং প্রাজ্ঞ আলোচনা ও পরামর্শ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের দুর্লভ গ্রন্থ আমার গবেষণাকর্মের পথ সুগম করেছে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন আমার গবেষণাপত্রের বিষয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

ছাত্রজীবনে অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতি আমি প্রবল আকর্ষণ বোধ করি; পরবর্তীকালে তাই এ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রতিনিয়ত উৎসাহ, পরামর্শ এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, সহকর্মী বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা, ড. হোসনে আরা, ড. মোহাম্মদ আযম, ড. তারিক মনজুর, সহকারী অধ্যাপক মুনিরা সুলতানা ও মোমেনুর রসুল। বিভাগের বাইরে আমার গবেষণাকর্মে সুপরামর্শ দিয়েছেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আমার অগ্রজ শাওলী মাহবুব। তাঁদের সকলের সৎপরামর্শ এবং আন্তরিক সহযোগিতায় আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে দুর্লভ পত্রপত্রিকা এবং লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন কলকাতার কবি শ্যামলকান্তি দাশ, কবি শঙ্কর সাহা, 'এবং মুশায়েরা'র সত্ত্বাধিকারী সুবল সামন্ত এবং কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্রের প্রধান সন্দীপ দত্ত। এছাড়া গবেষণাকর্মের প্রায় শেষপর্যায়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারের কন্যা আথেনা মজুমদার এবং দৌহিত্র চম্পকদ্যুতি মজুমদারের শুভাশিস আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এঁদের নিরন্তর সহযোগিতা আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

বাবা কবি মাহবুব সাদিক এবং মা শাহানা মাহবুবের অক্লান্ত সহযোগিতা এবং অনুজ অপূর্ব স্বাতী মাহবুবের নিরন্তর উৎসাহে অভিসন্দর্ভটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। তাঁদের প্রভূত আত্মত্যাগ এবং কর্মোদ্যমী মানসিক শক্তি আমার গবেষণাকর্মের পথ সুগম করেছে। গবেষণাকর্ম চলাকালীন সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজ আহনাফ তাহমিদের অসীম ধৈর্য এবং আত্মত্যাগ আমাকে দুরূহ পথ অতিক্রমণে সহায়তা করেছে। নিরন্তর উৎসাহ, প্রবল মানসিক শক্তি ও সাহস দিয়ে আমার এই কর্মযজ্ঞ সচল রেখেছেন জীবনসঙ্গী শরীফ মোশাররফ হোসেন। তাঁর প্রেরণা ও আন্তরিকতা আমার পাথেয়। পরিবারের এই মানুষগুলোর প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার এবং বাংলা বিভাগের মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষ ব্যবহার করেছি। উক্ত গ্রন্থাগার এবং পাঠকক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের প্রতিও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সোহানা মাহবুব
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

জুলাই ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অবতরণিকা i

প্রথম অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ ১

দ্বিতীয় অধ্যায় :
ইতিহাস-সময়পট: ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও জীবনবেদ ৩২

তৃতীয় অধ্যায় :
অরণ্যপ্রাণ মানুষের কথকতা ৮৬

চতুর্থ অধ্যায় :
নরনারীর সম্পর্ক : মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ অন্বেষা ১৪৯

পঞ্চম অধ্যায় :
পুরাণ ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়া: বৈশ্য শ্রেণির অস্তিত্বসন্ধান ১৯৭

উপসংহার ২৪২

পরিশিষ্ট ক : অমিয়ভূষণ মজুমদার: জীবনপঞ্জি ২৪৫

পরিশিষ্ট খ: অমিয়ভূষণ মজুমদার: গ্রন্থপঞ্জি ২৪৯

পরিশিষ্ট গ: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কালের অভিঘাতে সৃষ্ট ব্যক্তির সংকট এবং সংকট উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা। অস্তিত্বসংকট এখানে ব্যক্তিসংকটের নামান্তর। কাল ব্যক্তির চেতনায় যে অনপনেয় ছায়া ফেলে, সেটি অমোচনীয়। ব্যক্তিচেতনায় অনুরণিত কালের সেই অমোঘ ছায়াপাতকেই উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন অমিয়ভূষণ। তাঁর রচনায় কখনো বলয়িত হয়ে ওঠে প্রবহমান অখণ্ড এক বৃহৎ কালপট, যাকে তিনি একটি গোষ্ঠীজীবনের অস্তিত্বসংকটের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করতে চান। আবার কখনো-বা উঠে আসে ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র ব্যক্তিক সময়, যার সঙ্গে একাকার হয়ে থাকে ব্যক্তির একান্ত অস্তিত্বজিজ্ঞাসা। এইসব বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কালের অন্তর্গহনে নিহিত দ্বন্দ্বের সঙ্গে গোষ্ঠী-বা ব্যক্তি নিরন্তর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। কাল ও ব্যক্তির এই আত্যন্তিক সংঘাত কখনো ব্যক্তির মনোভূমে অস্তিত্বসংকটের জন্ম দেয়, কখনো বা কালস্পৃষ্ট ব্যক্তিসত্তা কিংবা গোষ্ঠী এই সংকট কাটিয়ে উঠে এক নতুন বোধে উত্তরিত হয়। অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে সময় ও ব্যক্তিকে এভাবেই অস্তিত্ববান করে তোলেন। ব্যক্তির অস্তিত্বসংকট অনুযায়ী উপন্যাসে বিন্যস্ত সময়কাঠামো কখনো বহিরাঙ্গিক, কখনো বা মনস্তাত্ত্বিক। বর্তমান অভিসন্দর্ভে অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছি।

'অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ লেখকের গ্রন্থিত উপন্যাসগুলোর প্রবণতা অনুযায়ী পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এই পাঁচটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রূপ নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলা উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ'। এই অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) থেকে শুরু করে অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১)-এর পূর্ব পর্যন্ত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বিন্যস্ত সময়চেতনা ও অস্তিত্ব সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। কাল ও ব্যক্তিঅস্তিত্ব অমিয়ভূষণের রচনায় যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে সেই বিষয়টিও ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ইতিহাস-সময়পট: ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও জীবনবেদ'। ইতিহাসের একটি বৃহৎপট উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে। কাল থেকে কালে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনজিজ্ঞাসা, কালজাত সংকট এবং নতুন কালে উত্তরণের অন্তর্ঘাত ও বেদনাভাষ্য আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে । বৈনাশিক কালের অমোঘ স্রোতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভাঙনের বেদনা ও ক্ষতের রূপাবয়ব নির্মাণ এ অধ্যায়ের অন্যতম অন্বিষ্ট। এ কারণেই কোথাও কোথাও মনস্তাত্ত্বিক সময়চেতনা ব্যবহৃত হলেও বহিরাঙ্গিক সময়চেতনা হয়ে উঠেছে এর মূল উপজীব্য বিষয়। অমিয়ভূষণের *নয়নতারা* (১৯৬৬), *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭) এবং *রাজনগর* (১৩৯১) উপন্যাসে ইতিহাসকালের অভিঘাত গাঢ়বদ্ধ। এর প্রবল প্রভাবে ব্যক্তির ক্ষত ও গোষ্ঠীবদ্ধজীবনের শেকড়বিচ্ছিন্নতাজাত সংকট বিশ্লেষিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'অরণ্যপ্রাণ মানুষের কথকতা'। এখানে ক্রমরূপান্তরিত সময় ও সভ্যতার কালান্তরের স্বর ধ্বনিত হয়েছে। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমঅগ্রসরমানতায় অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী জীবনের বিনষ্টি, বৈনাশিক কালের করাল গ্রাসে তাদের চেতনাজাত মূল্যবোধের সংকট, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং পুঁজিবাদী শক্তির হাতে কৃষিজীবী শ্রেণির অবমূল্যায়নের চালচিত্র এ অধ্যায়ের মূল উপজীব্য বিষয়। সেই সঙ্গে জোতদার শ্রেণির হাতে কৃষিজীবী-নিগ্রহের বিরোধিতার প্রতিবাদে ফেনিয়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোই উপন্যাসে বিন্যস্ত বহিরাঙ্গিক সময়-চিহ্নায়ক চাবিশব্দ। *দুখিয়ার কুঠি* (১৯৫৯), *মহিষকুড়ার উপকথা* (১৯৮১), *হলং মানসাই উপকথা* (১৩৯৩) এবং *সোঁদাল* (১৩৯৪) উপন্যাস এ অধ্যায়ের বিষয়ভুক্ত।

'নরনারীর সম্পর্ক: মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ অন্বেষণ' চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম। এই অধ্যায়ে যে উপন্যাসগুলো আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, *নির্বাস* (১৯৫৯), *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী* (১৯৫৭), *বিলাস বিনয় বন্দনা* (১৩৮৯) এবং *বিবিক্তা* (১৯৮৯)। সুনির্দিষ্টভাবে বহিরাঙ্গিক সময়ের দিক নির্দেশনা অচিহ্নিত থাকলেও উপন্যাসগুলোতে লেখক বেশ কিছু অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কালের অভিঘাত ধারণ করতে সচেষ্ট। সেইসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সময়ের রূপাবয়ব চিত্রণেও লেখক অত্যন্ত কুশলী। আধুনিক সময় ও সভ্যতার কৃত্রিমতায় ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসা, মনোবিকলন, চেতনায় বিরাজিত বেদনা ও অন্তর্ঘাত এইসব উপন্যাসভুক্ত নরনারীর ভেতর জটিলতার জন্ম দিয়েছে। মনোদৈহিক বৈকল্যের জন্ম হয় মানুষের মনোভূমে। এগুলো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলেই এ অধ্যায়ে পরম্পরাহীন কালকাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে।

পঞ্চম এবং সর্বশেষ অধ্যায়ের শিরোনাম 'পুরাণ ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়া: বৈশ্য শ্রেণির অস্তিত্বসন্ধান'। এই অধ্যায়ে পুরাণ ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় বৈশ্য শ্রেণির ব্যক্তিক সংকট রূপ পেয়েছে। *চাঁদবেনে* (১৪০০) এবং *মধু সাধুখাঁ* (১৯৮৮)–এ দুই উপন্যাসেই রচিত হয়েছে বাণিজ্য জীবনের কথকতা । বৈশ্যজীবনের সংঘাত-সংকট-অস্তিত্বজিজ্ঞাসা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাণিজ্যজীবনের রূপরেখা এখানে চমৎকার দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন লেখক। উপন্যাসদ্বয়ে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন বহিরাঙ্গিক সময়। সেই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সময়রূপে চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার ঘটেছে। *চাঁদবেনে* এবং *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে ইতিহাসলগ্ন ব্যক্তির স্বপ্ন-আত্মজিজ্ঞাসা-মনোদর্শন ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে অপরাজিত হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

অমিয়ভূষণের উপন্যাসে কালের অভিঘাতে ক্ষতাক্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অস্তিত্বসংকট রূপায়ণের চিত্র এবং বিশ্লেষিত বক্তব্যের সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে উপসংহারে।

পরিশিষ্টে উপস্থাপন করা হয়েছে:

ক. অমিয়ভূষণ মজুমদার: জীবনপঞ্জি

খ. অমিয়ভূষণ মজুমদার: গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা

উপর্যুক্ত কাঠামো-বিন্যাস করেই 'অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ' শীর্ষক গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ

সময়ের অভিঘাতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার নানা বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতা অগ্রসরমান। ক্রমবিবর্তিত সমাজের পরিবর্তিত রূপ এবং ব্যক্তির অস্তিত্ববোধের টানাপড়েনের মধ্যে আমরা সময়ের ব্যাপক উপস্থিতি উপলব্ধি করি। বৈনাশিক সময়ের প্রবল অভিঘাত সমাজ ও ব্যক্তিঅস্তিত্বে যে অনপনেয় ক্ষতাক্ত ছাপ ফেলে, সভ্যতার আদিকাল থেকেই সেই গভীর ক্ষত ব্যক্তি তার অন্তর্সত্তায় বহন করছে। তাই সময়, সমাজ এবং মানবঅস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন কোনো উপাদান নয়–বরং এগুলো পরস্পর অন্তঃগ্রথিত। প্রবহমান সময়ের বৈনাশিকতাই ব্যক্তির অস্তিত্ববোধ এবং সমাজ কাঠামোর নির্মাতা। সমালোচকের ভাষায়:

> বিচিত্র ঘটনার যে-সমাবেশ এবং বিভিন্ন চরিত্রের যে-উন্মোচন উপন্যাস পাঠকের চোখে সহজেই পড়ে, তার নেপথ্যে এমন একটি বিন্যাস থাকে, বলতে পারি, একটি বহতা স্রোত–যা অদৃশ্য নিঃশব্দ, কিন্তু যা নিশ্চিত ও অনিবার্য। সেটি সময়ের স্রোত। সেই স্রোত একই সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনার প্রকাশ্য পথ বেয়ে ও চরিত্রের নিভৃত অন্তর্লোকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে চলে নিরন্তর। (গোপিকানাথ, ১৯৮৪: ৩৯)

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে মানবচরিত্রের অন্তর্লোকে প্রবহমান সময়ের বিচিত্র অভিঘাত অন্বেষণ করেছেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি অনুভব করেছেন সময়ের নখরে ক্ষতাক্ত ব্যক্তির আত্মসংকট এবং তার অস্তিত্বসন্ধিৎসু সত্তার স্বরূপ ।

সময়-ধারণা

সৃষ্টিশীল লেখকই ব্যক্তির জীবন ও কালধর্ম নিজের সাহিত্যকর্মে রূপায়িত করতে সক্ষম। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য সময়কে 'অনেকার্থদ্যোতক' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ 'একই সময়ের মধ্যে রয়েছে কত...অবতল, কত গোপন ও প্রকাশ্য প্রবণতার টানাপড়েন' (তপোধীর, ২০০৯: প্রাককথন-১)। সময় সভ্যতার নির্মাতা এবং ধ্বংসকর্তাও বটে। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের এই আপাত বিরোধের ধারক হিসেবেই সময় 'অনেকার্থদ্যোতক'। সময়ের এই অনেকার্থদ্যোতনা, তার বিচিত্র গতি ও স্বভাবস্বর নিজের স্থায়ী স্বাক্ষর রাখে ইতিহাস এবং সাহিত্যকর্মে।

'একমাত্র মানুষেরই কালিক চেতনা আছে' (আলী, ২০০৭: ৭)। মানবচেতনায় এই কালিক ধারণা জন্মলাভ করে তার প্রাত্যহিক জীবনের মধ্য দিয়ে। 'একদিকে অনন্ত সময়প্রবাহ আর অন্যদিকে খণ্ডকালের প্রতীতি: এই দুইয়ের নিরন্তর সংঘর্ষে ক্রমশ' (তপোধীর, ২০০৯: ১৭) মানবচেতনায় জোরালো হয়ে ওঠে দৃষ্টিভঙ্গির বহুত্ব। 'ব্যক্তিপ্রতিভা যে বাস্তব বিশ্ব ও কালের অংশীদার, তার চৈতন্যপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শিল্পকর্মে সেই কালধর্মের রূপায়ণ ঘটে' (মাহবুব, ২০১১: ১২৫)। ব্যক্তি তার চেতনায় বহন করে বহমান কালকে। তাই বলা চলে, কাল ও ব্যক্তিচেতনা পরস্পর সম্পূরক। '...যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে

হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে।...লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯: ৭৫২)। কালের এই প্রভাব এসে পড়ে লেখকের সাহিত্যকর্মে।

ব্যক্তি আর বস্তুজগৎ একই। বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ আছে, আর সময় হচ্ছে চতুর্থ মাত্রা; কাজেই চেতনশীল প্রাণী হিসেবে মানুষও সময়সংযুক্ত–চতুর্মাত্রিক। কালের এই চতুর্মাত্রিকতার ধারণা দিয়েছেন আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)। নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭) সময় সম্পর্কিত ধারণার পটভূমিতেই ১৯০৫ সনে আইনস্টাইন তাঁর 'Theory of Relativity' বা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন, যেখানে নিউটনের তত্ত্বের মত স্থান-কাল পরস্পর কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং তাঁর এ তত্ত্বে স্থান ও কাল পারস্পরিক নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলে চতুর্মাত্রিক হয়ে ওঠে। এ তত্ত্বে সময়ের একরৈখিক প্রবহমানতার ধারণা বর্জিত হয়েছে। বর্জিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে নিউটনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী অভিন্ন কালিক মুহূর্তের ধারণা। সমালোচকের ভাষায়, নিউটনের সময় সম্পর্কিত ধারণায়:

> কালের প্রবাহ...নিরবচ্ছিন্ন, নিরপেক্ষ ও প্রান্তহীন। সমগ্র বিশ্বজুড়ে অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন এক কালের প্রবাহ চলছে। ফলে কোনো কালিক মুহূর্ত বা কালিক ব্যবধান প্রতিটি স্থানিক বিন্দু এবং পর্যবেক্ষকের জন্য অভিন্ন। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্থান ও কাল সমন্বিত হয়ে যে চারমাত্রিক জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে পর্যবেক্ষকের গতি-নিরপেক্ষভাবে যা পরম বা অপরিবর্তী, তা হলো ঘটনা। (আলী : ২০০৭, ৮৯)

আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বে সময়কে স্থান থেকে পৃথক করে দেখেননি। স্থান ও কাল মিলে যে ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তাকে স্থান ও কালের মিলিত চতুর্মাত্রিক জগতে একটি বিন্দু হিসেবে ধরা হয়। সময় এখানে ঘটনা পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির ওপর নির্ভরশীল।

আইনস্টাইনের এই সময় ধারণাকে বিজ্ঞানের সময় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রকৃতি ও মহাজাগতিক সময়পরিক্রমাই এর অন্বিষ্ট। সাহিত্যেরও একটি সময় আছে। লেখক তাঁর সাহিত্যকর্মে বিজ্ঞানের এই সময়কেই স্বকীয়তায় বিন্যস্ত করেন। 'ইতিহাস ধারণ করে সময়কে আর সাহিত্য ব্যক্তিগত সময়কে' (শামসুদ্দিন, ১৪০৪: ৩২)। ব্যক্তি ও সময়ের কথাই বলে উপন্যাস । ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব, তার পারিপার্শ্বিক সমাজ আর বহমান সময়স্পৃষ্ট ব্যক্তিজীবনই একটি উপন্যাসের অন্বিষ্ট। উপন্যাসের কালিকধারণা সম্পর্কে কালে কালে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যিকেরা নানা মতবাদের প্রকাশ ঘটান। সমালোচক রণজিৎ গুহ অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক কারমোডের কালিক ধারণা নিয়ে লিখেছেন। কারমোড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Sense of an Ending*-এ উপন্যাসের কালিক ধারণা সম্পর্কে লেখেন: '...মহাকালের দুর্নিবার স্রোতধারার মধ্যেই লেখকরা পাত্রপাত্রীর প্রাত্যহিক জীবন ও জীবিকার কথা নিয়ে এক-একটি আবর্তের অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে, তার ভিত্তিতে তাঁদের ছোট গল্পটাই উপন্যাসের কাহিনি বলে শোনাতে চাইছেন। বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত, প্রত্যেকটি রচনাই তার একান্ত নিজস্ব সময়ের টুকরোগুলি নিয়ে মজে আছে' (রণজিৎ, ২০১৪: ১০৭)। একেই হয়তো অশীন দাশগুপ্ত অভিহিত করেছেন 'বড় সময় ও ছোট সময়' (অশীন, ১৯৮১: ৪০) হিসেবে। তাঁর মতে ইতিহাসের সময় হলো 'বড়-সময়' আর কারমোড যাকে বলেছেন ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালখণ্ড, অশীন দাশগুপ্তের মতে সেই হলো ব্যক্তির 'ছোটসময়'। E. M. Forster মনে করেন:

> In the Novel, the allegiance to time is imperative: no novel could be written without it...it is never possible for a novelist to deny time inside the fabric of his novel: ...in a novel there is always a clock. (Forster, 1927: 42-43)

উপন্যাসে বিধৃত চরিত্র ও ঘটনার পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফরস্টার মনে করেন ব্যক্তিঅস্তিত্বের যে মূল্যচেতনা, যাকে তিনি অভিহিত করেছেন 'Life by Values' নামে, তাকে দেখাতে গেলে 'Life in Time' এর মধ্য দিয়েই দেখাতে হয়। কাজেই উপন্যাসের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো সময়। T. S. Eliot-ও মনে করেন, 'The great poet, in writing himself, writes his time' (Eliot, 1965: 52)। তিনি আরো মনে করেন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়েই কাল প্রবহমান। অতীত এবং বর্তমান ভবিষ্যতকালের গর্ভে অস্তিত্ববান–এলিয়টের Four Qurtets এর 'Burnt Norton' কবিতায় কাল সম্পর্কিত তাঁর এই বক্তব্য চিরায়ত। সমালোচক মনে করেন:

> ত্রিমাত্রিক কালের প্রতিবিম্বনেই অচেতন মন চৈতন্যময় হয়ে ওঠে।...মানুষের জীবন সময়ের পারম্পর্যে ধৃত ও গুণিত হয়।...অনেক সময় ভাবীকালের কোন অস্ফুট সম্ভাবনা বা স্বপ্ন মনের অন্তর্লোকে গুহায়িত অতীতের কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় মানস-পরিক্রমার সন্ধিমুহূর্তে। এতে স্মৃতিপুঞ্জ পুনর্জাত হয় এবং সেই মুহূর্তের বাস্তবতাকে গুণান্বিত করে। শিল্পিমানসে এইভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যুগপৎ আসা-যাওয়া করে, অবিমিশ্র হয় এবং চতুর্মাত্রায় পুষ্পিত হয়। (আকতার কামাল, ১৯৯২: ২৮৮)

মানুষ এভাবেই কালসংশ্লিষ্ট চতুর্মাত্রিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে রাশিয়ান তাত্ত্বিক M. M. Bakhtin তাঁর *The Dialogic Imagination* গ্রন্থে কালকে দেখেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সময় ও স্থানের আন্তঃসম্পর্ককে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি 'chronotope' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'সময়-স্থান'। এ প্রত্যয়টি সাহিত্যে স্থান ও কালের অবিভাজ্যতা জ্ঞাপক। Bakhtin মনে করেন, সত্যিকারের শিল্পসম্মত সাহিত্যে 'chronotope' তখনই জন্ম নেয়, যখন কোনো সাহিত্য তার স্থানিক ও কালিক উপাদানসমূহকে পুরোপুরি একাকার করে ফেলতে সক্ষম হয়, যা একটি সামগ্রিক রূপের জন্ম দেয়। তিনি লিখেছেন:

> In the literary artistic chronotope, spatial and temporal indicators and fused in to one carefully thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, takes on flesh, becomes artistically visible; likewise, space becomes charged and responsive to the movements of time, plot and history. This intersection of axes and fusion of indicators characterizes the artistic chronotope. (Bakhtin, 1994: 84)

স্থান আর কালের মিথস্ক্রিয়ায় কাল এক কংক্রিট অস্তিত্বে পরিণত হয়, যে কংক্রিটনেস ব্যক্তির ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে সময়চিহ্নিত করতে গিয়ে এভাবেই কখনো স্থান ও কালকে একাকার করে তোলা হয়েছে, কখনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, কখনো বা বৃত্তাকার বা রৈখিক সময়ের ধারণাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্যেই নয়, ভারতীয় সাহিত্যেরও একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কালচেতনা। ভর্তৃহরি লিখেছেন, 'জলযন্ত্রভ্রমাবেশ সদৃশীভিঃ প্রবৃত্তিভিঃ/ স কলাঃ কলয়ন্ সর্বাঃ কালাখ্যাং লভতে রিভুঃ/' [বাক্যপদীয়, কালসমুদ্দেশ, ৩/১৪]। অর্থাৎ, কাল জলের মতই ঘূর্ণায়মান, সর্বব্যাপী ও স্বতন্ত্র। সকল টুকরো খণ্ডাংশ-বিভক্ত কলাকে এই সর্বব্যাপী ও স্বতন্ত্র কাল কলয়িত করে বলেই তাকে কাল বলা হয়। ভারতীয় কালচেতনা সম্পর্কে হেলারাজের টীকার পাঠ বিশ্লেষণ করে সমালোচক রণজিৎ গুহ মন্তব্য করেন:

> ....হেলারাজের টীকার পাঠ মোটামুটি এই রকম: জল তোলার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের ঘুরপাকে যে-আবর্তন দেখা যায়, তার আলোড়নে জলে ও জলপাত্রে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তেমনই 'পরাবর্তমান' কালের আবির্ভাবে বসন্তাদি ঋতুর পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। তার ফলে, সবকিছু যা আছে তার কলা বা অংশগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে কালাখ্য নাম লাভ করে। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এই যে, যিনি বিশ্বাত্ম এবং পরম ব্রহ্ম নামে অভিহিত, তিনিই সত্য। তাঁর অনন্ত শক্তিতে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করা হয়। আর, এভাবেই ঘূর্ণায়মান চক্রের ক্রমিক পরিবর্তনের ভাব প্রকাশ করে যা সর্বভূতকে বিক্ষুব্ধ করে, তা-ই কাল। সে বিভু ও স্বতন্ত্র। তাই তা স্বাতন্ত্র্যশক্তি। (রণজিৎ, ২০১৪: ১০৭-১০৮)

ভর্তৃহরি কিম্বা হেলারাজের ভাষ্যমতে কাল ঘূর্ণায়মান এক চক্রসদৃশ; এই ঘূর্ণায়মান চক্রের আবর্তন ব্যক্তি-অস্তিত্বে অভিঘাতের জন্ম দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় চেতনায় কাল-সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। কাল নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিষমর্দিনী দেবীমূর্তিকে তুলে আনেন। তাঁর মতে এই দেবী:

> অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রবল বেগে দেবী মহিষাসুরের সঙ্গে সংগ্রামে নিরত। অথচ তাঁর মুখে, তাঁর পেশী ও ধমনীতে শিরায় ও উপশিরায় কিছুমাত্র বিকার কোথাও নেই, কোনো একটি ক্রাইসিস-এর মুহূর্তকে ধরবার চেষ্টামাত্র কোথাও নেই। সর্বত্র আছে শুধু একটি চলমান বর্তমান (ever-continuous present)। তার কারণও আছে। এই রূপকল্পে বা মূর্তিতে যা দেখানো হচ্ছে তা কোনো নাটকীয় মুহূর্ত নয়, ক্রাইসিস নয়, তা হচ্ছে মানবিক সত্তার বা অস্তিত্বের একটা অবস্থা (a state of being), যা সম্ভব শুধু চক্রাকারে আবর্তিত কালচেতনাতেই। দ্রুত তির্যক, জ্যামুক্ত তীরবৎ একরৈখিক কাল-চেতনা থেকে এই ধরনের মূর্তি রচিত হতে পারে না। ফিদিয়াস-স্কোপাস-লিসিপ্পাস থেকে শুরু করে রাফায়েল-মিকালাঞ্জেলো-রদ্যাঁ পর্যন্ত যে কালচেতনা প্রসারিত, তাতে সদ্যোক্ত a state of being এর কোনো পরিচয় সাধারণভাবে নেই। (নীহাররঞ্জন, ১৯৯২: ২০)

এভাবেই ভারতীয় কালচেতনার অখণ্ড প্রবহমানতায় খণ্ড, একরৈখিক ও বৃত্তাকার কালের দেখা মেলে। কখনো কখনো কাল বিশেষ কাল থেকে (point of time) অসীম কালে প্রসারিত হয়।

কালিক সংঘর্ষে মানবচেতনায় জোরলো হয়ে ওঠে দৃষ্টির বহুত্ব, যা ব্যক্তির ভেতর অস্তিত্বসংকটের জন্ম দেয়। ঔপন্যাসিক তখন সময়প্রবাহের নিরন্তর সাংঘর্ষিক পটে সৃষ্ট ব্যক্তির আত্মসংকটটি ধারণ করতে সচেষ্ট হন। এই প্রেক্ষিতে উপন্যাসে সময়ের ব্যবহার প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ঔপন্যাসিক নিজে একটা বিশেষ সময়ে অবস্থান করেন। অনেক সময় রচনা থেকে লেখকের সমকালকে চিহ্নিত করা যায়। আবার, অনেক সময় ঔপন্যাসিক কোন বিশেষ সময়কালকে তুলে ধরতে চান তাঁর রচনায়। উপন্যাসের কাহিনি ও তার কুশীলবরা তখন সেই বিশেষ যুগের প্রেক্ষাপটে অবস্থান করে। ...অনেক সময় রচনা পড়ে পাঠক নিজে থেকেই লেখকের অভিপ্রেত সময়কে বুঝে নিতে সক্ষম হন। সময়ের সরাসরি উল্লেখ থাকুক না থাকুক, প্রতিটি রচনাই কোনও-না-কোনও সময়কে উপস্থাপন করে। (উর্বী, ২০১৬: ৭৩)

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কালসংশ্লিষ্ট। কাজেই চরিত্রগুলোর অস্তিত্বসংকটের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে একটি কালের কথকতা। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় মনে করেন :

> সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন,... ।...সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তি মানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়।...সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।... একদিকে ব্যক্তিমানুষ আর একদিকে সময়–এই দুই দায়ের ভিতরে সঙ্গতি আবিষ্কার করাই ঔপন্যাসিকের শিল্পগত সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন।...সময়ের দায় ঔপন্যাসিককে মানতে হয়। সময়ের পাককেও ঔপন্যাসিক এড়াতে চান। কারণ তিনি পৌঁছাতে চান ব্যক্তিমানুষের কাছে। সেই ব্যক্তিমানুষ সময়ে অন্বিত, হয়তো বা সময়ের পাকচক্রে বাঁধা। (দেবেশ, ২০০৬: ৮৬-৯০)

দেবেশ রায় উপন্যাসের উপাদান হিসেবে সবচাইতে বেশি জোর দিয়েছেন ব্যক্তিমানুষকে, একথা ঠিক। তবে সেই ব্যক্তি মানুষটিকে হতে হবে সময়অন্বিত–একথা বলতেও ভোলেননি।

অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ:

জীবনসংকটের নামান্তর অস্তিত্বসংকট। কোনো একটি বিশেষ সময়পটে জীবনযাপন করা মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বর্তমান আলোচনায় পাশ্চাত্য দর্শনের অস্তিত্ববাদের আলোকে এই অস্তিত্বসংকটকে ব্যাখ্যা করা হয়নি। বরং ব্যক্তির সত্তায় উত্তরণ ও তার টিকে থাকার বিষয়ই এখানে প্রধান। পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল কথা হলো, ব্যক্তি যখন কোনো বিপন্ন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়ায়, এবং ব্যক্তিঅস্তিত্বে একধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্ম হয়, তখন সেই ব্যক্তি তার করণীয় সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কারণ সম্মুখে বিরাজমান কর্তব্যের প্রায় সবগুলোই তার জন্য সমমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সমমাত্রিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞের সম্মুখে এসে সিদ্ধান্তহীনতায় উপনীত ব্যক্তি সংকটে পড়ে।

পাশ্চাত্য দর্শন অনুযায়ী ব্যক্তিঅস্তিত্ব দু'ভাবে জীবনযাপন করে। প্রথমত, দৈনন্দিন জীবনযাপনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন গোষ্ঠীবদ্ধ ক্রিয়াকর্মে এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কর্মকাণ্ডে। প্রথমটি থেকে বিচ্যুতি সামূহিক অস্তিত্বকে সংকটের দিকে পতিত করে, দ্বিতীয়টি থেকে বিচ্যুতি ব্যক্তিক সংকটের জন্ম দেয়। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> যে অস্তিত্বে অন্য সব মানুষের মত গোষ্ঠীনিয়ম পালন করতে হয়, অস্তিবাদীরা বলবেন, সে অস্তিত্ব শুধু বেঁচে থাকা, অস্তিত্ব নয়, কারণ অস্তিত্বে মানুষ তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। সে উপলব্ধি করে, সে একজন ব্যক্তি। ব্যক্তি যখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে যায়, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া জীবনের সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার পক্ষে খুবই জরুরী, তখনই ব্যক্তি বুঝতে পারে, তার অস্তিত্ব আছে। রোজকার জীবনে হয়ত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি বুঝতে পারে না সে কি করবে, কারণ তার সামনে যে কয়েকটি কর্তব্য আছে, হয়ত দুটির কোনটিকেই সে অবহেলা করতে পারছে না, তখনই সে সঙ্কটে পড়ে। (মৃণালকান্তি, ১৯৯৯: ৬-৭)

পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল বক্তব্য এটি। অমিয়ভূষণ মানুষের জগৎ-অস্তিত্বের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। সময়ের অভিঘাতে মানুষ তার জগৎ-অস্তিত্ব নিয়ে বস্তুজগতে সংগ্রামরত, অমিয়ভূষণ এই সংগ্রামরত মানব অস্তিত্বের কথাই বলতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। হাইডেগার মনে করেন, সামাজিক জীবনের যান্ত্রিকতায় মানুষ বিচ্ছিন্ন, যে কারণে এই বিচ্ছিন্নতা তার ভেতর সংকটের জন্ম দেয়। তিনি মানুষকে জগতে অবস্থিত সত্তা তথা "Being in the world or dasein" বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাস্তবজগত, সময় ও মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল বলেই তিনি মনে করেন। হাইডেগারের এই মত অমিয়ভূষণের উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ওপর আরোপ করে বলা যেতে পারে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সময় ও সমাজসংশ্লিষ্ট এক সত্তা, যারা সভ্যতার যান্ত্রিকতায় ক্রমবিচ্ছিন্ন এবং সংকটাপন্ন। তাঁর উপন্যাস পাঠ করলে এই বিষয়টি আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে। অমিয়ভূষণের উপন্যাসে 'একাধিক স্তরে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের ভাঙাগড়া বিধৃত হয়েছে যেমন, তেমনি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সংঘর্ষ-প্রবণ অন্তঃস্রোত সম্পর্কে লেখকের সচেতনতাও প্রকাশ পেয়েছে' (তপোধীর, ১৪১২: ৮৪)।

জাঁ পল সার্ত তাঁর *Being and Nothingness* (1943) গ্রন্থে অস্তিত্ববাদের যে সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার ওপর সবচে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, সুতরাং মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো শক্তি নেই। মানুষ স্বাধীন এক অস্তিত্ব। সে নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক। সমালোচক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

> সার্ত সবার উর্ধ্বে মূল্য দিয়েছেন মানুষকে, তার ব্যক্তিত্বকে, স্বাধীনতাকে, মর্যাদা ও মূল্যবোধকে। তিনি এমন একটি পৃথিবী বা সমাজের চিন্তা করেছেন, যা হবে ঈশ্বরবিহীন, অস্তিত্ববাদী ও মানবতাভিত্তিক। মানুষ নিজেই সে সমাজ সৃষ্টি করবে, যেখান ঈশ্বরের কোন স্থান নেই, ভূমিকাও নেই। (নীরুকুমার, ১৯৯৭: ৮০)

ঈশ্বরহীন এই পৃথিবীতে ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ন্তা, যার মধ্য দিয়ে সে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। অমিয়ভূষণের উপন্যাসে ব্যক্তির হয়ে উঠবার ক্ষেত্র নির্মাণে তার স্বকীয়তার বিষয়টি রূপ পেলেও সার্তের এই অস্তিত্ববাদী ভাবনার প্রকাশ সেখানে প্রবলভাবে উপলব্ধি করা যায় না।

বাংলা উপন্যাসে সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ

ব্যক্তি আর বস্তুজগৎ একই। বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ আছে আর সময় হচ্ছে চতুর্মাত্রিক। প্রাণি হিসেবে মানুষও সময়সংযুক্ত চতুর্মাত্রিক সত্তা। চতুর্মাত্রিক সত্তা হিসেবে ঘাত-প্রতিঘাতময় কালের অভিঘাতে সংকটাপন্ন

অস্তিত্বকামী মানুষের কথকতা উপন্যাসে নানাভাবে উঠে আসে। লেখকের কালই শুধু নয়, উপন্যাসে আরো নানামাত্রিক সময়ের ব্যবহার ঘটে। সেই সঙ্গে অস্তিত্বসংকটেরও নানা মাত্রা থাকতে পারে। কখনো সেটি হতে পারে মনস্তাত্ত্বিক, কখনও বা বাহ্যিক, বহিরাঙ্গিক। বাংলা উপন্যাস যাঁর হাত ধরে উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রযুক্ত সময় বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী–এই দুই মাত্রাকেই ধারণ করেছে। ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স রচনা এর একটি প্রধানতম দিক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সমালোচক গোপিকানাথ রায় চৌধুরী মনে করেন:

> দুর্গেশনন্দিনী থেকে শুরু করে সীতারাম-রাজসিংহ পর্যন্ত এ ধরনের বিভিন্ন উপন্যাসে ঐতিহাসিক সময়ের বিভিন্ন স্তর ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় শেষ দশক পর্যন্ত কালখণ্ডের এক একটি পর্যায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের পটভূমিরূপে বিন্যস্ত হয়েছে। সুদূর লক্ষণ সেনের বাংলাদেশ থেকে শুরু করে আকবর, জাহাঙ্গীর আওরঙ্গজেবের বর্ণাঢ্য রোমাঞ্চকর কালখণ্ডের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে পাঠক এসে পৌঁছোন নবাবী আমলের ভগ্নস্তূপের ওপর গড়ে-ওঠা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দৃঢ়মূল রাজপথে। মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ থেকে চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত কয়েক শতাব্দীর এক দূরবিস্তারী সময়ের প্রসারিত চেতনা, একধরনের Macro-Time- প্রতীতি পাঠকের রস-কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। (গোপিকানাথ, ১৯৯১: ১)

উপলব্ধি করা যাবে, একটি মহাকাব্যিক কালপট ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবে, মহাকাব্যিক এই কালের অভিঘাত তাঁর চরিত্রের ভেতর কতটা সংকট তৈরি করেছে, সেটি চিহ্নিত করা দুরূহ। ব্যক্তির অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট অন্তর্বাহী সময়ের প্রকাশ তাঁর উপন্যাসে তেমন নেই। 'ব্যক্তিমনের আলো আঁধারি রহস্যলোকের যে বিশ্লেষণ বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে সূচিত হ'ল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার পরিস্ফুট বিন্যাস চোখে পড়ে না' (গোপিকানাথ, ১৯৯৬: ২৭-২৮)। বরং, ইতিহাসপটে প্রতিস্থাপিত ব্যক্তির অস্তিত্বসংকটের নির্মাতা হয়ে ওঠে ব্যক্তিক আবেগ ও চিন্তাচেতনা। '...বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবন-ঘনিষ্ঠতার,...অনেক উপাদানই ছিল–সমকালীন সামাজিক সমস্যা-সচেতনতা, পরাধীনতা থেকে বন্ধনমুক্তির চেতনা, ব্যক্তি ও সমাজ-পরিবারের সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত সংকট, ব্যক্তির মনোজীবন তথা অন্তঃসংঘাত ও যন্ত্রণা।...কিন্তু সমকালীন সময় ও সমাজের টানাপড়েনে এইসব প্রবণতা সেখানে যথাযোগ্য তীব্রতা ও গভীরতা পায়নি' (গোপিকানাথ, ১৯৯৬: ৮৪)। বরং উপলব্ধি করা যাবে, ইতিহাস-সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বস্তি দিয়েছে বলে ঐতিহাসিক কালের মোড়কে মুড়ে তিনি তাঁর কালচেতনা নির্মাণ করেছেন। সমালোচক মনে করেন:

> বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ-মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাহার বর্তমান অস্বীকৃত, কিন্তু তাহার অতীত নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল। সুতরাং অতীতের চেতনা (যদি ইহাতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়) তাহাকে ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করিতে পারে। (অরবিন্দ, ১৯৭৫: ৫২)

মহিমান্বিত অতীতের ছবি আঁকতে গিয়ে তাই তিনি বেশ অনেকগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) উপন্যাসে লেখক প্রেমকাহিনিকে মুখ্য করে তুলে তার মধ্যে একটি সূত্রে ইতিহাসকে গেঁথে দিয়েছেন। ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনির এই মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন, *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে:

> ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর মিশ্রণে কুশলতা দেখা যায়। ইতিহাসের বিবরণ বড় হয়ে ওঠেনি, তবে মোগল, বাঙালী ভূস্বামী এবং পাঠানের ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের সঙ্গে কাহিনীর নায়ক (জগৎসিংহ), নায়িকা (তিলোত্তমা) এবং দ্বিতীয় নায়িকা (আয়েষা)-ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইতিহাসকে স্বতন্ত্র দূরত্বে বিবর্ণ পটভূমি মাত্র করে রাখেনি। (ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৯৬: ২৯)

এই ইতিহাসপট চরিত্রের মনোজগতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করলেও বাহ্যিকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> ...বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহ' এর মত উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য একদিকে নৈর্ব্যক্তিক সময়শাসিত পরিসরের সূত্রধার, অন্যদিকে প্রেম দাম্পত্যের অন্তর্বয়ন তারই মধ্যে নিয়ে এসেছে ভিন্নতর পরিসরের প্রস্তাবনা। তবু, কোনো সন্দেহ নেই, তাদের নিভৃত অনুভূতিতে ছায়া ফেলেছে ইতিহাসের সময়। প্রতিবেদনের অন্তর্বর্তী প্রতীত-সময়ের নির্মিতি হিসেবে রাজনৈতিক সমাজের পরিসর কার্যত পৌর সমাজের উপস্থিতিকে গৌণ করে দিয়েছে। ফলে কুশীলবদের ব্যক্তিগত অণু ইতিহাস ও অস্মিতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে পক্ষপাতশূন্য ও নৈর্ব্যক্তিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সামগ্রিক বাচনে। ইতিহাসের প্রবল ঘটনাপ্রবাহ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ব্যক্তি অস্তিত্বের উপকূলরেখাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। (তপোধীর, ২০০৯: ২৫)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস-সময়পটের অভিঘাত এড়াতে পারেননি। যদিও চরিত্রের অন্তর্গহনে সেটি কোনো অন্তর্লীন ক্ষতের জন্ম দেয়নি।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) উপন্যাসেই প্রথম লেখক সমকাল বা সমসাময়িক সমাজজীবনকে উপন্যাসে প্রকাশ করলেন। দূরাগত ইতিহাস-সময় পরিহার করে তিনি *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮) উপন্যাসে সমকালের পটে অস্তিত্ববান মানব-মানবীর চিত্তবৈকল্যের পট উন্মোচন করেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, এসব উপন্যাসে:

> শুধু পারিবারিকতার গণ্ডি অতিক্রম করাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল না–নতুন কালের ব্যবহারে পটভূমিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাও এ-ক্ষেত্রে শিল্প প্রয়াসের অঙ্গীভূত হয়েছে। শ্রীশ-কমলমণির কলকাতাবাসের দর্পণে–আপনাতে-আপনি-সুন্দর নতুন মধ্যবিত্ত দম্পতির ছবি– ... দেবেন্দ্রনাথে...ইয়ং বেঙ্গলেরই দুষ্ট ছায়া। সমকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, নতুনকালের নানা টানাপোড়েন,–যার অনেকটাই মাত্র জনশ্রুতি–এই উপন্যাসের আকাশে বিভিন্ন স্তরের সমাবেশ ঘটিয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'বিষবৃক্ষে'র ঘটনা প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অপেক্ষা 'বিষবৃক্ষে' কাল-লক্ষণকে স্পষ্টত স্ফুটতর করে তোলা হয়েছে। সীমিতভাবে হলেও এই কাল-লক্ষণ এবং পটভূমি পরিবেশ সমকালীন বাংলাদেশের এক খণ্ডকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করার চেষ্টা। (সরোজ, ১৯৭১: ৯১)

অন্যদিকে, *আনন্দমঠ* (১৮৮২) উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটে বঙ্কিমচন্দ্র ঘরের কথা নয়, বরং বলতে চেয়েছেন দেশ ও জাতির কথা, যেখানে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর জাতীয় জীবন-তরঙ্গের অভিমুখী। কালপ্রবাহে ক্ষতাক্ত ভবানন্দ-জীবানন্দ কিংবা কল্যাণীর অন্তর্ঘাতের বেদনাভাষ্য উপন্যাসে উঠে আসে লেখকের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায়।

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) উদ্দেশ্য ছিল উপন্যাসে 'দেশ সমাজ ও সময়শাসিত চরিত্রসমূহের অন্তস্তল উন্মোচন করা, তাদের স্বাতন্ত্র্য পরীক্ষা করা ও অন্তর্প্রেরণার বহির্দেশের বস্তু অর্থাৎ বস্তুজগতের সমগ্রতা, অপরপ্রান্তে থাকে মানবজগতের বিস্ময় অন্তর্প্রদেশ'–রবীন্দ্রনাথ এই দুইকেই মিলিয়েছেন' (আকরম হোসেন, ২০১৩: ২০৭)।

'Inward' বা মনস্তাত্ত্বিক সময়ের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেই আমরা প্রথম পাই। তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে কালের যথাযথ পরম্পরা রক্ষিত হয়নি। যদিও প্রথাগত আঙ্গিকের উপন্যাস *বউ ঠাকুরানীর হাট* (১৮৮৩) কিম্বা *রাজর্ষি* (১৮৮৭) ইতিহাসাশ্রয়ী বলে সেগুলোতে প্রচলিত কালপরম্পরার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। *রাজর্ষি* আর *বউঠাকুরানীর হাট* উপন্যাসের সময়চেতনা বহিরাঙ্গিক। *চোখের বালি* (১৯০৩), *নৌকাডুবি* (১৯০৬) ও *গোরা* (১৯১০) উপন্যাসে ব্যক্তিচেতনার অন্তর্বাহী সময়স্রোতের সঙ্গে যুগ-কালপ্রবাহ পরম্পরাহীনভাবে ধরা দিলেও এসব উপন্যাসের সময়চেতনাও অনেকাংশে বহিরাঙ্গিক। *চোখের বালি* উপন্যাসেই প্রথম সচেতনভাবে ঘটনাসর্বস্বতার পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যারীতির দেখা মেলে এবং কোথাও কোথাও মনস্তাত্ত্বিক কালপর্বও ব্যবহৃত হয়। 'ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজ ও দ্বিধাবিকশিত বিবর্ণ নব্যধনবাদী সমাজের যোগফলে সৃষ্ট, বিকল সমাজকাঠামোতাড়িত বিনোদিনীর আন্তর-নৈঃসঙ্গ্য ও মানসিক বহুভুজ জটিলতা, ক্ষোভ-লোভ-প্রতিবাদ-ঔদার্য ও বেদনা মূলত *চোখের বালি*'র বর্ণনীয় বিষয়' (আকরম হোসেন, ১৩৮৮: ১৪৩)। চরিত্রগুলোর পেছনে সক্রিয় ছিল দেশকালের দ্বান্দ্বিক আবহ। আশা-মহেন্দ্র-বিনোদিনীর হৃদয়াবেগ, তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ-ব্যক্তিত্ব ও সংকট মূলত সমকাল-উৎসারিত সমস্যা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিকশিত নব্য হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির নবজাগরণ ঘটলেও তাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন অবিকৃতই থেকে গেছে। যথাযথ শিল্পবিপ্লবের অভাবে প্রাচীন সামন্তসমাজলালিত ধ্যানধারণাই মধ্যবিত্তের অস্তিত্বে প্রোথিত ছিল। কাজেই পাশ্চাত্য সভ্যতার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ভোগমুগ্ধ জীবনার্থের সঙ্গে সামন্ত সমাজলালিত প্রাচীন ভারতীয় ধ্যানধারণার দ্বন্দ্ব সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধারণ করেছে অক্লেশে। *চোখের বালি* কিংবা *নৌকাডুবি* উপন্যাসের চরিত্রগুলো তাদের অস্তিত্বে লালন করেছে কালের এই দ্বন্দ্ব। পরোক্ষভাবে হলেও সমকাল এ চরিত্রগুলোর অস্তিত্বসংকট সৃজনের এক নিয়ামকশক্তি।

রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ কলেবর উপন্যাস *গোরা*-য় মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশাল সময়পটের দেখা মেলে। এ উপন্যাসের চরিত্র 'যুগচৈতন্যে কল্লোলিত আবার যুগযন্ত্রণায় সঙ্কুচিত' (আকরম হোসেন, ১৩৮৮: ২০৭-২০৮)। গোরা যুগ-মর্মমূলে শেকড় চারিয়ে নিজেকে অস্তিত্ববান করে তুলেছে বলেই স্বদেশচেতনা এবং ভারতবর্ষের মুক্তির স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে এ চরিত্রের মূল শক্তি। কাজেই স্বদেশ ও সমকাললগ্নতাই এর অস্তিত্বসংকটের উৎসমূল। *গোরা*-র কালচেতনা সম্পর্কে সমালোচক গোপিকানাথ রায় চৌধুরী মন্তব্য করেন :

> এই উপন্যাসের নানা আখ্যান, বিভিন্ন চরিত্র, বিচিত্র সব সুখদুঃখে আশা-নিরাশায় স্পন্দিত অনেক খণ্ড মুহূর্তকে অতিক্রম ক'রে সামগ্রিকভাবে কালের এক ব্যাপকতর প্রবাহের আভাস পাঠকচিত্তে জাগিয়ে তোলেন লেখক। সব খণ্ডিত সময়ের নেপথ্যে যেন ফুটে ওঠে এক বড় কালচেতনার পট–যা' উপন্যাসটিতে কিছুটা মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। তখন আর উপন্যাসটিকে মাত্র ছ'মাসের সময়-সীমায় আবদ্ধ মনে হয় না–তা যেন সিপাহী বিদ্রোহের কাল থেকে শুরু হ'য়ে উনিশ শতকের শেষ পর্বের ওপর দিয়ে আরও সামনের

> দিকে–বিশ শতকের সূচনা পর্বের (অর্থাৎ উপন্যাসটির রচনাকালের) দিকে চলে আসে। তখন উপন্যাসটিকে দুই শতাব্দী কালের সংযোজক এক বৃহৎ কালখণ্ডের সংবেদন-সঞ্চারী কাহিনী বলে মনে হ'তে থাকে। (গোপিকানাথ, ১৯৮৪: ৫১)

এভাবেই মাত্র ছ'মাসের সময়সীমায় আবদ্ধ হয়েও কালের প্রবহমানতায় মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা পায় *গোরা* উপন্যাস। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও 'Flash back'-'Flash forward' রীতি ব্যবহার করেছেন।

স্মৃতিচারণমূলক ডায়েরিভিত্তিক উপন্যাস *চতুরঙ্গে* (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের পুঁজিবাদী সমাজে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সেইসব সংবেদনশীল ব্যক্তিমানবের কথা বলতে চেয়েছেন, যারা অন্তর্মানসে অনুপ্রবিষ্ট যন্ত্রসভ্যতার নেতিবাচকতায় ক্রমশ বৃত্তাবদ্ধ হয়ে উঠছিল। নিঃসঙ্গ ও অন্তর্মনস্ক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে একালের মানুষ। 'বিশাল ধনবাদী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টিশীল ইউরোপীয় প্রতিভা ক্রমশ হয়ে ওঠে চেতনায় বসবাসকারী; তারা আত্মসমর্পণ করে কোনো উচ্চাশার কাছে নয়, আত্মবিবরলালিত ভাবমানসে' (আকরম হোসেন, ১৩৮৮: ২৪১)। বিবরলালিত এইসব মানুষের কথকতায় *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক সময়চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে চমৎকারভাবে। কথাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক সময়চেতনা বিন্যস্ত হবার পেছনে একটি ঐতিহাসিক আবহ রয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে দৈশিক-বৈশ্বিক পটে পরিবর্তনের পাশাপাশি চিত্রকলা-সাহিত্য-দর্শনেও ঘটে অসামান্য সব পরিবর্তন। নব্য ধনতন্ত্রের আগ্রাসনে যৌথজীবন বিচ্ছিন্ন মানুষ সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তে আত্মবিবরলালিত ভাবমানসে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ক্রূর বাস্তবতার অভিঘাতে সমাজ-বিবিক্ত মনোবিবরবাসী এইসব মানবসত্তা বর্তমানকে নয়, বরং মানস-দোলাচলে আঁকড়ে ধরে স্মৃতিসর্বস্ব অতীতকে। স্মৃতি-সত্তা আর ভবিষ্যতের দোলাচলে সঞ্চরমান চেতনাই হয়ে ওঠে একালের সাহিত্যিক-দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী আর সমাজবিজ্ঞানীদের অভীষ্ট। মানব-চেতনার গতি-প্রকৃতিকে ধারণ করতে গিয়ে মূলত আধুনিককালের সাহিত্যিক-চিত্রকর-দার্শনিকেরা সময়কেই ফ্রেমবন্দি করলেন তাদের সৃষ্টিকর্মে। কার্ল মার্ক্স তাঁর *Economic and philosophic manuscript of 1844* গ্রন্থে সর্বপ্রথম শ্রমিক এবং তার শ্রমোৎপাদিত বস্তুর মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাকে যে 'Allienation' তত্ত্বে বন্দি করেন, সে তত্ত্ব ব্যাখ্যা দেয়, কেমন করে পুঁজিবাদের আগ্রাসনে শ্রমলব্ধ বস্তুভোগ থেকে শ্রমিকের অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ কেমন করে তাকে সমাজ থেকে একাকী অন্তর্মনস্ক করে তোলে, করে তোলে অতীতচারী। শ্রমিকসত্তার এই অতীতচারিতার মধ্য দিয়ে প্রথম সময়চেতনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-করা মার্ক্সের মানবচৈতন্যের অন্তর্মনস্কতার এই স্বরূপভাষ্য অর্থনীতিবিদ আর সমাজতাত্ত্বিকদের পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানীদের মননে রূপায়িত হয় নতুন মাত্রায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) *The interpretation of Dreams'* (1899) কিম্বা *Three essays on the theory of sexuality (1905), The Unconscious (1915), The Ego and the ID (1923)* গ্রন্থগুলো মানবচেতনার অভীপ্সা সম্পর্কে পাল্টে দেয় সকল পূর্বধারণা। পাঠকের মানসপাতায় তিনি প্রোথিত করেন স্বপ্ন, চেতনা, অবচেতনা ও প্রাকচেতনার গুঢ়ার্থ। তাদের জানালেন, 'Dreams were the product of repressed desires, akin to neuroses' (Childs : 2000, 47)। তাঁর এই অবিস্মরণীয়

আবিষ্কার আরও বেশি সমৃদ্ধ হলো আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭) এবং সিজি ইয়ুঙ-এর (১৮৭৫-১৯৬১) ভাবনায়। একালেই চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত সময় সম্পর্কিত অন্য এক যুগান্তকারী ভাবনার প্রকাশ ঘটালেন হেনরি বার্গসঁ (১৮৫৯-১৯৪১) তাঁর *Introduction to Metaphysics (1903)* গ্রন্থে। সমালোচকের ভাষায়, এ বইয়ে বার্গসঁ:

> যান্ত্রিক সময় ও মনস্তাত্ত্বিক সময়ের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন...যার ফরাসি শব্দরূপ 'La-duree' অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক বা ব্যক্তিগত সময়।...বার্গসঁর ব্যাখ্যায় এই মনস্তাত্ত্বিক বা ব্যক্তিগত সময় কোনো ঘন্টা কিংবা মুহূর্তের ক্রমানুপাতের নিয়ম মেনে চলে না, এক্ষেত্রে সময় কোনো ব্যক্তি কিম্বা চরিত্রের একান্ত অন্তর্গত প্রবাহ যার গতিরেখা কখনো বর্তমান থেকে অতীত আবার অতীত থেকে বর্তমানের দিকে ধাবিত। (শামীমা হামিদ: ১৪০৮, ১২১)

বার্গসঁর *Matter and Memory* (1896) গ্রন্থটিও সময় সম্পর্কে মানবধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়। একালেই প্রকাশিত উইলিয়ম জেমসের (১৮৪২-১৯১০) বিখ্যাত গ্রন্থ *The principles of psychology (1890)*-তে লিপিবদ্ধ হয় নতুন এক অভিধা। মানবমনের চেতন-অবচেতন কিম্বা প্রাক্‌চেতন স্তরে প্রবহমান নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাধারাকে তিনি অভিহিত করেন 'Stream of consciousness' নামে, যার সঙ্গে সময়ের যোগ ছিল গভীরতর। 'The Stream of thought' পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন :

> Consciousness then, does not appear to itself chopped up in bits. Such word as 'chain or train' do not describe fitly as it presents itself in its first instance. It is nothing Joined, it flows, a 'river' or a 'Stream' are the metaphors by which it is most naturally described. In talking of it, Let us call it the stream of thought, of consciousness or of subjecetive life. (James: 1896, 224)

শুধু কথাসাহিত্যে নয়, জেমসের এই অবিস্মরণীয় উক্তি চিত্রকলাতেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিশ শতকের শুরুতে গ্রাফ্‌টন গ্যালারিতে রজার ফ্রাই (১৮৬৬-১৯৩৪) ও ডেসমন্ড ম্যাকার্থি (১৮৭৭-১৯৫২) আয়োজিত ভ্যানগঘ (১৮৫৩-১৮৯০), গগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩), মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪), পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩), সেজান (১৮৩৯-১৯০৬) প্রমুখ Post impressionist শিল্পিগোষ্ঠীর চিত্রকলাতে একালে উদ্ভূত নানা তত্ত্ব বিচ্ছুরিত ভাবনা-আলোর প্রতিফলন ঘটে। ভার্জিনিয়া উলফের (১৮৮২-১৯৪১) অন্তর্মানস আলোড়িত হয় এই চিত্রকলা প্রদর্শনীর দ্বারা। তিনি ঘোষণা করেন, 'In or about December 1910, human character changed' (Peter : 2000, 47). মূলত ১৯১০-এর পর থেকেই মানুষ দুর্জ্ঞেয় মানবমনের বিসর্পিল গতিকে ধারণ করতে সচেষ্ট হয়। এরই সঙ্গে পাল্টে যায় সময়চেতনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণাটিও। ভিক্টোরীয় যুগের আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত পদ্ধতির পরিবর্তে কথাসাহিত্যিকদের অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে কাল পরম্পরাছিন্ন এবং ঘটনাপরম্পরাহীন এক অভিনব পদ্ধতি। *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে এই মনস্তাত্ত্বিক কালপট উঠে এসেছে চমৎকারভাবে। ডায়েরি ভিত্তিক উপন্যাস বলে চেতনার গতিকে ধারণ করবার চেষ্টা করেছে শ্রীবিলাসের চেতনাস্রোতে জাগরিত বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন মুহূর্তগুলির বিন্যস্ত শব্দরূপ। উপন্যাসে শচীশ ও দামিনীর

অস্তিত্বসংকট এবং ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন প্রধান হয়ে ওঠায় এখানে মনস্তাত্ত্বিক সময়চেতনাকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও, উপন্যাসে বহিরাঙ্গিক সময়চেতনার অভিঘাত ধ্বনিত হয়েছে সন্তর্পণে। কলকাতায় এসে শ্রীবিলাস চরিত্রের নতুন এক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি ঘটা, স্বদেশের মঙ্গলভাবনায় রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে তার ভলানটিয়ারি করা কিংবা পুলিশের অত্যাচারে জেলে যাবার উপক্রম হবার ঘটনায় এবং পজেটিভিস্ট জ্যাঠামশাইয়ের মানবতাবাদী ধর্মাচরণের বিষয়গুলোতে পরোক্ষভাবে সেই কালের স্কেচ রূপায়িত। বিশ শতকের প্রথম দিকের স্বদেশী আন্দোলন, দেশব্যাপী গণজাগরণ, হিন্দুমুসলমান বিরোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো সে কালটিকে সামনে নিয়ে আসে। বলা যাবে, শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশাই কিংবা শচীশ চরিত্রের মানসিক গঠন যুগোধর্মোৎসারিত।

রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসে কুমুদিনী আর বিপ্রদাস চরিত্র দুটির অস্তিত্বসংকটের মধ্য দিয়ে দুই কালের দ্বন্দ্ব রচিত হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজ ভেঙে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্তঃগহনে জন্ম নিচ্ছে এক নব্য বণিকশ্রেণি, যারা পুঁজির ধারক, যারা মূলধন সঞ্চয় করে যন্ত্র ও শিল্পবিস্তারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নতুন কালের ধারক হয়ে উঠছে ক্রমশ। কুমুদিনীর প্রাণমূলে নবজাগরণোত্তর মর্যাদাবোধের প্রাবল্যের পাশাপাশি সামন্ত মূল্যবোধসংবলিত সংস্কারচেতনাও রয়ে গেছে। অন্যদিকে, ঊনবিংশ শতকের নবোদ্ভূত বণিকতন্ত্রের প্রতিভূ মধুসূদন। এই দুই বিপরীত মনোভূমের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। কালসম্ভূত পারস্পরিক এই যোগ আর অযোগ মধুসূদন আর কুমুদিনীর ভেতর প্রবল অস্তিত্বসংকটের জন্ম দিয়েছে।

শরৎসাহিত্যে প্রযুক্ত সময়ের অনেকটাই উনিশ শতকের। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত সময় অধিকাংশক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজলালিত সনাতন বিশ্বাস ও মূল্যবোধসংক্রান্ত। সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মনে করেন, তাঁর সাহিত্যজীবনের কালপর্ব বিশ্লেষণে মোটামুটিভাবে তিন রকমের সময় মেলে। একটি উনিশ শতকের অন্তিম পর্ব, একটি বিশ শতকের প্রথম দুই দশক আর শেষেরটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্ব। সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য:

> বিশ শতকী জীবন-ভাবনার...প্রতিফলন ঘটেছে ব্রহ্ম-প্রবাসী শরৎচন্দ্রের লেখা বিভিন্ন উপন্যাসে। ...পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত...এবং গৃহদাহ। ব্যক্তিচেতনার বিকাশের বিরোধী যে অন্ধ যান্ত্রিক-সমাজ সত্তা, তার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের যে প্রতিবাদের মনোভাব পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতেই তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্ভুল পরিচয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তার ও সমাজসত্তার এই সংঘর্ষের ছবি ফুটে উঠেছে মুখ্যত নরনারীর প্রেম-চেতনাকে অবলম্বন করে। শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন, প্রেমের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার সমগ্রসত্তাকে, তার জীবনের প্রতি প্রবলতম তৃষ্ণাকে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে। আর সেই প্রেম-পিপাসা যেখানে চরিতার্থতা খুঁজে পায় না, নিষ্ঠুর সমাজসত্তা কিংবা আপন চিত্তের অন্ধ সংস্কারের প্রাচীরে যখন তা' প্রতিহত হতে থাকে বারবার, তখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নরনারীর ব্যক্তিত্বের গভীরতম সংকট-মুহূর্ত। (গোপিকানাথ, ১৯৯১: ৯৯)

ব্যক্তির আত্মিক-সংকট এবং সমকালের পটে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার সংগ্রাম এভাবেই শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) উপন্যাসে রূপ পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ অভিঘাতে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নেতিবাচক প্রভাব বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে হতাশা, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার জন্ম

দিয়েছিল। এই অভিঘাত পরোক্ষভাবে এসেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে । বিশেষ করে স্বাদেশিকতার বিষয়টি তিনি অনুভব করেছেন অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। *পথের দাবী* (১৯২৬) উপন্যাসে ভারতের বাইরের পটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন তরুণ-সমাজের হতাশার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী সমাজের আদর্শবোধের বিষয়টি উঠে আসে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ভেতর দিয়ে উপন্যাসে এইসব কালযন্ত্রণা রূপায়িত হয়। '*চরিত্রহীনে*-র...সতীশ ও বিশেষভাবে কিরণময়ী চরিত্রে, '*গৃহদাহ*'...উপন্যাসে সুরেশ ও বিশেষভাবে অচলার মধ্যে আধুনিক কালের অস্থিরতার যন্ত্রণা অভিব্যক্তি লাভ করেছে' (গোপিকানাথ, ১৯৯১: ৯৯)। *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *গৃহদাহ* (১৯২০) ও *দত্তা*-র (১৯১৭-১৯১৯) মত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের টানাপড়েন লক্ষ করা গেলেও Inward বা মনস্তাত্ত্বিক সময়ের ব্যবহার খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রের আত্মসংকটের ভেতরেই সমকালের প্রভাব উপলব্ধি করা যাবে। আত্মজীবনীমূলক *শ্রীকান্ত* (১৯১৭-১৯১৮-১৯২৭-১৯৩৩) উপন্যাসের কাল পরিবৃত্ত সর্বত্র একরৈখিক গতিতে চলমান নয়। মাঝে মাঝেই প্রবহমান সময়ের বেড়া ভেঙে শ্রীকান্তের চেতনা অতীত ও ভবিষ্যতের পথ হেঁটেছে। আর সেকারণেই হয়তো 'এই উপন্যাসের কোনো সুনির্দিষ্ট গড়ন নেই, এর এক মুখ খোলা–'ওপন্ এনডেড'' (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮: ৪৩)। যদিও ডায়েরি কাঠামোয় শ্রীবিলাসের চেতনাশ্রিত কালসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে, তবু *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে নায়কের আশৈশব বেড়ে উঠবার সময়খণ্ডকে লেখক ব্যবহার করেন ব্যক্তিমানসের গড়ে ওঠার প্রস্তুতিকাল হিসেবে। এ উপন্যাসের খণ্ড খণ্ড কাহিনিসমন্বিত শিথিলগ্রথিত সময়চেতনা একে অভিনবত্ব দিয়েছে। 'বিচ্ছিন্ন সময়, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, পরস্পর যুক্ত ও রহিত অসংখ্য নরনারী, পর্যটকের চলমানতা আর মোহতাড়িত সাময়িক স্থবিরতা, ব্যাকরণবিমুখ স্মৃতিসূত্রের উল্লম্ফনধর্ম' (ভীষ্মদেব, ২০০৭: ২১)–এ উপন্যাসকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। এছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে কাল অতিক্রমণে ঘটনা ও কালগত পারম্পর্য রক্ষা করেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্য যাঁদের হাতে ঋদ্ধ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্করই উপন্যাসে সময় ও ব্যক্তির অস্তিত্বসংকট নিয়ে কাজ করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *স্মৃতির রেখা* (১৯৪১) কিংবা *তৃণাঙ্কুর* (১৯৪৩)-এ তাঁর কালভাবনার প্রকাশ মেলে। *তৃণাঙ্কুরে* তিনি লিখেছেন:

> মনে হয় যুগে যুগে এই জন্ম মৃত্যু চক্র কোনো এক বড় দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে। হয়ত দু'হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ইজিপ্টে...পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে। cycle of birth and death-এই যিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন, আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েছি–তিনি এক বড় শিল্পী।....ওপারে মাধবদুবের বটগাছের সারি' বেলেডাঙার গ্রামের বেণুবনশীর্ষ সান্ধ্যবাতাসে দুলছে, আউশ ধানের ক্ষেতের আইলপথ বেয়ে কৃষকবধু মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসছে।...মনে হলো আমি দীন নয়, ক্ষুদ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়, আমি জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মা। দূর থেকে কোন সুদূরে নিত্য নতুন পথহীন পথে আমার গতি–এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোকে, এই সহস্র

> সহস্র শতাব্দী আমার পায়ে চলার পথ; নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হোক। (বিভূতিভূষণ, ১৩৯৩: ১৮১)

বিভূতিভূষণের জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মার সঙ্গে কাল এবং পথ বা স্থান-এই দুটি ধারণা যুক্ত। তাঁর উপন্যাসে সময়ের ব্যবহার ঘটেছে বেশ কয়েকভাবে। প্রথমত, তাঁর ব্যক্তিভাবনাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং বৃত্তাকার কালপ্রবাহের বীজ রোপিত। 'বিশেষকাল থেকে (point of time) অসীমকালে প্রসারিত' (অমরেন্দ্র, ১৪০৬: ৪৭) তাঁর উপন্যাসের কাল। এখানে 'point of time' হলো বর্তমান। উপন্যাসগুলোতে প্রকৃতির ভেতর বিধ্বংসী কালের এক স্বভাবস্বর উঠে আসে, যে কাল মহাকালের ভেতর প্রবিষ্ট। 'একদিকে তিনি বিরাট মহাকালের অন্তহীন গতিশীল রূপের ধ্যানে আত্মস্থ, অন্যদিকে সেই মহাকালের প্রেক্ষাপটে তারই বিপুলায়ত ডানার নীচে জীবনের অণু-কাল বা খণ্ড-কালের আনন্দ বেদনার অনুভবে তার চিত্ত বিহ্বল' (গোপিকানাথ, ১৯৯৬: ৯৭)। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য:

> তাঁর কাহিনীর মধ্যে যে-যুগের আভাস বা পরিচয় পাই, তাকে বর্তমান বলে অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া চলে, কিন্তু সে কেবলই বর্তমান নয়। বর্তমান যুগের কথা হয়েও সে যেন বর্তমানকে অতিক্রম করে মানুষের নিত্যকালের কাহিনী হয়ে উঠেছে। সমকালীন অন্যান্য অধিকাংশ লেখকের কাহিনীকে যখন বিশেষ একটি যুগের গল্প বলে মনে হয়,...বিভূতিভূষণের আদর্শবাদী কল্পনায় সে কাহিনী অনন্ত অখণ্ড এক মানবচেতনার রসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের দেশকালাতিশায়ী এই সামগ্রিক মানবচেতনা ও জীবন-কল্পনাই তাঁর সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। (গোপিকানাথ, ২০০৪: ৪২)

এক অখণ্ড অনন্তকালের কথকতায় বিভূতিভূষণ-সাহিত্য ঋদ্ধ। *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) ও *অপরাজিত* (১৯৩২) উপন্যাসদ্বয়েও সেই প্রবহমান, অখণ্ড ও অনন্তকালের আহবান ধ্বনিত। সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন মন্তব্য করেন, *পথের পাঁচালী-অপরাজিত* উপন্যাস:

> প্রবহমান সময়সমষ্টি-পরিস্রুত এক বিস্ময়কর মানবীয় পরিস্থিতিতে অপু নামক এক ব্যক্তি–অস্তিত্বের আত্ম-আবিষ্কার।...কালচালিত বহির্জগত ও সময়সৃষ্ট অন্তর্জগত অর্থাৎ Vastness of space and passing time এবং inner world এর পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে 'বল্লালী বালাই' অংশ অপুর ক্রমবিকাশের কারণে প্রকাশ-প্রকরণ হিসেবে উপন্যাসের সমগ্রসূত্রে গ্রথিত। (আকরম হোসেন, ১৯৯৭: ৭৫)

মহাকালের বিধ্বংসী স্বভাবস্বরের প্রকাশ ঘটেছে *পথের পাঁচালী*-র বল্লালী বালাই অংশে। লেখক এই অংশের ছ'টি পরিচ্ছেদে একরৈখিক সময়চেতনা ব্যবহার করেছেন। অপু চরিত্রের ভেতর কালের এই বিধ্বংসী রূপের প্রকাশ ঘটেছে । নিশ্চিন্দিপুরের নিসর্গ ও বীরু রায়, ব্রজ চক্রবর্তীর ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষ অপু চরিত্রের দৃষ্টিতে উপন্যাসে ধরা পড়ে:

> তাহার পর অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারী পুকুরে নাল পুলে বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে।...ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্তকাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীল কুঠির কত জন্‌সন, টমসন সাহেব কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। (বিভূতিভূষণ, ১৯৯৯: ৬)

গতিশীল এবং বিধ্বংসী মহাকালের এক প্রগাঢ় অভিঘাত এখানে অনুভূত, যার হিংস্র-মধুর ধ্বংসাত্মক প্রবাহে এবং চলমান সমকালের পটে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে অপু চরিত্র ক্রমবিকশিত হয়েছে। উপন্যাসদ্বয়ের সমাপ্তিতেও লেখক কালের প্রবাহমানতার সঙ্গে অপুর পথকে একাকার করে একে Open ended করে তুলেছেন। অনন্ত, অনিঃশেষ কালের প্রবহমানতার ভেতর দিয়েই অপুর এই পথপরিক্রমা।

শুধু *পথের পাঁচালী* উপন্যাসই নয়, কালের ঘূর্ণায়মান চক্রের প্রতীকী পরিচর্যার প্রকাশ ঘটেছে *অপরাজিত* উপন্যাসেও। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

ক. জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুতভাবেই আবর্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া! (বিভূতিভূষণ, ১৩৯২: ১২৫)

খ. দু' হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ইজিপ্টে–সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে নীলনদের রৌদ্র দীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্র ঘরের মা বোন ভাই বন্ধু বান্ধবদের দলে সে এক মধুর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে।–আবার হয়তো জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে...হাজার বছর পর আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে–তখন কি মনে পড়িবে এবারকার এই জীবনটা?...কতবার যেন সে আসিয়াছে...জন্ম হইতে জন্মান্তরে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া...বহু, বহুদূর অতীতেও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল...তাহার মনে হইল সে দীন নয়, তুচ্ছ নয়–এটুকু শেষ নয়। এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল এন্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ...–এই শত সহস্র শতাব্দী তার পায়ে চলার পথ। (বিভূতিভূষণ, ১৩৯২: ১৬৪)

ভারতবর্ষের অন্তঃহীন বৃত্তাকার এই কালের পটে অপু এক পথিকসত্তা। প্রবহমান কালের বিধ্বংসী স্বভাবচারিত্র্য অপুর ভেতর এক দার্শনিক, ভাবুকসত্তার জন্ম দেয়। নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে এক কলোনিয়াল শহরের বিকৃত বাস্তবতার পটে দাঁড়িয়ে তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। 'গতিশীল সময়ের কালো জলে নিমজ্জিত পারিবারিক ঐশ্বর্যস্মৃতি, অপুকে বিরুদ্ধ এবং অবরুদ্ধ সমকালে, বারংবার পৌঁছে দিয়েছে একধরনের আভিজাত্যমুগ্ধতায়।...অপুর আভিজাত্যমুগ্ধতা যখন সমাজ ও সময়ের রূঢ়তায় হয়েছে বিপন্ন-বিচূর্ণিত, তখনই তার চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে ...নৈঃসঙ্গ্য এবং নির্জনতা'; (আকরম হোসেন, ১৯৯৭: ৭৮)। এ উপন্যাসে 'অপুর জীবনযাপনও বিস্তীর্ণ, জটিল, ঘটনাবহুল, দ্বন্দ্বসংঘাতময়, এবং হার্দ্য রক্তক্ষরণমূলক। সাম্রাজ্যবাদী শোষণচালিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো-রূপ কল্যাণ-মূল্যবোধ-অস্তিত্বগ্রাসী কংসের বিরুদ্ধে অপু যুদ্ধ করেছে;...মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন শাহরিক ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, বিকৃতি এবং জীবনার্থহীনতার সঙ্গে সে সংঘাতে লিপ্ত (আকরম হোসেন, ১৯৯৭: ৭৮)। যদিও, *অপরাজিত* উপন্যাসে সমকালের অভিঘাত তেমনভাবে অনুরণিত হয়নি বলে মনে করেন সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী। চরিত্রের যে অস্তিত্বসংকট এ উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে, সেটি দেশকালজাত হলেও তার প্রকাশ পুরোপুরি ব্যক্তিক। এমনকি কখনো কখনো এমনটাও বলা যাবে যে, 'যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে ওই চরিত্রগুলির পরিস্ফুট হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, বিভূতিভূষণের রচনায় সেই 'স্বাভাবিক' ঘটনাটুকু চোখে পড়ে না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে বাস্তব চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ধরলে, বিভূতিভূষণের সৃষ্ট অধিকাংশ নরনারীকে ঠিক যেন পরিপূর্ণ চরিত্র বলা চলে না।...তারা যেন লেখকের এক একটি স্মৃতি-মন্থন-করা 'impression' (গোপিকানাথ, ২০০৪: ৪৫)। কাজেই চরিত্রের অস্তিত্বসংকটটি

কালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফেনিয়ে ওঠে না। বরং, একে ব্যক্তিক বলেই আখ্যায়িত করার পথ প্রশস্ত হয়। '১৯১৪ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে কলকাতার কলেজের ছাত্র অপুর মনে সমকালীন রাজনৈতিক উত্তালতা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা, অসহযোগ আন্দোলনের কোনো চিহ্ন মুদ্রিত দেখতে পাওয়া যায় না' (সুমিতা, ২০১০: ৮১)। প্রথম বর্ষে অপুর কাপড় কেনার সূত্রে পাঠক জেনে যান, ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বেঁধেছে। নানা অনুষঙ্গ বিবেচনা করে অনুভব করা যাবে, অপুর ঊনত্রিশ বছর বয়সে তেইশ বা চব্বিশ সন; অস্থির এক সময়পট অপুর চেতনায় কতটা ছাপ ফেলেছে, উপন্যাসে সেটি অনুভূত হয় না। উপলব্ধি করা যাবে, 'অপু ইতিহাস পড়ছে কিন্তু...অনুভব করছে না কোনো রকম শোষণ ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক। ইতিহাস থেকে সে শুধু আহরণ করে নিচ্ছে কালচেতনার একটি নির্দ্বন্দ্ব দার্শনিক দিক' (সুমিতা, ২০০৩: ৭২)। সমালোচকের ভাষায়, 'বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে ট্র্যাজিক ইতিহাসকে...এমন একটি স্মৃতিময়তায়, য়ুটোপিয়ার আবরণে আঁকেন যে এর নিহিত রাজনৈতিক ও ইতিহাসগত তাৎপর্য লুকিয়ে থাকে' (পার্থপ্রতিম, ১৯৯২: ৫৫)। কাজেই অপুর দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের ভাষ্যরূপ শেষপর্যন্ত দার্শনিক ভাবাদর্শেই আটকে থাকে।

বহিরাঙ্গিক সময়চেতনা ব্যবহারে *পথের পাঁচালী* কিংবা *অপরাজিত* উপন্যাসে সুনির্দিষ্টভাবে সন ব্যবহৃত হয়েছে। সমালোচক সুতপা ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণের দু'একটি উপন্যাসের ভেতর কাল ও চরিত্রগত সাযুজ্য কিংবা তারতম্য দেখাতে গিয়ে মন্তব্য করেন:

> পথের পাঁচালী'তে যে অতীত ঘুমন্ত, 'ইছামতী'তে তাই-ই বর্তমান। 'পথের পাঁচালী'তে শিশু অপু নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখে...'ইছামতী'তে সেই কুঠি জীবন্ত–...'পথের পাঁচালী'তে ঐতিহাসিক সময় অনুপস্থিত, সময়ের চলন সে উপন্যাসে চিহ্নিত ঋতু বা মাসের উল্লেখে, উৎসব অনুষ্ঠানের উল্লেখে। আর 'ইছামতী'র আখ্যান শুরুই হয় ইতিহাসের তারিখ দিয়ে: '১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েছে সবে'। সময়ের চলন বোঝাতে গিয়ে এ উপন্যাসে আখ্যানের মাঝে মাঝেই উল্লেখ করা হয় ইতিহাসের ঘটনাবলির কথা। 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুর বহির্জগতের সঙ্গে, রাজনীতির জগতের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য, কিন্তু ইছামতীর 'মোল্লাহাটি'তে বহির্জগতের ঝাপট, রাজনীতির ঝাপট প্রায়ই এসে ধাক্কা দেয়।...ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিতুমীর আর তার সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ আর নীলবিদ্রোহ–দুয়েরই মানচিত্রে আছে 'মোল্লাহাটি' আর ইছামতী'তে স্থান পেয়েছে দুটি বিদ্রোহই। (সুতপা, ১৯৯৫, ৩৫-৩৬)

ইছামতী (১৯৫০) উপন্যাসে তাই দুর্নিবার এক কালচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিভূতিভূষণ। বহিরাঙ্গিক সময় এর উপজীব্য। প্রবহমান, অনন্তকালের প্রতীক হয়ে উঠেছে ইছামতী নদী। সমালোচকের ভাষায়:

> 'ইছামতী'-র একেবারে সূচনায় ও সমাপ্তি-অংশে নদী-প্রবাহের সঙ্গে সময়ের গতিশীলতার একাত্মতার অনুভবকে বাঙ্ময় করেছেন লেখক। শতাব্দীর অন্তরাল রচনা ক'রে লেখক ইছামতীর তরঙ্গ প্রবাহে প্রতিফলিত দেখেছেন অতীত থেকে বয়ে আসা সময়ের স্তরে স্তরে জীবনের বিচিত্র রূপ-রূপান্তর। গত শতাব্দীর খণ্ডকালের স্বার্থ লোভ-লালসা-হিংসার বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে এক মহাকালের আনন্তিক প্রেক্ষণীতে নিরীক্ষণ করতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণ। উপন্যাসটিতে দূর অতীতকে কাছ থেকে খণ্ডিত করে যেমন দেখেছে, তেমনি আবার সব মিলিয়ে অখণ্ড বিশাল কালপ্রবাহ রূপেও উপলব্ধি করেছেন ঔপন্যাসিক। আর তাই দেখি, রাজারাম, গয়ামেম, শিপটন সাহেব, রামহরি কবিরাজ এমন কি, তিলু-বিলু-নীলুদের সুখ-দুঃখের প্রকীর্ণ

> কাহিনীর পিছনে রয়েছে ভবানী বাঁড়ুজ্জের দূর-প্রসারী মহাকাল-চেতনা, অনন্ত জীবনস্রোতের মহৎ অনুভব। (গোপিকানাথ, ১৯৯৬: ১০৬)

কাজেই সমকালের সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে বয়ে চলা এক অনন্ত, অখণ্ড কালের অস্তিত্ব এ উপন্যাসে গাঢ়বদ্ধ। *আরণ্যকের* (১৯৩৯) ভেতরেও অস্তিত্ববান এক চিরায়ত কাল। লেখকের মনে হয়, 'কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চ নদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকমই ছিল' (বিভূতিভূষণ, ১৪০৫: ৫৬)। বিভূতিভূষণের জন্মজন্মান্তরবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে বৃত্তাকার সময় চেতনার বিষয়টিযুক্ত। বিভূতিভূষণের কালচেতনা এবং জন্ম-জন্মান্তরের এই পথিক আত্মার স্বরূপ মনে করিয়ে দেয় বাংলা কবিতার আরেক শক্তিমান কবি জীবনানন্দ দাশকে (১৮৯৯-১৯৫৪)। জীবনানন্দের কবিতায় ইতিহাসচেতনা কিংবা জন্মান্তরবাদের প্রগাঢ় প্রকাশ পাঠক অনুভব করেন। কবির "অস্তচাঁদে" কবিতাটি যেন *আরণ্যক* উপন্যাসেরই কাব্যপঙক্তিমালা। মহাকালের প্রবহমানতায় এই কবি বার বার জন্মাবেন পৃথিবীর নানা সভ্যতার বুকে–এই আকাঙ্ক্ষা "অস্তচাঁদে" কবিতায় ধ্বনিত। কবির এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃত্তাকার সময় ভাবনার বীজ। তাঁর কালচেতনায় একরৈখিক ও বৃত্তাকার–এই দু'টি ধারণারই মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে। সময়চেতনা সম্পর্কে যে মন্তব্য তিনি করেছেন তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, সেগুলো তাঁর কাব্যসাধনার মৌল বীজ বলে ধরা যায়। সময় যে প্রত্যাবর্তনশীল–সময় যে বলয়ের মত হাজার হাজার বছর ধরে খেলা করছে, ঘুরছে...তার প্রমাণ মেলে "হাজার বছর শুধু খেলা করে" কবিতায়। "শ্যামলী" কবিতাতেও এরকম গতিশীল সময়ের কথা মেলে: 'অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল; মানুষকে স্থির–স্থিরতর হতে দেবে না সময়'। তাঁর কবিতায় বহিরাঙ্গিক সময়চেতনার প্রকাশ ঘটেছে সমকালীন যুদ্ধাহত, তরঙ্গক্ষুব্ধ পৃথিবীর রূপনির্মাণে। "সুচেতনা" কবিতার 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;' কিংবা "রাত্রির কোরাস" কবিতার 'নগরীর–পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম/ তবুও কেবলি ভেঙে যায়/ স্প্লিন্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।/ পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ; / পূর্বদিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;/ আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;/ ইয়াঙ্কীর লেনদেন ডলারে প্রত্যয়;–' অথবা, "অদ্ভুত আঁধার এক" কবিতার 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, / যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা; /.../ এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় / মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/ শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়'–কবির এইসব পঙক্তি মানবঅস্তিত্বে আঘাতের কথাই ব্যক্ত করে। একারণেই জীবনানন্দ ইতিহাসের কাছে ফিরে যেতে চান। তিনি মনে করেন 'ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি/ ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মত শত শত/ শত জলঝর্ণার ধ্বনি'।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কালের মাত্রাগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। তিনি তাঁর উপন্যাসে কালের বিবর্তিত ইতিহাসকে তুলে এনেছেন। সামন্তশ্রেণির ভাঙন আর নব্য পুঁজিবাদী শ্রেণি-উত্থানের দ্বান্দ্বিক রূপ হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাউৎসারী সময়চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা* (১৩৮৭) গ্রন্থে তিনি সময় সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন:

> অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমিলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ–আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত-দৃষ্টি শুভ্রবাসপরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ: আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সে-কাল আর এ-কালের মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই। (তারাশঙ্কর, ১৩৮৭: ১২৪)

তারাশঙ্করের উপর্যুক্ত বক্তব্যে একাল আর সেকালের দ্বন্দ্বহীনতার কথা ব্যক্ত হলেও কালের অমোঘ উত্থান-পতনের দ্বন্দ্ব তার উপন্যাসে সুপ্রকাশমান। 'সামন্ত সম্প্রদায়ের অনিবার্য পরাজয়কে সময় ও সমাজের বিস্তৃত ও বাস্তব পটভূমিতে' (রঞ্জিতকুমার, ১৯৮৭: ১০৫) রূপায়িত করেছেন তিনি। তাঁর *চৈতালী ঘূর্ণি* (১৯৩১), *কালিন্দী* (১৯৪০), *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* (১৯৪২, ১৯৪৪), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৫১) কিংবা *কীর্তিহাটের কড়চা* (১৯৬৭) উপন্যাস সম্পর্কে এক কথায় বলা চলে, উপন্যাসগুলো সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস' (ভীষ্মদেব, ২০০৭: ৪১), কিংবা 'সামাজিক ইতিহাসের মহাকাব্যিক উপন্যাস' (ভীষ্মদেব, ২০০৭: ১১৪)। ব্যক্তিগত জীবনেই তারাশঙ্কর রূপান্তরিত কালের ইতিহাস লালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন:

> একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য ও মহিমা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, আবার অন্যদিকে সেই বিরাট ভগ্নস্তূপের উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আধুনিক পশ্চিমী নগরতন্ত্রের বনিয়াদ, ব্যক্তিনির্ভর এক নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজবোধ।...রক্তের মধ্যে তিনি এই দুই যুগের, এই দুটি বিপরীত কাল স্রোতের নিগূঢ় আকর্ষণ অনুভব করেছেন।...তাঁর ফিউডাল রক্তস্রোতের উপর আছড়ে পড়েছে এই নূতন কালের দুর্বার প্রসঙ্গ। (গোপিকানাথ, ১৯৯১: ১২২)

উপলব্ধি করা যাবে, কালের এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শ্রেণিগত অস্তিত্বসংকটের জন্ম হয়েছে, পরিবর্তে ব্যক্তিমুখ্য একটি শ্রেণি অস্তিত্ববান হয়ে উঠছে। ব্যক্তিনির্ভর পুঁজিবাদী শ্রেণির উত্থান ও তাদের অস্তিত্ববান হয়ে উঠবার কথকতা তাই তারাশঙ্করের উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। সমাজ বিবর্তনের এই ইতিহাস রচনায় তারাশঙ্কর বহিরাঙ্গিক সময়চেতনাকেই বেছে নিয়েছেন। কোনো কোনো উপন্যাসে এসেছে সমকালীন রাজনীতি, আবার কোনো কোনোটিতে তিনি কৌম জীবনের কথকতা রচনা করেছেন। 'যে কালের মানুষ তিনি সে কালেরও তখন পূর্ণ পর্যায়, তারপরে এসেছিল কালান্তর; যেসব বিষয়ের প্রতি তারাশঙ্করের নাড়ির টান যেমন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি, সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র, জাতীয় আন্দোলন, গান্ধীবাদ, অহিংসা বনাম কম্যুনিজম, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমবেদনা, তাদের মানবিক উত্তরণ–এসব উদাহরণ-প্রাচুর্যের সঙ্গে ওই উপন্যাসগুলিতে দেখা দিয়েছিল' (গুণময়, ১৯৮৭: ৪৯)।

কালিন্দী উপন্যাসে সামন্তশ্রেণি-কৃষজীবীশ্রেণি-আদিবাসী আর উঠতি পুঁজিপতিদের ভেতর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন লেখক। এইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কালের অমোঘ রূপান্তরপ্রক্রিয়ায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়ে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে। অন্যদিকে, তাঁর *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯) উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের চেয়ে বিপ্লব এবং অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র উঠে আসে। সমগ্র বিশ্বে আন্দোলিত এই জীবন তরঙ্গের ঢেউ ব্যক্তিমানুষের তুলনায় সমষ্টিজীবনের ওপরেই আঘাত হানে। সমালোচক মন্তব্য করেন, 'তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে সমাজ সচেতনা ও গ্রামীণ জীবনের অপ্রতিরোধ্য ভাঙনের কথা প্রকাশিত; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী ও

পরবর্তীকালীন উপন্যাসে সামন্তব্যবস্থায় সমান্তরাল ধারার সঙ্গে আছে নতুন বণিক সভ্যতার রূপায়ণ, মহাযুদ্ধজনিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনজনিত জীবনব্যবস্থার বিশ্বস্ত চিত্রণ...অভিজ্ঞতালব্ধ যন্ত্রণা এবং ইতিহাসের বোধ' (ধ্রুবকুমার, ১৯৯৯: ৪৮৯)। এই প্রেক্ষিতে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসটিকে বলা যেতে পারে 'দেশকালপাত্রের দ্বান্দ্বিক জীবনায়ন' (আকতার কামাল, ২০১২: ১৫)। উপন্যাসে 'করালীই সেই নায়ক–যে কাজ করতে কারখানায় যায়, ভেঙে ফেলে কাহারদের পরম্পরা ও ট্যাবু।...প্রৌঢ় বনওয়ারীর নেতৃত্বের যে সংঘাত তা ঔপনিবেশিক বাংলার ভূমিজীবনে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী প্রতিষ্ঠার কাটাকুটিতে বিপর্যস্ত–এটাই উপন্যাসের মূল স্বর। ইতিহাসকেই পথ ছেড়ে দিয়ে উপকথার পূর্বতন নেতৃত্ব বদল হয় বনওয়ারী থেকে করালী-তে' (আকতার কামাল, ২০১২: ১৮)। উপন্যাসে এই নেতৃত্ববদল সময় বদলের কথাই বলে। 'রূপান্তর-উন্মুখ সমাজের অন্তস্তলীয় গতিশীলতার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন ভূমি ও মানসবিশ্বের প্রবহমান সময়স্রোতে অপ্রতিরোধ্য মহাশক্তির অনুশাসন' (ভীষ্মদেব, ২০০৭: ৫৮)। এভাবেই ৪৭ পরবর্তী আধা সামন্ততান্ত্রিক এক ভারতবর্ষে মহাজনী ব্যবসাদারী এক প্রবল ক্ষমতাধারী শ্রেণির জন্ম হতে থাকে। উপন্যাসে মেলে এই কালান্তরের কথকতা:

> খাঁ খাঁ করছে চারদিক, খাঁ খাঁ করছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির বাঁশবন নির্মূল হয়ে গিয়েছে।...আকাশের কোলে এতটুকু সবুজ নাই।...গাছতলায় বসে চোখে তন্দ্রা নামবার অবকাশ হবে না, ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার স্বপ্ন রচনার ঠাঁই রইল না।...বাবাঠাকুরের থান, আর তার মধ্যে ছিল আটপৌরে-পাড়ার সেই বটগাছটি, যার তলায় আলো নিবিয়ে দিয়েছিল কালোশশী, যার তলায় সুবাসীকে দেখে তার কালোশশী বলে ভ্রম হয়েছিল। কই সে গাছ? বাবাঠাকুরের থানই-বা কোন দিকে? ওটা কোন্ জায়গা? এত মোটর গাড়ি কিসের? কাদের? চন্ননপুরের কারখানাটা এগিয়ে এল? (তারাশঙ্কর, ১৩৮৯: ৪৬৩-৪৬৪)

কাহারকুলের পরিবর্তমানতার ইতিহাস এখানে উচ্চকিত। সমালোচকের ভাষায়:

> ...যুগ পরিবর্তনের নতুন...ইতিহাসের গোড়ায় জল ঢালছে নতুন কালের প্রতিনিধি করালী।...করালীর মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে সক্ষম হন নতুন কাল, নতুন সম্ভাবনা এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে ভেঙে পড়ছে নীতি-নৈতিকতা।...সুবাসীকে কেন্দ্র করে বনওয়ারী-করালী দ্বন্দ্ব চরমে গিয়ে পৌঁছে। দুইকালের দুই প্রতিনিধি মুখোমুখি দাঁড়ায়।...পরাজয় ঘটে বনওয়ারীর। পরাজিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে পুরনো কাল, পুরনো বিশ্বাস। (জুনান, ২০১২: ৯৩)

দুই কালের দ্বন্দ্বে ক্ষতাক্ত মানুষের অস্তিত্বসংকটের কথকতা এখানে মূর্ত। করালী আর বনওয়ারীর মধ্যকার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত জয়ী হয় নতুন কালের প্রতিভূ করালী। বনওয়ারী তথা হাঁসুলী বাঁকের কৌমজীবনে নতুন কালের হাত ধরে সন্তর্পণে ব্যক্তির অস্তিত্বসংকটের বীজ চারিয়ে যায়। তারাশঙ্কর বস্তুনিষ্ঠভাবে তাঁর উপন্যাসে 'শ্রেণিচেতনা, শ্রেণি-সংগ্রাম, সামাজিক বাস্তবতা এবং নতুন কালের সঙ্গে ব্যক্তির অন্তর্লীন আত্মবিরোধের বিচিত্র ও বিভিন্ন মাত্রা স্পর্শ করতে পেরেছিলেন' (সুমিতা, ২০১০: ৮৩)। তবে ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসা তারাশঙ্করের উপন্যাসে ব্যক্তিগত নয়, বরং একটি গোষ্ঠীজীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার সংগ্রাম তাঁর উপন্যাসগুলোতে প্রায়শই বিষয় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> জীবনের পুরাতন বিন্যাসের ছকে রূপান্তরের আঘাত হানবার জন্যই তারাশঙ্করের নায়ক-চরিত্র ব্যবহৃত হয়। রূপান্তরের ফলে পুরাতন ছকে আঘাতের প্রতিক্রিয়া বলার জন্য তারশঙ্কর ন্যায়তই ব্যস্ত। কিন্তু সে রূপান্তর সৃজনের-মাধ্যমে যে মানুষগুলো যেমন করালী, অর্থহীন–তারা যেন অনেকটাই ইতিহাসের যন্ত্র। করালী, অর্থহীন বা শিবনাথের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এদের মানসলোকেও যে একটা দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন চলতে পারে এবং তারও একটা নাটকীয় সার্থকতা থাকা সম্ভব–তারাশঙ্কর সে-সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন।...একমাত্র 'কবি' উপন্যাসের নায়ক ছাড়া তারাশঙ্করের প্রধান নায়কদের কারো অন্তর্দ্বন্দ্বই যথার্থ প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। (সরোজ, ১৯৭১: ২৫৪)

দেশকালের পরিবর্তমানতার সঙ্গেই চরিত্রগুলো পথ হেঁটেছে তাঁর উপন্যাসে। 'মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী এবং অন্তঃশক্তি ও বহিঃশক্তির শাসনশোষণের পরিপ্রেক্ষিতে যে জীবন প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সমাজকে অতীতে প্রভাবিত করেছে...অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন আদর্শবোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়...জীবন কোথায়ও অস্পষ্ট নীতি প্রধান হয়ে উঠেছে' (সমরেন্দ্র, ১৯৮৯: ১৪৩)।

কবি উপন্যাসে নিতাইচরণের কবিয়াল থেকে কবিসত্তায় উত্তরণের ইতিহাস রচনায় কখনো কখনো লেখককে Flash back, Flash forward পরিচর্যারীতির সাহায্য নিতে হয়েছে। নিতাইয়ের পূর্ব জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্নতা বর্ণনায় লেখককে যেমন অতীতে ফিরে যেতে হয়েছে, তেমনি একজন কবি হবার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষায় তাঁকে ভবিষ্যতের স্বাপ্নিকতায় বিচরণ করতে হয়েছে। এভাবেই *কবি* উপন্যাসের কালিক বৃত্ত রচিত। অন্যদিকে, 'কীর্তিহাটের কড়চা–য় কালিক ইতিহাসকে ফ্রেমবদ্ধ ক'রে এপিক সম্পূর্ণতা দিলেন তারাশঙ্কর। সামন্তসমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও অবক্ষয়ের এ ধারাভাষ্য বিশাল দেশকালের ক্যানভাসে রূপান্বিত হলো এই উপন্যাসে' (ভীষ্মদেব, ১৯৯৮: ৩২৪)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কালের দ্বৈরথকে চেতনায় ধারণ করে হয়ে উঠেছেন যুগন্ধর। তাঁর রচিত চরিত্রগুলোও তাঁর মতই কালচেতনায় জারিত। সময় ও 'সমাজের রূপ রূপান্তর এবং ব্যক্তি ও সমাজচৈতন্যের পরস্পরিত-সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর উপন্যাস এপিক-বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। সমকালীন রাজনীতির গতিচিহ্ন রূপায়ণের দক্ষতায়, সময়ধর্ম ও যুগধর্মের স্বনিষ্ঠ অনুধ্যানে...তারাশঙ্কর-সাহিত্য বাঙালির সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের চিরায়ত শিল্পসাক্ষ্য' (ভীষ্মদেব, ১৯৯৮: ৩২৪)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমকালের সম্পর্কভাষ্য রচিত হয় নির্মোহভাবে। সমালোচকের ভাষায়:

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পাল্টানো পৃথিবীটার ভিতরের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। আধুনিককালে পৌঁছুলো যে পৃথিবী–রক্তে ডোবা, দ্বন্দ্বে ফাটোফাটো, সংকটে সন্ত্রাসে জর্জর, নতুন ভাগ-বাঁটোয়ারায় ভয়াবহ সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষমাণ এক পৃথিবীর পটে নিজের দেশ এবং সমাজকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি, মানুষকে দেখেছিলেন তার অস্তিত্বের কঠিন ফাঁদে আটকানো। (হাসান আজিজুল, ১৯৯৮: ৫০)

বৈরি-সময়পরিস্রুত অভিজ্ঞতার আলোকে মানিক তাঁর উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচকতায় তাই জারিত হলো তাঁর *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) উপন্যাস। উপন্যাসটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অভিঘাতে নাগরিক মধ্যবিত্তের অনিকেত মানসজটিলতা আর দ্বন্দ্বদীর্ণ আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিরূপ। লেখক মনে

করেন, এ উপন্যাসের হেরম্ব, মালতী, অনাথ ও আনন্দ একেকটি মানুষের 'প্রজেকসন', মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ। তবু এদের মনোলোকে অস্বাভাবিকতার গূঢ় পদচারণা এদের অবাস্তব করে তোলে। আর এই অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে একটি তরঙ্গায়িত কালের কথকতা:

> উপন্যাসটির কাহিনী ও চরিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে আধুনিক যুগের মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গ মনের অনিকেত চেতনা–সব মিলিয়ে জীবন ও মানবিক সম্পর্কের অর্থহীনতা ও নিষ্ফলতার বোধ। উপন্যাসে এই জীবনবিষয়ক গূঢ় বক্তব্য ভাষা পেয়েছে কিছুটা হেরম্বের মননধর্মী চিন্তায় ও হেরম্ব-আনন্দের কথোপকথনে এবং বাকিটা রোম্যান্টিক কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনায়। (গোপিকানাথ, ২০০৮: ৯৪)

মনোজটিলতা, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এ উপন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমালোচক মনে করেন, 'কলোনিয়াল জীবনব্যবস্থা পুরোনো সম্পর্ককে যেমন বিষাক্ত করে দেয়, তেমনি নতুন সম্পর্ক গড়ার আকাঙ্ক্ষাকেও হত্যা করে।...এরা প্রত্যেকেই অস্তিত্ববাদী অবস্থানের ঘেরাটোপে আটকে পড়া এক-একটি ব্যক্তিমানুষ' (আকতার কামাল, ২০০৮: ১৪৪)। কলোনির ছাঁচে গড়া ব্যক্তিচেতনা এভাবেই কালের অভিঘাতে অস্তিত্বসংকটে আটকে পড়ে।

পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানসিকতালালনকারী শশীর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের পাশাপাশি গাওদিয়া গ্রামের মানুষের অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ উন্মোচিত। সমকালে প্রবহমান স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট, শোষণের কথকতা কিংবা তরঙ্গায়িত কালের স্রোতে শশী কিংবা শ্যামা অথবা হেরম্বের মত চরিত্রগুলোকে উত্তাল হয়ে উঠতে দেখা যায় না। কালের উত্তাল-তরঙ্গ বরং চেতনায় লালন করে তারা অস্তিত্বগত এক গভীর বিষণ্নতায় ভোগে। শশী অনুভব করে, গাওদিয়াকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা শশীদের নেই। নিয়তির পুতুল হয়ে তাকে অক্ষমতার গণ্ডীতে বাস করতে হয়। সমালোচক মনে করেন:

> *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র গাঁওদিয়া কলকাতার বৈপরীত্যে সাজানো। এই দুই বিন্দুর মধ্যে শশী অহরহ আন্দোলিত।...সে যেন হয়ে উঠেছে আমাদের ঔপনিবেশিক সমাজজীবনে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শেকড়হীনতার প্রতিভূ। শশীর সমস্যার জটিলতার মধ্যে ব্যক্তিগত মাত্রা ছাড়িয়ে সামাজিক মাত্রার ছোঁয়া লাগে–তার মধ্যে নিহিত থাকে গ্রাম্য এবং শহুরে মনের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব সামঞ্জস্যের চেষ্টার প্রচ্ছন্ন কাহিনী। ছিন্নমূল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের সামাজিক চেহারা শশীর মধ্যে রূপ পায়। (অশ্রুকুমার, ২০১২: ২২০)

অন্যদিকে, *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসে দরিদ্র এক জেলেপল্লীর কঠোর সংগ্রামী জীবনের কথকতা লিপিবদ্ধ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন প্রায় আট ন'মাসের সময়সীমায় পদ্মা তীরবর্তী এক জেলেপল্লীর পালাবদলের রূপরীতি, তাদের জীবন টিকিয়ে রাখবার সংগ্রাম আর সময়ের প্রবহমানতা একাকার হয়ে আছে উপন্যাসে। সমালোচক এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> মানিক বরঞ্চ আঁকেন কেতুপুরের ছবি। এক বদ্ধ, অবসাদগ্রস্ত জীবন, কুবেরের পঙ্গু বউ মালার মতই। পদ্মানদীর মাঝিও বিষণ্ন ইতিহাসের পুতুল। এ ইতিহাসে হোসেন মিয়া যেন ঐ অবসাদ ভাঙা, স্বপ্ন দেখার

> মাধ্যম...জাতীয় আন্দোলন বলে যা চলছে তা মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনে না। মানুষের সময়ও ইতিহাসের হাতে বদ্ধ, যেন নিয়তিতাড়িত মানুষকে স্বাধীনতা দেবে না। শশীর মতই কুবেরেরও সিদ্ধান্ত নির্ধারণের কোনো স্বাধীনতা নেই। (পার্থপ্রতীম, ২০০৮: ১০৭)

এখানে সময়ের পরোক্ষ পদচারণা ঘটে। মূলত, ব্যক্তির অন্তর্গূঢ় মানসজটিলতা ও দ্বন্দ্বই এইসব উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সমাজ রূপান্তরেরও একটি ইঙ্গিত মিলছে সন্তর্পণে। কেতুপুরের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে হোসেন মিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই কেতুপুরের মানুষ ক্রমশ আস্থাবান হয়ে পড়ে। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী মনে করেন:

> পদ্মানদীর পারের কেতুপুর গ্রামের জমিদার মেজোবাবুর কাছে প্রজারা বাঁধা আছে।...সেখান থেকে ছিন্ন হয়ে তার প্রজারা হোসেন মিয়ার প্রজা হতে চলেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও আসলে তারা প্রজা নয়–হয়ে উঠছে শ্রমিক। মাঝি, জেলে, চাষির জীবন ছেড়ে গ্রাসাচ্ছাদন ও একটি ঘরের বিনিময়ে ময়না দ্বীপে জমি চাষ করে সে মজুরিটুকুই পাবে, পাবেনা উৎপাদনের অংশ। আসলে সামন্ততন্ত্র ভেঙে বেরিয়ে আসা ধনতন্ত্রের নিয়মগুলিই হোসেন মিয়া চরিত্রে প্রতিফলিত।...ঔপনিবেশিকতার সামন্ততন্ত্রে প্রজারা দিনের পর দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে অথচ পরিত্রাণের উপায় জানে না। তাদের অস্তিত্ব যখন ভেঙে পড়ার মুখে তখনই দেখা দেয় হোসেন মিয়া। চতুর ব্যবসায়ী। নির্ভুল ক্যাপিটালিস্ট। সামন্ততন্ত্রের জীর্ণতা ভেঙেই ধনতন্ত্রের যাত্রা শুরু। একটি পর্যায়ের পর আর একটি পর্যায়। (সুমিতা, ২০১২: ১৮৭, ১৮৯)

এই পর্যায়ের পর পর্যায় সময় ও সমাজের ক্রমরূপান্তরকেই চিহ্নিত করে।

চিহ্ন (১৯৪৭), *জীয়ন্ত* (১৯৫০) কিংবা *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১)–এইসব উপন্যাসে পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সম্যসার প্রেক্ষাপটে মানুষের মানবেতর জীবন, তাদের সংগ্রাম-প্রতিরোধ এবং মানসদ্বন্দ্ব রূপায়িত। 'প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক উত্তাল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ের সাক্ষী হয়ে আছে তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলো' (আজিজুল হক, ২০১২: ৪১৫)। স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, ১৯৪৬ এর নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলি দিবস উপলক্ষে ছাত্র-যুবকের বিশাল বিক্ষোভ-মিছিল এবং মিছিলে পুলিশের গুলিচালানোর ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই *চিহ্ন* উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত। সময়ের অভিঘাতে কোনো একক ব্যক্তির আন্তর্জাগতিক দ্বন্দ্ব বা সংকটের কথকতা রচিত হয়নি এ উপন্যাসে। সমালোচকের ভাষায়:

> মাত্র কয়েকটি চরিত্রের আশা-হতাশা, প্রত্যয়-সংশয় ও প্রেম-প্রেমহীনতার কাহিনী এই উপন্যাসে নেই–পরন্তু মিছিলের ও ব্যাপক গণ-সংগ্রামের জোয়ারকে কেন্দ্র করে এই বইটি রচনা করতে গিয়ে লেখক বহু চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন এবং তারা এক-একটি স্কেচের মত হলেও সামগ্রিকভাবে একটি যুগ যুগের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে পেরেছে। রাজনৈতিক দালালদের মুখোশ খুলেছেন অমৃত চরিত্রের মাধ্যমে, অভিজাত সমাজের নোংরামি উদঘাটিত করেছেন দাশগুপ্ত, পিটার সাহেব, ঘোষ সাহেব প্রভৃতি এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের অপকর্মের সত্যনিষ্ঠ চিত্রণে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের চরিত্রায়ণের মাধ্যমে লেখক প্রকৃতপক্ষে আগামী দিনের বলিষ্ঠ দুর্বার সত্যসন্ধ মুমূক্ষু মানব সম্প্রদায়ের ছবি এঁকেছেন।...উপন্যাসের সময়সীমা অতি পরিমিত–আগের দিন প্রচণ্ড হাঙ্গামা, অতঃপর রাত্রি, পরদিন সর্বাত্মক ধর্মঘট ও বিকেলে শোভাযাত্রা। (নিতাই, ১৯৯৯: ১১৫)

এক ঐতিহাসিক কালপট থেকে একটি খণ্ড সময় তুলে এনে লেখক এই উপন্যাসটির প্লট রচনা করেছেন, যেখানে জনসমষ্টির অস্তিত্বসংকট সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত।

শহরতলী (১৯৪০, ১৯৪১) পর্বের উপন্যাসগুলোতে সমসাময়িক কালের পটে বৃটিশ শাসকের বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি ও অর্থনীতির ফলে সৃষ্ট বেকারসমস্যা, জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি কালোৎসারিত হতাশার চিত্র আঁকেন লেখক। কালের এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ পর্যায়ক্রমে মানিকের উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অস্তিত্ববাদী হয়ে ওঠার ক্রম চিহ্নিত করেন এভাবে:

> মানিকের অস্তিত্ববাদী নায়ক অন্তত তিনটি স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে:
>
> ক) প্রথম পর্যায়ের অস্তিত্ববাদী নায়ক নিয়তিতাড়িত, কিন্তু নিরন্তর সংগ্রামশীল। (শশী, কুবের)
>
> খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্তিত্ববাদী নায়ক মূলত স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও দায়িত্বশীল। (তারক, বিমল, রাজকুমার)
>
> গ) তৃতীয় পর্যায়ে অস্তিত্ববাদী নায়ক একাধারে অস্তিত্ববাদী ও মার্ক্সবাদী, তার ব্যক্তিত্ব আত্মতায় লীন নয়, সামাজিকতায় প্রমুক্ত। (কেশব) (আবদুল মান্নান, ২০১৩: ৬২)

এভাবেই মানিকের উপন্যাসে সময় ও ব্যক্তির অস্তিত্বসংকট রূপায়িত হয়েছে।

ত্রিশের দশকের পর সময়-সমাজ ও রাজনীতিতে ব্যপক পালাবদল ঘটে। এই সময়ের লেখকের মূল প্রবণতা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ত্রিশের দশকে...ছিন্নমূল বুদ্ধিজীবীদের বিপন্নতা আরো প্রকট হয়ে উঠল,...কথাসাহিত্যে তাই একদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরশুরাম। ক্রমশ বনফুল, বিমল কর, কমলকুমার মজুমদার, রমেশচন্দ্র সেন, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ দ্বন্দ্ববিক্ষত কালের আবহে শেকড়-হারানো ও শেকড় খোঁজার মীমাংসাহীন আলেখ্য নির্মাণ করলেন। (তপোধীর, ২০০৪: ৫০-৫১)

বাংলা উপন্যাসে তাই এ পর্যায়ে সময়ের অভিঘাতে ক্ষতাক্ত ব্যক্তির শেকড়সন্ধিৎসার বিষয়টিই মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠছে। বহিরাঙ্গিক সময়পটের পাশাপাশি চেতনাপ্রবাহরীতির আশ্রয়ে মনস্তাত্ত্বিক সময় ব্যবহৃত হয়েছে এইসব উপন্যাসে। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) কিম্বা সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬-১৯৬৫) চেতনাপ্রবাহরীতির সফল রূপকার। বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির ভিত গড়েছেন যাঁরা, তাঁরা মূলত ঋণী পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস কিম্বা রিচার্ডসনের কাছে। তাঁরাই মূলত তথাকথিত বহির্জাগতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মানসিক অনুষঙ্গকে মুখ্য করে তুলেছেন উপন্যাসে। এরই সঙ্গে যুক্ত হন মার্শেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২), যিনি আমাদের জানান অতীত থেকে অবিচ্ছিন্নতার কথা। অভিজ্ঞতার বিশেষক্ষণকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা বলে মানলেন তিনি। কালের এই বন্ধন মুক্তির চেষ্টায় চেতনাপ্রবাহরীতির অন্য এক পরিচর্যারীতির নাম সময় বদল। বর্তমানকালে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে চেতনার হাত ধরে সময় বদল করে অন্য কোনো সময়ে উপস্থিত থাকার বিষয়টিই অভিনব।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫) উপন্যাসে খগেন্দ্রনাথ স্ত্রী সাবিত্রীর শেষকৃত্যের শোকে অবগাহন করতে করতেই তার রূপসী শরীরের সুগন্ধকে আগুনের তাপে দুর্গন্ধে পরিণত হতে দেখে উপলব্ধি করে, সেই গন্ধ ভাতের ফেনপোড়া গন্ধসদৃশ, যা তাকে দাম্পত্য জীবনের বিগত দিনগুলোর স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, প্রুস্তের কথক কিম্বা খগেন্দ্রের মত ব্যক্তিসত্তা চেতনায় এভাবেই এক পলকে যাপন করে দূরাগত অতীতের দিনগুলো, কখনো কখনো একজীবনকালও। একালের উপন্যাসে তাই কখনো কখনো একদিকে যেমন ইতিহাসের পুনর্জীবন ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি নিছক বর্তমানই অন্বিত হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক গোপাল হালদারের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর *একদা* (১৯৩৯) উপন্যাসে চরিত্রগুলোর অস্তিত্বসংকট, তাদের বেদনা-নিগ্রহ কিংবা আত্মসংকট চেতনাপ্রবাহরীতির মধ্য দিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। তাদের অন্তর্ঘাত প্রকাশের ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে সমকালের একটি দ্বান্দ্বিক রূপ ।

সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* (১৯৪৫) উপন্যাসে 'আন্তর্মানবিক সম্পর্কগুলি...চেতনাপ্রবাহের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রবাহে ভাসমান' (হিমবন্ত, ২০০২: ১৭৭)। *জাগরী* উপন্যাসের ভূমিকায় ক্ষতাক্ত চার ব্যক্তিমানুষের কথকতা উঠে আসে:

> রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গবিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে।–এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী। গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। (সতীনাথ, ১৩৭৯: ৪৫৫)

উন্মাতাল রাজনীতির ঢেউ কেমন করে ব্যক্তিজীবনে অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের মূলে এসে লাগছে, কেমন করে তাদের অস্তিত্বসংকট তৈরি হচ্ছে, উপন্যাসে সেটি অনুসন্ধান করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কম্যুনিস্ট নীলু, সোশ্যালিস্ট বিলু, গান্ধীবাদী পিতা কিংবা শাশ্বত এক মাকে কেন্দ্র করে আগস্ট আন্দোলনের পটে উপন্যাসটির প্লট নির্মিত। 'জাগরী...আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু মত বহু পথের দলিল হয়ে উঠতে পারে একটি পরিবারের রক্তের সম্পর্কের মানুষজনের আন্তঃসম্পর্কের কাহিনীর আধারে' (দেবেশ, ২০০৩: ৩৯)। সময়ের অভিঘাতে চারটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন উপন্যাসটিকে বহুমাত্রিক করে তুলেছে। সমালোচকের ভাষায়:

> বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অনিবার্য পটভূমি তাঁদের...বিচ্ছিন্ন করেছে, আবার সংযুক্ত করেছে।...বিয়াল্লিশের আন্দোলন অর্থাৎ বাইরের রাজনীতি চারজনকে যেমন পৃথক করে দিয়েছে বাইরের অস্তিত্বের দিক থেকে, তেমনি মানসিক বাস্তবের দিক থেকে তাদের খুব কাছে নিয়ে এসেছে। এর আগে এত তন্ন তন্ন করে তারা তাদের পরস্পর সম্পর্ককে বিচার করেনি, একজন অপরজনের প্রতি এত সচেতন মনোযোগ দেয়নি। এরও মূলে আর একটি উপাদান: পরিবারের বড় ছেলের সেই রাত্রি অবসানেই ফাঁসি হবে। এই অস্তিত্বগত (একসিসটেনশিয়াল) বিনাশের সামনে দাঁড়িয়ে চারজনই জীবন-জগৎ পরস্পর সম্পর্কে বুঝে নিতে চাইছে... (পার্থপ্রতিম, ১৩৯৪: ৩৫-৩৬)

চরিত্রগুলোর এই অস্তিত্ববিনাশের বিষয়টি সমকালকেন্দ্রিক।

ঢোঁড়াই চরিত মানস (১৯৪৯, ১৯৫১) সতীনাথ ভাদুরীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর অন্যতম। একটি মহাকাব্যোচিত কালপট এখানে জড়িয়ে আছে ঢোঁড়াই নামক ব্যক্তির জীবন-আখ্যানের সঙ্গে। 'আগস্ট আন্দোলনের তেজী মন্দার সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের নিজস্ব জীবননাট্যের পটপরিবর্তন ও চূড়ান্ত পটক্ষেপে এই নবচরিত-মানসের সমাপ্তি' (সরোজ, ১৯৮৬: ১৫২)। ঢোঁড়াইয়ের মনোজাগতিক দ্বন্দ্ব কিংবা তার অস্তিত্বসংকটের তুলনায় তাৎমাটুলি, ধাঙরটুলি কিংবা পরবর্তীকালের কেয়ারিটুলির নিম্নশ্রেণি-মানুষের অস্তিত্বসংকটের প্রকাশ এ উপন্যাসে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। উপন্যাসে ঢোঁড়াই এই শ্রেণির প্রতিনিধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধীর লবণ-সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য আন্দোলন, সমান্তরাল বিপ্লবী-সংগঠনের কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জমিদার-আধিয়ার দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক টানাপড়েনের ধাক্কায় এ চরিত্রটি সামনে এগিয়ে গেছে। ব্যক্তিক কিংবা সামষ্টিক অনুশাসনের কারণে কখনো ঢোঁড়াইকে কখনো বা তাৎমাটুলির অন্য কোনো পরিবারকে শেকড় ছেড়ে অস্তিত্ব ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। তখন প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে তাদের সংকট। তবে, সামষ্টিকভাবে তাদের অস্তিত্বসংকট *ঢোঁড়াই চরিত মানসে*'র দ্বিতীয় চরণে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায়:

> এ যুগে মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণা অনেক বেশি তীব্র, সে নিজেই নিজের ভিত্তিকে কুরে কুরে ক্ষয়ে ফেলেছে, যদিও প্রতি মুহূর্তে সেই ভিতটাকে শক্ত করে তুলতে চায়, তার আত্মপ্রকাশ আর আত্মহনন সমপাতী, উপরন্তু আছে একটি ব্যাপক সমষ্টিচেতনা, যার সঙ্গে তার অবিরত সহযোগ-সংঘর্ষের সম্পর্ক। এ উপন্যাসে সমষ্টি বা সমাজচেতনা এসেছে নানা রূপে: কখনো 'পঞ্চ'-এর মাধ্যমে, কখনো রামজীর মারফৎ, কখনো ইংরেজ সরকার সেই ভূমিকা নিয়েছে, নিয়েছে এমনকি জোতদার বাবুসাহেব।...ব্যক্তি ও সমষ্টির টানাপোড়েনে কখনো মানুষগুলো দীপ্ত হয়ে উঠেছে, কখনো অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।...এই নাট্যের কুশীলবদের বারবার ফুরিয়ে যাওয়ার, ভেসে যাওয়ার উপলব্ধি প্রকাশিত হয়: ১.'দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে।... (গুণময়, ১৩৯৪: ৬৪)

দুনিয়া ভেঙে পড়বার এই চিত্রে টালমাটাল এক সমকাল চিহ্নিত। উপন্যাসে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সময়ের উল্লেখ না থাকলেও কতগুলো চাবিশব্দে লেখক সময়কে চিহ্নিত করেন। শেষাংশে ঢোঁড়াইয়ের আবারো পাক্কী অর্থাৎ সড়কে বেরিয়ে পড়বার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসের কালচেতনা একরৈখিক হয়ে গেছে। ঢোঁড়াইয়ের পথ অনিঃশেষ প্রবহমান কালের সঙ্গে হয়ে উঠেছে একাকার।

চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের এইসব খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকের রচনাকর্মে বিন্যস্ত সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতায় এবার অমিয়ভূষণের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) প্রবহমান কালপটে প্রতিস্থাপিত ব্যক্তি ও সমষ্টির খণ্ড খণ্ড সময়কে ব্যবহার করেছেন, যার সঙ্গে ব্যক্তির টিকে থাকার কথাও জড়িয়ে গেছে। কাজেই ব্যক্তির অস্তিত্বসন্ধিৎসা কালকে জড়িয়েই তাঁর উপন্যাসে প্রকাশিত। তিনি নিজে যে সময়ে অবস্থান করেছেন, তার অনেকটাই উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। তবে, অধিকাংশ সময়েই উপন্যাস থেকে তাঁর সমকাল চিহ্নিত করা যায় না। বরং বেশ কিছু চাবিশব্দ দিয়ে একটি কাল, যাকে অমিয়ভূষণ কোনো ঘটনার ঘনঘটায় বিশেষ করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে, উপলব্ধি করা যাবে। নানা অনুষঙ্গ থেকে লেখকের অভিপ্রেত সময়কে খুঁজে বের করতে হয় তাঁর উপন্যাসে। চরিত্রগুলোর প্রায় প্রত্যেকেই সময়লগ্ন ব্যক্তিমানুষ। কাহিনিকাল এবং কথনকালের মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর উপন্যাসের সময়কাঠামো

নির্মিত। একটি অখণ্ড-প্রবহমান কালের পটে (time) প্রতিস্থাপিত ব্যক্তিজীবনের খণ্ড খণ্ড কালপট (period) উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে । 'উপন্যাসে প্রযুক্ত সময় কোথাও বহির্মুখী–যেখানে সময়ের ধারা বয়ে চলেছে, আকাশের ওপর দিয়ে বিরাট ডানাওয়ালা পাখির ভেসে যাওয়ার মত। আবার কোথাও বা অদৃশ্য সময় উপন্যাসের চরিত্রের অন্তর্লোকের পথ দিয়ে গূঢ় স্রোতে বয়ে চলে' (গোপিকানাথ, ১৯৯১: ১)। অর্থাৎ বহিরাঙ্গিক সময়ের পাশাপাশি মনোচেতনাসংবলিত অন্তর্জাগতিক সময়চেতনার সন্তর্পণ পদচারণা অনুভূত হবে উপন্যাসে। তাঁর সাহিত্যকর্মে চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার ঘটেছে গভীরভাবে। সময়াভিঘাতে ক্ষতাক্ত ব্যক্তি তাঁর রচনায় প্রবলভাবে স্মৃতিকাতর। মার্সেল প্রুস্ত যাকে হারানো সময় আখ্যা দিয়েছেন, চেতনাপ্রবাহরীতির মধ্য দিয়ে সেই হারানো সময়ের সঙ্গে সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক। সমকালের নেতিবাচকতায় বার বার অতীতসংশ্লিষ্টতা আহত ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংকটের কথাই মনে করিয়ে দেয়; কাজেই বাহ্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই দুইরকম অস্তিত্বসংকটের মধ্য দিয়েই অমিয়ভূষণের চরিত্রগুলো পথ হেঁটেছে। কোনো একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অমিয়ভূষণের উপন্যাসের চরিত্র সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে সংকটে পতিত হয়নি। সমকাল-সভ্যতার দুর্বিপাক তাদের সংকটে ফেলে। তাদের অস্তিত্বসংকট তৈরি হতে থাকে সমকাল ও সভ্যতার হাতে, যে সংকটে ব্যক্তিক স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাবোধ উচ্চকিত হবার পরিবর্তে সামষ্টিক সংকটটিই মুখ্য হয়ে ওঠে। *নয়নতারা* (১৯৬৬), *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭) কিংবা *রাজনগর* (১৩৯১) উপন্যাসে যেমন একটি বিশেষ কালের প্রভাবে সামূহিক জীবনের ভাঙন কিংবা সংকট রূপায়িত হয়েছে, তেমনি *দুখিয়ার কুঠি* (১৯৫৯), *মহিষকুড়ার উপকথা* (১৯৮১), *হলং মানসাই উপকথা* (১৩৯৩) কিংবা *সোঁদাল* (১৩৯৪) উপন্যাসে অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী জীবনের বিনষ্টি, শেকড় বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের অস্তিত্বসন্ধানের কথকতা রচিত হয়েছে। কোনো কোনো উপন্যাসে হয়তো ব্যক্তির মনোজাগতিক টানাপড়েন মুখ্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু লক্ষ করলে অনুভূত হবে, সেই ব্যক্তিমানুষেরা কোনো একটি বিশেষ কালের প্রতিনিধি এবং তাদের মনোদৈহিক বিকলনের পেছনে পরোক্ষভাবে সক্রিয় ছিল বিষাক্ত কালের আঁচড়। এসব চরিত্র সেই অসুস্থ কালের অভিঘাত চেতনায় লালন করে মনস্তাত্ত্বিক সংকটে কাল কাটায়। *নির্বাস* (১৯৫৯) উপন্যাসের বিমি, *বিলাস বিনয় বন্দনা* (১৩৮৯) উপন্যাসের বিলাস-বিনয়-বন্দনা, *বিবিক্তার* (১৯৮৯) হৈমন্তী, *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী*'র (১৯৯৭) তরু, *মধু সাধুখাঁ* (১৯৮৮) উপন্যাসের মধু কিংবা *চাঁদবেনে* (১৪০০) উপন্যাসের চাঁদ একান্তই ব্যক্তিগত সংকটে কাল কাটালেও সেটি কাল-উদ্ভূত সংকট।

কোথাও কোথাও লেখক 'বছরখানেক' বা 'মাসতিনেক' বা 'দিনসাতেক' জাতীয় শব্দযুগল ব্যবহার করে সময়কে অনির্দেশের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। এইসব খণ্ড-খণ্ড বাহ্যিক অনুসময়ের সমষ্টিতে উপন্যাসে বিন্যস্ত সময় নির্বিশেষ থেকে বিশেষ হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও আবার অমিয়ভূষণ সময়ের গায়ে রঙের ব্যবহার করেছেন। এইসব রঙ ব্যক্তির মানসপটের সঙ্গে যুক্ত। কালের আঘাত উপেক্ষা করে ব্যক্তি যখন অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে, তখন সময়ের ভেতর একধরনের রঙ ব্যবহৃত হয়, আবার ব্যক্তি যখন কালসৃষ্ট সংকটে পতিত হয়েছে, তখন ব্যক্তির ঘনীভূত অস্তিত্বসংকট সময়ের রঙ পালটে দিয়েছে। অমিয়ভূষণকর্তৃক বিন্যস্ত এই সময়ের রঙ তাঁর উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলা উপন্যাসে সময়ের অভিঘাতে ক্ষতাক্ত মানবের অস্তিত্বসংকট নিয়ে কাজ করেছেন অনেক লেখক। অমিয়ভূষণ এঁদের অন্যতম। তবে অমিয়ভূষণের বিশেষত্ব এখানে যে, তিনি বিচিত্র কালপট নিয়ে কাজ করেছেন মূলত একটি অখণ্ড-প্রবহমান সময়ের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবার জন্য। বৈনাশিক সময়ের অভিঘাতে মানব অস্তিত্বের সংকট কালে কালে বিচিত্রমাত্রিক হলেও একে তিনি এক সর্বজনীন রূপে ধারণ করতে সচেষ্ট তাঁর উপন্যাসে। একারণেই তিনি তাঁর কালের বাইরে গিয়ে ইতিহাসপটে প্রতিস্থাপিত মানবের উন্মুল সত্তাকেও অনুভব করতে চান। সময়ের অভিঘাতে মনোদৈহিক জটিলতা, অস্তিত্বগত টানাপড়েন এবং বেদনার্তসত্তায় উপনীত হওয়া কিংবা সংকট উত্তরণে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার কথকতা তাঁর উপন্যাসের অন্যতম মূল বিষয়। কখনো রাজনৈতিক পালাবদলের ক্রান্তিকালে উদ্বাস্তু মানবের শেকড়ছিন্ন জীবনের সংগ্রাম, কখনো কৃত্রিম সভ্যতা-সময়ের মুখোমুখি দাঁড়ানো নরনারীর অসহায়ত্ব, কখনো আদিবাসী প্রান্তজনের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট সভ্যতার বৈনাশিক অভিঘাতে ছিন্নমূল মানবের আর্তি, কখনো বা একান্তভাবেই নরনারীর মনোদৈহিক বিকলনের রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। এর বাইরে গিয়ে তিনি পুরাণ-ইতিহাসপটে প্রতিস্থাপিত মানবের ব্যক্তিক-সামষ্টিক-শ্রেণিগত সংকটকেও চিহ্নিত করেছেন। এইসব সংকট গভীরভাবে কালজাত। কাল ও মানবঅস্তিত্ব অমিয়ভূষণের উপন্যাসে এভাবেই একাকার হয়ে আছে।

সহায়কপঞ্জি

অমরেন্দ্র গণাই (১৪০৬)। 'ছোটগল্পের বিভূতিভূষণ', *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা ১-২, ৩৫ বর্ষ, সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত, কলকাতা। পৃ. ৪৪-৬৪

অরবিন্দ পোদ্দার (১৯৭৫)। *বঙ্কিম মানস*, গ্রন্থবিতান, কলকাতা।

অশীন দাশগুপ্ত (১৯৮১)। *ইতিহাস ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার (১৯৮৮)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১২)। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: আদি উপন্যাস', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃ. ২০৪-২২৪

আকরম হোসেন, সৈয়দ (১৯৯৭)। *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আকরম হোসেন, সৈয়দ (১৩৮৮)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা।

আকরম হোসেন, সৈয়দ (২০১৩)। 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা', *তোমার সৃষ্টির পথ:* প্রথম খণ্ড, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, নান্দনিক, ঢাকা। পৃ. ২০৭-২১৭

আজিজুল হক, সৈয়দ (২০১২)। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃ. ৩৬৫-৪১৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৩)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: *অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আলী আসগর (২০০৭)। *সময় প্রসঙ্গ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

উর্বী মুখোপাধ্যায় (২০১৬)। *অমিয়ভূষণের উপন্যাস প্রসঙ্গে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৯৬)। *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি*, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা।

গুণময় মান্না (১৩৯৪)। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস: একটি পুনর্মূল্যায়ন', *সতীনাথ ভাদুড়ী: স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে*, দিলীপন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, জলার্ক, কলকাতা। পৃ. ৬০-৮২

গুণময় মান্না (১৯৮৭)। 'তারাশঙ্করের নাগিনী কন্যার কাহিনী', *তারাশঙ্কর অন্বেষা*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রমা প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ. ৪৮-৮০

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৮৪)। *রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৯৬)। *রবীন্দ্রনাথ-বাংলা কথাসাহিত্য: নানা দর্পণে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৯১)। *বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০০৪)। *বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০০৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

জুনান নাশিত (২০১২)। "নতুন কালের প্রতিভূ : 'করালী'", *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, রেডিয়ান্স প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ. ৮৮-৯৪

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০০৪)। *আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০০৯)। *উপন্যাসের সময়*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৪১২)। *উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৮৯)। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', *তারাশঙ্কর রচনাবলী* সপ্তম খণ্ড, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৮৭)। *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা* প্রথম খণ্ড, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০০৩)। *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০০৬)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৯)। 'তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেশকাল', *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রত্নাবলী, কলকাতা। পৃ. ৪৮৫-৫১৬

নিরুকুমার চাকমা (১৯৯৭)। *অস্তিত্ববাদ-ও-ব্যক্তি স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

নিতাই বসু (১৯৯৯)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯৯২)। 'গ্রীক ও ভারতীয় কাল-চেতনা সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য', *ইউরোকেন্দ্রিকতা ও শিল্পসংস্কৃতি: গাঙ্গেয় পত্র সংকলন* ১৩, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। পৃ. ১৮-২১

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯২)। *উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৮)। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীক্ষাভূমি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: শতবার্ষিক স্মরণে*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা। পৃ. ১০৫-১১৪

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯৪)। 'জাগরীর বাস্তব', *সতীনাথ ভাদুড়ী: স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে*, দিলীপন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, জলার্ক, কলকাতা। পৃ. ৩৪-৪৯

বেগম আকতার কামাল, (১৯৯২)। *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, বাংলা একাডেমি, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল (২০০৮)। 'দিবারাত্রির কাব্য: মানিক-মানসের আলোছায়া', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: শতবার্ষিক স্মরণে*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা। পৃ. ১৩৬-১৪৪

বেগম আকতার কামাল (২০১২)। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-র উপন্যাসায়ণ', *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ*, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, রেডিয়ান্স প্রকাশনী কলকাতা। পৃ. ১৪-২৪

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৯)। *পথের পাঁচালী*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯৩)। 'তৃণাঙ্কুর', *বিভূতি-রচনাবলী*: দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৯২)। অপরাজিত, *বিভূতি-রচনাবলী*: তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০৫)। *আরণ্যক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০০৭)। *কথাশিল্পের কথামালা: শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর*, অবসর, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯৮)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মাহবুব সাদিক (২০১১)। *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মৃণালকান্তি ভদ্র (১৯৯৯)। *অস্তিত্ববাদ: জাঁ-পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা।

রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮৭)। *তারাশঙ্কর ও রাঢ়-বাংলা*, নবার্ক, কলকাতা।

রণজিৎ গুহ (২০১৪)। "কতিপয় সমাপ্তি", 'দেশ', ৮১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১০৫-১১০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৯)। *রবীন্দ্র রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শামসুদ্দিন চৌধুরী (১৪০৪)। *উপন্যাসের উপচার*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

শামীমা হামিদ (১৪০৮)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম: শব্দ ব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহরীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সমরেন্দ্র মল্লিক (১৯৮৯)। *তারাশঙ্কর: জীবন ও সাহিত্য*, প্রতিভাস, কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৩৭৯)। *সতীনাথ গ্রন্থাবলী* (১ম খণ্ড), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭১)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৬)। *উত্তরপ্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুতপা ভট্টাচার্য (১৯৯৫)। *কথাসাহিত্যের একলা পথিক*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১০)। *উপন্যাস বহুরূপে*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (২০০৩)। উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১২)। 'হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃ. ১৮৫-১৯০

হাসান আজিজুল, হক (১৯৯৮)। *অতলের আঁধি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০২)। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস: অনন্যতার সন্ধানে', *বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন: বাংলা উপন্যাস*, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ১৭৩-১৮৭

Bakhtin, M. M. (1994). *The Dialogic Imagination*, (translated by Caryl Emerson and Michael Holquest), University of Texas Press, America.

Childs, Peter (2000). *Modernism*, Routledge, London.

Eliot, T.S. (1965). *Selected prose*, penguin, London

Forster, E. M. (1927). *Aspects of Novel*, Penguin, London.

James, William (1896). *The Principles of Psychology*, Henry Holt and Co, New York.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস-সময়পট: ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও জীবনবেদ

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে ইতিহাস অন্তর্ভুত ব্যক্তি-সময় ও সমাজের রূপান্তরিত মুখাবয়বের চালচিত্র মেলে। তাঁর *নয়নতারা* (১৯৬৬), *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭) কিংবা *রাজনগর* (১৯৮৪) উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এক বিস্তৃত কালপরিসরের ধারাবাহিক ইতিহাস-সময়পট ব্যবহৃত হয়েছে। সময়ের এই পরিমণ্ডলকে বৃহৎ সময় হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়; ব্যক্তির ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সময়ে মেলে না সামষ্টিক কোনো রূপান্তরের প্রকাশ। কিন্তু বৃহৎ সময় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এক কালচেতনা, যেখানে সমাজ আর ব্যক্তির রূপান্তরিত অস্তিত্বের কথকতা প্রোথিত থাকে। অমিয়ভূষণ কালের এই বৃহৎ ক্যানভাসেই কাজ করতে চেয়েছেন; উপলব্ধি করতে চেয়েছেন ইতিহাসের বৃহৎ কালপরিসরে ব্যক্তির অবস্থান এবং অনুভব করতে চেয়েছেন তার শেকড়সন্ধিৎসু অস্তিতের আকাঙ্ক্ষা।

উপন্যাস ও ইতিহাস সম্পর্কে অমিয়ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

> উপন্যাস এবং ইতিহাস দুটো পৃথক জিনিস। একটা সত্যভিত্তিক, একটা কল্পনাভিত্তিক। সুতরাং, উপন্যাস কখনোই ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেয় না। ইতিহাসকে আমি ব্যবহার করি, কারণ রোমান্টিসিজমের খনি হচ্ছে ইতিহাস Far of things হচ্ছে Romance-এর গোড়ার কথা। আমি মূলতঃ রোমান্টিক বলে ইতিহাসকে ব্যবহার করি। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ১)

উপলব্ধি করা যাবে, রোমান্টিসিজম-উদ্ভূত আকাঙ্ক্ষা থেকেই মূলত অমিয়ভূষণ ইতিহাসের বিচিত্র কালপর্ব নিয়ে কাজ করেছেন, '...তাঁর উপন্যাসে অতীতচারিতা, ইতিহাসের সংকেত, বিলীয়মান ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অবশয়িত চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাস, পুরাণ, মিথ, কল্পনা আর বাস্তবতার এক বিচিত্র বিনির্মাণ এক পরাবাস্তবতার জগৎ তৈরি করে' (অর্ণব, ২০১১: ১৯১) তাঁর উপন্যাসে। *নয়নতারা-রাজনগর* আর *গড় শ্রীখণ্ডে* আমরা এমনই এক জগতের সঙ্গে পরিচিত হই। 'সুবিস্তৃত দেশ ও কাল-প্রবাহের চিহ্ন–একেই আজ আমরা ইতিহাসবোধ বলে থাকি।...জনমন ও জনজীবনের সামগ্রিক রূপ ও গতি পরিবর্তনের সূত্রগুলি নির্ণয় করার চেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে ইতিহাসবোধ' (সুমিতা, ২০১৬: ২৭৫)। অমিয়ভূষণ ইতিহাসবোধের আলোকে এইসূত্রগুলোই উপর্যুক্ত উপন্যাসে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলোতে যে কালের কথা বলা হয়েছে, সেটি ইতিহাস-সময় অবলম্বী কাল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই উপন্যাসগুলো রাজনৈতিক উপন্যাসের অভিধা পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মতামত প্রাসঙ্গিক:

> প্রচলিতভাবে যেসব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি তার অধিকাংশ কনজাংচারাল (A combination of circumstances or events usually producing a crisis); কোন রাজনৈতিক ঘটনা-আন্দোলন প্রত্যক্ষ আদর্শের ছায়ায় তারা নির্মিত।...প্রসঙ্গত কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধে।

> অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়ার উন্মোচনে, অভিজ্ঞান সন্ধানে, জনসমাজের নির্মাণ-ভাঙ্গনের চেতনায়,...উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে। (পার্থপ্রতিম, ১৯৯১: ১১)

অমিয়ভূষণের এই উপন্যাসগুলোতে বহমান অন্তঃসলিলা সময়-স্রোত জীবনের ভাঙা-গড়ার এক গভীরবোধে উচ্চকিত । বর্তমান অধ্যায়ে এরকম এক অন্তঃসলিলা সময় ও ব্যক্তি অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচনই মূল উদ্দেশ্য।

নয়নতারা

অমিয়ভূষণ মজুমদার *নয়নতারা* উপন্যাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, এটি '...ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কারণ এর সবগুলি চরিত্রই কাল্পনিক। আবার, এটি ঐতিহাসিকও, যেহেতু তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৫৪৮)। অমিয়ভূষণের এই স্ববিরোধী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা চলে, ব্যক্তির 'সৌন্দর্য' 'রূপবোধ' এবং 'জীবন ভালবাসা'র মত অভিজ্ঞতা ঊনবিংশ শতকের অস্থির পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে অমিয়ভূষণ এ উপন্যাস রচনা করেন। সমালোচক মনে করেন এ উপন্যাসে:

> ...সিপাহি যুদ্ধের আগে-পরে কয়েক বছরের...ক্রান্তিকাল রঙে-রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকে সিপাহি বিপ্লবের কয়েক বছর আগে এবং বিদ্রোহের কালে বাঙালি সমাজে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অমিয়ভূষণ সেই সময়কার সামাজিক ইতিহাসকে নানা উল্লেখের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। (অলোক, ২০০০: ২৫৮)

অমিয়ভূষণ যদিও এখানে নীলাক্ত সমাজের কথা লিখেছেন, কিন্তু নীলকেন্দ্রিক সমাজের পরিবর্তে এ উপন্যাসে সমকালীন অস্থির সময়পটে স্থাপিত ব্যক্তিক-মানুষের কথকতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। একালে একইসঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭), সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭-১৮৫৮) এবং নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১) সংঘটিত হয়েছিল, যাকে অস্থির সময়পটরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

নয়নতারা উপন্যাসে ১৮৫৫ এবং তার পরবর্তীকাল পদ্মা তীরবর্তী এক ক্ষুদ্র রাজত্ব ও এর মানুষগুলোর ওপর তার পরিব্যাপ্ত অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান। সমালোচকের ভাষায়:

> কলকাতার তুলনায় এই জনপদে দ্বন্দ্বের চেহারাটি অনেক বেশি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির কাছে নীলকরদের কুঠি বা সিপাহিবিদ্রোহ কিছুটা দূরবর্তী...। অন্যদিকে রাজচন্দ্র বা হরদয়ালরা যে-পৃথিবীর বাসিন্দা, সেখানে মরেলগঞ্জের কুঠিয়ালরা তাদের নিকটতম প্রতিবেশী–পিয়েত্রোর আবাদের সূত্রে ফরাসি-ইংরেজ মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এসে যায়। (ইরাবান, ১৯৯৪: ৩৬)

এই কাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। সমালোচক কার্তিক লাহিড়ী মনে করেন:

> বিশেষত সিপাহি বিদ্রোহের পরিণামে ব্রিটিশ শাসনের রীতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়,...এই-সমস্ত বিদ্রোহের অকুস্থল ছিল...কলকাতা থেকে বিশেষ দূরে অবস্থিত গ্রাম ও গঞ্জে; যদিও...সাঁওতাল বিদ্রোহ বাংলার পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং সিপাহি বিদ্রোহ বাংলার খুব সামান্য জায়গায় প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কেবল নীলের ক্ষোভে বাংলার সকল স্তরের মানুষ কমবেশি জড়িয়ে পড়ে।...অমিয়ভূষণ

> রাজনৈতিক ইতিহাসের ধার না ধেরে আন্দোলনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আলোড়িত মানুষের প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেন...এখানে কোনও এক ব্যক্তির ভূমিকা সর্বৈব হয় না, আন্দোলনের সার্বিক চরিত্র বোঝার জন্য নানা শ্রেণীর নানা মানুষের সমাবেশের ছক সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন থাকতে হয়...। (কার্তিক, ১৯৮৪: ৮৯)

অমিয়ভূষণ এই উপন্যাসে সেই সচেতনতার পরিচয় দেন। উপন্যাসে সমকালীন এইসব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো চরিত্র নিজের মনোজাগতিক টানাপড়েনকে পাশ কাটিয়ে অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে, কিংবা কেউ বা আন্দোলনে অস্বীকৃতি জানিয়ে অস্তিত্বসংকটে ভুগেছে। বাঙালি-অস্তিত্বে একাকার হয়ে থাকা এইসব আন্দোলন এ উপন্যাসে চরিত্রগুলোর অস্তিত্বসন্ধিৎসার আকাঙ্ক্ষা নির্মাণ করেছে।

নয়নতারা উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের পরিবর্তে সময় হয়ে উঠেছে প্রোটাগনিস্ট চরিত্র। নীলাক্ত সময়ের 'আবর্তনে-আলোড়নে চরিত্রগুলির অস্থিরতা আর কারো সুস্থিতি খোঁজার প্রয়াসই এই উপন্যাসে বড়ো হয়ে ওঠে।...সেই সময়টি অবশ্যই জটিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দম্ভ, উপনিবেশের টানাপোড়েন, ধর্মের সত্যানুসন্ধান, য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রতি ঔৎসুক্য–এইসব মিলে তৈরি হয় জটিলতা' (ইরাবান, ১৯৯৪: ৩২)। সময়ের এই জটিল আবর্তনে আলোড়িত মানুষগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই ও দ্বন্দ্বচিত্রের পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিক আবেগ উপন্যাসে উচ্চকিত। পদ্মা-তীরবর্তী এক ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্থির সময়-নখরে হয়ে ওঠে ক্ষতাক্ত ভারতের প্রতীক। ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্গত সেই ছোট্ট গ্রামকে তরঙ্গিত ঊনবিংশ শতক তার সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন (১৮২৯), বিধবা বিবাহ আন্দোলন (১৮৫৬), বাল্যবিবাহ রদ আন্দোলন (১৯২৯), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭) কিংবা নীলবিদ্রোহ (১৮৬০) নিয়ে স্পর্শ করে গেছে। যদিও উপন্যাসে এই সবগুলো বিদ্রোহের আভাস নেই , কিন্তু উত্তাল সময়ের গর্জন উপলব্ধি করা যায় নিবিড়ভাবে। গণমানুষের জেগে ওঠার কথকতা, আন্দোলনে দেশীয় সামন্ত রাজাদের পক্ষাবলম্বন করবার দ্বিধা, একইসঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধতা আর নীলকরদের প্রতি বিতৃষ্ণা কিংবা ইউরোপীয় মননে নিজেকে গড়ে তুলে মস্তিষ্ক দিয়ে তাদের মোকাবিলা করার স্বপ্ন দেখেছে একালের মানুষ। কাজেই কাল এ উপন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

বহিরাঙ্গিক সময় ব্যবহারে এ উপন্যাস অভিনব। বেশ কয়েকটি জায়গায় লেখক সুস্পষ্টভাবে সন উল্লেখ করে সময়কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উপন্যাসের শুরুতেই ১৮৫৫ সনের উল্লেখ করেছেন, আর সময়টি শীতকাল–সেটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, 'ইতিহাস লেখার চেষ্টা করে যেসব অনুসন্ধান করা গেছে তাতে নির্দিষ্টভাবে স্থির করা যায়নি মাসটা কী ছিল। আঠারোশো পঞ্চান্ন বটে, জানুয়ারি কিংবা ডিসেম্বর তা স্থির করা যায়নি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২৩)। অর্থাৎ ইতিহাসের সময়কাল ব্যবহার করলেও তিনি এর ভেতর অনির্দেশ্যের গন্ধ জড়িয়ে দিয়েছেন। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, সেই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর অনির্দিষ্ট সময়কে পুরে দেন লেখক।

পিয়েত্রোর পিতার সময়কাল ধারণে লেখক স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে কখনো ফিরে গেছেন ১৭৯৪ সনে, কখনো বা পিয়েত্রোর ভাষ্যে উঠে এসেছে ইংরেজ ফরাসির ১৮১৫ সনের যুদ্ধ। এই সনগুলো উপন্যাসের ঐতিহাসিক

সময়পট নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যত্র, এ উপন্যাসের নীলাক্ত সময় নির্মাণে অমিয়ভূষণ সমকালীন কিছু অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় রামগোপালের বক্তৃতা, হরিশচন্দ্রের নীলকর বিরোধী বক্তব্য, সমকালীন বিধবা বিবাহ আইন পাস সংক্রান্ত তথ্য সেকালের পুনর্নির্মাণ ঘটায়। রাজচন্দ্রের গ্রামে আগত টুকরো টুকরো এইসব দূরাগত সংবাদ একত্র হয়ে উপন্যাসে এক অখণ্ড অস্থির কালপট নির্মাণ করে। এছাড়া সময়ের ক্রমপরিবর্তনও ঘটেছে উপন্যাসে। পুরনো পাঠশালা উঠে গিয়ে সেখানে ইংরেজি শিক্ষার স্কুল নির্মাণ, বিধবা বনদুর্গা আর চরণদাসের বিয়ে সময় ও সমাজের রূপান্তরকে প্রকাশ করে দেয়:

> কলকাতায় এক নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছে। সেই নতুন সমাজের নেতা ইংরেজ এবং ইংরেজের নুনের ব্যবসায়ের বেনিয়ানরা । (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৭১)

ক্রমরূপান্তরিত নব্যসময়ের অভিঘাত অনুভূত হচ্ছিল সর্বত্র।

অমিয়ভূষণ উপন্যাসে বেশ কয়েকবার সময় চিহ্নিত করতে গিয়ে ঋতুর উল্লেখ করেন। বসন্তকাল, শীতকাল কিংবা চৈত্রের পড়ন্তবেলা নির্দিষ্ট করে বললেও ঠিক কোন বছরের ঋতু, উপন্যাসে সেটি নির্দিষ্ট করে দেননি লেখক। প্রত্যেকবার ঋতু ব্যবহারে সম্পর্কের এক নিবিড় রূপ প্রতীকায়িত হয়েছে। চৈত্রের পড়ন্তবেলায় নয়নতারা যখন রাজুর হাত ধরেছে, তখন লেখক বলে দিচ্ছেন, 'সে আকাশ-বাতাসে চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় কিছু ছিল অবশ্যই' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৩০)। চৈত্রের মধুময়তায় লেখক এক রোমান্টিক আবেগ ছড়িয়ে দেন নয়নতারা বা রাজুর সম্পর্কের আদলে। অথবা, বনদুর্গা আর চরণদাসের বিয়ের মাস বসন্তকাল–একটি নতুন জীবনের সূত্রপাত প্রতীকায়িত হয়ে গেছে এই ঋতুর মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে এভাবেই ঋতুগুলো হয়ে উঠেছে জীবনের প্রতীকবাহী।

অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহারে সময় চিহ্নিত করেছেন তিনি। 'কয়েকটা মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে', 'সেদিনটি তখনও শেষ হয়নি', 'কথাটা উঠেছিল বছর তিন-চার আগে হরদয়ালের দেওয়ানগিরির দ্বিতীয় বৎসরের গোড়ার দিকে'–উপন্যাসে অনির্দিষ্টভাবে এভাবেই সময়কে চিহ্নিত করেন অমিয়ভূষণ। পিয়েত্রোর মৃত্যুর পর দিনশেষের অপার্থিব আলোর ব্যঞ্জনায় প্রতীকায়িত হয়ে যায় মৃত পিয়েত্রোর ব্যর্থ জীবনের হাহাকারময় শূন্যতা। কখনো কখনো লেখক নিজেই এই অনির্দেশ্যের শরণ সম্পর্কে লিখেছেন, 'না-আছে পাথরের গায়ে লেখা ঐতিহাসিক উপাদান, না-আছে ফারসি ভাষায় লেখা কোনো রোজনামচা। ঘটনার পারম্পর্য অনেকক্ষেত্রেই কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে-দৃশ্যপটটা এখন দেখা যাচ্ছে সেটা মশালের আলোকে উদ্ভাসিত এক রাত্রির প্রাথমিক অবস্থার' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৫০)। প্রত্যক্ষভাবে বুজরুক আর গোবর্ধনের সিপাহি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার দৃশ্যপট এটি। ১৮৫৭-এর কোন সময়ের কথা এটি, লেখক উপন্যাসে তা নির্দিষ্ট করে দেননি। শুধু মূল ঘটনার সঙ্গে মিশে গেছে কল্পনা আর চরিত্রগুলোর আবেগ। কোথাও কোথাও সময়ে রঙের ব্যবহার ঘটেছে। প্রকৃতি-সময় আর জীবন কোথাও কোথাও একাকার। নয়নতারার ভাবনায় এক অপার্থিব রাতের বর্ণনা মেলে:

> রূপচাঁদ আবার এসে যখন ডাকল, তখন রাত হয়েছে। আকাশে একটা ধূসর জ্যোৎস্না উঠেছে। রাতের দিকে তাকিয়ে সময়ের মাপ বোঝা যাচ্ছে না, যতটা প্রকৃতপক্ষে গভীর তার চাইতেও গভীর বোধ হচ্ছে জ্যোৎস্নাটার জন্য। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৯৭)

উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক সময় রূপায়ণের প্রকাশ খুব বেশি নেই। চরিত্রগুলোর বাহ্যিক কথোপকথনের তুলনায় অন্তর্কথন তেমনভাবে পরিলক্ষিত নয়। তাই বর্তমান থেকে অতীতে চেতনার গতায়ত ঘটেনি তেমন। পিয়েত্রোর স্মৃতিচারণে কিংবা হরদয়ালের মনোভাবনায় বেশ কয়েকবার বর্তমান থেকে অতীতে চরিত্রগুলোর পদচারণা ঘটেছে। চরিত্রগুলোর অন্তঃচেতনার গতিপ্রকৃতি লেখকের সর্বোজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্ত হয়েছে বলে চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার তেমন ঘটেনি। সময়ের এই বিচিত্রমাত্রিক আবহে লেখক এ উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে প্রতিস্থাপন করেন, এবং সময়ের অভিঘাতে এদের চেতনাগত বেদনা ও সংকট উপলব্ধিতে সচেষ্ট হন।

নয়নতারা উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী ক্ষুদ্র এই গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক রাজত্ব এবং সেই রাজত্বের চারপাশে ফরাসি ও ইংরেজের মত দুটি ইউরোপীয় আবাদের পারস্পরিক সখ্য ও দ্বন্দ্ব মুদ্রিত। এরই সাথে সিপাহি বিপ্লবের দূরাগত অভিঘাত ধ্বনিত রাজপরিবার, ফরাসি আবাদের পিয়েত্রো কিংবা মরেলগঞ্জের দেওয়ান ডানকানের দৈহিক-মনস্তাত্ত্বিক তরঙ্গক্ষুব্ধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। অর্থাৎ, কালের অভিঘাতে ব্যক্তিঅস্তিত্বের টানাপড়েন উপন্যাসে মুখ্য হয়ে ওঠে। সমালোচক জহর সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

> উপন্যাসের সর্বাঙ্গে...স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তরঙ্গিত সময়ের দাগ।...সামন্ততান্ত্রিক গ্রামটি সমগ্র উপন্যাসে একটু একটু করে উনিশ শতকের সমাজ, ইতিহাস ও রাজনীতির সামগ্রিক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে... ।...আমরা নয়নতারা উপন্যাসে যেসব মানুষের সাক্ষাৎ পাই, তারাও মূলত...প্রসারিত 'কালবৃত্ত'–এরই মানুষ।...কালবৃত্তের অংশীদার মানুষের জীবনপ্রবাহ নয়নতারা উপন্যাসে বর্ণিত সামন্ততান্ত্রিক গ্রামটির চলনের সঙ্গে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সংযোগ ঘটিয়ে দেন নিপুণ বুনন-প্রতিভায়। গ্রাম যেন বহু ঘটনার প্রাত্যহিকতায় চলতে চলতে নিজেরই অজান্তে কখন যেন আচম্বিতে ঢুকে পড়েছে ওই সিপাহি বিদ্রোহের অগ্ন্যুৎপাতে... ।...সে এক সময়, যখন ইংরেজরা একদিকে একশ্রেণির উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে সমাজে একটা আলাদা শ্রেণি গড়ে ওঠার পরোক্ষ প্রশ্রয় দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে বাংলার কৃষক সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কণ্ঠরোধ করছে এই দেশের, এই দেশের অন্তঃকরণের। (জহর সেন, ২০০১: ৭০-৭২)

নীলাক্ত সময়ের অভিঘাত এ উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অর্ন্তসত্তায় কতটা ক্ষত তৈরি করেছে, উপর্যুক্ত মন্তব্যের আলোকে সেটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

উপন্যাসে সতেরো বছর বয়সী অপরিণত রাজচন্দ্রকে সমকালীন অস্থির সময়পট তেমন প্রভাবিত করেনি। ঔপন্যাসিক বেশ কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজচন্দ্রকে নিয়ে গেছেন, যা তার ভেতর একধরনের সূক্ষ্ম টানাপড়েনের জন্ম দিয়েছে মাত্র। মরেলগঞ্জের দেওয়ানের কোষায় বন্দুক চালনা এবং বুজরুকের ইন্ধনে সেই নৌকার ইউনিয়ন জ্যাক বা পতাকায় গুলি ছোঁড়ার বিষয়গুলো রাজুর চেতনায় পরিবর্তনের স্বাদ আনে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদেশী কুঠিয়ালের দম্ভে দাম্ভিক মরেলগঞ্জের সদর তহসিলদার চন্দ্রকান্ত সেনকে হত্যা করার

এক প্রবল অহমবোধ রাজুকে পেয়ে বসে। পিয়েত্রো আর বুজরুক তার চেতনায় সাহস আর দম্ভের বীজ এখানেই প্রথম রোপণ করে দেয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার বিপরীত অবস্থান এই একবারই প্রকাশ্যে উপস্থাপিত হয়, এবং সেটিও ছিল বেশ আকস্মিক। চন্দ্রকান্তের মৃত্যুদৃশ্য রাজুকে পীড়া দিলেও নয়নতারার কাছে রাজুর কনফেস তার উৎকণ্ঠা দূর করে। চন্দ্রকান্ত হত্যায় রাজুর মর্মবেদনা আর একবারও উপন্যাসে উচ্চারিত হয় না। কাজেই উপন্যাসে রাজুর ভেতর অস্তিত্বসংকটের সূত্রপাত ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি নয়নতারাকে পাবার আবেগে চাপা পড়ে।

উপন্যাসে নয়নতারা ও রাজুর সম্পর্ক অনবদ্য। অমিয়ভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের নারীদের মতই পঁচিশ পেরুনো নয়নতারা রাজুর চাইতে পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন। মায়ের পর রাজু অবচেতনে নয়নতারাকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে, যার পেছনে সক্রিয় ছিল তার প্রবল কিশোর আবেগ। যদিও সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ রাজুর নয়নতারাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় কোনো কামচেতনার প্রকাশ ঘটেনা। কয়েকবার বেশ অন্তরঙ্গ সময়যাপনও কোনো শরীরী সম্পর্কের প্রকাশ ঘটায়না উপন্যাসে। কিশোর রাজু আর যৌবনে অভিষিক্ত নয়নতারার অসমবয়সী প্রেম উপন্যাসে বিমূর্ত থেকে যায়, দানা বাঁধেনা। কেননা, পরিণত নয়নের সতর্ক ব্যক্তিসত্তা অপরিণত রাজু আর তার মধ্যকার শ্রেণিব্যবধান সম্পর্কে ছিল সচেতন। তবু নয়নতারা রাজুর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক গভীর আশ্রয়। আত্মসংকটের দিনগুলোতে নয়নতারা রাজুকে মানসিক শক্তি দিয়েছে। রাজুর নিজস্ব কিছু অজ্ঞতা ও অভাববোধ তাকে হীনমন্য করে তোলে। অনুভবের গভীরতায় সে এইসব অভাববোধের তীব্রতা টের পায়। নয়নকে না পাবার ব্যর্থতাবোধ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এইসব হতাশাজাত ক্ষোভ আর বেদনাবোধ থেকে মুক্তি পেতে শিকার বেছে নেয় সে। রাজু ভাবে:

> বিদ্যালয়ে গ্রামের প্রজাসাধারণ শিক্ষিত হবে। কিন্তু শিক্ষিত হবার বয়স তার চলে গেছে। মর্মবেদনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মন। নয়নতারার অভাববোধ কী করে এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। যেন নয়নতারাও এজন্যই দূরে থাকছে। স্বপ্নে একটা গভীর খাদে ডুবে যাওয়ার মত অনুভব হয়েছিল তার। তারপর শিকার। শিকার নয়, সে-উদ্দেশ্য ছিল না–নিজেকে ক্লান্ত করা, ভয়ংকর কিছু ঘটিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল। নৃশংস হওয়ার মত মনের অদম্যতা ছিল, নিজেকে রেহাই দেওয়ার ইচ্ছা ছিলনা। পাখি শিকার করতে গিয়ে কাঁটার খোঁচায় পা দিয়ে রক্ত পড়েছে, এক-হাঁটু কাদায় দাঁড়াতেও ঘৃণা করেনি। বরং বেদনা ও ঘৃণার অনুভূতিতে মনের অন্য একটি অংশকে পীড়ন করেই সুখ পাচ্ছিল। চিতল হরিণটার মৃত্যুতেই চূড়ান্ততায় উঠল ব্যাপারটা।...হরিণটা যখন পড়ে গেল তখন সে-ও বসে পড়েছিল একটা শুকনো গাছের গুঁড়িতে। দেহের সঙ্গে-সঙ্গে মন। হরিণটার চোখে জলের ধারা ছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাণীমাত্রেরই চোখে জল আসে নাকি?...আর তারপর এল, সবার শেষে উত্তুঙ্গ আনন্দের মত নয়নতারা।...শাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা কঠিন আবরণের মধ্যে মুক্তার মত নয়নতারা। অবগুণ্ঠন সরালে নয়নতারার মুখ ঘরের রাঙা আলোয় যে-রকম দেখিয়েছিল তার তুলনা নেই।...সবচাইতে মধুর এ লুকোচুরি, এই গোপনতা। গোপনে এসেছিল বলেই বোধহয় এমন সৌরভ রেখে গেছে সে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১০১)

রাজুর এই মনোভাবনায় আবেগের তীব্রতা অনুভব করা যায়। কোথাও কোথাও আত্মদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটলেও এই আবেগের সবটুকুই ব্যক্তিক; সমকালীন অস্থির দেশকালের প্রতিচ্ছবি তখন পর্যন্ত তার অন্তর্জগতে কোনো ছায়া ফেলে নি। অমিয়ভূষণ অবশ্য *নয়নতারা* কিংবা *রাজনগর* প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

> আমরা যাকে রেনেশাঁস বলেছি, কালচারাল রিভাইভাল বলেছি, এই যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশের উপর দিয়ে ঊনবিংশ শতকে যেসব পরিবর্তনগুলো হয়েছিল, যা নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এর মধ্যেও সৌন্দর্য, রূপবোধ এবং জীবন ভালোবাসা–এগুলো এত মহার্ঘ যে বিভিন্ন সময়ের মধ্য দিয়েও এগুলি ফুটে ওঠে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৫৪৯)

সুতরাং উপন্যাসে লেখক কালের অভিঘাত অনুভবের পাশাপাশি চরিত্রগুলোর চিরায়ত জীবনবোধ ও আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের বিষয়টি সম্পর্কেও সমান মনোযোগী ছিলেন।

নৌকা ভরে দেশি বন্দুক আনার পেছনে বুজরুকের সিপাহি বিপ্লবে অংশগ্রহণের এক গুপ্ত মনোবাঞ্ছা গভীরভাবে সক্রিয় ছিল। রাজুর বরকন্দাজদেরকেও সে কৌশলে বন্দুক চালানোর কায়দা কানুন শিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। এমনকি পিয়েত্রোর বরকন্দাজ আর রাজবাড়ির বরকন্দাজদের ভেতর দাবার ছকে তলোয়ার আর ফৌজ ফৌজ খেলার মহড়ার ব্যবস্থাও ছিল বিপ্লবের জন্য সিপাহিদের প্রস্তুতির একটি অংশ:

> ‘যদি একদল ডাকাত এনফিল্ড রাইফেল নিয়ে চড়াও হয়, আমাদের এই বরকন্দাজরা কী করে আমাদের বাঁচাবে’?...
>
> ‘এনফিল্ড রাইফেল থেকে প্রতি মিনিটে ওস্তাদ বন্দুকবাজ কখনো কখনো দুটো গুলি ছুঁড়তে পারে।’
>
> ‘কেন, ফরাসি বিট্‌লোডারগুলি কীরকম মনে হয় তোমার’?
>
> ‘ভালো। কিন্তু মাত্র তিনটি আছে। একটি আপনার, একটি আমার, একটি রাজাভাইয়ের’।
>
> রাজু হাসতে হাসতে বলল, ডাকাত এলে তিনটেই তোমাকে দেওয়া হবে, আলি খাঁ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১২৭)

তখনও পর্যন্ত রাজুর কাছে এইসব বিষয় বেশ কৌতুককর। প্রাজ্ঞ নয়নতারা ছক কেটে তাকে বুঝিয়ে দেয় এইসব ডামাডোলের অন্তরালে কোম্পানির প্রতিনিধি ডানকানের সুবিধাবাদী ভোগাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি। কৃষকদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে ডানকান জমিদারি কিনে নিজের আখের গোছানোতে ব্যস্ত–নয়নতারার এই উপলব্ধি রাজুকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে বন্দুক বা তলোয়ার চালনা কিংবা রাজুর বরকন্দাজদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কৌশল রপ্ত করানোর পরিকল্পনা অথবা ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচকতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে বুজরুক রাজুকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর আহবান জানায়। পারস্পরিক কথোপকথনে রাজুর সহজ ধ্যানধারণার ওপর পিয়েত্রো আর বুজরুকের প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী মনোভঙ্গি রাজুকে নতুন করে ভাবায়। স্বাধীন দেশের স্বপ্নে বিভোর বুজরুক আর ইংরেজ বিরোধী পিয়েত্রো রাজুর চেতনায় স্বাধীনতার বীজ রোপণ করে:

> তুমি যদি এ-জেলাটা ইংরেজের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারো এবং তারপর পঁচিশ বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করার মত শক্তি অর্জন করতে পারো তাহলে কঠিন কী? যখন ক্লাইভ জালিয়াতি করতে আসছিল মুর্শিদাবাদের দিকে তখনও কি সে ভেবেছে দেওয়ানি করতে পারবে তারা? তবে তার আগে অন্তত এক হাজার দুর্ধর্ষ

সৈনিক তৈরি করতে পারা চাই। এক হাজার সৈনিক নিয়ে কাজ শুরু করলে ইংরেজকে বাংলা ছাড়া-করা কঠিন নয়, সময়সাপেক্ষ হতে পারে'।

'ইংরেজ বীরের জাত'।

পিয়েত্রো হো-হো করে হেসে উঠল, 'কোথায় তারা বীরত্ব দেখাল, পলাশিতে'?

বৃদ্ধ, রুগ্ন, অর্ধ-বিদেশি আবাল্য-পরিচিত এই লোকটির দিকে চেয়ে চেয়ে রাজু অন্ত পেলনা।...রাজু পিয়েত্রোর কাছেই শুনেছে বৃদ্ধ হৈদার আলির কথা। তার কল্পনায় হৈদার আলি-পিয়েত্রো কিছুক্ষণের জন্য এক হয়ে মিলে গেল। পিয়েত্রোর মুখেই সে শুনেছে আর্কের এক কুমারীর কথা। সে তাড়িয়েছিল বটে ইংরেজকে তার দেশ থেকে। সে শুনেছে ঈশা খাঁর কথা।

...পিয়েত্রো বলল , 'রাজু, তুমি রাজা হও বা না-হও , বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হোক কিংবা ইংল্যান্ডের রাণী, আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবে একথা আমাকে বলতেই হবে রাজত্ব স্থাপনার মূলে অভূতপূর্বতা কিছু নেই; অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে পারলেই হলো, নেতৃত্ব করার ক্ষমতা থাকলেই হলো, যুদ্ধেও জ্ঞান থাকা চাই, আর বোধ করি কতকগুলো ঘটনাপরম্পরা, যাকে ভাগ্য বলে। তুমি যদি চেষ্টা করে ব্যর্থ হও তোমাকে লোকে পাগল বলবে, হয়তো মৃত্যুই হবে সেই বোকামির পরিণাম। কিন্তু যদি জয়লাভ করো, শিবাজি ও প্রতাপের সম্মান তুমি পাবে।...

বুজরুক বলল, 'আমি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে চাই না। এই ইতর ধর্মহীন নিমকহারাম জাতটাকে বাংলা দেশ থেকে তাড়াতে চাই'।...ইংরেজ আমাদের শাসন করে আমাদের দিয়েই। আমরাই সিপাহি হয়ে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়ি।...

'আমরা যদি আমাদের দিকে ফিরে চাই, যদি সিপাহিরা বলে আর তারা ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করবে না'?

বুজরুক উঠে রাজুর মুখোমুখি দাঁড়াল, 'রাজাভাই, যদি কখনো সেদিন আসে আপনার সাহায্য আমি নিশ্চয় পাব।... (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৪৩-১৪৫)

মরেলগঞ্জের চন্দ্রকান্ত সেন হত্যার পেছনে রাজুর স্বদেশপ্রেম কিংবা ব্রিটিশ বিরোধিতার চাইতে রাজদম্ভই বেশি কাজ করেছে। বুজরুক আর পিয়েত্রো রাজুর ভেতরকার সেই দম্ভকে দেশপ্রেমের আবেগে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে, সেই সাথে তার চেতনায় সন্তর্পণে রোপণ করেছে দেশপ্রেমের বীজ। এ কারণেই রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তার ভেতর জন্ম নেওয়া গাঢ় আক্ষেপ থেকে সে নয়নতারার কাছে উচ্চারণ করে, 'নয়ন, আমি যদি রাজা হতাম'...সত্যিকারের রাজা, যেমন ছিল শিবাজি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৪৭)। একজন ক্ষুদ্র দেশীয় রাজার পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধাচারণ করাটা দুঃসাহস–এই বোধ বুজরুকের স্বাদেশিক ভাবনার সাথে রাজুর একাত্মতাবোধের বিষয়টিতে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। এই দ্বান্দ্বিক ভাবনাতেই সৃষ্টি হয় তার সংকট। অস্থির এক সময়পটে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে মানসিকভাবে রাজু বুজরুক বা পিয়েত্রোর স্বাদেশিক ভাবনার সাথে সখ্য বোধ করলেও প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা করতে কিংবা সিপাহি বিপ্লবে অংশ নিতে অথবা নীলচাষীদের পক্ষাবলম্বনের শক্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। বরং এইসব দ্বন্দ্ব ছাপিয়ে ফেনিয়ে ওঠে তার ব্যক্তিক প্রেম। সে নয়নকে বলে, 'একটা বিপ্লবের সময় এসেছে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেসব বিপ্লবের চাইতেও

তুমি অপূর্ব' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৪৮)। উপলব্ধি করা যাবে, রাজুর আবেগ শেষ পর্যন্ত নয়নতারাতেই আটকে থাকে। হরদয়াল আর বুজরুক গোবর্ধন এর মধ্যবর্তী রাজু সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে ভোগে, অস্তিত্বসংকট তাকে গ্রাস করে। তবে সেটিও উপন্যাসে অচিহ্নিতই থেকে গেছে। অমিয়ভূষণ একটি দৃশ্যপটে এই চরিত্রগুলোকে তাদের যুক্তি-তর্ক-আবেগসহ একত্র করেছেন। সেখানে রাজুর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> 'বারিকপুরে সিপাহিরা যুদ্ধে নেমেছে। এবার আমরা রওনা হব'।
>
> ...বুজরুক হেসে বলল, '...কাল সকালে বারিকপুরে সিপাহিরা তাদের আজাদি কায়েম করেছে'।
>
> ...গোবর্ধন বললে, 'দেওয়ানজি, আমাদের নৈতিক আদর্শ আছে। সেই নীতি সামনে রেখেই বারিকপুরে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছে। এবং সে-নীতি ইংরেজকে বিতাড়িত করা'।
>
> উত্তাপহীন কণ্ঠে হরদয়াল বললে, '...ইংরেজকে তোমরা বিতাড়িত করবে কেন?'
>
> ...আপনি কি জানেন এন্‌ফিল্ড রাইফেলে টোটার কী কারসাজি হয়েছে?...তাতে গোরু ও শুয়োরের চর্বি মাখানো থাকে। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিকে তাই দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হয়'।
>
> ...হরদয়াল হেসে বলল, '...আমি মানতে পারি এমন কোনো আদর্শই কি তোমাদের নেই?'
>
> রাজু বললে, 'আছে বইকি। বিদেশি শাসনের হাত থেকে মুক্তি'।
>
> হরদয়াল বিস্মিত হলো। একটু থেমে বলল, 'রাজার উপযুক্ত কথা বলছেন রাজকুমার'...ইংরেজ এসে আমরা বেঁচেছি। তৃতীয় পক্ষের দরকার ছিল।'
>
> 'ছি-ছি, এ কী বলছেন দেওয়ানজি'? রাজু ঘৃণাভরে বলল।...
>
> ...'দাঁড়াও আলি খাঁ, আমি আসছি'।
>
> 'রাজকুমার, আমাকে ইংরেজের সাহায্য নিতে হবে আপনি যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে চান।'
>
> 'দেওয়ান!' রাজকুমার গর্জন করে উঠল।
>
> ...রাজকুমার দ্রুতপদে রাজবাড়ির দিকে চলে গেল।...রাজু তার নিজের ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। গোবর্ধন সামনে আসতে তার হাতে পিয়েত্রোর দেওয়া বন্দুকটা তুলে দিয়ে বলল, 'মাস্টার, আলি খাঁকে দেখে রেখো ভাই'। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৫১-১৫৩)

মানসিকভাবে সিপাহি বিপ্লবকে সমর্থন জানালেও সামন্ত-অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে প্রত্যক্ষভাবে বুজরুক বা গোবর্ধনের সঙ্গে বারিকপুরে যাবার পথ রাজুর বন্ধ। জানালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুজরুক বা গোবর্ধনের দলের মশালগুলোকে কালো রাতের গায়ে অন্ধকারের জ্বলন্ত অগ্নিক্ষরা হৃদপিণ্ড মনে হলেও তাদেরই একজন হয়ে ওঠার সামর্থ্য ও সাহস রাজুর নেই। কিন্তু মানসিক টানাপড়েন আছে। যদিও সে টানাপড়েন আবেগের গণ্ডিতেই সীমায়িত:

> দুপুরে নিজের ঘরে বসে রাজুর সহসা দুঃসহভাবে একা বোধ হলো।...মনে হলো এই গ্রামে গোবর্ধন নেই। আলি খাঁর কথা মনে হতে তার মন উৎকণ্ঠায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। যেন বুজরুক একা সেখানে, যেন তার সঙ্গী নেই যথেষ্ট–এ চিন্তাই উৎকণ্ঠার কেন্দ্রে। তার চোখের কোণ দুটিও ভিজে উঠল। আর পিয়েত্রো।...নিস্তব্ধতায় আরামকেদারায় স্তব্ধ হয়ে পিয়েত্রো। রোগ বটে, তার চাইতেও বেশি অবসাদ।...আলি খাঁকে যদি এর জন্যই সে প্রস্তুত করে থাকে এখন তবে প্রফুল্ল হয়ে ওঠার কথা। অথচ কোথাও যেন স্পৃহা নেই,...। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৫৫)

এখানে রাজুর বুজরুকদের একজন হতে না পারার অনুশোচনাবোধ একদমই উপলব্ধ হয় না। যেটি উপলব্ধ হয়, সেটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ এবং নিঃসঙ্গতা। কাজেই রাজুর অস্তিত্বসংকট ব্যক্তিকবোধে সীমায়িত, দেশ ও কাল সেখানে গাঢ় হয়ে ওঠে না। শাসক ইংরেজ বা বাহাদুর শা যেই হোক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে তার কোনো লাভ বা ক্ষতি হবার নয়–ক্রমশ এই মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলেও, এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রকাশ উপন্যাসে মেলে না। শুধুমাত্র সিপাহি বিপ্লবের ব্যর্থতায় বুজরুক, গোবর্ধন আর বরকন্দাজদের মৃত্যু তাকে বেদনাতুর করে তোলে। ব্যক্তিক সংকটই রাজু চরিত্রের মূল প্রবণতা।

রাজুর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে উঠে আসে নামচরিত্র নয়নতারা। অমিয়ভূষণ এই উপন্যাসের নামকরণ সম্পর্কে লিখেছেন:

> প্রথমে বইটার নাম ছিল নীল ভুঁইয়া–এটা ট্রিলজি হবার কথা ছিল। তারপরে 'নয়নতারা' নাম দেওয়া হলো এইজন্যে যে যখন দেখলাম যে 'নীল ভুঁইয়া' নামে ট্রিলজি কেউ ছাপতে চাইছে না, আমিও আর লিখতে পারছি না। ইতিহাসের ডিটেল্‌স বড় বেশি এসে যাচ্ছে, একশো বছরের ইতিহাসের ধারাটাকে ঠিক ধরতে পারছি না। সেই সময় ভাবলাম, এটা 'নয়নতারা' নামে আলাদা একটা বই-ই হোক। তারপর আবার মত বদলে যায়, তখন ট্রিলজির সেকেন্ড পার্ট 'রাজনগর' লিখতে আরম্ভ করি। এখন এই সম্পূর্ণ ট্রিলজি মিলে এর নাম 'নীল ভুঁইয়া' হবে। কিন্তু পার্ট বাই পার্ট–'নয়নতারা', 'রাজনগর'...এই রকম। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৫৪৯)

নয়নতারা নামকরণের তাৎপর্য বেরিয়ে আসে লেখকের বক্তব্যে। নয়নতারা কবিরাজ রাজু চরিত্রের মানসিক আশ্রয়। অমিয়ভূষণ মজুমদার নয়নতারা সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:

> ...নয়নতারা নেই! নয়নতারা না থেকেও আছে। প্রথম থেকে আরম্ভ করে রাজুর যে রাজকীয়তা, আমি রাজা হ'ব, এই স্বপ্নটা কে দিল?...পিয়েত্রো যা ট্রেনিং দিয়ে পারেনি, রাজুকে একটা কথায়, একদিনে যে তা বুঝিয়ে দিল–সে নয়নতারা। নয়নতারা পাশে ঘুমিয়ে আছে। দীপ নিভে গেছে। অথচ রাজকুমার রাজকুমারের মত ঘুমোচ্ছে, নয়নতারা নিজের মত। এই যে দারুণ সংযম–তাকে কে শেখাল?...। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ১০-১১)

লেখকের বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে–রাজুর হয়ে ওঠার নিয়ামক শক্তি নয়নতারা। নয়নের স্বাধীন, সংগ্রামী জীবন যেন সমকালীন অস্থির সময়পটে স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই নারীর ভেতর এমন এক শক্তি ছিল, যা রাজুকে গভীরভাবে আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়েছে।

নয়নতারা চরিত্রের আত্মসংকটের জায়গাটি রাজুকেন্দ্রিক। রাজুকে সে ভালবাসে, কিন্তু রাজুর সঙ্গে তার শ্রেণিগত ব্যবধান সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন। নিজের ভাবাবেগ সংবরণে মাঝে মাঝে প্রগলভ হয়ে পড়লেও পরিণত নয়নতারা রাজুর ছেলেমানুষি প্রণয়-বানে ভেসে যায়নি। তবে সমকালীন অস্থির সময়পট রাজুর মতই তাকে তেমন স্পর্শ করেনি। শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে মানুষগুলোর জন্য সে প্রগাঢ় আবেগ অনুভব করেছে। সমালোচক অর্ণব সেন নয়নতারাকে চিরন্তনী এক স্বাধীনভর্তৃকা নারীরূপে আখ্যায়িত করেছেন (অর্ণব, ২০০৩: ৭)। যদিও উপন্যাসে স্বাধীন নারী হিসেবে তার চলাফেরায় কোথাও কোথাও স্ববিরোধিতা চোখে পড়ে। রাজুর সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানোর বিষয়ে নয়নতারা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু, পথে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে যাবার অনীহায় কোথাও স্বাধীনতার লেশমাত্র চোখে পড়ে না। অন্যদিকে, স্বাধীনভর্তৃকা এই নারীকে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করার বিষয়টিতেও দ্বিমত পোষণ করা যায়। কেননা, গণমানুষের মনে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা প্রাণে বাজে, সেটি নয়নতারারও হৃদয়ের বাণী কিনা, উপন্যাসে সেটি চিহ্নিত নয়। কালের ক্ষত নয়নতারার পেলব চরিত্রে কতটা আঁচড় কেটেছে, সে বিষয়টি এখানে অস্পষ্ট। কাজেই কালের অভিঘাতে এ চরিত্র অস্তিত্ব সংকটে ভোগেনি।

উপন্যাসে বেশ কয়েকবার রাণীর সৌগন্ধ্যময় উপস্থিতি চিহ্নিত করে দেয় তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে। পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন এই নারী দক্ষ হাতে রাজ্য পরিচালনা করেছে। প্রথম শিকার গমনের দৃশ্যপটে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ রাজুর যৌবনাভিষেক রাণীর চোখে অনবদ্য লাগে। চন্দ্রকান্ত হত্যার পর মৃত চন্দ্রকান্তের লাশ গুম করতে রাতের অন্ধকারে অবগুণ্ঠনবতী ছদ্মবেশী রাণীর নিঃশঙ্ক পদচারণা তার প্রবল বাৎসল্যেরই প্রতীক। সন্তানবাৎসল্যে হরদয়াল তাকে কুন্তির সঙ্গে তুলনা করলে ব্যক্তিত্বময়ী রাণী আত্মবিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করে, 'যদি তোমার কুন্তী বলে রাণীকে সম্মান করতে সাধ যায়, আমি আপত্তি করব না, হরদয়াল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৯)। এই বক্তব্যে রাণী তার নিজের চারপাশে মাতৃত্বের যে গণ্ডি এঁটে দেন, হরদয়ালের অযাচিত অনুপ্রবেশের দ্বার তাতে রুদ্ধ হয়ে যায়। অমিয়ভূষণ এক অসাধারণ প্রতীকে বিষয়টিকে রূপ দেন:

> ইতস্তত চাইতে চাইতে দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল হরদয়ালের। আলো পড়ে ঘড়ির ডায়ালটাকে একটা লাল আলো বলে বোধ হচ্ছে। একটা মথ-জাতীয় প্রজাপতি সে-আলোর গায়ে বসবার জন্য উড়ছে, ডানার ঝাপটা লাগছে কাঁচের গায়ে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৫২)

আলোসদৃশ রাণীর প্রতি অনুরক্ত হরদয়াল এখানে পতঙ্গসম। রানীর টেনে দেয়া কাঁচের গণ্ডিতে বার বার হরদয়ালের হৃদয় ধাক্কা খেয়ে ফেরে। রাণীকে ঘিরে এক অব্যক্ত অনুরাগের আকাঙ্ক্ষা এভাবেই হরদয়ালের হৃদয়ে থানা গাড়ে। যদিও লেখক উপন্যাসে সেটি খুব স্পষ্ট করেননি। রাণীর ব্যক্তিত্বের বেশ কিছু মূল্যায়ন রাণীর প্রতি হরদয়ালের অব্যক্ত অনুভূতির তীব্রতাকে উপন্যাসে অনুভবযোগ্য করেছে। অমিয়ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে নিজে বলেছেন, 'হরদয়াল ভালবাসত রাণীকে। রাণী হরদয়ালকে স্নেহ করত' (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ১১)। রাণীকে এই বাক্যগুলো দ্বারা বেশ মূল্যায়ন করা যায়। তবে তার অস্তিত্বসংকট তখন পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেনি।

মৃত চন্দ্রকান্তের স্ত্রী রোহিণীকে আশ্রয় দেবার বিষয়ে রানী যে কথা বলেন, তাতে ব্রিটিশদের প্রতি তার মনোভঙ্গির কিছুটা সুলুক সন্ধান মেলে:

> 'স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা না-হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি এখানেই থাকতে দিতে পারতাম। কিন্তু জানো কি, সেই সুবাদে কুঠিয়ালদের সঙ্গে কোনো পরিচয় হয় তা আমি চাই না।...যদি খুঁজে পাওয়ার হয় খবরও পাবে তুমি। আর যদি কোনোদিন সংসার চালাতে অসুবিধে হয়, আমাকে খবর দিও।' রোহিণী চলে গেলে রাণী বললেন রূপচাঁদকে, 'তোমাদের কুমারের কাছে যেন মেয়েটি কখনো না যায়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৯-৪০)

অতিসাবধানী রানীর পরিকল্পিত চিন্তার প্রকাশ এটি। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে রানী আয়োজিত কালি পূজোয় মরেলগঞ্জের ইন্ডিগো কোম্পানির ম্যানেজার ডানকান, ডেপুটি যেমন নিমন্ত্রণ পেয়েছে, তেমনি নিমন্ত্রণ পেয়েছে পিয়েত্রো। রাজুকে বাঁচানোর জন্য এই পথ রানী খুঁজে বের করেন। উৎসব শেষে দেওয়ানকে রানীর জিজ্ঞাস্য ছিল, ইন্ডিগো কোম্পানির সঙ্গে এ বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করা যাবে কিনা–উত্তরে দেওয়ানের উত্তর, 'আশা করা যাক। অন্তত তদন্তের কথাটা আর-কোনো প্রকারে কেউ তুলতে সাহস পাবেনা' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৬৮)। রানীর খাটানো এইসব সূক্ষ্ম, রাজনৈতিক কৌশল ব্যক্তিগত হলেও রাজত্ব রক্ষার নিমিত্তে এই নারী কোম্পানির সাথে বিবাদে জড়ায়নি। স্কুল প্রতিষ্ঠায় ডানকানের অমতের বিষয়টি রানীর গোচরীভূত হলে তিনি মন্তব্য করেন, 'দ্যাখো হরদয়াল, ওদের দেশ, ওরা রাজা...' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৯০)। কাজেই ব্রিটিশ শক্তিমত্তার প্রাবল্য সম্পর্কে সচেতন এই নারী তার ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে। ক্ষমতা সম্পর্কে রানীর ধারণা থেকে তার পক্ষপাত বোঝা যাবে, যার পেছনে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টিই মুখ্য ছিল।

রানীর সংকটের সূত্রগুলো উন্মোচিত হতে থাকে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ রাজুর সঙ্গে নয়নতারার সম্পর্ক প্রসঙ্গে। একমাত্র অবলম্বন রাজুকে ঘিরে রানীর সকল স্বপ্নের শেকড় প্রোথিত। কিন্তু মায়ের তুলনায় নয়নের অস্তিত্ব রাজুর কাছে মূল্যবান–এরকম ভাবনা তাকে ব্যথিত করে। নয়নতারার বাড়ি থেকে ফেরার পথে তার বিষণ্ন মনোভাবনায় রানীর অস্তিত্বগত টানাপড়েন উপলব্ধ হয়:

> ছেলে নরহত্যা করেছিল, সেখানে ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু সত্যি যদি ছেলে অবিবাহিত প্রেমের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কী করে তা রোধ করা যাবে। কী করে তাকে বলা যাবে, নিষেধ করা যাবে। তখন তাঁর মনে হলো, নয়নতারাকে আকর্ষণ করে নিজের মহলে আনার চেষ্টা কি তাহলে রাজুর পুরুষ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার সমান হলো! সহসা নয়নতারার তুলনায় নিজেকে দুর্বল মনে হলো রানীর। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৮১)

রানীর এই দুর্বলতাই তার সংকটের মূল কারণ। রাজুকে করায়ত্ত করার ক্ষমতা হারাচ্ছিলেন রানী ধীরে ধীরে। এখানেই তার ভেতর লুক্কায়িত এক গাঢ় বেদনার সন্ধান মেলে।

পিয়েত্রোর প্রতি রানীর গোপন অনুরাগের বিষয়টি উপন্যাসে অনুচ্চারিত থেকে গেলেও, দু একটি ইঙ্গিত তাদের পূর্ব প্রেমের ধারণাকে গাঢ়বদ্ধ করেছে। পিয়েত্রোকে নিয়ে রানীর বেদনা অচিহ্নিতই থেকে গেছে। তাই

এ বিষয়টি রানীর ব্যক্তিগত সংকটের কারণ হয়ে উঠতে গিয়েও হয়নি। সমকাল, যাকে অমিয়ভূষণ নীলাক্ত সময় বলে অভিহীত করেছেন, সেটি রানীকে প্রত্যক্ষভাবে কতটা স্পর্শ করেছিল, সে বিষয়ে তেমন ধারণা উপন্যাসে মেলে না। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশলগুলো সে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছে। যদিও ইংরেজ-বিদ্বেষ তার ভেতর কতটুকু কাজ করেছে, উপন্যাসে সেটি প্রচ্ছন্নই থেকে যায়। এটিও রানীর এক গূঢ় কৌশল।

রাজবাড়ির অন্যতম প্রধান চরিত্র দেওয়ান হরদয়াল ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এক নিভৃতচারী ব্যক্তিসত্তা; ঊনবিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের নির্যাস চেতনায় ধারণ করে তিনি হয়ে ওঠেন নবজাগ্রত এক মধ্যবিত্তশ্রেণির অংশী। পিয়েত্রো-বুজরুকের আদর্শের বিপরীত মেরুতে তাঁর অবস্থান। কারণ পিয়েত্রো-বুজরুক আর গোবর্ধনের মত আবেগে নয়, তার জীবন চলেছে যুক্তি ও বাস্তববাদিতায়। সিপাহি বিপ্লবের ব্যর্থতা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে এর বিরুদ্ধপথ বেছে নেন তিনি। চরিত্রটি সম্পর্কে অমিয়ভূষণ বলেছেন:

> হরদয়াল সত্যিকারের ইনটেলেকচুয়ল, আজকের বুদ্ধিজীবী না, নদীর ঢেউ গুণে খায় না। তার প্রমাণ, 'ওরিজিন অব স্পিসিস' বেরিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে এসে গেছে। ফিফটি নাইনে বেরিয়েছে, সে সিক্সটি টুতে কিনেছে। যে কবির নাম বাংলাদেশের পাঠকরা শোনেনি, সেই ডানের কবিতার খোঁজ করছে। সে এইরকম একজন দারুণ ইনটেলেকচুয়াল। বেশ-ভূষা, আদব-কায়দা, হাঁটা-চলা–সব অ্যারিস্ট্রোক্রেট।...তার লাইব্রেরী...একটা স্কুল করতে হবে যা ইংরেজদের সঙ্গে জ্ঞানে বিজ্ঞানে মোকাবিলা করবে। তার পাঠসূচী মাস্টার বাগচী কিংবা কলকাতার বুক সোসাইটি ঠিক করবে না। এইরকম একটা লোক যে ইংরেজী Times কাগজ নিয়মিত পড়ে।...মোকাবিলা করতে হবে।...সে এক দুর্ধর্ষ চরিত্র। লক্ষ্য করো, ইংলিশ শিক্ষা, সাহিত্য, জীবনচর্যার পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজের মোকাবিলা করছে। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ১১-১২)

অমিয়ভূষণের বক্তব্যের আলোকে হরদয়ালকে মূল্যায়ন করা হলে উপলব্ধি করা যাবে, নিভৃতচারী ইনটেলেকচুয়াল এই মানুষটির স্বপ্নের জায়গাটি ছিল স্কুলঘর। নিজেকে বিটন সাহেবের সাথে তুলনায় তার চোখে আনন্দে জল আসে। আপাতদৃষ্টে, সিপাহি বিপ্লবের বিরুদ্ধাচারণ হরদয়ালকে ইংরেজের পক্ষাবলম্বী হিসেবে চিহ্নিত করলেও তাঁর দেশপ্রেমের জায়গাটি ছিল আরোও নিভৃত ভাবনার অন্তর্গত। নীলকরদের প্রতি বিরূপ সত্যভাষণে হরদয়ালকে অনবদ্য মনে হয়। উপন্যাসের শুরুর দিকে রাজুকর্তৃক ইউনিয়ন জ্যাক ছিন্ন করার বিষয়টি নিয়ে তার ভাবনা কিংবা ডেপুটির সঙ্গে কথোপকথনে নীলকরদের প্রতি তার ঘৃণার প্রকাশ ঘটে:

> রাজুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে জানতে পেরেছিল রাজু গুলি করে পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে। অন্যায় বইকি। রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীককে অপমান করা। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীক নীলকররা ব্যবহার করছে, এটাই-বা অন্যায় নয় কেন?
>
> ...হরদয়াল বললে, '...সত্যি যদি নীলকরের সুলুপের মাথায় ওড়ানো ইংলন্ডের জাতীয় পতাকাকে ওরা নষ্ট করেই থাকে তবে সবটুকু সত্য বলতে গেলে কি এ-ও বলতে হয় না যে, ওরা একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছে মাত্র? নীলকরের কি নৈতিক অধিকার আছে অন্যায়ের জাহাজে রাষ্ট্রীয় পতাকা স্থাপন করার? সে তো তার রাষ্ট্রের প্রতিভূ নয়। সে শুধু চায় তার রাষ্ট্রের অস্ত্রবলের ভয় দেখিয়ে পদ্মার বুকে অন্যায়ের জাহাজ

> চালিয়ে নিয়ে যেতে। পর্তুগিজ হারমাদদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? সেইসব হারমাদদের যারা জব্দ করেছিল তারা কি অন্যায় করেছে? না। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে মরেলকে জব্দ করাও অন্যায় হয়নি। কিন্তু এই অন্যায়কে অন্যায় বলা যাচ্ছে না। মরেল-হারমাদদের সমর্থন করছে কিছু লোক। সবটুকু সত্য বলাও ভালো নয়, শুনেও ফল হয় না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৪৩)

হরিশচন্দ্র মুখার্জির 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হরদয়াল নীলকরদের ঘৃণা করেছে। একারণেই নীলকর ডানকানের ভূমিকা তার কাছে নিন্দনীয়। মুর্খের মত ডানকানের কাছে বাঙালিরা নিগার, প্রভু ইংরেজদের মুখে মুখে কথা বলার সাহস পাবে ইংরেজি শিখে–এ কথায় চরম অপমানিত হরদয়াল ডানকানের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও স্কুলের কাজ এগিয়ে নেয়। উপরন্তু রানীর কাছে তার অকপট স্বীকার, 'দেশ ইংরেজের বটে, ডানকানের নয়। যে-দেশে বার্ক জন্মায়, যে-দেশের মাটিতে ফিলিপ সিডনি জন্মায়, যে-দেশের লোক বিটনসাহেব, সে-দেশে ডানকানদের মত মূর্খ জন্মায় বটে, তাই বলে সে দেশের প্রতিনিধি হয় না' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৯০)। হরদয়াল ইন্ডিগো কোম্পানি আর ইউরোপের সমৃদ্ধ সভ্যতাকে কোথাও এক করে ফেলেননি। তাই ইংরেজি শিক্ষা আর শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তিনি; বিশ্বাস করেন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার কারণে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের উত্তম বিষয়গুলো গ্রহণের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। ভেতরে ভেতরে ইউরোপীয় শিক্ষার সারবস্তু এতটাই গভীরে চারিয়ে গিয়েছে যে তার তীব্র বিশ্বাস ছিল– ইংরেজ ভারতীয়দের পরিত্রাতা। গভীর এই বিশ্বাসের নিন্দা করলে তিনি রাজুকে বলেন:

> 'আমি অনেকদিন ধরে ভেবেছি ইংরেজ আমাদের কাম্য ছিল। কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ য়ুরোপের তুলনায় কাব্য ও সাহিত্যে হীন ছিল না। ইংরেজ পণ্ডিতদের গবেষণায় জানতে পারি খলিফারা সংস্কৃত থেকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই জ্ঞান য়ুরোপেও প্রচারের পথ করে দিয়েছিল। তখনও ভারতের জ্ঞান য়ুরোপে মহার্ঘ্য ছিল। তারপর পাঁচশো বছর কী হয়েছে? জাতিটা শুধু যুদ্ধই করল। কখনও পাঠানের বিরুদ্ধে, কখনও মোগলের, কখনও বা পাঠানের হয়ে মোগলের বিরুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধের শেষ হলো না। শুধু ধ্বংসই হলো, সৃষ্টি হলো না। এ তো ভালোই হয়েছে রাজকুমার, কিছুদিন ধ্বংসের শেষ হোক। কিছুদিন না-হয় পরাধীনই রইলাম'। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৫৩)

মননবাদী এই ব্যক্তি ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে চান মস্তিষ্ক দিয়ে, আবেগ কিংবা অস্ত্র দিয়ে নয়। এজন্যই তার স্কুল গড়ে তোলা। এই স্ববিরোধিতা তার ভেতর আত্মদ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। একদিকে তার ইনটেলেকচুয়ল সত্তার ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে নীলকরদের প্রতি অসীম বীতশ্রদ্ধ মনোভঙ্গির মিথস্ক্রিয়া এ চরিত্রকে স্ববিরোধী করে তোলে। তখন পর্যন্ত কোনোরকম গভীর আত্মদ্বন্দ্ব উপলব্ধি করেনি হরদয়াল। যদিও কখনো কখনো বিবেকের তাড়না তাকে কলকাতার বন্ধুর কাছে লিখতে বাধ্য করেছে। নবজাগরণের ঢেউ হরদয়ালকে প্রভাবিত করেছিল। '...ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব উনিশ শতককে পীড়িত করেছে অহরহ। পুরনো প্রথা আর সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে...ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় গড়ে তোলার তাগিদটা প্রবল–সেই তাগিদেই ব্যক্তির সমষ্টির আশা আকাঙ্ক্ষাকে এড়িয়ে যেতে হয়েছে অনেকসময়' (ইরাবান, ১৯৯৪: ৩৬)। সংস্কারমুক্ত নবজাগরণের একলা পথিক হবার মনোভাবনায় হরদয়ালের ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। যে কারণে বুজরুক-গোবর্ধন-পিয়েত্রোর মত সামষ্টিক শক্তির গণআন্দোলনে তার ব্যক্তিক শক্তি সায়

দেয়নি। ইউরোপীয় নবজাগরণ আর মানবিকতায় তার ব্যক্তিসত্তা বিভোর ছিল। কিন্তু, 'দেওয়ানজি...আপনি কি ডানকানদের মত কুঠিয়ালদেরও দেখতে পাননা? আপনি কি আপনার গ্রামের নিঃসম্বল তাঁতিদের দেখেও বুঝতে পারছেন না?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৫৪)–গোবর্ধনের এই শেষ বাক্যগুলো তার ভেতর আত্মোপলব্ধির জন্ম দেয়। বুজরুক বা গোবর্ধনের ইতিহাসের দুঃসাহসী দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্যে যাবার যে যোগ্যতা আছে, সেই একই সামর্থ্য বা যোগ্যতা তার নেই–এই ভাবনা তাকে দুর্বল করে তোলে। তার মনে হয়, 'গোবর্ধনমাস্টার যেন মাস্টারি-ভাষায় তার অঙ্কের হিসাবে গোড়ার ভুলটা দেখিয়ে দিয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৫৫)। একটা যুক্তিহীন বিষণ্নতা তাকে বিদ্ধ করে। একদিকে তার প্রতি বুজরুক আর গোবর্ধনের শ্লেষ বর্ষণ, অন্যদিকে ডানকানের স্কুলে টাকা দিয়ে তাকে করায়ত্ত করার নতুন কৌশল তার ভেতর অনুশোচনা এবং এক অনির্দিষ্ট দাহের জন্ম দেয়। একসময় তার আত্মোপলোব্ধি ঘটে, পরাজয়ই মানুষকে বিশিষ্ট করে। সাময়িক জয়ে উচ্ছ্বাসসর্বস্ব ব্রিটিশ শক্তি ডানকানের পাশাপাশি সিপাহি বিপ্লবে পরাজিত বুজরুক, গোবর্ধনের সত্তার গভীরতা অনবদ্য। 'কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনটা টালমাটাল করে উঠল। স্মৃতি আলোড়িত করে যেন কোনো-কোনো পরাজয়ের কথা মনে পড়বে।...অন্য অনেক পরাজয় হয়েছে নাকি? এটাও কম বিস্ময়ের নয়, ভাবল সে। কিভাবে কাকে হার স্বীকার করতে হবে। বুজরুকের কী হলো! কী হয় কে জানে!' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৮৫)। বুজরুকের জন্য এই অনুভব হরদয়ালের রূপান্তরিত চেতনার কথা বলে। হরদয়াল চরিত্রের এই চেতনাগত দোলাচল তার অস্তিত্বসংকটের পরিচয়বাহী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় রানীকর্তৃক দেওয়ান থেকে পদচ্যুতির বিষয়টি। পিয়েত্রোর মৃত্যুর পর রাজু আর নয়নতারার চোখে বৃষ্টিস্নাত নিঃসঙ্গ হরদয়ালের আপাত পরাজিত অস্তিত্বই মূর্ত হয়ে ওঠে। হরদয়ালের পাশেই 'সুরকি তৈরির লোহার চাকাটা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে'(অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৯০) থাকার রূপকল্প চিত্রণের মধ্য দিয়ে লেখক প্রতীকায়িত করেন হরদয়ালের পরাজয়। 'মহানগর থেকে দূরবর্তী এক গ্রামীণ জনপদে, পুরনো সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে বসে একটি মানুষ আধুনিকতার স্বাদ পেতে চেয়েছিল, চেয়েছিল চিত্তের মুক্তি, তৈরি করে নিতে চেয়েছিল দ্বন্দ্বাকীর্ণ নতুন নৈতিকতার বোধ, যে দ্বন্দ্বের পরিচয় বন্ধুর কাছে লেখা তার চিঠিতে, বিশেষত রাজচন্দ্রের হাতে মানুষ খুন হওয়ার পর–কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না চারপাশের সাধারণ মানুষের বদলে-যাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষাকে' (ইরাবান, ১৯৯৪: ৩৭)। এই অসহায়ত্বেই হরদয়াল চরিত্রের সংকট নিহিত।

ফরাসি পিতার ঔরসে বাঙালি মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া পিয়েত্রো রাজবাড়ির বাইরের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ইংরেজ আর ফরাসির মধ্যকার যুদ্ধ ভুলে যায়নি ফরাসি পিয়েত্রো। ইংরেজের প্রতি প্রতিহিংসা আর বাঙালি রক্তের টান থেকে তাই সে সিপাহি বিপ্লব আর স্বাধীনতাকামনায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করেছে বুজরুক আর গোবর্ধনকে। সেইসঙ্গে রাজুকে সেই বিদ্রোহের অনুকূলে রাখার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণে পিয়েত্রোর নীরব সহায়তা কাজ করেছে। শিকারের মধ্য দিয়ে রাজুকে তৈরি করা, চন্দ্রকান্ত হত্যার দায় থেকে তাকে আড়াল করা কিংবা বুজরুককে বিপ্লবের জন্য তৈরির সকল সহায়ক-শক্তি যুগিয়েছে পিয়েত্রো। সমালোচক মনে করেন:

> ইতিহাসচেতনা ও উপন্যাসবোধ অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠলে দেশাত্মবোধ হয়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষ, যা সিপাহি বা নীলবিদ্রোহে স্পষ্ট লক্ষ্য করা চলে। আর এই বোধ রানী, পিয়েত্রো, বুজরুক, রাজু প্রভৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকে,... কে মুসলমান, কে হিন্দু, কে আধা-খ্রীস্টান–তার কিছুই মনে পড়ে না। পিয়েত্রো-ই অবশ্য এই

> বোধের মধ্যমণি, যাকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছে সকলের বোধ, এর ফলে, এবং পিয়েত্রো প্রায় চালিকাশক্তির মত বলে দেশাত্মবোধ তার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে,...জাতি-ধর্মের বিভেদ এভাবে অতিক্রম করা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য, আর সমস্ত চরিত্র পিয়েত্রোকে কেন্দ্র করে খুব কাছাকাছি আত্মীয় হয়ে ওঠে এজন্য। (কার্তিক, ১৯৮৪: ৯৫)

কাজেই পিয়েত্রো এই উপন্যাসের এক কেন্দ্রাতিগ শক্তি। পিয়েত্রোর আত্মসংকট বা অস্তিত্বসংকটের জায়গাটি চিহ্নিত হয় সিপাহি বিপ্লবের ব্যর্থতায়। সেটি হয়ে ওঠে তার ব্যক্তিগত পরাজয়। চেতনায় বাঙালির স্বাধীনতাকামনার স্বপ্ন অনেক গভীরে চারিয়ে গিয়েছিল তার। হরদয়ালের স্কুল প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তার অনুশোচনা আর সংকটের জায়গাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> তুমি ভেব না দেওয়ান, ইংরেজ আমার এখনও জাতশত্রু। আমি জানি দ্যুপ্লের সময়ে একটা ভুল করেছে ফরাসিজাতি, দ্বিতীয়বার ভুল করে পলাশিতে। এখন দ্যুপ্লের সময় ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়। যদি তুমি আমাকে বলতে ফরাসি শেখার জন্য স্কুল করবে, আমি আপত্তি করতাম। কেন করবে? কী তোমার যুক্তি? তুমি কি মনে করো কোন বিষয়েই ভারতীয়দের চাইতে বেশি অগ্রসর ইংরেজ কিংবা ফরাসি? (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৭১)।

ইতিহাসে নিজেদের ভুল শোধরানোর জন্যই সে বাঙালির পক্ষাবলম্বন করে। ফ্রেঞ্চ ইন্ডিজ এর গভর্নর জেনারেল দ্যুপ্লে যে ভুল করেছিল, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের যুদ্ধ এবং ক্লাইভের স্বৈরাচারী বিজয় যেভাবে দ্যুপ্লেকে পরাজিত করেছিল, এবার আর সেভাবে তিনি পরাজিত হতে চাননি। স্কুল নির্মাণে তার সদর্থক আচরণের পেছনেও ছিল মস্তিষ্কে বাঙালিকে ইংরেজের সমকক্ষ করে তোলার আকাঙ্ক্ষা:

> ইংরেজি-জ্ঞানে তাদের মনকে উন্নত করছে তা নয়, তীক্ষ্ণ করছে; প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হলে যে যোগ্যতা দরকার সেগুলি তারা আহরণ করছে ইংরেজদের কাছ থেকে। ঠিক যেন বারুদের ব্যবহার শত্রুর কাছে শিখে নেওয়া।...যেমন ধর্মের ব্যাপারে। নিজস্ব সংস্কৃতি যাদের নেই তারাই খ্রিস্টান হয়েছে। তেমনি শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজদের অনুকরণ তারাই করবে যাদের শিক্ষার ঐতিহ্য নেই। যাদের সেটা আছে তাদের সঙ্গে প্রতি মিটার জমির জন্য ঝগড়া হবে। ইংরেজি শিক্ষার দ্বন্দ্বপ্রবণতা এদিক দিয়ে মন্দ নয়। রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের কথা, ফরাসিদেশের রেভুল্যুশন, বার্কের বক্তৃতা এদের জানা থাকা ভালোই। মানসিক উন্নতি না-হোক, ইংরেজদের রাজনীতির সমকক্ষ হোক। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৯৪-৯৫)

ইংরেজবিমুখ পিয়েত্রোর মনোভঙ্গি স্পষ্ট এখানে। আলী খাঁ'র স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষার উৎসস্থল পিয়েত্রো। শিবাজী ও প্রতাপের সম্মানে সম্মানিত হোক রাজু–এটাই ছিল তার চাওয়া। শিবাজী কিংবা প্রতাপের মত ধীর-সময়সাপেক্ষ বিপ্লবের বীজ তিনি গণচেতনায় প্রোথিত করে দিতে চেয়েছেন। উপন্যাসের শেষে পিয়েত্রোর মৃত্যু আর ডানকানের কালিপূজোর উল্লাস সিপাহি বিপ্লবের গাঢ় ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে। এই ব্যর্থতা শুধু সিপাহি বিপ্লবেরই নয়, প্রকারান্তরে হয়ে ওঠে পিয়েত্রোরও।

উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ইউনেটোরিয়ান বাগচি মানবিক ও একেশ্বরবাদী, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চরণের কাছে আত্মস্বীকৃতিতে তার উদারনৈতিক ধর্মভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ক্রাইস্ট যা বলেছে, সেগুলো তার কাছে থিয়োরি মাত্র। কাজেই অ্যাংলো বাগচি ধর্মবোধের দিক থেকে খ্রিস্টান সমাজের এক

অপাংক্তেয় ব্যক্তি। উপন্যাসে একমাত্র বাগচীকে কেন্দ্র করেই অমিয়ভূষণ কথিত 'নীলাক্ত সময়ে'র প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। বাগচির স্কুলে যাওয়ায় মরেলগঞ্জের নীলকর ডানকানের কুঠিতে কর্মরত দুজন বালকের প্রতি নীলকরের নির্যাতন প্রতিহত করতে গিয়ে বাগচি ডানকানের নিষ্ঠুরতাকে কৌশলে চিহ্নিত করার সামর্থ্য ও স্পর্ধা দুটোই দেখায়। নীলাক্ত সময়ের ক্ষুদ্র অথচ সুস্পষ্ট-বাস্তবনিষ্ঠ এক প্রকাশ সেটি। বাগচির বিরুদ্ধাচারণও ছিল কৌশলী, কিন্তু নিরেট। এমনকি বালকদুটোর অন্তঃকরণে যে আত্মবিশ্বাসের বীজ বাগচি রোপণ করে দেয়, সেটি নীলকরের বিরদ্ধে একধরনের গণবিপ্লবের সূত্রপাত বলেও মনে করা যেতে পারে। গোবর্ধন কিংবা বুজরুকের সিপাহিবিপ্লব গমনের বিষয়টি তার চোখে তীর্থযাত্রার সমতুল্য। তার ভেতর আত্মতৃপ্তির পাশাপাশি আত্মদ্বন্দ্ব ও বেদনাও ছিল। খ্রিস্টান ধর্মের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নতা তাকে খ্রিস্টান সমাজে সম্মান দেয়নি। বার বার তাকে ডানকানকর্তৃক অপমানিত হতে হয়েছে। নিজের স্ত্রী কেট সম্পর্কে কুৎসা শুনতে হয়েছে। এমনকি বাঙালি হয়ে কেটকে বিয়ে করার বিষয়টিতেও ডানকানের মত ইংরেজ সমাজের কাছে তাকে হতে হয়েছে অপমানিত। তার আত্মদ্বন্দ্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধে। যদিও সেটি তার অস্তিত্বসংকট তৈরি করেনি। কারণ, বাগচির আত্মশক্তি তার কর্মস্পৃহায়। কাজেই বারবার অপমানিত হলেও বাগচি তার কর্মযজ্ঞে অপরাহত। নীলাক্ত সময়ের ক্ষত ধারণ করে বাগচির মত চরিত্রগুলো উপন্যাসে স্বমহিমায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে অস্তিত্ববান।

উপন্যাসের আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আলী খাঁ বা বুজরুক এবং গোবর্ধন। সিপাহি বিপ্লবের শক্তিকে এঁরা প্রত্যক্ষভাবে রক্তে ধারণ করেছে বলেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে পেরেছে। দুজনের পিতাই প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শক্তির দ্বারা অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হওয়ায় উত্তরসূরি হিসেবে সেই অপমানের যন্ত্রণা তারা প্রতিমুহূর্তে অন্তর্সত্তায় উপলব্ধি করেছে। বুজরুক আর গোবর্ধন এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত নীলাক্ত কালের ক্ষত প্রত্যক্ষভাবে ধারণ করেছে সত্তায়।

ভারতের সম্রাট ইংরেজ নাকি বাহাদুর শাহ–এই জিজ্ঞাস্য প্রথম আলি খাঁর তীব্র ব্রিটিশ বিরোধি সত্তার প্রকাশ ঘটায়। রাজুর কাছে প্রকাশ্যে আলি খাঁ তার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করে বলে, 'আমি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে চাইনা। এই ইতর ধর্মহীন নিমকহারাম জাতটাকে বাংলাদেশ থেকে তাড়াতে চাই' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ১৪৪)। উপলব্ধি করা যাবে, বুজরুক চরিত্রটির আত্মদ্বন্দ্ব তেমন নেই। শুরু থেকেই সে তার উদ্দেশ্য পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই অস্তিত্বসংকটের বিষয়টি তেমন মেলেনা এই চরিত্রে।

নয়নতারা উপন্যাসে কালের অভিঘাতে প্রবলভাবে আলোড়িত চরিত্র কেবল বুজরুক-গোবর্ধন-বাগচি এবং পিয়েত্রো। অন্য চরিত্রগুলোর ভেতর তাদের ব্যক্তিক আবেগই ফেনিয়ে উঠতে দেখা যায়। সময় নিজেই এখানে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রকাশিত। কাজেই *নয়নতারা* উপন্যাসে কালের এক অনন্য প্রকাশ ব্যক্তিকবোধে উচ্চকিত চরিত্রগুলোর অস্তিত্বসংকট নির্মাণে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

রাজনগর

নয়নতারা উপন্যাসের মত *রাজনগর* উপন্যাসে ব্যক্তির কথকতা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। ক্রমরূপান্তরিত কাল এখানে প্রোটাগনিস্ট চরিত্র। সমালোচক মনে করেন, অমিয়ভূষণ তাঁর *নয়নতারা* এবং *রাজনগর* উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে:

> ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা নয় বরং সমাজের ঐতিহাসিক চিত্র, একটা যুগ এবং সমাজের কথা তিনি বলেছেন। এর পিছনে একটা ঐতিহাসিক বোধ; এলিয়টের ভাষায়:–historical sense…a sense of the timeless as well of the temporal (Tradition and the Individual Talent: T. S. Eliot) এ একটি ইতিহাস বিষয়ক অনুভূতি যার মধ্যে অতীত এবং বর্তমান জড়িয়ে গেছে। (রাণা, ১৪০৮: ৩৯৭)

১৮৬০ থেকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তরঙ্গিত সময়কালের চালচিত্র এখানে রূপ পেয়েছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রায় সবগুলো দিক উপন্যাসে উঠে এসেছে। পরিবর্তমান কালের ঢেউ এখানে কলকাতা থেকে বহুদূরের গ্রাম রাজনগরে এসে ব্যক্তিমানুষগুলোর চেতনাজগতে আছড়ে পড়েছে। শুধু ভারতবর্ষই নয়, এমনকি বৈশ্বিক কালও চরিত্রের কথোপকথনে কংক্রিট হয়ে ওঠে। তবে চরিত্রগুলো সক্রিয়ভাবে এই তরঙ্গায়িত সময়ের সংস্পর্শে আসেনি। বরঞ্চ আলোড়িত সময়ের অভিঘাত তাদের স্পর্শ করে গেছে পরোক্ষভাবে। কীবল কথিত প্লিমাথের স্টিমার চলাচল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ভূমিকা, সেন্ট টমাসের হসপিট্যালে নার্সস্কুল খোলার প্রস্তাব, ওয়াং বিদ্রোহ দমনে কায়েতকুমার মুকুন্দের ইংরেজ সেনাবাহিনিতে যোগদান, উনিশ শতকীয় ইংল্যান্ডের ধর্মীয় আন্দোলন, এদেশে তার প্রভাব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কেশবচন্দ্র সেন প্রসঙ্গ, ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, ইন্ডিগো কমিশন বসার সম্ভাবনা, নারীশিক্ষা আন্দোলন ও সমাজসংস্কারপ্রসঙ্গে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ কিংবা মদ্যপান নিবারণী সভাপ্রতিষ্ঠা, নীলকর বিরোধী নাটক নির্মাণের মত বিষয়গুলো উপন্যাসে সমকালের আদল রচনা করে। '...এইভাবে নীল ভূঁইয়া-র থেকেও রাজনগর আরও বেশি কালচিহ্নিত উপন্যাস হয়ে ওঠে।...অমিয়ভূষণ উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের স্বরূপকে বুঝতে চান–এবং বোঝাতে চান' (অলোক, ২০০১: ১৮৮)। সমকালীন পরিবর্তনের ঢেউ কলকাতা থেকে দূরবর্তী এই রাজনগরে যে আলোড়ন তোলে, সেটি চরিত্রগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আরো বেশি গাঢ়বদ্ধভাবে অনুভূত হয়।

সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ লিখেছেন:

> রাজনগরের পটভূমি কোন্ অঞ্চলকে ভিত্তি করে তা নিয়ে মতভেদ আছে। একজন সমালোচকের মতে কোচবিহারের রাজপরিবারের কাহিনিই মূল উপজীব্য। ১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। কোচবিহারের অষ্টাদশ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের শাসন ও মৃত্যু থেকে ঊনবিংশতিতম রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেকের পর্যন্ত সময়। বেশির ভাগ সময়ে রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলে রানিমা এবং পরবর্তীকালে হটন সাহেব রাজ্য পরিচালনা করতেন।...আবার অন্য মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মফস্বল জমিদার পরিবারের কাহিনি রাজনগর। কোচবিহারের কাহিনি নয়। সময়কে ধরবার জন্যে হয়তো ইতিহাসের

> প্রক্ষেপ। স্বয়ং অমিয়ভূষণ বলেন, 'এ কোন মতেই কোচবিহারের রাজকাহিনি নয়। দু-একটি ঘটনার বিক্ষিপ্ত মিল থাকলেও উপন্যাসটির পটভূমি পূর্ববাংলা। (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ১৩৩-১৩৪)

লেখকের সাথে একমত হয়ে বলা যেতে পারে, রাজনগরের পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে, সেটি যে পদ্মা, এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ সে সত্য নিশ্চিত করেছেন। কাজেই এর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পূর্ববাংলার কথাই মনে করিয়ে দেয়। অমিয়ভূষণ উপন্যাসের নানাক্ষেত্রে বেশ কয়েকবারই সময়কালটিকে নির্দিষ্ট করে দেন, সমকালে ঘটমান নানা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখই যার প্রমাণ। এ উপন্যাসের কালচিহ্নিতকরণে সমালোচক অলোক রায়ের বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত পোষণ করা যাবে। তিনি লিখেছেন:

> রাজনগর-এর কাহিনীকাল ১৮৫৯-৬১ মনে করার সংগত কারণ আছে (যদিও প্রথম পরিচ্ছেদে জানানো হয়েছে "বোধহয় মৃদু মৃদু বাতাস একটা আছে ১৮৬০-এর শেষ হেমন্তের ঠাণ্ডাটাকে বাড়ানোর মত।") নীল ভুঁইয়ার কাহিনীর সমাপ্তি ১৮৫৮ সাল। তার অল্প পরেই রাজনগর-এর কাহিনীর সূচনা।..১৮৫৯-এ রানীর জন্মতিথি উৎসবে ''ডানকানরা এলো না। সে বললো, কলকাতায় কিন্তু এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ৫৭-৫৮র সেইসব ব্যাপারের পরে ইংল্যান্ডের লোকেরা দূরে দূরে সরবে।" ১৮৬০–এর জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজকুমার কলকাতায় ছিলেন। ১৮৬০ সালের ইন্ডিগো কমিশন উপন্যাসে ভালোভাবে বর্ণিত হয়েছে। ডানকান ''হয়তো কমিশন নয়, স্ত্রী-পুত্রের কথাই ভাবছে। তারা সেই ৫৭-তে হোমে গিয়েছে, এদেশে আসতে চাইছে না। যদিও ১৮৫৭-৫৮র ব্যাপারগুলো তারা প্রত্যক্ষভাবে জানে না। ফলে এখন এই ১৮৬০-এর শেষেও মরেলগঞ্জ স্ত্রীলোকহীন।"..."১৮৫৯-এর চাষিদের ঔদ্ধত্যের কথা ভাবো। লাটসাহেব স্যার জন পিটার গ্রান্ট ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজনগর এসেছিলেন মনে করা যেতে পারে। তাহলে উপন্যাসের শেষে যে-গুডফ্রাইডের দিনে গুলি চলল তা কি ১৮৬১ সালের ঘটনা নয়? (অলোক, ২০০৯: ২৬২-২৬৩)

উপন্যাসের বহিরাঙ্গিক সময়টিকে এভাবেই বের করে আনতে হয়। যদিও, পুরো উপন্যাস জুড়ে কালের অভিঘাতে ব্যক্তির অস্তিত্ব ও সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরিত স্বভাবস্বর উচ্চকিত। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'কাছারিতে তখন রাণীমার জন্মোৎসবের কথাই প্রাধান্য পাচ্ছিলো–তা ঠিকই, কিন্তু সেই একরকমের যুদ্ধ, যার অন্য নাম আধুনিকতাও বলা যায়, তার কথাও এসে পড়ছিলো।...এখানে যেন পরে যা হবে তার সূচনা সেবারই দেখা দিয়েছিল। একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা।... ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২৭১)। নতুন কালের একটা বড় পরিবর্তনের অভিঘাত এসে লাগে রাজবাড়িতে; যার ফলে পুরনোকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা জন্মে চেতনায়। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই রাজবাড়িতে সদর দরোজায় পরিবর্তন ঘটে কিংবা গাড়িবারান্দা যুক্ত হয়। সামন্তজীবনে রূপান্তরের এই হাওয়াকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন রানীমা; হয়তো নতুন কালের সাথে খাপ খাইয়ে নিজের অস্তিত্বকেই তিনি শক্তিশালী করতে চাইছিলেন। রানী বিশ্বাস করেন, একালে বণিকেরা তৈরি করে দিচ্ছে যে আকাঙ্ক্ষা, তাতে পুরনো অভ্যাস পাল্টে যাচ্ছে, রূপোর বাসনের পরিবর্তে নিত্য তৈজসপত্র হয়ে উঠছে চিনেমাটির বাসন। কলকাতার আধুনিকতার কথা ভেবেই আর্মেনি শিশাওয়ালা রাজনগর বা তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে ধনী-মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্তদের উপযুক্ত পণ্য সরবরাহ করছে। মেদিনীপুর-কলকাতা আর হুগলীর মত স্ট্রিট লাইটনিং এসে গেছে রাজনগরে। বিলাসিতার পরিবর্তে সামন্ততন্ত্রের এতকালের অভ্যাস ভেঙে রানী স্টক আর কোম্পানির কাগজে টাকা রাখেন। গ্রামীণ অর্থনীতি

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় এভাবেই ব্যক্তি ও তার পারিপার্শ্বিক আকাঙ্ক্ষার জগতটিও রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। মরেলগঞ্জের আড়াআড়ি ছ-আনির কায়েত বাড়ি থেকে রাজবাড়ির সদর পর্যন্ত রানীর সুড়কির সড়ক নির্মাণেচ্ছার ভেতর প্রতিফলিত হতে থাকে ক্রমবিকশিত যন্ত্রসভ্যতা-আত্মীকরণের আকাঙ্ক্ষা। মরেলগঞ্জের আড়াআড়ি পরিকল্পিত এই সড়ক উপন্যাসে কোম্পানির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে রানীর প্রবল প্রকাশকেই প্রতীকায়িত করে। যদিও, রাজকুমারকে ইউরোপীয় কেতায় মানুষ করার আগ্রহ রানীর মনোভাবনা সম্পর্কে একধরনের স্ববিরোধিতার জন্ম দেয়। হরদয়ালের মনোভাবনা রানীর আকাঙ্ক্ষাকে ধারণে সচেষ্ট:

> রানী কী চাইছেন? সেক্রেটারি না টিউটর? নাকি বয়স্য চাইছেন যে বাগচীর মত স্থিতধী এবং সৎচরিত্র, মদ খায় কিন্তু মদ্যপ নয়। সে নিজে এসেছিল রাজকুমারের সেই পাঁচ বছর বয়সে টিউটর হয়ে।...রাজকুমার তখন তেরো-চোদ্দো হবে। ক্রমশ পিয়েত্রো বুজরুক তার দিনের বেশিরভাগ নিতে লাগল।...সে সব কি রানীর ইচ্ছাতে? এখন পিয়েত্রো, বুজরুক নেই। সেজন্যই কি নতুনতর সঙ্গী হিসাবে বাগচী?...সবটার পেছনেই কি পরিকল্পনা ছিল রানীর? কলকাতার শিক্ষা দিতে তাকে নিযুক্ত করে পরে পিয়েত্রো বুজরুককে উপযুক্ততর মনে হয়েছিল? আর এখন পিয়েত্রো, বুজরুকের কাল চলে গিয়েছে বলে বাগচী? (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২৮৪)

কালের গতিপ্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার এই আকাঙ্ক্ষায় রানী ও তার উত্তরসূরি রাজকুমারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার গোপন অভীপ্সাই প্রকাশমান। সমালোচক বিনয় ঘোষ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন:

> ভারতের পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো লণ্ডভণ্ড করে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা নতুন যে শক্তি সঞ্চারিত করল তার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির পথে তারাই আবার বাধা সৃষ্টি করল। ভারতের বণিকশ্রেণী, ভারতের ভবিষ্যৎ ধনিকশ্রেণীকে ব্রিটিশ ধনিকরাই সচেতন করল, নতুন ধনতান্ত্রিক যুগের মন্ত্রে তাদের দীক্ষিত করল, পুরাতন প্রাকারবেষ্টিত নগর ও আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজের সংকীর্ণ সীমানা থেকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে নতুন যন্ত্রযুগের মুখোমুখি তাদের দাঁড় করিয়ে দিল,...প্রাচীন ভারতীয় সামন্তপ্রথার ভিত শিথিল করে দিয়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুকূল বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করা। (বিনয়, ১৪০২: ২৬)

যে রূপান্তরের বীজ রাজবাড়ির সর্বত্র বিরাজমান, তাকে রোধ করবার কোনো পথ আর রইল না। কালের অমোঘ গতির সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণিকে খাপ খাইয়ে নিতেই হচ্ছিল।

শুধু রাজবাড়িতেই নয়, গ্রামবাসীদের জীবনেও যন্ত্রসভ্যতার নানা বিস্ময় কালের পরিবর্তমানতাকেই উচ্চকিত করে তোলে। রাজনগরের নদীতে প্রথম অ্যালবেট্রস নামক স্টিমশিপের চলাচল এখানকার মানুষের কাছে একইসঙ্গে বিস্ময়-কৌতূহল আর অজানা আশঙ্কার, যেন তা 'এমন এক একচক্ষু জলদানব যার অশুভ উচ্চ ছাগনিনাদের কথা এমনকী কোনো কাব্যে-পুরাণেও বলা যায়নি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৮৫)। তবে সেটি যে অশুভ সেই বোধটুকু তাদের ছিল। হরদয়াল অনুভব করেছিল এর নেতিবাচক প্রভাবটুকু:

> স্টিমশিপ অবশ্যই উন্নয়নের সহায়ক হইবে। ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করি, কেননা যেখানে নদীপথ আছে সেখানে রেলপাতার তুলনায় স্টিমশিপ লাইন প্রবর্তন অনেক কম শ্রমে ও অনেক কম ব্যয়ে হইতে পারে। কিন্তু বলিব কী, হয়তো বহুদিনের সংস্কারে মনে হইল সব দিক দিয়া আচ্ছন্ন

> হইলেও হয়তো-বা রক্তে কোথাও আরোগ্যের বীজ ছিল, কিন্তু এই স্টিমশিপ যেন নদীরূপ শিরা বাহিয়া দেশের অন্তঃকরণকেও আক্রমণ করিল। কিছু আর অজিত রহিল না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৮৫)

অমিয়ভূষণের উপন্যাসগুলোতে 'নদী' সর্বত্রই প্রাণশক্তিরূপে বিবেচিত। পদ্মা সম্পর্কে লেখক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:

> ...ওই পদ্মা-পদ্মিনী নদী বাংলাদেশের প্রাণ।...পদ্মা বাঙালীর জিনিয়াসের সিম্বল। জিনিয়াস বলতে প্রতিভা নয়। জিনিয়াস বলতে জাতির গভীরতম সত্তা–তার সিম্বল পদ্মা। পদ্মা নেই তো বাঙালী নেই।...হরদয়াল সত্যিকারের ইনটেলেকচুয়ল, আজকের বুদ্ধিজীবী না,.....যে লোকটার (হরদয়াল) রেলগাড়িতে তত ভয় ছিল না, কিন্তু যখন পদ্মার উপর দিয়ে স্টিমার চলতে শুরু করল, তখন তা তার শিরা উপশিরায় পরাজয় ছড়িয়ে দিল। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ৪-৫, ১২)

ইউরোপীয় সভ্যতাসৃষ্ট এই আধুনিকতার অনুপ্রবেশ হরদয়ালের কাছে ইতিবাচক। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার বীজসম স্টিমশিপগুলো যখন নদীরূপ শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে রাজনগরের মত গ্রামে প্রবেশ করে তাদের প্রাণরস ও স্বকীয়তা বিনষ্টিকরণের আয়োজন করবে, তখন সেটি হবে তাদের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাতসদৃশ। এই মনোভাবনাই হরদয়ালের চেতনায় এক আত্মিক পরাভবের জন্ম দেয়। পরবর্তীকালে অ্যালবেট্রসে চড়ে জঙ্গি লাট বার কয়েক রাজনগরে এসে হানা দেয়। ক্রমশ ব্রিটিশ পরাশক্তির কাছে ভারতীয়দের আত্মিক পরাভবের বিষয়টি অনুভব করে বেদনার্ত হরদয়াল উপলব্ধি করে, রাজনগরের মানুষ ব্রিটিশ পরাশক্তির কাছে ক্রমে আত্মসমর্পণ করছে। জঙ্গিলাটের আগমনের পর রাজনগরের আমূল পরিবর্তনকে অমিয়ভূষণ চিহ্নিত করেছিলেন এভাবে, 'গ্রামটাই যেন সাহেবদের হয়ে গিয়েছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৪০৮)। যদিও নায়েবের ধারণা, যে গ্রামে সিপাহি বিপ্লবের আগুন জ্বলেছিল একবার, সেই গ্রামের কোথাও এখনও তার স্ফুলিঙ্গ মাটি-চাপা দেয়া আছে কিনা, সেই খবরটুকু নেবার তাগিদেই জঙ্গি লাটের এই আকস্মিক পরিভ্রমণ। তবু, রাজনগরের মাটিতে ক্রমশ ব্রিটিশদের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিষয়টি ছিল সর্বজনবিদিত। *নয়নতারা* উপন্যাসে একদা রাজু নীল কোম্পানির যে সুলুপ গুলি করে ডুবিয়ে দিয়েছিল, সেই সুলুপের পরিবর্তে এখনকার স্টিমশিপের শক্তি দ্বিগুণ, যাকে গুলি করে আর ডুবিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই দেশীয় কোনো রাজন্যের। এভাবেই লেখক কালের অভিঘাতে ব্রিটিশ পরাশক্তির কাছে রাজনগর তথা দেশীয় রাজন্যের ক্রম পরাজয় এবং তাদের সংকটগুলো চিহ্নিত করেন।

তবে, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার লড়াইয়েরও প্রস্তুতি চলছিল। কোম্পানির সঙ্গে রাজবাড়ির একটি অলিখিত দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে উঠছিল ক্রমশ। কোম্পানিকর্তৃক পাকা সড়ক নির্মাণের মধ্য দিয়ে সে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। চাষের জমি মাটি চাপা দিয়ে নতুন সড়কের জন্ম প্রতীকায়িত করে তোলে ক্রম-নিমজ্জিত কৃষিসভ্যতার গর্ভে ক্রমস্ফীত যন্ত্রসভ্যতার স্ফূরণ। ডানকানের সুবিধার জন্য চাষের জমির ওপর নির্মিত সড়ক রাতারাতি নায়েবের নির্দেশে মাঠে পরিণত হয়। রাজবাড়ির পক্ষ থেকে মরেলগঞ্জের মনোহর সিং এর বিরুদ্ধে ট্রেসপাসের অভিযোগে মামলা করা হয়। মূলত, এসবের অন্তরালে নায়েবের সামন্ত-অভিমান আর সিপাহি বিপ্লবে পুত্রসম গোবর্ধনকে হারানোর গোপন বেদনা লুকিয়ে ছিল। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> ...সেই রাস্তা কাটার ব্যাপারটাই। সোজা সে-কথা? নাক কেটে দেওয়ার চাইতে কম কিছু? তাও কার? ডানকানের? হতে পারে সে স্কচ, একেবারে ষোলআনা ইংরেজ নয়, তাহলেও সে কি রাজার দেশের লোক নয়?...অথচ মাথা ফাটল না দু-পাঁচজনের, দু-চারজনের বুকে বল্লম বিঁধল না,...। এদিকে নায়েবমশায়ও যেন ব্যাপারটাকে নিজের মনের মধ্যে চেপে রেখেছেন। রাগ (নাকি ক্রোধই বলবে) ছাড়া কী? দারুণ ক্রোধ। নতুবা আলাপ আলোচনা নেই, কথাবার্তা নেই, শাসানো নেই। লাঞ্চো খেলে তো একইসঙ্গে বসে...আর সেই লাঞ্চো থেকে উঠে এঁটো মুখেই হুকুম গেল সড়ক কাটার। এদিকে সব শুনশান। যেন কিছুই নয়। কিছু না-ঘটাই তো একটা ঘটনা।
>
> কারো কারো মতে এটাই ঘটনা যে ১৮৫৭ শেষবারের মত ঘটেছে আর ঘটবে না, ঘটনা এটাই যে এখন থেকে নতুনভাবে ঘটবে। এসব লক্ষ্য করেই তারা বলতে পারে: হতে পারে তখনও স্যার বার্নেশ পীকক কলকাতার হাইকোর্টে জমকালো হয়ে বসেনি। কিন্তু এখানে যেন পরে যা-হবে তার সূচনা সেবারই দেখা দিয়েছিল । একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২৭১-২৭২)

প্রত্যক্ষ শারীরিক লড়াইয়ের পরিবর্তে ঠাণ্ডা বাকযুদ্ধের সময় সমাগত–এই বিষয়টিই যেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্তিত্বসন্ধিৎসু গণমানুষের প্রতিরোধ-প্রস্তুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্রোধ-হিংসা-হাতাহাতি থেকে দূরে সরে গিয়ে কৌশলে তাকে বাক্‌যুদ্ধে নিষ্পত্তি করার আধুনিক যুদ্ধের এই সূত্রপাতে কালের পরিবর্তমানতা এবং রাজনগরের সমষ্টিগত অস্তিত্বের সংকট-উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট করে দিচ্ছিল। রানী তাঁর জন্মোৎসবে মরেলগঞ্জের ডানকান আর মনোহর সিং কে নিমন্ত্রণ করলেও ১৮৫৭-৫৮'র সিপাহি বিপ্লব কিংবা ১৮৬০ এর নীল বিদ্রোহ অথবা রাজবাড়ির সঙ্গে মরেলগঞ্জের বিরোধের জের টেনে ডানকান এ উৎসবে যোগদান থেকে বিরত থাকে। হরদয়ালের উপলব্ধি, 'কলকাতায় কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ৫৭-৫৮র সেই ব্যাপারের পরে ইংল্যান্ডের লোকেরা দূরে দূরে সরবে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৫৫)। এভাবেই গণজীবনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই এবং তার প্রস্তুতি শুরু হচ্ছিল সন্তর্পণে।

সিপাহি বিপ্লবের পরবর্তীকালের ঘটনা এ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়, যখন কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা রানী ভিক্টোরিয়ার হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে। ইন্ডিগো কমিশন প্রতিষ্ঠা কিংবা রাজনগরে মুন্সেফ কোর্ট বসবার খবরে রানীর চেতনায় সংকটের জন্ম হয়। তার জায়গীরদারিতে ব্রিটিশ শাসকের হস্তক্ষেপ তার অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। উপন্যাসের শুরুতে কোম্পানি আর দেশীয় স্বাধীন রাজন্যের অস্তিত্বগত টানাপড়েন কিছুটা হলেও অনুভব করা যাবে। পিয়েত্রোর জায়গাটুকু নিজের দখলে রাখার আকাঙ্ক্ষা থেকে রানী 'অখাদ্য-খাওয়া অনাচারী...আধা-ফরাসির হাওয়াঘরে'র মাটিতে মন্দিরের ভিত তৈরি করেন। কেননা, ডানকানের মত নীল কুঠির ম্যানেজারের ভূমি করায়ত্তকরণ কিংবা মনোহর সিং এর মত দেওয়ানের জমিদারি ক্রয়ের সম্ভবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নায়েবের ভাবনায় উঠে আসে রানীর ক্ষমতাদখলের নিরব বৃত্তান্ত:

> সে একেবারে স্তম্ভিত! ঢোলডগর, লোকলস্কর, খানাপিনায় চেপে গিয়েছে ব্যাপারটা। দখল বলে দখল? শোবার ঘরে বাঁশগাড়ি। হাওয়াঘরে শিব-গাড়া! রানীর বিচক্ষণতায় সে দিশেহারা হয়ে গেল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২৭৯)

উপন্যাসের শেষ দিকে, পিয়েত্রোর ডিয়ার হিল দখলের ঘটনায় রানীর সঙ্গে কোম্পানির দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ডিয়ার হিল করায়ত্তকরণের মধ্য দিয়ে চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের খবর রানী অবগত হবার পর পিয়েত্রোর সঙ্গে তার এতদিনকার আত্মীয়তার সম্পর্ককে সামনে এনে ফরাসডাঙ্গার ওপর রাজুর অধিকারের বিষয়টিকে সুদৃঢ় করেন তিনি। এমনকি, রাজনগরের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসডাঙ্গার মাটিতেও অস্তিত্বের ভিতকে গাঢ় করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় পিয়েত্রোর সঙ্গে তার গোপন প্রণয়ের মুখাবয়ব উন্মোচনে দ্বিধাবোধ করেননা রানী। এভাবেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে দ্বিধাহীন এক নারীর প্রতিমূর্তি রচিত হয় উপন্যাসে।

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবর্তনের অভিঘাত উপলব্ধি করা যাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। ইংরেজ নীলকরের পাশাপাশি বাঙালি নীলকরেরও আনাগোনা শুরু হচ্ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মত অভিজাত বাঙালি পরিবারগুলোতেও নীলচাষের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠছিল। ফলে বাংলার কারুশিল্পগুলো ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ব্রিটিশদের ২৭১ টি নীল কারখানার পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির প্রিন্স দ্বারকানাথের নীল কারখানা ছিল ১৪০টি। ফলে বাঙালির এতকালের তাঁত ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। উপন্যাসেও উপলব্ধ হবে, যে রাজনগর এককালে তাঁত ও রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল, পিয়েত্রোর মৃত্যুর পর তাঁতীদের উৎপাদিত শিল্প ক্রয়ের পৃষ্ঠপোষক না থাকায় ক্রমান্বয়ে সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বদলে উচ্চবিত্তদের জন্য আমদানিকৃত সার্জ-কাশ্মীরি শাল আর নিম্নবিত্তদের জন্য মিলেন কাপড় তৈরি হয়। এভাবেই তাঁতীদের অস্তিত্ব-বিনাশের সূত্রগুলো চিহ্নিত হতে থাকে। *নয়নতারা* উপন্যাসে নয়নতারার জন্য রাজুর ক্রয়কৃত মসলিনের কাল এখন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত–এ নির্মম সত্য এখানে সুস্পষ্ট। পুরনো অর্থনীতি ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি জাতির অস্তিত্ব-গহ্বরে বিনাশের বীজ প্রোথিত হতে থাকে। 'কারখানাজাত বিলাতি দ্রব্যের কাছে বিনিময়-মূল্যের প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করে দেশীয় কারুশিল্পকে বাজার থেকে বিদায় নিতে হলো। দুটি কারণে দেশী শিল্পের অবনতি হলো–দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি এদেশের ব্যবহারকদের (consumers) মনোভাবের পরিবর্তন, নতুন উপযোগ-বোধ (utility) এবং কলে তৈরি বিলাতি দ্রব্যের সুলভ মূল্য' (বিনয়, ২০০০: ৪০)। কেটের জন্য সিল্ক ক্রয় করতে গিয়ে ধনঞ্জয়-মেহের আলি আর আল্লারাখার মত তাঁতিদের কাছে বাগচি তাঁতশিল্পের এই ক্রম-পতনের ইতিহাস জানতে পারে:

> 'কী এক মিলেন কাপড় হয়েছে, তাই নাকি বাবুভায়াদের ফ্যাশোয়ান।...কে-আর তিনগুণ দাম দিয়ে রেশম কিনছে'।...পেত্রোদের স্থায়ী গুদাম হওয়ার আগে পূজা ঈদের ছ'মাস আগে দাদন বরাত নিয়ে সাধাসাধি, এক-দেড় মাস আগে কুতঘাটে নৌকার ভিড় লাগত মহাজনের। রেশম তো বটে, সুতোর শাড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি। সেসব নৌকা বন্ধ হলো; এক কুড়ি বছর আগে পেত্রোদের জাহাজ চলাও বন্ধ হলো।' 'তো পেত্রো বলতেন, মেহের, হাজার বছর ধরে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠেছ ওদের, এবার ওরা আইন করে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠবে।...হুজুর ফেশোয়ান বদলায়। পাঁচ সাল আগেও বুজরুক খাঁর কিস্তি যেত লখনউ। এখন, হুজুর, সেখানে সে ফেশোয়ান নেই। কে আছে কলকেতায় মুকসুদাবাদে দবীরখানি মসলিনের শাড়ি পিন্ধে, কামিজ বানায়, দো পাট্টা পিন্ধে? কে আছে হুজুর, মালকানি বোরকেটের শেরোয়ানি, আচকান, চোগা পিন্ধে'?...সেই ছিয়াত্তরের রক্তবমি। রাজবাড়ি আর পেত্রোর চেষ্টায় ওস্তাদেরা বেঁচেছিল, কিন্তু পাঁচআনি লোক, কাটুনি জোলা, রজক ওস্তাগর, কামার কুমোর, গুড়ে, চাষী শেষ হয়েছিল। পেত্রো বলতেন, তারপরে শরীর সারেনি, জাতটাই আধহাত কমে গিয়েছে'। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩২১-৩২২)

তাঁতীদের এই ক্রমপতনের পেছনে ব্রিটিশ পরাশক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্ক্স লিখেছেন:

> It was the British intruder who broke up the Indian hand-loom and destroyed the spinning-wheel. England began with driving the Indian cottons from the European market; it then introduced twist into Hindostan, and in the end inundated the very mother country of cotton with cottons…Those family communities were based on domestic industry, in that peculiar combination of hand-weaving, hand spinning and hand tilling agriculture which gave them self-supporting power. English interference having placed the spinner in Lancashire and the weaver in Bengal, or sweeping away both Hindu spinner and weaver, dissolved these small…communities by blowing up their economical basis and thus produced the greatest, and to speak the truth the only social revolution ever heard of in Asia. (Marx, 1853)

মার্ক্সের বক্তব্যে কারিগরদের জীবন থেকে উৎপাদনের আনন্দ কেড়ে নেবার এই আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা চিহ্নিত হয়। সুতরাং, 'বয়নশিল্পের পতনের পর বাংলার বস্ত্রশিল্পী, কারিগর ও সুতো মজুররা জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি বয়নশিল্পের পতনকে দ্রুততর করে। কৃষি ও শিল্পের ওপর নির্ভরশীল বাংলার মানুষ শুধু কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে' (সুবোধ কুমার, ১৯৫৮: ১৯৬)। এভাবেই অমিয়ভূষণ কালের অভিঘাতে রূপান্তরিত সমাজের আদল চিহ্নিত করে দেন। সমলোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> রাজনগর যেন তার গ্রামীণ পরিচয় ছেড়ে ক্রমশ ব্রিটিশ উপনিবেশের নাগরিকতার দিকে এগোচ্ছে। সে নাগরিকতায় আর যেন বুজরুক-গোবর্ধনদের কোনো ছায়া থাকে না, শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতি ছাড়া। ইতিহাসের টান থেকে যায়, থেকে যায় ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে শ্রেণীর দ্বন্দ্বের টান।...সাধারণ মানুষ এখন আর শুধুই নির্বিরোধ এক জড়পিণ্ড নয়, ঘটনাপ্রবাহ তাদেরও ধাক্কা দেয়, সেই ধাক্কায় তাদের যে আলোড়ন, তাও বদলে দেয় ঘটনাকে, স্রোতের মুখকে কিংবা তাতে এনে দেয় তীব্রতা।...তাদের স্বার্থ আর ভূমিকা নির্ধারণ করে দিতে চায় উচ্চবর্গের অবস্থান আর কর্তব্যকে। যশোর-নদীয়ার চাষিদের আন্দোলনের পর ইন্ডিগো কমিশন বসে, তাই ডানকানরা আর দাদন দেওয়ার ঝুঁকিতে না গিয়ে ধার দেওয়া শুরু করে মরেলগঞ্জের চাষিদের, সেই চাপে বিপর্যস্ত হতে থাকে চাষিদের জীবন। (ইরাবান, ১৯৯৪: ৪৬)

কৃষকের অস্তিত্বের ওপর বার বার এই চাপ তাদের বিপর্যস্ত করে তোলে। ডানকানকর্তৃক কৃষকদের দাদনের পরিবর্তে ধার দেবার প্রস্তাব চরণের কাছে আসন্ন বিপদকেই আভাসিত করে তোলে। ঋণগ্রহণে কৃষকের অস্বীকৃতি তাদের ওপর যে নির্যাতনের প্রকাশ ঘটায়, সেটি অমর্ত্য দাসের মত কৃষকের প্রতি কোম্পানির অত্যাচারেই প্রকাশমান। অন্য কৃষকদের প্রতি তার সাবধানবাণী উচ্চারিত, 'এতে কিন্তুক শয়তানি আছে,–গোপালদা–কলকেতার শয়তানি।...যশোর-নদের কৃষকেরা এককাট্টা হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে তো নীলে-শালারাও এককাট্টা হচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৪৪)। ইন্ডিগো কমিশন বসবার খবরও তাই স্বস্তি দেয় না তাদের। 'গভর্ণমেন্ট যে নীল কমিশন (Indigo commission) নিয়োগ করেন (১৮৬০), তার সুপারিশে

অবশ্য প্রজারা বিশেষ উপকৃত হয়নি। কেবল নীলকরদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা কিছুটা সংযত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ শাসকরা প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে কিছুটা নীলকরদের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন' (বিনয়, ২০০০: ২৫০)।

আগেই বলা হয়েছে, *রাজনগর নয়নতারা*'র মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। তবু এখানে কোনো কোনো চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েনে তাদের অস্তিত্বসংকট চিহ্নিত করা যায়। সমকালীন তরঙ্গায়িত সময় ও সমাজ তাদের মনোজাগতিক টানাপড়েন সৃষ্টির উৎসস্থল হিসেবে গণ্য। বাগচী ও রাজচন্দ্র এদের অন্যতম। সমকালীন সময় দ্বারা বাগচী গভীরভাবে স্পৃষ্ট। ব্রিটিশ পরাশক্তির নেতিবাচক বিষয়গুলো বাগচীকে ভাবায়; ইউরোপিয়ান শিক্ষা সংস্কৃতির ওপর তার এবং হরদয়ালের গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু রাজনগরের মত প্রত্যন্ত গ্রামে এসে প্রান্তিক কৃষকের সংস্পর্শ তাকে বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এইসব অন্ত্যজ মানুষগুলোর প্রতি ইন্ডিগো কোম্পানির বর্বর অত্যাচার তাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। তার মনে হয়, সিপাহি বিপ্লবে সিপাহিদের 'লক্ষ্ণৌ কিলিং' এর সাথে সাথে ইংরেজদের 'দিল্লী কিলিং'ও সমান অন্যায়; সিপাহি বিপ্লবের ব্যর্থতার আনন্দে ডানকানের কুঠিতে উদযাপিত কালিপূজার স্মৃতি বাগচির ভেতর ঘৃণা জন্মায়। যদিও সাধারণ প্রজারা বাগচীকে কোম্পানির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হিসেবেই গণ্য করে। রাজনগরে তার শেকড়ায়নের ভিত যেন গভীরে পৌঁছায় না। কীবলকর্তৃক প্রহৃত ইসমাইলকে কেন্দ্র করে চরণের বক্তব্যে অনুভূত হয় বাগচী-চর্চিত খ্রিস্টান ধর্ম আর কেটের সঙ্গে তার পরিণয়ের কারণে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তার বিচ্ছিন্নতাবোধের বিষয়টি। তবু এই মানুষগুলোর প্রতি ইন্ডিগো কোম্পানির বর্বরতার প্রথম প্রতিবাদ তাঁর হাত দিয়েই ইন্ডিগো কমিশনের কাছে পেশ হয়।

বাগচি সংকটগ্রস্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কিংবা ইউরেশিয়ান মানুষগুলোর কথা ভাবে। তাদের আত্মপরিচয়ের সংকট ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনের নেতিবাচকতা সম্পর্কে বাগচিকে আত্মোপলব্ধি দেয়। ইংরেজ-আইরিশ-স্কচ পিতা আর মুসলমান-গোয়ানিজ-আদিবাসী খ্রিস্টান মায়ের ঔরসজাত ডিসিলভা কিংবা ওসুলিভানের মত সন্তানেরা ভারত কিংবা ইংল্যান্ডের কাছে স্বীকৃত নয়। এদেরকে একদিকে যেমন ইংল্যান্ডে আর্মি র‍্যাংকস থেকে ছাটাই করা হয়, তেমনি ভারতে সিপাহি বিপ্লবেও তাদের অবদান সরকার বিস্মৃত হয়। তাদের 'না ঘরকা না ঘাটকা' হবার এই যন্ত্রণা অনুভব করে বাগচির মনে হয়, '...যারা ইংল্যান্ডেরও নয়, ভারতেরও নয়, তাদের শিকড় খুঁজে বেড়ানোর সমস্যা। মরেলগঞ্জের নীলকুঠির ম্যানেজার কিংবা কীবলের মত ভাগ্যান্বেষী মানুষেরা 'সাজানো গোছানো লন্ডন সভ্যতার কেন্দ্রর চাইতে অসভ্যতার প্রান্তে যেখানে সভ্যতা গড়ে উঠছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২৪২), রাজনগরের মত, সেইসব জায়গার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। আর প্রান্তিক নারীরা হয়ে ওঠে তাদের চারণভূমি। জুড়ান পাইকের স্ত্রী মেহের কিংবা ডানকানের আয়া ফুলীর মত নারীদের যথেচ্ছ ব্যবহার করবার মধ্য দিয়ে এইসব শেকড়সমস্যাময় সন্তানের জন্ম হয়। অস্তিত্বসংকটে পতিত এই মানুষগুলো উপন্যাসে নেতিবাচক এক কালের প্রতীক। অমিয়ভূষণ এদের বলেছেন 'শ্যাওলা' কিংবা 'জলের ওপর ভাসা স্কাম' অথবা 'রুটলেস'। এদের অন্তর্ঘাত বাগচীকে বেদনার্ত করে।

এ উপন্যাসের আর একটি বেদনার্ত চরিত্র রাজু। রাজু বা রাজচন্দ্র এখানে নয়নতারা উপন্যাস থেকে আরো পরিণত। এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ বলেন:

> ...প্রথমে দেখলে বাঘ শিকারী। এক বালক বাঘ শিকার করছে। মানুষ শিকার করছে। জলে নেমে কুমীর শিকার করছে। শেষে সে হরিণ শিকার করছে। যার কোনো শিকার করা উচিতই না–এইতো সীড অব ডেথ। শেষে সে কি বলছে? চলো আমরা ঘুরে আসি। বলছে, সে আমার কৃতদাস ছিল–তাকে বললাম যে–তোকে এবার মুক্তি দিলাম। সে আমার কৃতদাস ছিল–তাকে বললাম যে–তুই এবার মুক্ত। সে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকলো। কৃতদাস ছাড়া তার কোনো পরিচয় নেই। তেমনি আমি রাজকুমার ছিলাম। এই তো সীড অব ডেথ...। (অমিয়ভূষণ, ২০০৬: ১০)

শিকারের ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটিই প্রায় প্রতীকী। রাজচন্দ্রের জীবনের নানা সন্ধিক্ষণ ও তার অস্তিত্বব্যাখ্যায় শিকার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। *নয়নতারা* উপন্যাসে পিয়েত্রো-বুজরুকের সঙ্গে বাঘ শিকারে রাজুর ভেতর এক রোমাঞ্চের বীজ রোপিত হয়। কালের অভিঘাতে কৈশোর পেরিয়ে এক ধাক্কায় সে যৌবনে পদার্পণ করে। এখানে বাঘকে পরাক্রমশালী ইংরেজের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধিতায় পিয়েত্রো বুজরুককে সঙ্গ দেয় রাজু। দ্বিতীয়ত, মরেলগঞ্জের চন্দ্রকান্ত হত্যার বিষয়টিও রাজুর ইংরেজের বিরুদ্ধাচারণকেই প্রতীকায়িত করে, যদিও তার অনেকটাই ছিল রাজকুমার হিসেবে অপমানের প্রতিবিধান। তৃতীয়ত, কুমীর শিকারে কুমীরের মত শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার বিষয়টিতেও যৌবনাভিষিক্ত রাজুর হিরোইজম প্রকাশিত। নয়নতারার উপস্থিতি তাকে আরও বেগবান করে তোলে। আর শেষ পর্যন্ত যে সাদামাটা হরিণ শিকার, সেটি তার জৌলুসহীন পরাজয়কেই প্রতীকায়িত করেছে। শেষপর্যন্ত অস্তিত্বগত টানাপড়েনে স্যার রাজচন্দ্র হয়ে ওঠার বিষয়টি রাজুর ব্যর্থতাকেই মূর্ত করে। অমিয়ভূষণ উপন্যাসে এভাবে শিকারের প্রতীকে শৃঙ্খল-আবদ্ধ এক রাজপুত্রের বেদনার কথকতা রচনা করেন। ক্রীতদাস রুপুর যেমন যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, 'দাসত্ব'ই যার একমাত্র পরিচয়, তেমনি, রাজুর রাজপুত্র ছাড়া দেবার মত আর কোনো পরিচয় নেই। শিকারে বৃত্তাবদ্ধ এই একঘেঁয়ে জীবনে তার রাজপুত্র সত্তাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে শিকারলগ্ন প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুকে সত্তায় লালন করেছে বলেই লেখক মনে করেন, রাজুর ভেতর সিড অব ডেথ এর বীজ লুক্কায়িত।

নয়নতারা উপন্যাসে সিপাহি বিপ্লবের মুখোমুখি হয়েছিল দুই ব্যক্তিসত্তা, যাদের একজন সেই বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আরেকজন নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে গিয়ে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়ে নিরবে সরে এসেছিল। এদের একজন বুজরুক, অন্যজন রাজু। পরবর্তীকালে *রাজনগর* উপন্যাসে রাজুর স্মৃতিচারণায় বুজরুক আর রাজুর পারস্পরিক পথ অতিক্রমণ এক প্রতীকে পরিণত হয়। পথের প্রতীকে অমিয়ভূষণ এদের পরস্পরবিরোধী পরিণতি সামনে নিয়ে এলেন:

> ...পালকি-বেহারার হুমহাম শব্দে তার ঘোড়া বারবার শিষপায়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘোড়ার উপর থেকে সে যেমন , পালকির ভিতর থেকেও তেমন বিরক্ত বুজরুক 'কে যায়' বলে ঝেঁঝে উঠেছিল।...একই পথের উপরে মুখোমুখি অবস্থান করলেও চেনা যায়না, জানাও যায় না কী কার পরিণতি হবে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২১৯)

অক্ষমতা সত্ত্বেও বারবার রাজু রাজপৌরুষের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। উপন্যাসে তার মনোভাবনায় উঠে আসে মুক্তির চিন্তা,' ...রাজুর বৃদ্ধ পিতামহের সময়ে পুরনো বাড়িতে বন্যার জল পৌঁছলে

হাতার চিড়িয়াখানার হরিণগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সে হরিণ তাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টি হবে।...পুরনো ঝাড় থেকে একেবারে নতুন বেপরোয়া এক বংশ। তা কি হতে পারে? গৃহস্থ মানুষ থেকে স্বাধীন এক পুরুষ?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২২০)। গৃহী জীবন থেকে বেরিয়ে স্বাধীন সত্তায় উপনীত হতে চায় রাজু। সেইসঙ্গে সিপাহি বিপ্লবে অংশ নিতে না পারার বেদনাবোধ তার আরও গাঢ় হয়ে ওঠে পাটনা-মুঙ্গের-লক্ষ্ণৌ-কাশির মত জায়গায় ভাঙা প্রাসাদ-কবর-গোলাগুলির চিহ্ন প্রত্যক্ষভাবে দেখার অভিজ্ঞতায়। মাসদশেকের এই ভ্রমণ রাজুকে আরো পরিপক্ব করে তোলে। আর এই পরিপক্বতা থেকেই 'রাজা' শব্দ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পেতে চায় সে। বাহাদুর শাহ জাফরের ব্যর্থতার ইতিহাসের তুলনায় ইংল্যান্ডের রাজা চার্লস কিংবা ফরাসি রাজা মার্কুইস কাউন্টের সাহসিকতা তাকে আলোড়িত করে; বুজরুক কিংবা গোবর্ধন হয়ে ওঠে এঁদের সাহসিকতার উত্তরসূরি; পক্ষান্তরে চেতনায় সে নিজে বাহাদুর শাহ জাফরের মত অনুভব করে ব্যর্থতার অসহায়বোধ:

> ...রাণী মারিকে ওরা যখন নিয়ে যাবে গিলোটিনে, তখন কিন্তু তিনি তাঁর সাজপোশাকে ত্রুটি করেননি। তাঁরা কেউ কিন্তু বলেননি, যা করেছি ভুল করেছি। সূর্য-ডোবার মত ব্যাপার নয়? তেমনি তেমনি ম্লান হয়ে যাওয়া কিন্তু অনেক রঙের মধ্যে কোনো অনুতাপ নেই'।...তোমাদের রাজা চার্লস, ফরাসিদের রাজা লুই আর এদেশের রাজা বাহাদুর শা-এর মধ্যে কত তফাত! শুনেছি সে বুড়ো। জীবন ভোগ করার কোনো ক্ষমতাই আর নেই। কিন্তু মরতে জানল না, ছি! অবশ্য একা বাহাদুর শা নয়। অনেক নকল নবাব, অনেক নকল রাজা কেউ এ-শহরে, কেউ অন্য শহরে বৃত্তি ভোগ করছে।...মাঝে মাঝে বরং মনে হয়, অনেকদিন থেকেই মোমভরা নকল মোতির মত নকল বাদশা ছিলেন দিল্লির ভদ্রলোকেরা।...যেমন অন্য কোথাও কেউ নকল রাজকুমার থাকতে পারে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২২৯)

বাহাদুর শা জাফরের মত রাজু নিজেকে মনে করে এক নকল রাজপুত্র, মৃত্যুকে যে অসীম সাহসিকতায় জয় করতে পারে না। রাজুর মতে, একে ঠিক রাজা বলা চলে না। বরং রাজা '...একটা ধারণামাত্র,...রাজা অনেকগুলি মানুষের স্বাধীনতার ধারণা। শক্তির ধারণা। সেটা গেলে রাজাই-বা কোথায়? শরীরটা?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ২৩০)। মূলত ব্রিটিশ অধিনস্ত দেশীয় রাজাদের শক্তিহীন, কর্তৃত্বহীন হতাশাব্যঞ্জক জীবন রাজুকেও অবলম্বন করতে হয়েছে, যেখানে স্বাধীনতার স্বাদ নেই। এই পরাধীনতা তাকে হতাশ করে তার ভেতর অস্তিত্বসংকটের জন্ম দেয়। স্বার্থ রক্ষার্থে যে বিপ্লব থেকে রানী ও সে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, সেটি যে শক্তিহীনতার নামান্তর, তা অনুভব করে বেদনার্ত হয় সে। সেঁকো বিষপানে নেপোলিয়ন যেমন বন্দি জীবনে বেঁচে ছিলেন অন্ধকারাচ্ছান্ন দ্বীপে, রাজুর মত ক্ষমতাহীন-শক্তিহীন জীবনে নকল রাজা হয়ে তেমনি হয়তো বেঁচে থাকতেই হয় । রাজুর সকল অক্ষমতা সুর হয়ে বেজে ওঠে শঁপ্যার রেভলিউশনারি স্টাডির বাজনায়:

> রাজু বাজাতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সুর এমন হলো যে কিছু যেন ভেঙে পড়ছে। কোথাও বিদ্রোহ যেন আক্রোশ আর বেদনা, হার না মানার প্রবল প্রতিজ্ঞা। সে রাত্রিতে রাজু শঁপ্যার সেই রিভলিউশনারি স্টাডি বার বার বাজিয়ে যেন মুখস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।...তীব্র কঠোর ধ্বনিগুলি দীর্ঘায়িত আর উচ্চরব হচ্ছে। যেন বাঁধন ছেঁড়া, বাঁধ ভাঙা, তাকে তীব্রভাবে অস্বীকার করা যা তোমাকে স্বাধীন হতে দেয় না, আর ব্যর্থতা যখন ভাগ্যের মত তখন বিষণ্নতার ঘাটগুলো বেজে উঠছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩০৯)

রাণীর জন্মোৎসবের নেপথ্য কারণ চন্দ্রকান্ত হত্যাকাণ্ড তাকে আহত করেছে, 'একটি প্রাণ হরণ করে অন্য অনেক প্রাণ পোষণ করলে শোধ হয়,' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৬৭)–এরকম ভেবেও তার কোনো স্বস্তি হয়নি। নয়নতারার মনোভাবনায় রাজুর বেদনা অনুভব করা যায়:

> নয়নতার ভাবল,...আরেকটা বিদ্রোহ হলে সে নিজেকে খুঁজে পায়, রাজবাড়ির ঘরে-ঘরে নিজেকে খুঁজতে হয়না।...মরেলগঞ্জের কটুভাষী সেই তহশিলদারকে হত্যা করার ব্যাপারটাই তো রাজকুমারের মনে।...এই জন্মতিথির উৎসব তো সেই নরহত্যাকে আলোর আড়ালে লুকিয়ে ফেলতেই শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে কি নিরর্থক আর ভয়ঙ্কর বোঝা বলে মনে হয়। যদি একজন নিজেকে আর রাজা মনে করতে না পারে! ...রানীমা কিংবা পিয়েত্রোর সম্ভাব্য বিদ্রোহের নায়ক, তার নিজের এক কাল্পনিক সিংহাসনের রাজার অস্তিত্ব থেকে সরে এসে রাজকুমার কি সত্যিই অতীত এবং বায়বীয় হতে পারে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৩৬৭-৬৮)

রাজনগর উপন্যাসে রাজু আত্মপরিচয়সন্ধিৎসু। ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনতা তাকে বিচলিত করলেও ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে তার সন্দিগ্ধ চেতনা আত্মপরিচয় সন্ধানে ব্রতী, যা তার সংকটগ্রস্ত অস্তিত্বের নামান্তর:

> ...'আচ্ছা, মাস্টারমশাই, আমি কি জাতি? আপনি বলেছিলেন, বিপ্লবের আগে-পরে ফরাসি দেশে একটা জাতি। নেপোলিয়নের সৈন্যদল সেই জাতির হয়ে যুদ্ধ করত। আপনি, আমি, কেট, রাজনগরওয়ালি, ডানকান হোয়াইট কি এক জাতি? দিল্লিওয়ালে মুসলমানরা মারাঠাদের বিরুদ্ধে আবদালিকে সাহায্য করেছিল, তারা আর মারাঠিরা এক জাতি নয়। নানা সাহেব গোয়ালিয়রের বিশ হাজার সৈন্যকে টেনেছিল সেই বর্গিরা আর রোহিলারা কি এক জাতি? ওদিকে রানীমা বড় রানীর এক ঘোষণাপত্রের অনুবাদ পড়তে দিয়েছেন। আমরা আর কোম্পানির প্রজা নই, তাতে আমি আর ডানকান কি এক জাতি হলাম? (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৪০৫)

রাজুর এই বেদনার্ত জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর মেলে না। হাহাকারের মধ্য দিয়েই নিঃশেষিত হয় তার উচ্চারণ।

শেষপর্যন্ত মরেলগঞ্জে চরণের জমিতে ট্রেসপাসের বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই রাজুর সঙ্গে কোম্পানির প্রত্যক্ষ লড়াই বাঁধে। সিপাহি বিপ্লব এড়ানোর যে কৌশল পরিণত রাজুকে বেদনার্ত করেছিল, তার মাশুল দেবার জন্যই হয়ত সে ডানকানের সঙ্গে জমির বিরোধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। একদিকে কোম্পানিকর্তৃক অপহৃত চরণ, বন্দা কিংবা গজা হত্যা, অন্যদিকে রাজকুমারকর্তৃক প্রহৃত ডানকান–রাজনগর আর কোম্পানির এই পারস্পরিক সংঘাতের ইতি ঘটে কালেক্টর আর হরদয়ালের আর্থিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে, যা কিনা পুঁজিবাদী সমাজের বেনিয়াবৃত্তিকে নিভৃতে ধারণ করে। অর্থের বিনিময়ে রাজকুমারের নজরবন্দী জীবনের সূত্রপাত ঘটে সেইদিন থেকেই। এই অধীনতা আরো বিশ বছর পর রাজুর 'সার' উপাধি গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট পরাভবের বিষয়টিকে প্রতীকায়িত করে। সমালোচক ইরাবান বসু রায় লিখেছেন:

> দেশীয় সামন্ততন্ত্রের শেষ পরিণতি কি ইংরেজের অনুগ্রহলাভে!... রাজনগর বদলায়, মরেলগঞ্জ বদলায়, ফরাসডাঙা বদলায়–রাজচন্দ্রও বদলায়, রাজকুমার থেকে সার।...সমস্ত শিকড়ই যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে তাকে ভেসে বেড়াতেই হবে। 'রাজনগর' উপন্যাস তাই শেষ হয় রাজচন্দ্রের ইউরোপ যাওয়ার

> ইচ্ছেয়।...আসলে সে উৎপাটিত হয়ে গেছে তার মূল থেকে। এও কি ভারতবর্ষের ট্রাজেডি, মূল থেকে উৎপাটিত হয়ে যাওয়া –ইউরোপমুখীনতার টানে! (ইরাবান, ১৯৯৪: ৫৩-৫৪)

এরপরপরই উপন্যাস চলে গেছে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৩'র রাজু চল্লিশোর্ধ, যার উপাধি সার। এক রূপান্তরিত পুরুষকে দেখতে পাই। কিন্তু কেন তার এই রূপান্তর, সে প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ কোনো ইঙ্গিত দেননি।

কুমার ও রাজচন্দ্রের কথোপকথনে উঠে আসে অতীত। কুমার, যার পরিচয়েও রয়ে গেছে ধোঁয়াশা, হয়তো বা নয়ন ও রাজুর ঔরসজাত সন্তান এই কুমার, যে রাজুর ব্যর্থতা বা সফলতার সব খবর রাখে। রাজুর ব্যর্থতার গ্লানি, তার হতাশাবোধ কুমারের কথায় পুনরায় জেগে ওঠে:

> মনে করুন কেউ যদি রাজার ছেলে হয়ে থাকে, তবে সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে সেই রাজা কী করেছিল তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। হয় সেই রাজা বিদ্রোহে প্রাণ দিয়েছে, ফলে রাণীকে আত্মগোপন করতে হচ্ছে। অথবা সেই সময়ে সেই রাজা এমন কিছু করেছে যে তার পুত্রদের লজ্জায় থাকতে হয়, সেই রাজা বেঁচে থাকলেও এখন হয়তো এমন একজন প্রৌঢ় যার মধ্যে রাজাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৪৪৫)

চল্লিশোর্ধ্ব রাজুর 'সার' উপাধি গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিসত্তার পরাজয়ভাষ্য রচিত হয় নীরবে ; কুমার হয়ত এর প্রতিই অঙ্গুলি হেনেছে। রাজুর 'রাজা' সত্তার পরাজয় তার অস্তিত্বসংকটের বোধকেই উপন্যাসে গাঢ় করে তোলে। বিশ বছর পর রেলের অফিসার, জেলার কালেক্টর কিংবা ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারির মত উচ্চপদস্থ লালমুখো গেস্টরাই তখন সার রাজচন্দ্রের কাছের মানুষ। অন্যদিকে, ব্রিটিশ পরাশক্তি ততদিনে নীলের লোভ ছেড়ে 'চা' উৎপাদনের দিকে তাদের লোভের হাত বাড়িয়েছে। যদিও রাজুর প্রতি কুমারনারায়ণের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলোতে উঠে আসছিল ভারতবাসীর অন্তঃকরণে 'সর্বভারতীয়বোধের' ধারণা রোপিত হবার ইতিবাচকতার কথকতা:

> 'আপনাদের জেনারেশনে কিন্তু এই সর্বভারতের বোধটা ছিল না।'...'সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে,...আপনারা কিছু করতে পারেননি, কারণ তখন মারাঠা, শিখ, বাঙালি, হায়দ্রাবাদী, দিল্লীওয়ালা এইসব স্বার্থ পৃথক ছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৩: ৪৪৪)

সর্বভারতীয়তার এই বোধই শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে ভারতীয়দের অস্তিত্বসংকট অবসানের, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার এক আকাঙ্ক্ষিত পথ। *নয়নতারা* উপন্যাসে যেমন একটি কালের অবসান ঘটেছিল, *রাজনগরের* শেষে এসেও আরেকটি কালের অবসান ঘটার ইঙ্গিত মিলছে। নতুন কালের প্রতিনিধি হিসেবে কুমারনারায়ণের যোগ ঘটছে; রাজনগরে ট্রেনের আনাগোনা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আন্দোলন, লালমোহন ঘোষের লন্ডন গমন, আর্মস অ্যান্ড আর ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধতা, ইলবার্ট বিল ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জির অল ইন্ডয়া ন্যামনাল ফান্ড তৈরির ঘটনাগুলো আরেকটি নতুন যুগকেই উপন্যাসে সামনে নিয়ে আসে। নতুন এই কালের অভিঘাত সার রাজচন্দ্রের ভেতর কোনো আলোড়ন সৃজন করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে অমিয়ভূষণ কোনো ইঙ্গিত না দিলেও রাজচন্দ্রের উত্তরসূরির চেতনায় নতুন কাল এক নতুন বোধের জন্ম দিচ্ছে, সেই

ইতিবাচকতায় উপন্যাসটির সমাপ্তি টেনেছেন তিনি। চেতনায় তরঙ্গায়িত কালের অভিঘাত ধারণ করে সর্বভারতীয়বোধে জারিত কুমারনারায়ণেরাই একদিন ভারতের সামষ্টিকসংকট উত্তরণের পথ রচয়িতা হবে–এই আশাবাদের ইঙ্গিতই উপন্যাসশেষে ধ্বনিত।

গড় শ্রীখণ্ড

অমিয়ভূষণের *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭) উপন্যাসে পদ্মা বিধৌত এক জনপদের চালচিত্র প্রকাশমান। ১৯৪২-১৯৪৭ এর মত তরঙ্গায়িত কালের কথকতা প্রবলভাবে বলয়িত এখানে। অমিয়ভূষণ আসক্তিবিমুক্ত চোখে দেখেন, 'ইতিহাসের পরিবর্তমান স্রোত কিভাবে লোকজীবনের গভীরে পুঁতে দেয় রূপান্তরের বীজ' (তুষার, ২০০১ :৯৭)।

এ উপন্যাসে কালের অভিঘাতে রূপান্তরিত ব্যক্তি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে গেছে শেষপর্যন্ত, যাদের চলমানতার ভেতরে লেখক সন্তর্পণে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার বীজ রোপণ করে দেন। এ উপন্যাসে পদ্মা, কাল আর জনজীবন একসূত্রে গাঁথা বলেই পদ্মা তীরবর্তী চিকন্দি-সানিকদিয়ার-বুধেডাঙা-চরণকাশি কিংবা বন্দর দিঘার গোষ্ঠীজীবনের অস্তিত্বগাথা রচিত হতে থাকে পদ্মা আর অমোঘ কালের হাতে। *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে 'একটি যুগের জাতীয় বেদনা বিপুল ঐকতানে ঝংকৃত হয়েছে। জাতীয় জীবনের একটি গোটা সমাজের কথা চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে।...মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার পূর্বক্ষণটিতে কোথায় টান পড়ে, কেমন করে গুঁড়িয়ে যায় বহুকালগত সম্পর্ক' (সরোজ, ১৯৭১: ৩৩২), অমিয়ভূষণ সেই বিষয়টিই এখানে দেখতে চেষ্টা করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে।

চারটি কাহিনিবৃত্ত উপন্যাসটিকে প্রাণ দিয়েছে। মাধাই-সুরতুন-ফতেমা-ইয়াজ-ইসমাইল-ফুলটুসি-টেপির মা-গোঁসাইয়ের মত শেকড়ছিন্ন গণমানুষেরা তৈরি করেছে একটি কাহিনিবৃত্ত, যাদের অস্তিত্বসন্ধিৎসা উপন্যাসে গভীর প্রত্যয়ে বিরাজমান। অন্য বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ভূস্বামী চিকন্দির সান্যালমশাই এবং সামন্তপরিবারভুক্ত অনুসূয়া-সুমিতি-নৃপনারায়ণ-মনসা-সদানন্দ মাস্টার আর রুপু। তৃতীয় বৃত্তে মেলে রামচন্দ্র-কৃষ্টদাস-ছিদাম-মুঙলা-পদ্ম-সনকা-ভানুমতির মত কৃষিজীবী মানুষের কথকতা। সবশেষে চতুর্থ বৃত্তে রূপায়িত হয়েছে আলেফ-এরফান-আল মাহমুদ-সাদেকের মত অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থের গার্হস্থ্য জীবনকথা। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'এই উপন্যাসে প্রধানতঃ সমাজের নিম্নতম শ্রেণী, মাঝামাঝি অবস্থার কৃষক সম্প্রদায় ও তখনও সচ্ছল সমাজনেতা ও গ্রামহিতৈষী জমিদারগোষ্ঠীর আসন্ন পরিবর্তনের আভাসে অস্থির নূতন পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় বিব্রত জীবনবৃত্ত অঙ্কিত হইয়াছে' (শ্রীকুমার, ১৩৪৫: ৭৫৬)। কালের গাঢ় অভিঘাত আর পদ্মার খামখেয়ালি পদসঞ্চারণপিষ্ট এই মানুষগুলোর শেকড়ছিন্নতা আর শেকড়সন্ধিৎসার চালচিত্র এ উপন্যাসে সৃষ্টি করেছে এক দ্বান্দ্বিক আবহ। 'পদ্মার ভাঙাগড়ার তীরে অথবা প্লাবন-বিধ্বস্ত ভূখণ্ডে পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে দেশবিভাগের মধ্যবর্তীকালে, 'ভূমিহীন, ভূমিবুভুক্ষু, ভূমিলোভী ও ভূম্যধিকারীদের' (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮: ২৭২) পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাঁচার চেষ্টার সমষ্টির যে সমগ্রতা তাই এখানে শিল্পরূপ পায়।

পাঠকের সঙ্গে সমকালের সংবিত্তি ঘটেছে উপন্যাসে। ব্যক্তিক সময়ের পরিবর্তে সামষ্টিক সময়ই এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। সমালোচক সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, 'এডওয়ার্ড ভের রচিত এবং বার্নাদো বার্তোলুচি যেভাবে ব্যক্তিগত কাহিনীর অনুবৃত্তকে সামাজিক-রাজনৈতিক বৃহৎ বৃত্তের অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপিত করেন এবং কোনো ব্যক্তিগত কাহিনী নয়, একটি বিশেষ সময় ও জনপদকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলেন; অমিয়ভূষণও শেষপর্যন্ত তাই করেন' (সুশান্ত, ১৯৯৪: ৬৬)। পদ্মা তীরবর্তী এক জনপদের জীবনগাঁথা রচনা করেছেন তিনি, যে মানুষগুলো সময়ের গাঢ় অভিঘাতে সমূলে উৎপাটিত হয়ে স্বমৃত্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বেদনা উপলব্ধি করেছে। আবার সেই বেদনার নিমজ্জন থেকে উত্থিত হয়ে নতুন করে মৃত্তিকা-গভীরে শেকড় প্রোথিত করার সংগ্রামে বলীয়ান হবার স্বপ্ন দেখেছে। উপলব্ধি করা যাবে সমকালমনস্কতা উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমালোচক মনে করেন:

> অমিয়ভূষণের ইতিহাসবোধ আর সময়চেতনার অপরূপ যুগলবন্দি গড় শ্রীখণ্ড। ব্যক্তির প্রাধান্য এড়িয়ে কালই এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, নায়ক। একটি কঠিন সময়ের পৃষ্ঠপটে বহু মানুষের বিচিত্র কাহিনি বহমান রয়েছে উপন্যাসটির গদ্যশরীরে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ মোটামুটি এ সময়ের বৃত্তকে ঘিরে রয়েছে তার আখ্যান সমষ্টি। সময়টা ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিমুহূর্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাজন, কৃত্রিম খাদ্যসংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি, সব মিলিয়ে বাংলার জনমানসে কালান্তরের অভিঘাত। (তুষার, ২০০১: ৯৭)

ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে এই কালান্তরের কথকতা:

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপ্তি, নৃশংস অত্যাচার সরকার ও কংগ্রেসের সম্পর্ককে নষ্ট করে দিয়েছিল। বাংলায় দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধকালীন খাদ্য সংকট সরকারের নৈতিক ভিত্তি নষ্ট করেছিল। হিন্দু মুসলিম বিভাজন ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রধান বাধা ছিল। পাকিস্তান প্রাপ্তির দাবী যতই অস্পষ্ট থাক, মুসলিম জনসঙ্ঘবদ্ধতা প্রচারে মুসলিম জমিদার, পেশাগত প্রতিষ্ঠিতরা, ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে ছিল উৎসাহী... ।...বাংলায় ফজলুল হক ও তার কৃষক প্রজা পার্টি এবং পাঞ্জাবে সিকান্দর হায়াৎ খান ও তার ঐক্যকামী পার্টিকে কোণঠাসা করা হয়, পাকিস্তান গঠনের দাবীর ক্রমবর্ধমানতায় এরা ভেসে যায়। ১৯৪৬-এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় বাংলায় গড়ে তোলে মৌলানা আজাদের ভাষায় religious crusade...১৯৪৬-এর ফেব্রয়ারীতে ক্যাবিনেট মিশন ও তৎকর্তৃক ভারতের জন্য three tier structure of a loose federal government, পূর্ণ স্বাধীন পাকিস্তান পরিকল্পনা। পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ার জেহাদ শুরু ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট, সেই দিনটাই ঠিক করা হলো কলকাতায়–Direct Aaction Day–নরকের দরজা খুলে দেওয়া হলো এখানে। কথা ছিল মুসলমানরা দেশব্যাপী ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা, শোভাযাত্রা করবে।...কিন্তু ঘটল Great Calcutta Killing. মুসলিম জনতা হিন্দুদের, তাদের সম্পত্তি আক্রমণ করল, হিন্দুরাও পালটা আক্রমণে নামল, চারদিন ধরে চলল এই শৃঙ্খলমুক্ত হানাহানি,...এই convergence of elite and popular communalism এর প্রভাবে দাঙ্গা ঘটল–চট্টগ্রামে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পাবনায়। সবচেয়ে খারাপ ঘটল নোয়াখালি ও ত্রিপুরায়।...১৯৪৭, মার্চ থেকে শোচনীয় সাম্প্রদায়িক নারকীয়তা দেখা দেয় পাঞ্জাবে।...গান্ধী পরিক্রমা করলেন নোয়াখালি থেকে কলকাতা, বিহার থেকে দিল্লি–তাঁর উপস্থিতি অতি বিস্ময়কর প্রভাব আনলেও তা স্থায়ী হলো না।...১৯৪৭ এর ১৪/১৫

> আগষ্ট দেশ বিভাজনের প্রভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িক হানাহানি, মানুষের উদ্বাস্তুভবন ঘটে গেল উপমহাদেশে। (রবিন, ২০১১: ২১২-১৩)

এই কালপটেই এ উপন্যাস রচিত। উপন্যাসের শুরুতেই সুরোর স্মৃতিচারণে চল্লিশের দশকের উত্তাল কালপ্রবাহ উঠে আসে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, দেশত্যাগের বেদনা, নিঃস্ব হয়ে পথে নামার যন্ত্রণা, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা, কৃষিকেন্দ্রিক সামন্তজীবন থেকে প্রাক-ধনতান্ত্রিক জীবনে উপনীত হবার কথকতায় রচিত চল্লিশের দশকের তরঙ্গায়িত কালপ্রবাহের চালচিত্র:

> ...বাঙাল নদীর দুপাড়ে সে-বার এক দুর্ভিক্ষ এলো। তারপর গ্রামের বাইরের জীবন। র‍্যাল, হাউইজাহাজ, সোলজর। আঘাতে আঘাতে তার মনের পরিসীমা বিস্তৃত হতে লাগলো। বাঙাল নদীর হংসপক্ষ-বিধূত একটি দৃশ্যপটে সহসা যদি বনরাজির মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়াকলের চোং জেগে ওঠে, যদি চোং-এর ফাঁকে-ফাঁকে হাঙর রং-এর লোহার পাখি গর্জন করে উড়ে যায়, সুরোর মনের তুলনাটা দেওয়া যায় তাহলে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২২)

সুরো-ফতেমার মত গৃহী নারীকেও আগ্রাসী কালের দাবীতে চাল-চোরাকারবারিতে নামতে হয়। রুক্ষ-ধূলিমলিন যাযাবর জীবনে পুরুষালী-সংগ্রাম ক্রমে সয়ে যাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন:

> ফতেমার মত মেয়েরা আর তেলচুকচুকে কাজলমাখা গৃহিণী নয়,...দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিকতায় তাদের গায়ের মেদ ঝরে গেছে। সুরতুন-ফতেমা-ফুলটুসিরা ট্রেনে ট্রেনে চাল চালানের অবৈধ ব্যবসা করে। দুর্ভিক্ষে চাষীরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, আর তার সুযোগে নগদ দামে, রেহানে, খাইখালাসি বন্দোবস্তে চৈতন্য সাহারা চাষীদের দশ আনা জমি গ্রাস করে। গ্রাম ছেড়ে চলে যায় ভক্ত কামারের পরিবার, হালদারপাড়ার ছয়ঘর মানুষ। যুদ্ধ চলছে, কাজ হচ্ছে ঝড়ের গতিতে, মাইনে বাড়ছে, দাম বাড়ছে, টাকা উড়ছে। (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮: ২৭২)

সিকদারের এই বর্ণনা কালচিহ্নায়ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ এসে লাগে দিঘা বন্দরে। স্টেশনগুলোয় যুদ্ধফেরত নিষ্প্রাণ লোকের ভিড়, খাকি পোশাকের জয়জয়কার, মাইনে বেড়ে যাবার হিড়িক, হাওয়াই জাহাজের আনাগোনায় চৈতন্য সাহাদের মহাজনি কারবারের আগ্রাসী আয়োজন, মধ্যসত্ত্বভোগী সম্পন্ন গৃহস্থ কৃষকের জোতদার হবার আকাঙ্ক্ষা, ভূমিহীন কৃষকের গ্রামত্যাগের মত বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো তরঙ্গায়িত কালেরই প্রতীক। মনসা সুমিতিকে বলেছিল, '...কালের স্রোত যে পথ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তা থেকে অনেক দূরে আমাদের অবস্থান, তবু তারই একটা আবর্তসংকুল ধারা প্লাবনের মত এসে আমাদের কাল সম্বন্ধে সচেতন করেছিলো...' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৭)। এরই ধারাবাহিকতায় দেশভাগের আভাস মিলছিল। কলকাতায় বসবাসরত এরফানের শ্যালক মুসলিম লীগের আল মাহ্‌মুদ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্রমশ চরণকাশিসহ আশেপাশের গ্রামগুলোতে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের বীজ বুনে দেয়। কলকাতার অসন্তোষময় আগুনের আঁচ বুধেডাঙা-চরণকাশি-চিকন্দির মত গ্রামে বয়ে এনে হিন্দু-মুসলিম একতায় ফাটল ধরায় সে:

> ভাইসব, আপনাদেক একটা কথা কবো। এই সুবে বাংলার মালিক হতেছি আমরা মোসলমানরা। ইংরেজ আমাদেক দাবানের জন্য রাজ্য কাড়ে নিয়ে হেঁদুকে বড়ো করছিলো। এতদিনে ইংরেজরা বুঝছে সরকার

> চালাবের ক্ষমতা হেঁদুর নাই। তাই এখন আমাদের ডাকে নিয়ে রাজ্য চালাবের কইছে। আপনেরা গৈগাঁয়ে থাকে খবর পান না, কৈলকাতা নামে এক শহরে আমরা হেঁদুদেক দাবায়ে দিছি। আমাদের মোসলমান উজির আপনাদেক ত্যাল, কাপড়, চিনি পরাবি। তা কন্, মাঝখানে হেঁদুক আসবের দেওয়া কেন্? আমাদের সেখসাহেব এই মজিদ করছে। তার মত বড়ো মোসলমান কে আছে? মোসলমানদের মধ্যি তার বড়ো কে? তাই কই, চিরকাল হেঁদুর দাবে না থাকে, ভাইসব, মাথা উঁচু করে ওঠেন। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২২৮-২৯)

চিকন্দিতে সান্যালবাড়ির রেডিও মারফত খবর মেলে নোয়াখালির দাঙ্গার। দিঘায় রেল কলোনির অধিবাসীদের মধ্যকার দ্বিধাবিভক্তি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চূড়ান্ত ইঙ্গিত বয়ে আনে। এখানকার মানুষের হৃদয়েও সমকালের প্রভাবে সংশয় আর সহিংসতা গাঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে। কলকাতায় 'ডাইরেক্ট এ্যাকসন ডে'তে আলেফের পুত্রের মৃত্যু সেই সহিংসতায় যেন অসহিষ্ণুতার মাত্রা আরেক কাঠি বাড়িয়ে দেয়। ইতিহাসবিদ জয়া চ্যাটার্জী তাঁর *বাঙলা ভাগ হল* গ্রন্থে কলকাতার এই 'ডাইরেক্ট এ্যাকসন ডে' সম্পর্কে লিখেছেন:

> কোলকাতা ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' একটা আকস্মিক ঝলকের মত বিষয় ছিল না, এটা ছিল উদ্ভূত বিভিন্ন ঘটনার ফল যা দীর্ঘদিন থেকে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। অংশত এটা ছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্যের পরিণতি, সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের সাফল্যের উন্মাদনা এবং বাঙলাকে যে কোনো কাঠামোয় পাকিস্তান বানানোর ব্যাপারে তাদের ক্ষমতার ওপর দৃঢ় আস্থা; অংশত এটা ছিল তথাকথিত 'মুসলিম স্বেচ্ছাচার'কে প্রতিরোধ করার হিন্দু সংকল্প। এই রক্তক্ষরণের দায়িত্বের অনেকটাই বহন করেন সোহরাওয়ার্দী নিজে; কারণ তিনি হিন্দুদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ দেন এবং দাঙ্গা শুরু হওয়া মাত্রই তা দমনে সন্দেহজনক অবহেলার ...কারণে ব্যর্থ হন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার পর দেখা যায়, উভয় পক্ষের হাজার হাজার লোক নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে । (জয়া, ২০০৩: ২৭১)

কলকাতার এই দাঙ্গার দামামার ঢেউ এসে লাগে গ্রামগুলোতে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আর সংশয়ের তরঙ্গ ফেনিয়ে ওঠে মানুষের চেতনায়:

> ...একটি হিন্দুর সঙ্গে পথে একটি মুসলমানের দেখা হলে আলাপ না জমলেও তারা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু পাঁচজন হিন্দুর সঙ্গে পাঁচজন মুসলমানের দেখা হলে সকলেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে, হিংস্রতাও জেগে ওঠে মনের মধ্যে। খেতে গেলে পাছে একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এইজন্যই যেন মাঠে যাচ্ছে না চাষীরা। হাট বসছে না।...সান্যালমশাই দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলি তাঁর প্রাসাদের ছাদে পায়চারি করে কাটাতে লাগলেন। একটিমাত্র চিন্তা তাঁর, কলকাতার রাজনীতির এই প্লাবন যা তাঁর গ্রামকে বেষ্টন করে থৈ থৈ করছে সেটা যদি তাঁর গ্রামের উপরে ভেঙে পড়ে কী করে তিনি সে ধ্বংসকে কাটিয়ে উঠবেন। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৬৯)

শেষপর্যন্ত সান্যালকর্তা-হাজিসাহেব-রামচন্দ্র আর এরশাদের মত মানবিক মানুষগুলোর তৎপরতায় দাঙ্গার প্রত্যক্ষ তাণ্ডব থেকে গ্রামের মানুষ বেঁচে যায়। তবে সাম্প্রদায়িক ভীতি আর বিদ্বেষের অবসান ঘটলেও শহর থেকে সদানন্দর স্কুলের মাস্টার আর সান্যালবাড়ির কনট্রাক্টরেরা ফেরে না। রেডিও কিংবা কাগজের সংবাদে যে সময়ের কথকতা নির্মিত হচ্ছে, সব যেন অশান্তিতে কাঁপছে। নবদ্বীপের উদ্বাস্তু মানুষগুলোর অসহায় চোখ কিংবা ট্রেনের অকুলান ভিড়ের বিপরীতে গ্রামগুলোর বিরান বাড়ি-ঘর-চাষের জমি দেশভাগের আসন্নতার আভাস দেয়। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় লিখেছেন:

> চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে-গল্পগুলি ও যে উপন্যাস লেখা হয়েছে, তাতে দেশভাগ স্বাধীনতার সঙ্গে জড়ানো সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের অভিঘাতটাই প্রধান–খুন, লুট, রক্ত, ধর্ষণ, উৎপাদন, পালানো, তাড়ানো। দেশ-স্মৃতি ও দৈনন্দিন–নিহত হচ্ছে। দখলদারি থেকে উচ্ছেদ ও নতুন দখল কায়েম-দেশ বা স্পেসকে নিজের করে নেয়ার একটিই পদ্ধতি।...যে গল্পগুলিকে...লেবেল দিয়েছি দেশহারা-স্মৃতিহারা, সেই গল্পগুলিতে ট্রেনের কথা বারবার আসে। ট্রেনের কামরাগুলি তো ধাবমান স্পেস। সেই পলায়নে যেন স্পেস থেকে স্পেস পালাচ্ছে। (দেবেশ, ১৯৯৪: ৭২)

এভাবেই পলায়নরত মানুষেরা দেশহারা স্মৃতিহারা হয়ে আজন্মবিচরিত মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা কিংবা দেশভাগই সেই শেকড় বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ। এই মানুষগুলোর অস্তিত্বে উত্তাল কাল হিংস্র নখর দাবিয়ে তাদের বিপন্ন করে। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'এদিকে এক রাজা আর ওদিকে এক নবাব। দেশ ভাগ হয়েছে, একই ফলের দুটি টুকরো' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৩৩)। দেশভাগের সেই রাজসিক সীমারেখার অবস্থান কোথায়, কতদূর, সে সম্পর্কে এই ভূমিবিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর কোনো ধারণাই নেই। হালদার পাড়া কিংবা জেলেপাড়া অথবা মহিমের মত সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় রাজসিক সীমারেখার ওপারে। 'মহিমের মত দলে-দলে যারা বেরিয়ে পড়েছে, তাদের এই যাত্রা –''তীর্থভ্রমণ নয়, দেশ-পর্যটন নয়, শ্মশানযাত্রা'' (অলোক, ২০০৯: ২৫৬)। সমালোচক আহমদ রফিক লিখেছেন:

> বাংলার অবস্থা পাঞ্জাবের মত না হলেও এখানে দেখা গেছে সংখ্যালঘুদের মনে আতংক আর ভয়। অন্যদিকে প্ররোচনা ও বিত্তবানদের সম্পদ দখলের চেষ্টা, সব কিছু মিলে বিত্তবান মধ্যবিত্তশ্রেণীর হিন্দুদের দেশত্যাগ। সেইসঙ্গে অচিরেই ভারতীয় হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ায় বা স্থানীয় উপদ্রব হিসাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাবলীর চাপে কথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ নিয়মিত হয়ে ওঠে।...এ প্রক্রিয়া...বঙ্গে শুরু হয় দেশভাগের আগেই ১৯৪৬-আগস্টে সংঘটিত কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি-ত্রিপুরায় দাঙ্গার সময় থেকে। সাতচল্লিশের বঙ্গভাগ সে অস্থিরতায় আরো গতি সঞ্চার করে। যারা হিসেবি মানুষ তারা কিছু অর্থের বিনিময়ে ঘটনার আগেই ঘরবাড়ি ছেড়েছেন, তবে অধিকাংশকেই বিরূপ পরিস্থিতিতে সম্বলহীন অবস্থায় অজানা অচেনা গন্তব্যে পাড়ি দিতে হয়েছে। তাৎক্ষণিক লক্ষ্য সীমান্ত অতিক্রম করে স্বধর্মী স্বদেশে আশ্রয় গ্রহণ, যেদেশ বিভক্তির কারণে বিদেশ হয়ে গেছে। (আহমদ, ২০১৫: ৪৩৬-৪৩৭)

পদ্মা যেমন খাত পাল্টে সিকস্তি বা পয়স্তি ভূমির জন্ম দিয়ে চিকন্দি-বুধেডাঙা কিংবা চরণকাশির মানুষগুলোর জীবনের গল্পে নতুন মোড় ফেরায়, কালও তেমনি ভাঙাগড়ার খেলায় মানবজীবনে নতুন কালের আগমনধ্বনি শোনায়। 'পদ্মার ভয়াল হিংস্রতা গ্রামের পর গ্রামকে গ্রাস করেছে। আবার সেই ভয়াল ধ্বংসের মধ্যেই গড়ে ওঠে নরম মাটির, পলিমাটির চর। যে মানুষগুলির জীবন পদ্মার করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, হয়ত তারা কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠী নতুন করে জীবনের ভিত্তি রচনা করেছে' (মৃণালকান্তি, ২০০২: ২২৯)। মানুষের জীবনে বিসর্পিল কালের গতিময়তাও পদ্মার মতই ধবংস আর সৃষ্টির কথকতা রচনা করে। একারণেই লেখক *গড় শ্রীখণ্ডে* কাল আর পদ্মাকে একাকার করে তোলেন । উপন্যাস শেষে তাই তাঁর মনে হয়, 'বন্যা থেমে গেলে হয়তো বোঝা যাবে, পদ্মা এবার আবার পাশ ফিরলো কিনা–এটা তার প্রসাদ কিংবা রোষ'(অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৪৫)। দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগের মত কালের অভিঘাতে যে বঞ্চিত মানুষগুলো অস্তিত্ব টিকিয়ে

রাখতে পারল, উপন্যাসে তারাই শেষপর্যন্ত কালোত্তীর্ণ অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে বেঁচে থাকে। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> পদ্মাকে বলছে: হে কাল-পদ্মা যেন কাল, কালের প্রতিমা–তুমি দয়া করো। এই যে কালপ্রবাহ, পদ্মার মত এদিক-ওদিক টার্ন নিচ্ছে, আমরা কষ্ট পাচ্ছি, বুঝতে পারছি না এর মধ্যে ক্যারাকটার তৈরি হয়ে গেছে। তাই কাল, তুমি দয়া করো, অর্থাৎ ধ্বংস কোরো না। জীবনে যারা সবচাইতে বঞ্চিত, সেই শ্রেণী জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, তুমি দয়া করো। ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে আমরা জীবনের আয়োজন করছি–এটা কিন্তু চিরস্থায়ী, কালকে সারপাস করে যাচ্ছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৪৫১)

পদ্মার মত সময়ও ভাঙছে, গড়ছে। অখণ্ড এক প্রবহমান মহাকালের অভিঘাত সত্ত্বেও *গড় শ্রীখণ্ডের* মানুষগুলো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যাপৃত। সমালোচকের মন্তব্য:

> নদীর জলের মত সময়ের বহতা ধারা। পদ্মার কালো জলরাশির যে উত্তাল তরঙ্গ গড় শ্রীখণ্ডের দুপাশের জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে মহাপ্রলয়ের মত নেমে এসেছিল, তা যেন কালেরই একরূপ। একই কালখণ্ডের কাছে মানুষ তৃণমূলের মত অসহায়। "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু" তারাই যখন জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে তখন ছোটখাটো জিনিস সাজিয়ে জীবনে চিরস্থায়ী মুহূর্ত বয়ে আনার যে প্রয়াস, তাকে হারিয়ে যেতে না দেবার জন্যেই যেন পদ্মার কালো জলরাশির প্রতীকে মহাকালের কাছে আমাদের চিরন্তন প্রার্থনা–হে মহাকাল, তুমি দয়া করো,...। (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ১২১)

এভাবেই তরঙ্গায়িত কালের পটে এ উপন্যাসের মানুষগুলোকে প্রতিস্থাপিত করেন লেখক।

উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছে ভূমিহীন সুরতুনকে দিয়ে। শেকড়বিচ্ছিন্ন ভাসমান মানবমিছিলের একজন সুরতুন, অন্যজন মাধাই। *মহিষকুড়ার উপকথার* আসফাকের মত অকিঞ্চন-সত্তার অধিকারী না হলেও সুরোকে বুধেডাঙার মাটির গভীরে চারানো শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তার মত করেই:

> জল ও জঙ্গল নিয়ে জাঙ্গাল-বাঙ্গাল বাংলা দেশের এক গৈ-গাঁয়ের মেয়ে সুরো। ব্রাত্য 'সান্দার'–বংশে তার জন্ম। বাপ নেই ভাববে, মা নেই কাঁদবে। গাঁয়ের পরিসীমার সঙ্গে সম-আয়ত ছিলো তার মনের বিস্তার।...পদ্মার চরে বসানো গাঁয়ের একটির নাম বুধেডাঙা, তারই মেয়ে সে।...ধান যখন নতুন বউ-এর মত পাত্রে-অপাত্রে অকাতরে সলজ্জ হাসি বিলোচ্ছে তখন আহার করা, এবং ধানের দিন সরে যেতে-যেতেই উপোস শুরু করার অভ্যাস ছিলো তার । কিন্তু বাঙাল নদীর দু পাড়ে সে-বার এক দুর্ভিক্ষ এলো। তারপর গ্রামের বাইরের জীবন। র‍্যাল, হাউইজাহাজ, সোলজর । আঘাতে আঘাতে তার মনের পরিসীমা বিস্তৃত হতে লাগলো। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২২)

এই উদ্ধৃতিতেই সুরোর শেকড়বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ উঠে আসে। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ তাকে নিয়ে এল গ্রামের বাইরের জীবনে, যেখানে তার ব্যক্তিক সংকট গাঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে। পিতা বেলাত আলীর জীবদ্দশাতেই সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ সুরো পুরুষের হাতে নিগৃহীত হয়। পিতার মৃত্যুর পর শরিক রজব আলীর অকারণ সন্দেহের খেসারত দিতে গিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়তে হয়। মাধাই কর্তৃক গরুকে বিষ দেবার অভিযোগ আরোপিত হয় সুরোর ওপর। যদিও বিষ দিতে গিয়ে রামচন্দ্র মণ্ডলের হাতে ধরা পড়ে মাধাইকেও ছাড়তে হয়েছিল গ্রাম।

আর তারপর তিনমাসের ভেতর রেলওয়ে পোর্টার হিসেবে স্টেশনের চাকরিতে যোগ দেয় মাধাই। এভাবে শেকড়বিচ্ছিন্নতা মাধাই আর সুরোর নিয়তিকে এক করে দেয়।

অনুশোচনাবোধ থেকে রেলওয়ের পোর্টার মাধাই সুরোকে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিল। সদ্য মাতৃহারা মাধাইয়ের 'শূন্যীভূত আত্মা একটা অবলম্বন পেয়েছিলো' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৭)। মাধাই একই সঙ্গে ত্রাতা আর রক্ষীর কাজ করেছে সুরো ফতেমার চাল চোরাকারবারীতে। কখনো বাহুতে নীল উল্কিতে আঁকা ডানা মেলা পক্ষী, কখনো লাল জমির ঠেঁটি শাড়ি, কখনো বা সার্কাস দেখতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবন উপভোগের স্বাদও পেল সুরো, যার সবটুকুই ছিল মাধাইকেন্দ্রিক। মাধাই সম্পর্কিত ভাবনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সুরোর মনোজগত:

> আত্মীয়তার হিসাবে ফতেমা তার ভাই-বউ, রজব আলি তার জ্যাঠামশাই। গ্রামের বাইরে অনাত্মীয়ময় পৃথিবীতে তাদের নিকট বলে মনে হয়, গ্রামের ভিতরে তারা প্রতিবেশীর মত। আর চালের কারবারে নেমে ফতেমার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এসবের চাইতে বড়ো মাধাই, নির্ভরযোগ্য কোনো সম্বন্ধই যার নেই, অকারণে যে প্রাণ বাঁচায়, প্রয়োজনের সময় যে পরামর্শ দেয়। তাকে আজকাল সুরোর সব আত্মীয়ের সেরা আত্মীয় বলে বিশ্বাস হয়। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৫২)

এভাবেই কালের অভিঘাতে উন্মুল সুরো ভাসমান-জীবনে এসে পড়ে। অন্যদিকে, যুদ্ধধ্বস্ত তরঙ্গায়িত কাল মাধাইয়ের অন্তর্জগতেও জন্ম দেয় এক নৈঃসঙ্গ্যচেতনার। এই নৈঃসঙ্গ্যবোধ থেকে সে সুরোর প্রতি এক গভীর আকর্ষণ বোধ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছোঁয়াচ এসে লাগছিল দূরের এই দিঘা বন্দরে। যুদ্ধ ফেরত নিষ্প্রাণ মানুষগুলোর উত্তাপহীন শুষ্ক মুখ মাধাইয়ের অন্তর্মানসে এক জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়, 'যুদ্ধ যদি খারাপই হবে, তবে বাবু, স্টেশনের সব লোক এমন মনমরা কেন্, তাদের সকলের মুখ ফ্যাকাসে দেখায় ক্যান্ যুদ্ধের জেল্লা কমায়?' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১০৩)। যুদ্ধবিরোধী এক বোধ গভীরভাবে মাধাইকে আলোড়িত করে। এই বোধে অনুপ্রাণিত মাধাই গোবিন্দ আর মাস্টারমশাইয়ের সহায়তায় শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলে। কিন্তু এখানেও ক্লান্তি ঘিরে ধরে তাকে। একঘেঁয়ে সংঘের কাজ করতে করতে তার চেতনায় এক ভাবনার জন্ম হয়। সে ভাবে, '...বেঁচে থাকা তখনই ভালো লাগে যখন আপন একজন থাকে। সংঘের কাজে বিদ্বেষের নেশাটা আর তেমন ধরছে না। বাকিটুকু কর্তব্যের মত, চাকরির মত ভারি বোধ হচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১১১)। আত্মীয়হীন অস্বস্তিকর সময়ে মাধাইয়ের শেকড়বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব তাকে সুরো, ফতেমার আন্তরিক সান্নিধ্য এবং ফুলটুসির ছেলেদের প্রতি স্নেহাতুর সম্পর্কের দিকে প্রলুব্ধ করে। এদের সঙ্গে এক প্রবল সাদৃশ্য খুঁজে পায় নিজের। অমিয়ভূষণ এই অনাত্মীয় পথমানুষগুলোকে বেশ কয়েকবারই উপন্যাসে এক বিচিত্র পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন, যাদের কারোরই একে অপরের সঙ্গে ছিলনা কোনো রক্তের সম্পর্ক। যুদ্ধের নিষ্প্রাণ শীতলতার বিপরীতে সদ্যোজাত পারিবারিক আবহের উষ্ণতা মাধাইকে আশ্বাসের আশ্রয় দেয়। সেইসঙ্গে মাধাইয়েরই সংগ্রহীকৃত প্রসাধনে চর্চিত নতুন লাবণ্যময়ী সুরোর মুখোচ্ছবি তাকে গাঢ় আবেগে আপ্লুত করে। সেইসঙ্গে মাধাইয়ের অনেককালের অবদমিত কামনার আকস্মিক প্রকাশ সুরোকেও আচ্ছন্ন করে। কিন্তু সুরোর ভেতর একই সঙ্গে মাধাইয়ের প্রতি প্রেমাকর্ষণ আর ভীতিবোধ পরস্পরবিরোধী এক দ্বন্দ্ব তৈরি করে। একদিকে

মাধাইয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, অন্যদিকে, কৈশোরে ধর্ষিত হবার গাঢ়বদ্ধ ভীতিবোধের দ্বন্দ্ব তাকে মাধাইয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাড়া দিতে নিরস্ত করে। তাই এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সুরতুন আর মাধাইয়ের বিচ্ছেদ ঘটে:

> সুরতুন তো প্রেমে পড়ার মুখেই ছিলো, তার অবচেতনে একটা ভয় ছিলো পুরুষের প্রতি–সেই জন্যে যাকে ভালবাসতো সেই মাধাই বায়েনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারলো না। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৪৫১)

মাধাইকে গ্রহণ করতে না পারার বেদনাবোধ, টানাপড়েন সুরোকে অস্তিত্বসংকটে নিক্ষেপ করে। একইসঙ্গে মাধাইও সুরোর পরিবর্তে কখনো টেপি, কখনো বা চাঁদমালাতে স্বস্তি খুঁজে ব্যর্থ হয়, যে ব্যর্থতাবোধ তাকে সংকটের দিকে ধাবিত করে।

সুরোর না খেয়ে থাকার দিন আবার ফিরে এলে কখনো ফতেমার সংসারে, কখনো টেপির মায়ের সংসারে কখনো বা তার একলা থাকার জীবনে মাধাইয়ের আনাগোনা ঘটতেই থাকল। ইতোমধ্যে মাধাই আর সুরোর পারস্পরিক দ্বিধা আর সংকোচ তাদের ভেতর দূরত্ব তৈরি করে। নিয়তি তাদের পথ যেমন করে এক করে দিয়েছিলো, তেমনি আবার সেই গ্রন্থি খুলেও নিল।

বুধেডাঙায় ফিরে রজব আলি সান্দার, ফাতেমা, ফুলটুসির আগের ঘরের পুত্র ইয়াজ–এদের সমন্বয়ে রক্তসম্পর্কহীন এক 'অপূর্বগঠন' পরিবারে কাল কাটতে থাকে সুরোর। মানুষগুলোর প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ অতীত ছেড়ে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের ভয়াবহতায় উন্মূলিত হয়ে গ্রাম ছেড়েছে, জীবিকার তাগিদে পথে নেমেছে। কালের করাল গ্রাসের প্রত্যক্ষ শিকার তারা। যদিও দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে এরা ভাবিত নয়। কারণ প্রান্তিক এই মানুষগুলো কেন্দ্র থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। কাজেই কেন্দ্রের কোনো ভাবনাতেই এদের কিছু যায় আসে না। তবু সমাজ-রূপান্তরের নেতিবাচকতার দায় একমাত্র এদেরই বহন করতে হয়েছে। সুরোর মত এদের প্রত্যেকেরই ভাসমান জীবনের একইরকম গল্পে ধরা পড়ে শেকড়সন্ধিৎসু আকাঙ্ক্ষার বহুকৌণিক ভাবনারাশি:

> ...কী করা যাবে যদি এই ব্যর্থতাই তার ভাগ্য। এখানেই থাকতে হবে,...। মাঝখানে কিছুকাল নিজে ব্যবসা করে পেট চালাতে শিখেছিলে, দু বেলা আহার পেতে, সেটা চিরকাল থাকার নয় এটাই বুঝে নাও। এই বুধেডাঙা এখন তোমার পরবাস নয়, তিনপুরুষ হলো এখানে। কোণঠাসা হয়ে সে চিন্তা করতে লাগলো: ভাগ্যের দিগন্তে মাধাই উঁকি দিয়েছিল একদিন, এই বলে শোকই যদি করতে হয় পথে পথে পাগল হয় বেড়াতে হবে কেন, এখানেই কাঁদা যেতে পারে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৩৯)

বেদনাবোধ সত্ত্বেও ভাসমান মানুষগুলোর সঙ্গে একসাথে বসবাসে স্থিতিবোধ সুরোর অস্তিত্বে জাগ্রত। সুরো ভাবে, 'মানুষে মানুষে সম্বন্ধই-বা কী আর বিমুখতাই বা কোথায়' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৪১)। বুধেডাঙার উদাসীন নিস্পৃহ বাতাসে ভেসে আসা বীজের মত পথমানুষগুলোর সঙ্গে এক গ্রন্থিতে এভাবেই একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়ে সে। কখনো তার মনে হয়, সে যেন মাধাইয়ের যত্নে লালিত এক আমনের চারা, যাকে কোনো বোকা চাষী বুধেডাঙার এক কাশের ক্ষেতে রোপণ করে দিয়েছে। আবার কখনো মনে হয় দিঘার জঙ্গলে জন্মানো সে এক পা ভাঙা বনবিড়াল, মাধাইয়ের দয়ায় সুস্থ হয়ে আজ এভাবে বুধেডাঙা আর চিকন্দির

অচেনা জঙ্গলে ঘটছে তার পদচারণা। এইসব ভাবনারাশি মাধাইকে আরও আবেগাপ্লুত করে। রোগাক্রান্ত মাধাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একটি কথাও সে বলতে পারে না। কিন্তু মাধাই তাকে আদর করে সন্তের মত। পুরুষের যে স্পর্শকে সে এতকাল ভয় করেছে, মাধাইয়ের কামহীন সন্তের মত স্পর্শ যেন তার ঊর্ধ্বে। এক অনিঃশেষ বেদনাবোধে মাধাইয়ের সঙ্গে সুরোর সম্পর্কের ইতি ঘটে। অন্যদিকে, উপন্যাসে কয়েকটি আঁচড়ে সুরোর প্রতি ইয়াজের লুক্কায়িত আকর্ষণ মূর্ত হয়ে ওঠে। স্পষ্ট কোনো প্রণয় নয়, কিন্তু ইয়াজের আচরণে গাঢ় আবেগের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। বুধেডাঙায় এক বিকেলে শেকড়হীন ইয়াজ আর সুরোর পারস্পরিক কথোপকথনে মূর্ত হয়ে ওঠে এই ইঙ্গিতময়তা:

> ইয়াজ বললো, 'কেন্, সুরো, জয়নুল আর সোভানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী? সে তো ঐ কসাইয়ের ছাওয়াল। তাদের আমি দেখবো শুনবো ভালবাসবো, আমাক বাসে কে?...
>
> সুরতুনের মনে হলো ভালবাসা ইয়াজ জীবনে কখনো পায়নি, কেউই তাকে আপন করে কখনো কাছে টেনে নেয়নি।...সহসা সুরতুনের নিজেকেও অপরিসীম ক্লান্ত মনে হলো।...সারাদিনের কায়িক পরিশ্রমের ও অনাহারের ক্লান্তি মানসিক ক্লান্তিতে সংযুক্ত হয়েছে। তার মনে হলো যেন এই পৃথিবীতে সে আর ইয়াজ ছাড়া সব নিবে গেছে।...সুরতুনের ইচ্ছা হলো ইয়াজের ডান হাতখানা নিজের কোমরের উপরে রেখে নিজের হাত দিয়ে সেটাকে ধরেও রাখবে কিছুকাল। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৪১)

বুধেডাঙায় ভাসমান এই মানুষগুলোর মমতায় শেকড়বিচ্ছিন্ন শহুরে ইয়াজের গায়েও গ্রামের শ্যাওলা জন্মায় । অমিয়ভূষণ উড়ে আসা বীজকে ধীরে ধীরে চারাগাছে রূপান্তরিত করে তার এক গভীর ভিত রচনা করেন। যদিও সুরো আর ইয়াজের মধ্যে মাধাইয়ের অবিচল অস্তিত্ব এদের এক হতে দেয় না।

মাধাইয়ের প্রতি সুরোর মত অকিঞ্চনের প্রণয় প্রথম ভাষা পেল উপন্যাসের একেবারে শেষে। বাঁধ ফেটে দিঘায় জল ঢোকার খবর পাবার বিহ্বলতা কাটতে সুরোর কিছু সময় লাগলেও ফেঁপে ওঠা বান পেরিয়ে মাধাইয়ের কাছে ফিরতে চায় সে। ইয়াজ আর সুরোর পারস্পরিক কথোপকথনেই তিনটি প্রণয়ের আভাস ইঙ্গিতময় করে তোলেন লেখক:

> বিকেলের দিকে হঠাৎ সে বারান্দা থেকে নেমে দ্রুতগতিতে হাঁটতে শুরু করলো, অবশেষে ছুটতে। পায়ে পায়ে জলের শব্দ হচ্ছে, জলে গতি আটকাচ্ছে।...
>
> সুরতন অন্ধকারে কালো সেই জলস্রোতের মধ্যে নামার জন্য পা বাড়িয়েছে, তখন ইয়াজ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'থামো-থামো। ও জল কি পার হওয়া যায়?
>
> সুরতন থমকে দাঁড়িয়ে বললো, 'মাধাই যে একা আছে'।
>
> 'তাহলেও তোমাক যাতে দিতে পারি না।'
>
> ...ইয়াজ সুরতনের চোখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করেছিলো।...সুরতনের কাছে গিয়ে শক্ত মুঠোয় তার দু হাত চেপে ধরে টানতে টানতে সড়কে ফিরিয়ে আনলো।

সুরতুন প্রথমে তার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলো, তার পরে হিংস্র ভর্ৎসনার সুরে বললো, যা চাও, তা তুমি পাবা না। আমাক ছুঁয়ো না কলাম। হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো'।...

শোনো, সুরো, শোনো, দিঘায় ঘোরাপথে যাওয়া যায় না কি দ্যাখো'।

সুরতুন সম্বিৎ পেলো। কেঁদে কেঁদে বললো, 'কেন্, ইজু, এত লোক বাঁচে, মাধাই বাঁচলি কী দোষ'? (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৪২-৪৩)

সুরোর প্রতি ইয়াজের এই আহবান জীবনের আহ্বান। মাধাইকে বাঁচিয়ে তোলার আকুতিতে রচিত হয় সুরোর প্রণয়ভাষ্য। তার মত অকিঞ্চনের এই সরব প্রণয়-ভাষ্যই তাকে সংকট থেকে অস্তিত্ববান করে তোলে। উপন্যাস শেষে মাধাইকে না পেলেও ইয়াজকে অবলম্বন করেই সুরো নতুন এক জীবনে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে। অমিয়ভূষণ উপন্যাসের শেষে এক কালোত্তরিত যুগলের প্রগাঢ় ইতিবাচক অস্তিত্ব রচনা করেন, যারা দেশভাগের মত বৃহৎ ঘটনার ঊর্ধ্বে জীবনকেই বেঁচে থাকার প্রধানতম অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরে:

সেই অকূল পাথারের ওপারে মাধাই, আর এপারে সে। জলকাদায় বসে পড়ে উচ্ছ্রিত জানুতে মুখ লুকিয়ে দীর্ঘক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সুরতুন অবশেষে ইয়াজের ডাক শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিলো।...কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাদের একটা গন্তব্য স্থান ছিলো, এখানে এসে সেটা মিলিয়ে গেছে। এখন সব কিছুই পদ্মা।

আর জীবন কী? সেটাও যেন পদ্মার মত একটা কিছু। সে না থাকলে কিছুই থাকে না, থেকেও শুধু ভয় আর বেদনা।...এই জীবন কখন কার কোন প্রতিরোধ ধসিয়ে দিয়ে আবর্তের মধ্যে টেনে নেবে কেউ বলতে পারে না। কী সার্থকতা এই নাকানি-চোবানি খাওয়ার?

সুরতুনের অবাক লাগলো ভাবতে, এত ঠকেও মানুষের শিক্ষা হয় না।...

ইয়াজ বলেছিলো, 'কেন্, সুরো, আমরা কি বাঁচবো না'?...

কিন্তু এর চাইতেও চূড়ান্ত বিস্ময়ের কিছু আছে। সুরতুনের এই শরীরের ভিতর থেকে এক অচেনা শরীর যেন আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তার বোকামিগুলি যখন ইয়াজের ক্ষেপা কামনার উত্তর হয়ে উঠতে লাগলো, ক্লান্ত আবেগের করুণা নিয়ে তার মন তখনো মাধাইয়ের কথাই ভাবছে। কিন্তু মাধাইয়ের বেদনায় ব্যথাতুর মন নিয়েও তার সেই নতুন শরীরকে খানিকটা স্নেহ না দিয়ে পারেনি সে। এখনো সেজন্য বিষণ্ন নয়।...(অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৪৩-৩৪৫)।

অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

...ইয়াজ তাকে উইন করছে কীভাবে? চলো আমি তোমাকে তোমার প্রেমিকের কাছে নিয়ে যাবো, মাধাই বন্যায় ডুবে যেতে পারে, তুমি একলা যেতে পারবে না–এই বলে তার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে বন্যার জলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় সে-ও তো যুবক, সে-ও তো সুরতুনকে কামনার চোখে দেখে এসেছে–যেহেতু ঠিক জীবনের পরিপোষক নয়, সে মরবিড হয়ে গেছে, সেখানে জীবন ইয়াজের চেহারা নিয়ে সুরতনকে ফিরিয়ে এনেছে। তারা ফিরে আসছে। যে-চরে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে আদিগন্ত সেই চর থেকে জল সরে গেছে, শুধু কাদার পাথর, কিছু দেখা যায় না। শুধু দেখা যাচ্ছে, চরণকাশির আলেফ সেখ–তারও তো কলকাতার দাঙ্গায় ছেলে গেছে, যে-ছেলে জীবনকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিয়েছে: ডাক্তার ছিলো,

> ফুটপাতে রোগী পড়েছিলো, তুলে আনতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। তা, সেই আলেফ সেখ এই বন্যা-ছেলের মৃত্যু-দেশভাগ-রাজনীতি কিছু ভাবছে না: সে লাঠি হাতে দেখছে উপরে যে-বালি পড়েছে তার কত নিচে পলিমাটি, অর্থাৎ পলিটা সরিয়ে সে চাষ করবে–এই দেখছে। এই দেখে সুরতুনকে ইয়াজ বলছে যে আমি আমার কাপড় থেকে আর-একটু ছিঁড়ে দি, তুই গায়ে জড়িয়ে নে।...জীবন সৃষ্টি হচ্ছে সুরতুনের মধ্যে–প্রতিষ্ঠা করছে ইয়াজ। দেখছে, এই লাইফটা আমরা হাতে পেয়েছি,...সে সময়ে লেখকের একটা কথাই মনে হয়, সেটা হচ্ছে, উপরে মেঘ ডাকছে, পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠছে। পদ্মাকে বলছে: হে কাল-পদ্মা যেন কাল, কালের প্রতিমা–তুমি দয়া করো। এই যে কালপ্রবাহ, পদ্মার মত এদিক-ওদিক টার্ন নিচ্ছে, আমরা কষ্ট পাচ্ছি, বুঝতে পারছি না এর মধ্যে ক্যারেকটার তৈরি হয়ে গেছে। তাই কাল, তুমি দয়া করো, অর্থাৎ ধ্বংস কোর না। জীবনে যারা সবচাইতে বঞ্চিত, সেই শ্রেণী জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, তুমি দয়া করো। ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে আমরা জীবনের আয়োজন করছি–এটা কিন্তু চিরস্থায়ী, কালকে সারপাস করে যাচ্ছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৪৫১)

এ উপন্যাসে পদ্মা কালের নামান্তর; পদ্মা বা কালের প্রসাদময়তা কিংবা বিধ্বংসী আচরণের প্রেক্ষাপটে মানুষ তবু জীবনেরই জয়গান গায়। মাধাইয়ের প্রণয়ের পলিতে সুরো-ইয়াজ নতুন জীবনে স্থিত হবার স্বপ্ন-বীজ রোপণ করে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে কালোত্তীর্ণ, অমিয়ভূষণের ভাষায়, 'যারা কালকে সারপাস করে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৪৫১) যায়। অমিয়ভূষণ দেখিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা কিংবা দেশভাগ এইসব পথমানুষের ভেতর কোনো আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয় না। কালের অভিঘাতে জর্জরিত এইসব মানুষেরা কালের অভিঘাত ধারণ করে নির্বিকারচিত্তে পথ হাঁটে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ...দেশজুড়ে স্বাধীনতার নামে এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, এইসব চরিত্রের যেন তার সঙ্গে কোনোভাবেই প্রাণের যোগ নেই।...ফতেমা, সুরো, ফুরকুনি, শ্রীকৃষ্ণ অধিকারীর বোষ্টমী পদ্মা, ফুলটুসি, টেপি, টেপির মা, কেউই এই স্বাধীনতা-কেন্দ্রিক কর্মযজ্ঞের সঙ্গে নিজেদের কোনো যোগ অনুভব করেন না।...দেশে স্বাধীনতাবোধের উত্তাপ এইসব চরিত্রের জীবনে কোনো উষ্ণতা ঢালতে পারছে না, কোনো মুক্তির স্বাদ দিতে পারছে না। অর্থাৎ সামাজিক মূলস্রোতের সঙ্গে কোথাও রয়েছে বিচ্ছিন্নতা। (ভবেশ, ১৯৯৩: ১৬)।

প্রান্তিক পথমানুষের জীবনে কেন্দ্রের বড় কোনো রদবদল প্রভাব বিস্তার করে না। রাষ্ট্রযজ্ঞের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর কাছে তাই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার লড়াইটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

জীবনেচ্ছা বা গভীর জীবনাকাঙ্ক্ষা আঁকড়ে বাঁচে তারা। উপন্যাসে ফতেমাও এমন একজন। সে সন্তানবতী হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষে নিঃস্ব রজব আলির বেটা বউ নিঃসন্তান নিষ্ফলা ফতেমা চালকারবারি জীবনের সহযাত্রী ফুলটুসির মৃত্যুর পর সন্তানাকাঙ্ক্ষায় তার দুই শিশুপুত্রকে আঁকড়ে ধরে বাঁচে। পরবর্তীকালে বুধেডাঙায় 'বাপ নয়, মা নয়, এমন কী ভালবাসার মানুষ ইয়াকুব পর্যন্ত নয়; বুড়ো রজব আলিকে মাঝখানে বসিয়ে ফতেমা একটা ফাঁকা জাল' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৪১) বোনে সংসারের। গভীর জীবনেচ্ছা থেকে নিজের ঔরসজাত সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় শেষপর্যন্ত ধান কাটতে আসা এক বাঙাল কৃষকের বীজ গর্ভে ধারণ করে বুধেডাঙার মাটিতে স্থিত হয় সে। বাঙালের ফিরে যাবার খবরেও তাই হাহাকার বা অনুশোচনা নেই তার। বরং, 'অর্ধেক ভেঙে পড়তে পড়তে কোনো কোনো গাছ যেমন কোনো গোপন শিকড়ের জোরে সামলে নেয় ফতেমা যেন তেমন কিছু করেছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩১৪)। আসন্নপ্রসবা ফতেমার শেকড় যেন তার গর্ভস্থ শিশু। 'বয়স

যখন তার প্রায় অতিক্রান্ত, যখন নিদারুণ অন্নাভাব, ঘোর দুর্দিন, সেই সময় সে নিজের বহুদিনের চেপে-রাখা সন্তান-কামনাকে–'ছাওয়াল চাওয়াকে ফলবতী ক'রে তুললো' (সত্যেন্দ্রনাথ, ২০০৯: ২৪৯)। সুরোর ভাবনায় মেলে ফতেমার অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার কথকতা:

> ...একটা কথা সুরতুন শত চেষ্টাতেও বুঝতে পারবে না–'ছাওয়াল-চাওয়া' কী করে ফতেমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলো। সে সন্তান চাইতো বলেই ফুলটুসির ছেলেদের নিয়ে আতিশয্য করতো কিংবা তাদের সঙ্গে নকল মায়ের অভিনয় করেই 'ছাওয়াল-চাওয়া' জেগে উঠেছিলো তার? (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৪০)

শেকড়-বিচ্ছিন্ন এই পথমানুষগুলো নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে যতটা ভেবেছে, কালের অভিঘাত তাদের ততোটা স্পর্শ করেনি। কেবল মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এদের অস্তিত্বের ভিত নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু ফতেমা-ফুলটুসি-মাধাই-ইয়াজ কিংবা সুরতুনের অস্তিত্বে বিশ্বযুদ্ধ-দাঙ্গা কি দেশভাগ কামড় বসাতে পারেনি। দেশভাগের কোনো অংশে সুরো কিংবা মাধাইয়ের অবস্থান, সেটি সুরোর মাথায় এলেও ইয়াজের উচ্চারণে এক সর্বজনীন চেতনা উচ্চকিত হয়ে ওঠে:

> ...সুরো সান্দারনি এক মোছলমান, আমুও এক হেঁদু। ফতেমাকে আম্মা কতাম, বাপ কেডা জানি নে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৪৪)

কালের অভিঘাত সত্ত্বেও বঞ্চিত, অকিঞ্চিতকর এই মানুষগুলো প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। অস্তিত্ববান হয়ে উঠছে। অর্থাৎ 'ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে আমরা জীবনের আয়োজন করছি–এটা কিন্তু চিরস্থায়ী, কালকে সারপাস করে যাচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৪৫১)–শেকড়সন্ধিৎসু মানুষগুলোর জীবনে এই আকাঙ্ক্ষাকেই অমোঘ সত্য করে তোলেন অমিয়ভূষণ।

এ উপন্যাসের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে কৃষিজীবী রামচন্দ্র-কেষ্টদাস-ছিদাম-মুঙলা-সনকা-পদ্ম-ভানুমতির কথকতা উপস্থাপিত। অমিয়ভূষণ তাঁর চেতনায় বাংলার প্রকৃত কৃষককে যেভাবে ধারণ করেছেন, রামচন্দ্রে তারই প্রতিফলন ঘটে। কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর আর কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদিনীপুর থেকে বীরভূম কিংবা পুরুলিয়া থেকে নদীয়া-উলুবেড়ে-সিকিমের মত হিন্টারল্যান্ডের দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকা 'ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৮) কৃষকেরাই অমিয়ভূষণের মতে বাংলার প্রকৃত মানুষ। এই উপন্যাসে বিলমহল থেকে বুধেডাঙায় উঠে আসা চাষীদের বর্ণনাতেও ভালুকে চেহারার কথা বলেন তিনি। বলেন, 'এরকম কীংবদন্তী রটেছে, এদের গায়ে শ্যাওলা আছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৬৫)। রূপনারায়ণের চোখে শক্তির বলিষ্ঠতায় ওরা 'ভালুকে চাষী' (অমিয়ভূষণ, ২০০২ : ৩৯)। রামচন্দ্রও এমনই এক প্রকৃত কৃষিজীবী মানুষের নাম। অমিয়ভূষণ লেখেন:

> পৃথিবীতে চাষ ও মাটি ছাড়া আর কিছু সে বোঝে বা জানে, তার প্রিয়জনরাও এতখানি গুণপনা তাকে কোনোদিন বর্ষণ করেনি। মাটির রঙ দেখে, হাতের চেটোয় মাটির ডেলা গুঁড়ো করে, জিহবায় স্বাদ নিয়ে জমির প্রকৃত মূল্য সে বলে দিতে পারবে; কিংবা জমির উত্তাপ হাতের তেলোয় অনুভব করে সে অক্লেশে ঘোষণা করতে পারে বিনা বর্ষণে ধানের জমি তৈরি করার দুঃসাহস করা যায় কিনা।...বাল্যকাল থেকে এই

> মাটির সঙ্গে কতরকম সম্বন্ধই স্থাপন করেছে সে। সুখের দিনে মনে মনে পূজা করেছে, দুঃখের দিনে অব্যক্ত আবেগ নিয়ে বসে থেকেছে মাটির পাশে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৬৪)

কেষ্টদাস যেমন জাত বৈষ্ণব থেকে কৃষকে রূপান্তরিত হয়েছে কালে, রামকৃষ্ণ তেমন নয়। যেন বা কৃষক হয়েই জন্মেছে সে। জমি যেমন তার কাছে আদরের, তেমনি জমিই আবার তার বেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল এককালে । দুর্ভিক্ষে জমির লোভে খাবার ধানটুকু বিক্রি করায় অনাহারে-অভিমানে কু-আহার থেকে মুখ ফিরিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল রামচন্দ্রের কন্যা। জামাই মুঙলা তার পুত্রবৎ, যাকে অবলম্বন করে রামচন্দ্র বেঁচে গেলেও জীবন তার কেটে যায় এক গাঢ় বেদনাবোধে।

বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠব রামচন্দ্রের নিবিড় মৃত্তিকাসংলগ্ন অস্তিত্বকে প্রতীকায়িত করে, যে বলিষ্ঠতা শক্তি দেয় ছিদাম আর মুঙলার মত তরুণ কৃষকদের। এই শক্তির বলে তারা মহাজন চৈতন্য সাহার বিরুদ্ধে গান বাঁধে, যা শুনে রামচন্দ্রের 'বুকের ভিতর চাপা আগুন হাঁ-হাঁ করে জ্বলে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৬৯) ওঠে। কেবল মনে হয়, 'তার মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গেও কি গৌণভাবে চৈতন্য সাহাদের অদ্ভুত ব্যবসার যোগ নেই?' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৬৯)। চৈতন্য সাহার আগ্রাসী মহাজনী কৌশল জমির মালিকদের ক্রমশ মজুরে পরিণত করলেও, কৃষিজীবী মানুষগুলো ক্রমশ প্রতিবাদী হচ্ছিল নানা অন্তর্ঘাতে। ছিদাম আর মুঙলার বাঁধা কীর্তনে উঠে আসে বৈনাশিক কালের কথা, উঠে আসে চৈতন্য সাহার সর্বগ্রাসী অস্তিত্বের কথা। মন্বন্তরে উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামগুলোর শূন্য মুখাবয়ব কিংবা জীবিকার তাগিদে দলে দলে বুধেডাঙা-চিকন্দি-চরণকাশির মায়া কাটিয়ে ওপারের ধানের কলে কাজ নিয়ে চিরকালের জন্য ভিটে ত্যাগের এই মোচ্ছবের সূত্রপাত রামচন্দ্রকে বেদনাহত করে। তার অস্তিত্বের ভিত নড়ে গেলেও নিষ্প্রাণ মানুষগুলোর প্রতি ছিল তার গাঢ় আশ্বাসবাক্য, 'তোমরা যদি থাকো, আমি তোমাদের ছাড়ে যাবো না' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৮১)। কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের টলায়মান অস্তিত্ব রামচন্দ্রের আশ্বাসে স্থিতি পায় না। বরং, রামচন্দ্রকেও গ্রাম ছেড়ে ওপারে যাবার অসহায় কৃষকের মিছিলে শামিল দেখতে চায় ছমির মুন্সি বা এরফান সেখের মত সুবিধাবাদী অবস্থাপন্ন কৃষকশ্রেণি। রামচন্দ্রের অস্তিত্বের শেকড় যে ভূমির গভীরে চারিয়ে গেছে, তার প্রতি এদের নগ্ন লোভ রামচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করে। দুর্দম্য ক্ষোভে তেতে ওঠে সে, 'কেন্ রে, একি ভাগাড়, শকুন উড়ে'?'...জমি, জমি। বুকের হাড় ভেঙে নিতে চায় ওরা' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৯৩, ৯৪)। অমিয়ভূষণ রামচন্দ্রের অস্তিত্বগত টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে সমকালের কৃষকের সার্বিক সমস্যার ছবি আঁকেন। নড়বড়ে লাঙল, বলদ আর বুড়ি গাই এবং এক রুদ্ধ আক্রোশ আর অভিমান নিয়ে একাই একটুকরো নাবলা ভূঁই চষে প্রতিবাদ করে রামচন্দ্র। এভাবে মহাজনের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের মত শক্তিপ্লাবিত বলিষ্ঠ কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকূলতা শোষকের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে।

চৈতন্য সা ছিদামের বোরো ধান অন্যায়ভাবে কব্জা করতে গেলে রামচন্দ্রের গর্জে ওঠা কণ্ঠের প্রতিবাদে পিছিয়ে যায় তারা। অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রতিবাদরত রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসে বাঙালির কৌমগত এক আর্কেটাইপকে মূর্ত করে তোলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মনসা বাঙালির কৌমগত অবচেতনের এক শক্তিমতী অংশ, *গড় শ্রীখণ্ডে*-র মত হতাশ পরিস্থিতিতে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠার যজ্ঞে যাকে প্রয়োজন। সনকা রামচন্দ্রের স্ত্রী,

সেদিক থেকে রামচন্দ্রকে চাঁদ সদাগরের আদলে কল্পনা করে নেয়াটা খুব অযৌক্তিক নয়। অমিয়ভূষণের ভাষায়:

> ...ক্রমশ রামচন্দ্র সুরতন মাধাইদের হয়ে কেঁদে কেঁদে যখন মনের গভীর অন্ধকারে ডুবে খুঁজছি, তখন কৌমগত অভ্যাসেই, পদ্মা তো চোখের বাইরেও ভয় দেখিয়ে ভালোবেসে যেন শিরায় শিরায় প্রবাহিতই, তখন হয়তো আমার নির্জ্ঞান মন অবচেতনের সেই দারুণ শক্তিকে খুঁজে পেয়েছিলো। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৪৫২)

এ প্রসঙ্গে সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদারের মত প্রণিধানযোগ্য:

> খরা-মন্বন্তর-বন্যা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে অপরাজেয় চিরন্তন কৃষকের চরিত্র এঁকেছেন অমিয়ভূষণ রামচন্দ্রের মধ্যে।...চাঁদবেনে, মধ্যযুগের বাংলাকাব্যের সেই বলবত্তম পুরুষটিই, রামচন্দ্রের আর্কেটাইপ। তার স্ত্রীর নাম সনকা।...চৈতন্য সাহা ওরফে চিতিসা, সেই বিষাক্ত সাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যখন রামচন্দ্র তখন সে হয়ে যায় হেন্তালের লাঠি হাতে চাঁদসদাগর। মনসার অন্য নাম পদ্ম। মনাসামঙ্গলের মনসা তো চাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই পূজা পেতে উন্মুখ। পদ্মও শ্রদ্ধা করে রামচন্দ্রকে। শ্রদ্ধারও বেশি,...ছিদামের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র শোনে তার আবেগতপ্ত সাশ্রু স্বীকারোক্তি,...। নিরুপায় হয়ে মনসার পূজা করেছিল চাঁদবেনে। মুঙলা-ভানুমতীর সংসার ভেঙে দিতে পারে পদ্ম এই আশঙ্কায় নিরুপায় রামচন্দ্র পদ্মকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়।...হয়ত এমনভাবে কৌম-অবচেতনের অতল থেকে উঠে এসেছে বলেই রামচন্দ্রের চরিত্র উপন্যাসে এমন গরীয়ান। (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮: ২৮০)

ছিদামের আত্মহত্যা রামচন্দ্রকে বেদনার্ত করায় দেশ ছাড়ে রামচন্দ্র। সনকা, কেষ্টদাসের সঙ্গে তীর্থের দিনগুলোতে বৈরি পৃথিবীর হাওয়া গায়ে না লাগলেও দেশভাগের খবর ঠিকই তার কাছে পৌঁছে যায়। ভানুমতীর চিঠিতে উল্লেখিত দেশভাগের সমাচার বা নবদ্বীপের শ্রীমায়াপুরধামে পৌঁছে যাওয়া উদ্বাস্তু মানুষের অসহায় মুখোচ্ছবি রামচন্দ্রের মনে শঙ্কা জাগায়। তার মত আমজনতার কাছে পৃথিবীর অবারিত ভূমি ভাগের বিষয়টি বিস্ময়ের। মনে হয়, 'পৃথিমি কি সানিকদিয়ার জোলা, বাঁধ দিয়ে জমি ভাগ করবা'? (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩২৭)–যদিও এর অর্থ রামচন্দ্রদের মত কৃষকের কাছে গুরুত্বহীন, তবু হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব রচনার পেছনের ইন্ধনশক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়:

> কেষ্টদাস বললো, 'শুনছেন মণ্ডল, দেশ বলে ভাগ হতিছে'?
>
> 'সে আবার কী'?
>
> 'হয়। এক ভাগ হিঁদুর, আর এক ভাগ মোসলমানের'।
>
> 'ভাগ কে করে ? ইংরেজ? তার নিজের জন্যি কী রাখবি'?...
>
> 'কী আবার রাখবি! মনে কয়, খাসের জমি পত্তনি দিতেছে। মনে কয়, বিলেতে বসে খাজনা পাবি'। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩২৬)

বৈরি সময়ের টুকরো ছবি এভাবেই রূপায়িত হয় উপন্যাসে। দেশভাগের অন্তরালে ব্রিটিশ শাসকের নেতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে আমজনতা এভাবেই সংশয় প্রকাশ করে, ইতিহাসে যার সত্যতা মেলে। সমালোচক আহমদ রফিক লিখেছেন:

> ...ইংরেজ শাসক তার প্রয়োজনে সম্প্রদায়বাদী রাজনীতিকে লালন করেছে, শক্তিমান ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় থেকে 'ভাগ করা ও জয় করা'র সফল নীতি পরবর্তীকালে 'ভাগ করা ও শাসন করা'র নীতিতে পরিণত হয়। যা অবশেষে দেশবিভাগের নীতিতে শেষ ফসল তুলে নিতে চেষ্টা করে। এর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ইংরেজ-বিরোধী রাজনীতি ও শ্রেণীসংগ্রাম দমন করা। স্থায়ী উদ্দেশ্য পেছনে ফেলে যাওয়া উপনিবেশটিকে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহার করা। (আহমদ, ২০১৫: ৪১৬)

মূলত, ব্রিটিশ পরাশক্তি ভারতীয় পুঁজিবাদী শক্তিকে করায়ত্ত করে সন্তর্পণে এগিয়েছে। সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ১৯৪৬ সালে শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক সংগ্রাম ও ভারতীয় নৌবাহিনী সহ সামরিক বাহনীর মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ যে পর্যায়ে উপনীত হচ্ছিলো, তাকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পুঁজি এবং ভারতীয় পুঁজির স্বার্থে তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস মিলিতভাবে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা তীব্র ও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নোতুনভাবে শুরু হয় এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই সেই অবস্থায় ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে যথাশীঘ্র হস্তান্তর করে পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন রাখার ব্যাপারে সকলেই একমত হন এবং এই মতৈক্যের কারণেই মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে তাঁর পরিকল্পনা দ্রুত কার্যকর করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। (বদরুদ্দীন, ২০০০: ১২২)

ব্যক্তিগত বেদনায় যে বলিষ্ঠ মানুষটি গ্রাম ত্যাগ করেছিল, সেই রামচন্দ্র আবার ব্যক্তিক কারণেই গ্রামে ফিরে গেল। ফেরার পথে উদ্বাস্তু পথমানুষের ভিড়, এর বিপরীতে গ্রামের শ্মশানসম শূন্যতা, জমিগুলোর পতিত দশা তার সামনে দেশভাগের নেতিবাচক রূপের নগ্ন উন্মোচন ঘটায়। রামচন্দ্রের মত সাধারণ মানুষের জীবনে এর প্রভাব ও প্রকৃতি রূঢ় এক বাস্তবতাকে উচ্চকিত করে:

> বুঝি না। কোনকার কোন দুই রাজা যুদ্ধ বাধালো একবার, ধান না পায়ে উজাড় হলাম। কনে কোন শহরে দুইজনে বাধালো কাজিয়া, খেত-খামারের কাজ বন্ধ করলাম। আবার দ্যাখো কন থিকে কোন দুই জন আসে দেশ ভাগ করতিছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৩১)

সানিকদিয়া মুসলিম নবাব আর চিকন্দি হিন্দু রাজার অধীনস্ত হওয়ায় দুই অঞ্চল যেন একই ফলের দুটো টুকরোর মত আলাদা হয়ে গেছে। শুধু জমিই নয়, মানুষগুলোর মধ্যকার বিভেদ রামচন্দ্রকে অসহায় করে তোলে। সান্যালমশাই, চৈতন্য সাহা কিংবা মিহির সান্যালের মত উচ্চবিত্ত মানুষগুলোর গ্রামত্যাগ তাকে আরো ভীতিগ্রস্ত করে। সবশেষে ভানুমতি আর মুঙলার গ্রাম ছাড়ার সম্ভাবনা তাকে গভীরভাবে অস্তিত্বসংকটে পতিত করে। এর চাইতেও বেশি বেদনাহত হয় সে, যখন জানতে পারে চিকন্দির সীমানায় তার পাঁচ বিঘা জমি ছাড়া বাকি জমিগুলো নবাবের করায়ত্ত হয়ে গেছে। তার কেবল মনে হয় মাটির গহীনে চারিয়ে যাওয়া শেকড়ে টান পড়েছে মানুষগুলোর:

> এ যেন কোনো অত্যন্ত খুঁতখুঁতে কৃষকের রোয়ার বেছন বাছাই করা। মাটি থেকে শিকড়সুদ্ধু চারাগাছগুলিকে টেনে টেনে তুলছে। কিন্তু সে কৃষক যেন সাধারণ কৃষকের চাইতে কম জানে কিংবা অত্যন্ত বেশি জানে। চারাগুলিকে বারে বারে তুলছে আর লাগাচ্ছে, আর লাগানোর আগে চারাগুলির কোমলতম শিকড়ে যে মাটিটুকু লেগে থাকে আছড়ে আছড়ে সেটুকুও ঝেড়ে ফেলেছে। অহহ। একবার না, তিনবার। সেই দুর্ভিক্ষ, তারপর দাঙ্গা, তারপর এই দেশভাগ। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৩৬)

কিন্তু যতোই হোক, এই মাটির এক বলবত্তর সন্তান রামচন্দ্র। কাজেই জঙ ধরা লাঙলের ফলায় রূপোর জেল্লা না ফেরাতে পারলেও তাকে চাষোপযোগী করে তোলে সে। তার মনে হয়, 'একা যেন তাকে কোনো গড় রক্ষা করতে রেখে গেছে কেউ' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৩৭)। সনকাকে সে তার কর্তব্যের কথা বুঝিয়ে বলে, 'বুঝলা না, বউ, ধরো যে তোমার মহাভারতে ক্ষত্রিয়ের ধম্ম লেখা আছে, ব্রাহ্মণের ধম্ম লেখা আছে, কিন্তুক আমার ধম্ম কই লিখছে ? তাইলে আমি চাষই করবো' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৩৯)। সাধারণ এক বলিষ্ঠ মানুষের প্রতিষ্ঠাই অমিয়ভূষণের কাম্য। কাজেই চিকন্দির সান্যাল যখন গড় ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিল, তখন সেই গড় রক্ষার দায়িত্ব এসে পড়ে রামচন্দ্রের মত সাধারণ মানুষের হাতে। সান্যালেরা এই মাটির একান্ত সন্তান নয়; কিন্তু রামচন্দ্রের রক্ত মাংস এই মাটির সারে পুষ্ট। কাজেই রামচন্দ্রের অস্তিত্ব মাটির গভীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়, যতো সহজ সান্যালের অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন করা।

আলেফ, এরফান, আল মাহমুদ কিংবা সাদেকের মত অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মুসলিম কৃষকদের নিয়ে যে কাহিনিবৃত্ত রচিত হয়েছে, তাদের অস্তিত্বসংকটও উপন্যাসে বিরাজমান। আলেফ বা এরফানের মধ্য দিয়েই শহুরে কালবৃত্তের বৈরি আঁচ উপন্যাসে চরণকাশির গায়ে এসে লাগে। দুর্ভিক্ষে সর্বস্ব হারিয়ে ওপারে পাড়ি জমানো শেকড়হীন কৃষকের জমি সুলভে কিনে আলেফের মত গৃহস্থ নিজের অস্তিত্ব আরও গাঢ়ভাবে মাটির গভীরে চারিয়ে দিতে চায়। একজনের অস্তিত্ব উপড়ে ফেলে আরেকজনের অস্তিত্ব বলিষ্ঠ করবার কথকতা অমিয়ভূষণ রচনা করেন। তাই, যখন হালদারপাড়া কিংবা জেলেপাড়ার মানুষেরা শেকড়হীন হয়ে গাঁ ছাড়ে, তখন তাদের অস্তিত্বের উপস্থিতি মুছে ফেলে আলেফ সেখেদের মত মানুষেরা নিজেদের ভিত শক্ত করে। কৃষকের তকমা খুলে ফেলে এরা হয়ে উঠতে চায় জোতদার। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে রায়দের পতিত জমি ক্রয়ে আলেফের স্বপ্ন জাগে। কিন্তু জমির সঙ্গে জড়িয়ে যায় ধর্মের বিদ্বেষ। মুসলিম পাবেনা হিন্দুর জমি–এই ইঙ্গিতে লেখক আভাসিত করেন কলকাতায় আসন্ন দাঙ্গার কথকতা। পতিত জমিতে রামচন্দ্রের চোখে এরা যেন শকুন। 'ওরা খাতে না পায়ে জমি বেচতিছে, সে জমি কেনা কি অধর্ম না'? (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৩৮)–এরফানের বক্তব্যের এই বিবেকবোধ আলেফ সেখের নেই। লোভের লাঙ্গলে আলেফ চরণকাশির সব জমি চষার স্বপ্ন দেখে।

এরফানের শ্যালক মুসলিম লীগ কর্মী আল মাহ্মুদ কলকাতার দাঙ্গা সঙ্গে টেনে আনে। তার উচ্চাভিলাষ একপর্যায়ে আলেফকে স্পর্শ করে। ফুড কমিটির সেক্রেটারি হবার আকাঙ্ক্ষা আলেফের হৃদয়ে গেড়ে দিয়ে মাহমুদ নিরবে চরণকাশি-বুধেডাঙা কি চিকন্দির মুসলমানের ভেতর দ্বন্দ্বের বীজ রোপণ করে মুসলিম লীগের স্বার্থ কায়েম করতে চায়। কিন্তু নিজের মাটির প্রতি মমতাবান হাজি সাহেবের মত অসাম্প্রদায়িক মানুষেরা এইসব মানুষের স্বার্থ হাসিলের আগেই সেগুলো মাটি চাপা দিতে সচেষ্ট। ইতোমধ্যে কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দু

কর্তৃক মুসলিম নিধন এবং সেই হত্যাযজ্ঞে আলেফের পুত্র সাদেকের নিহত হবার খবর নিয়ে চরণকাশি ফেরে আল মাহ্‌মুদ। উদ্দেশ্য, আলেফের পুত্রের মৃত্যুর খবর দেয়া নয়, বরং হিন্দু মুসলিমের ভেতর জাতিগত বিদ্বেষের বীজ রোপণ করে দেয়া। তার পরিকল্পনা আংশিক সিদ্ধ হলো, এজন্য যে শহর থেকে সাদেকের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে ফিরে এলে আলেফসহ অনেক মুসলিমই হিন্দুদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। যদিও সান্যালমশাই-হাজিসাহেব-এরফান-এরশাদ-রামচন্দ্রের মত মৃত্তিকালগ্ন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী মানুষ শেষ পর্যন্ত দাঙ্গার কলুষতা মুছে ফেলতে সক্ষম হয়। বৈরি কালপ্রতিবেশের অভিঘাতে জর্জরিত চিকন্দি-চরণকাশি-বুধেডাঙ্গার মানুষগুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়:

> বিলমহলের সর্দার এরশাদ একদিন গিয়ে আল মাহ্‌মুদকে বলে এসেছে,
>
> 'মেঞাভাই, শহরের ভদ্রলোক শহরে যাও। এখানে বেশি কথা কয়ো না। ভদ্রলোকের সঙ্গে মারপিঠ করো গা'।
>
> 'তোমরা কী'?
>
> 'যা-ই হই। জমিদারের হুকুম হলে হিঁদু কাটবের পারি, মোসলমানও কাটবের পারি।...(অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৭০)

দাঙ্গায় সন্তান হারানোর পরেও আলেফ সেই ক্ষত কাটিয়ে উঠে নতুন করে বাঁচার কথা ভাবে। লেখক এক ইতিবাচকতার মধ্য দিয়ে আলেফ-ইতিবৃত্তের সমাপ্তি ঘটান। শেকড় বা অস্তিত্বের মূল অবলম্বন সন্তান হলেও, লেখক এখানে ভূমিকেই সন্তানসম করে তুলেছেন। বৈরি সময়ও সেখানে হেরে যায়। পদ্মার বানে বিধ্বস্ত সুরতুনের চোখে পড়ে আলেফ সেখের অস্তিত্বে জীবনসংগ্রামের এক নতুন পদচারণার বহিঃপ্রকাশ:

> সুরতুন দেখতে পেলো কে একজন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। খুব ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে জোলার ধার দিয়ে সে আসছে। একবুক শাদা দাড়ি, একটা অত্যন্ত লম্বা জামায় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। লোকটি এক-একবার থেমে হাতের লাঠিটা বালির মধ্যে পুঁতে দিয়ে তারপর সেটাকে তুলে লাঠির ডগাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কী একটা পরীক্ষা করলো। এ প্রক্রিয়াটি সে অনেকবারই করছে।
>
> ইয়াজ বললো, 'চরণকাশির বড়ো ভাই আলেফ সেখ না? হয়, তাই। ওই যে, সুরো, যার ছাওয়াল কাজিয়ায় মারা গেলো'।
>
> 'আহা-হা, পাগল হইছে'?
>
> 'না, মনে কয়। চাষ দেওয়ার কথা ভাবে। বালির কত নিচে মাটি তাও বোধায় দ্যাখে'।...। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৪৫)

অমিয়ভূষণ মনে করেন, ইয়াজ ও সুরতুন বন্যার পর:

> যে-চরে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে আদিগন্ত সেই চর থেকে জল সরে গেছে, শুধু কাদার পাথর, কিছু দেখা যায়না। শুধু দেখা যাচ্ছে, চরণকাশির আলেফ সেখ–তারও তো কলকাতার দাঙ্গায় ছেলে গেছে, যে-ছেলে জীবনকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিয়েছে: ডাক্তার ছিলো, ফুটপাতে রোগী পড়েছিলো, তুলে আনতে গিয়ে

> প্রাণ দিয়েছে। তা, সেই আলেফ সেখ এই বন্যা-ছেলের মৃত্যু-দেশভাগ-রাজনীতি কিছু ভাবছে না: সে লাঠি হাতে দেখছে উপরে যে-বালি পড়েছে তার কত নিচে পলিমাটি, অর্থাৎ পলিটা সরিয়ে সে চাষ করবে–এই দেখছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৪৫১)

অর্থাৎ বৈরি কালের অভিঘাতকে অতিক্রম করে সে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে চাইছে। নিজের অস্তিত্বের বীজ পুনরায় রোপণ করার জন্যই সে নতুন করে মাটির খোঁজ করে।

উপন্যাসে যে ভূস্বামীদের কথকতা রূপায়িত, তারা চিকন্দির সান্যাল। অমিয়ভূষণের চেতনায় পূর্বপুরুষের সামন্ত ঘরানার বীজ প্রোথিত ছিল, অনেকক্ষেত্রেই যার ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর উপন্যাসগুলোতে। শৈশবে ঠাকুরদাদামশায়ের অধিকৃত 'সিপিয়া রঙের দুর্গে'র অনাধুনিক, বিদ্যাবিমুখ কালচার থেকে কোচবিহারের আধুনিক বিদ্যামুখী সংস্কৃতিতে সংযুক্ত হলেও অমিয়ভূষণের চেতনায় আজীবন এই কুঠির সামন্ত আভিজাত্যবোধ রয়ে গেছে। 'নিজের কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, '...নীল ভুঁইয়া, রাজনগর, গড় শ্রীখণ্ড ওই বাড়িটার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৪)। শুধু বাড়িই নয়, সান্যাল মশাইয়ের চরিত্রে যেমন ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর পিতার, তেমনি অনুসূয়া চরিত্রে খোঁজ মেলে তার মায়ের আদলের। উপন্যাসে রূপায়িত দাঙ্গার সঙ্গে তাঁর নিজের দাঙ্গা-অবরুদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়:

> ...১৯২৬-এই বোধহয় ঠনঠনে কালীবাড়ি আক্রান্ত হয়েছিলো। ঢাকাতে দাঙ্গা হচ্ছিলো। আমাদের গ্রামে সেই দাঙ্গা এসে পড়তে পারে এরকম সম্ভবনা দেখা দিচ্ছিলো। বড়দের ক্রোধ ও আশঙ্কার আলাপ শুনছিলাম। রামদা, তরোয়াল, সড়কিতে ধার পড়ছিলো। বাবা বন্দুক কিনে আনলেন, কয়েক বাকসো পিতলমোড়া বুলেট। অনেকদিন রাতে বাবা বন্দুক হাতে গ্রাম ঘুরতে বেরোতেন। শুনতাম ওরা হিন্দুদের কেটে ফেলে, হিন্দু মেয়েদের চুরি করে। মার মুখ শুকনো, বাবার মুখ গম্ভীর। কখনো নিজেদের টডের রাজপুত মনে হতো। ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত এরকম একটা বিদ্বেষ ও ক্রোধ ছিলো মনে। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১০)

এ উপন্যাসে কালের অমোঘ গতিপ্রবাহে সামন্তশ্রেণির প্রতিভূ চিকন্দির সান্যালদের ক্ষয়িষ্ণু অস্তিত্বের কথকতা রচিত হয়েছে। প্রাক-ধনতান্ত্রিক আবহে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ এই মানুষগুলো পরার্থজীবী। গ্রামের কৃষকশ্রেণির ওপর নির্ভর করে তাদের অস্তিত্ব টিকে ছিল। অমিয়ভূষণ মনে করেন, সান্যালরা দেশভাগ হোক না হোক ক্যাপিটালিজম ধরতে না পেরে প্রায় মৃত। তাঁরা জানেন গ্রামে তাঁদের স্থান হতে পারে না। সমাজ ও সময়ের রূপান্তর টের পাচ্ছিলেন সান্যালেরা। রামচন্দ্রের মত প্রজাকে তাই কোনো আশ্বাস প্রদানের পরিবর্তে তাকে বলতে হয়েছে, 'কলকাতা থেকে দূরে থাকার ফলে কিছুদিন আগেও মধ্যযুগীয় সেসব প্রথার কিছু কিছু এ অঞ্চলে বেঁচে ছিলো, ক্রমশ সে সবও গত হচ্ছে। এখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে নালিশ হয় না, হয় আদালতে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩৭)। সান্যালের এই বক্তব্যে রূপান্তরিত সময় ও সমাজকে মেনে নেবার এক বেদনার্ত মনোভঙ্গি প্রকাশমান। এককালে সান্যালকর্তৃক নীলকর ফ্রেজারের পরাভব একালের চৈতন্য সাহার ওপর বর্তে না। সেখানেও ব্যর্থতার বেদনা প্রোথিত। সান্যালদের আরেক উত্তরসূরি মিহির সান্যাল ক্রমশ নব্যপুঁজির ধারক হয়ে উঠছিল; সান্যালবংশের ক্রম-অপসৃয়মানতার পাশে মিহির সান্যাল যেন এক নতুন কালের প্রতিভূ।

সান্যালের সামন্তগৃহে প্রথমে অনুসূয়া, পরে সুকৃতি যেমন রাজনৈতিক চাঞ্চল্যহীন গড় শ্রীখণ্ডে-র প্রাগৈতিহাসিক মিনারে বহির্জগতের আলো বয়ে আনে, সুমিতিও তেমনি এক পরিবর্তনের আভাস নিয়ে এল। অনুসূয়া নিজে বিলেতি কায়দায় নৃপনারায়ণ আর রূপনারায়ণকে গড়েছে বলেই তাদের ভেতর এক সামন্তবিরোধী চেতনাবীজ প্রোথিত ছিল। কাজেই ক্রমশ গান্ধীবাদী নৃপনারায়ণের সাথে পিতা সান্যাল মশাইয়ের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সান্যাল মশাইয়ের টলায়মান সামন্ত-অস্তিত্ব বিলীন হবার পথ রচিত হয়। রাষ্ট্রদ্রোহ নিবারণ আইনে অন্তরীণ নৃপনারায়ণ ব্রিটিশ বিরোধী, পিতা সান্যাল ব্রিটিশের অধীনস্ত সামন্ত। সুমিতির মনে হয়েছিল, 'নৃপনারায়ণ হয়তো-বা সান্যালমশাই থেকে খুব পৃথক নয়, কিন্তু তার ক্ষেত্রে আভিজাত্যের মর্মও যেন কোথায় চিড় খেয়েছে, আর সেই ফাটলে প্রাণশক্তি উচ্ছ্রিত হচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৭০)। অমিয়ভূষণ বিশ্বাস করতেন, 'পুরুষের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট একটাই যুক্তি আছে অস্তিত্বের সন্তানদের রক্ষা করা' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১০)। কারণ সন্তান বিস্তার ঘটায়। নৃপনারায়ণের মধ্য দিয়ে সান্যাল নিজের রক্তের, সামন্ত-ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু নৃপনারায়ণের ভেতর সামন্ত-ভোগবিলাসী জীবন-বিরোধিতার বীজ রোপণ করে দিয়েছিল মা অনুসূয়া আর শিক্ষক সদানন্দ। কাজেই সান্যালের সামন্ত-অস্তিত্ব বিস্তারে নৃপনারায়ণের ভূমিকা ছিল নগণ্য। পরবর্তীকালে নৃপনারায়ণের পুত্রকে ঘিরে সান্যালের আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়ে ওঠে। সদানন্দর শিক্ষায় নৃপনারায়ণ সামন্তবিরোধী হয়ে উঠলেও এতে একধরনের স্ববিরোধিতা কাজ করেছে। সদানন্দ নিজেই ছিলেন সামন্ত-আশ্রিত জীবনের ধারক। সুমিতির মনে হয়েছে, 'সদানন্দর মস্তিষ্ক যখন সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে থাকে, তখন তার মস্তিষ্কের অন্য অংশ যেন এই পলাতক জীবন, যা সামন্ততন্ত্র-আশ্রিত, তাকে বেছে নেয়। এ কি অন্তর্ঘাত? অথবা এ কি ঘুণপোকার স্বভাব?' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৮০)। নৃপনারায়ণের ভেতরেও এই একই দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পর গান্ধীবাদী আদর্শে সংশয় থেকে যখন তার গায়ে খদ্দরের বদলে গরদের জামা আর ফরাসডাঙার ধুতি উঠল, তখন তার রক্তে প্রবহমান সামন্ত-বীজের প্রভাব প্রকাশিত হলো। গান্ধীবাদ তার কাছে কেবল, 'ভীরু ও দুর্বলের' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৯৮) আশ্রয়। সুমিতির কাছে তার জিজ্ঞাসা:

> 'সে অহিংসা না বুদ্ধিদীপ্ত না শক্তিমানের। নতুবা এতবড় দাঙ্গায় সত্য ও অহিংসাকে আশ্রয় করে আর কাউকে দাঁড়াতে দেখা গেলো না, সুমিতি'?
>
> ...নৃপ বললো, 'অস্বীকার করে লাভ নেই। হিংসার্জিত স্বাধীনতার চাইতে অহিংসালব্ধ স্বাধীনতা বেশী ভালো এরকম মানতে দ্বিধা আসছে যেন। খদ্দরকে স্বাবলম্বন আর মিতাচার মনে করতে সন্দেহ আসছে।...অহিংসা , খদ্দর ও সত্য ছাড়াও তো দেশের অনেকটা জায়গায় স্বাধীনতা আসছে, দেশের বাকি অংশে যদি অহিংসায় স্বাধীনতা আসেই'। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ২৯৮)

নৃপনারায়ণের যে আদর্শ সামন্ত-জীবনের অন্তর্জগতে ফাটল ধরায়, সেটি সংশয়ের ভেতর দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এক আকস্মিক অনিশ্চিত যাত্রাপথে পা দিয়ে এমনকি গান্ধীবাদী সুমিতির থেকেও আলাদা হয়ে যাচ্ছে সে।

উপন্যাসশেষে নৃপনারায়ণের পুত্র নিয়ে সুমিতির কলকাতা প্রত্যাগমনের বিষয়টিও সান্যাল পরিবারের আত্মবিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করে। উপলব্ধি করা যায়, সুমিতির সন্তান কলকাতার পুঁজিবাদী সমাজেরই ধারক হয়ে বেড়ে উঠবে। কাজেই অস্তিত্ববিনাশক এক বেদনায় নিমজ্জিত হয় সান্যাল। তার মনে হয়, রামচন্দ্রের মত পদ্মার মৃত্তিকালগ্ন মানুষগুলোই শেষপর্যন্ত এখানে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে:

> শিশু যেমন মায়ের উপরে তিনি তেমনভাবে আর আকৃষ্ট নন, সেজন্যই কি তিনি এখানে নিজের জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। সম্বন্ধটা কৃত্রিম মনে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রর কথা মনে হলো। সে যেন মাটি থেকে জন্মেছে।...সে এই মাটির বলবত্তম সন্তান, মাটির মতোই ধ্রুব।... (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩২১)

পদ্মা আর কাল উপন্যাসে সমার্থক। দুর্ভিক্ষ বা দেশভাগের দায়ভার প্রত্যক্ষভাবে সান্যাল পরিবারকে নিতে হয়নি। সেটি সংবাদ হিসেবে রেডিও কাগজেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও কাল-রূপান্তরের অভিঘাতে নিজের সামন্ত অস্তিত্বের ক্রম ক্ষয় তিনি টের পাচ্ছিলেন। অনুভব করছিলেন সুমিতির চলে যাওয়া 'তাঁর জীবনের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের অকালে মঞ্চাবতরণ এবং অন্তর্ধান' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩২০)। নিঃসঙ্গ ও পরাজিতর বোধ ক্রমশ তার চেতনায় ফেনিয়ে ওঠে:

> ...সব যেন অশান্তিতে কাঁপছে। কোথাও কি আনন্দ উচ্ছ্বসিত হবে? সে আনন্দে কি কান্না জড়ানো থাকবে, কিংবা দুঃখ ঢাকার বেপরোয়া হাসি? এ কি এক নতুন দর্পিত বৈশাখ আসছে তার ঝড়ে পুরনো সব কিছুকে ধ্বংস করে? কারো কারো মনে হতে পারে–পদ্মা নতুন খাত নিতে পারে, সংবাদটা এরকমই যেন। যে প্লাবন পলি আনে তা নয়, বরং যেন কীর্তিনাশা রূপ নেবে। ভয় হতে পারে, ভয়কে অবিশ্বাস করতে সাধ যায়। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৩১৮)

উপন্যাসের শেষে সান্যাল আর তার পরিবারের দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে অমিয়ভূষণ সামন্ত-রাজ্যপাটের অবসান টেনে এক নতুন কালের আগমনকে আভাসিত করেন। পদ্মার বানে চিকন্দির সান্যালবাড়ি উল্টানো পিরিচের মতই মুখ থুবড়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের ধারক সান্যাল ও তার পরিবারের অগভীর শেকড় পদ্মাসদৃশ কালের অভিঘাতে সমূলে উৎপাটিত হয়। আসলে চিকন্দিতে সান্যালেরা 'raison d`etre' বা অস্তিত্বরক্ষার কারণ খুঁজে পায়নি। অমিয়ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

> ওরা তো নিজেরা বলছে, ...আমরা এখানে আনফিট। আমাদের এখানে কোন বৃদ্ধি নেই। এই গ্রামের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ বহুদিন কেটে গেছে। রামচন্দ্রদের থাকতে পারে, কারণ ওরা এখানকার মানুষ। আমাদের এখানে কিছু হবে না, এখানে থাকা যাবে না। মার্কসিস্ট বিপ্লবী যে ছেলে পড়াতে আসে, ছবি আঁকে, সেও জানে এটা আমাদের জায়গা নয়। ওর এক ছেলে গেছে বিলেতে ক্যাপিটালিস্ট হতে। আর এক ছেলে ট্রেড ইউনিয়ন করবে। তার জায়গা তো কলকাতা। এটাই নরম্যাল, ন্যারাচাল। জমিদাররা তখন বুঝতে পেরেছে, আমরা বুঝতে পেরেছি, সেইজন্য যখন জমিদারিসত্ত্ব লোপ পেল, আমরা কেউ যুদ্ধ করিনি। আমরা যদি বন্দুক ধরতাম, কংগ্রেস বলো, কম্যুনিস্ট গভর্ণমেন্ট বলো, কেউ পারত না। সেই সন্তোষ বলো, সিতলাই বলো, রাজশাহীর কুড়িটা রাজা বলো–সবাই জেনেছিল যে গ্রাম আমাদের জায়গা নয়।...আমরা সবাই জানতাম যে culturally we are different, এটা আমাদের কালচার নয়। ব্রাহ্ম কালচার অনুসূয়ার, গ্রামের নয়, কলকাতার কালচার। নাটোর চলে গেল, সিতলাই চলে গেলো। সন্তোষরা-ও থাকতে পারল না–চলে গেল। কলকাতা যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ যার সঙ্গে যোগ নেই, যারা পদ্মাকে ভুলে

> যাচ্ছে, কেবল মাঝে-মাঝে স্মরণ করে, তারা ঐ জমির জন্য প্রাণ দিতে পারে না। জমি হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে তবু একটাও বন্দুক ধরল না। বন্দুকের কি অভাব ছিল!...কারণ বন্দুক ধরে জমি রাখা যায় কিন্তু আমি তো ওখানকার লোক নই। ও তো ওখানকার লোক নয়।...বেটা-বউ চলে যাচ্ছে...দুজন বরকন্দাজ, একজন কর্মচারী নিয়ে কলকাতার বাড়িতে থাকো...তারা বেটা-বউয়ের সঙ্গে থাকছে না কেন? তারা ভাবছে–আমরা অন্য জায়গায় থাকব। কারণ আমরা তো স্যোসালিস্ট হচ্ছি না বড় ছেলের মত। কিন্তু এই গ্রামে থাকা যাবেনা। এখানকার লোক হচ্ছে রামচন্দ্র, যে বলে মরার পরও আমার আত্মা এখানে থাকবে। অন্যরা এই জন্যই চলে গেল। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ৮-৯)

সান্যাল তথা ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণির সংকটের মধ্য দিয়ে একটি কালের অবসান ঘটে, নতুন আরেক কালের আগমন অনিবার্য হয়ে ওঠে; অমিয়ভূষণের আকাঙ্ক্ষা, সেই নতুন কালের ধারক হয়ে উঠবে রামচন্দ্রের মত খাঁটি-ভালুকে কৃষকেরা, যাদের গায়ে গ্রামের শ্যাওলা মাটির সঙ্গে তাদের গভীর ভিতের কথাই প্রকাশ করে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন:

> 'গড় শ্রীখণ্ড' হচ্ছে রবি ঠাকুরের মৃত্যুর পর, ৪২ থেকে ৪৬ পর্যন্ত। আর রবি ঠাকুর যেদিন থেকে উপন্যাস আরম্ভ করেছেন, তার আগে হচ্ছে 'নয়নতারা' ও 'রাজনগর'। মাঝখানে রবি ঠাকুর লিখেছেন 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ইত্যাদি। সেখানে আমি ঢুকতে চাইনি।...রবীন্দ্রনাথ যে পিরিয়ডটা লিখেছেন, তার আগের পিরিয়ড হচ্ছে 'নয়নতারা'-'রাজনগর'। আর রবি ঠাকুর যেটা লিখতে পারেননি, লিখতে চেয়েছিলেন 'আমি তোমাদেরই লোক' বলে, সেটা 'গড় শ্রীখণ্ড'। আমি তাদের কথা লিখেছি। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ১৩)

এই প্রান্তিক-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কথাই উঠে এসেছে *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে। সমালোচক মনে করেন এ উপন্যাসে:

> ...অমিয়ভূষণের সৃষ্ট চরিত্ররা নতুন জীবনের স্বপ্নে...ভরপুর। তাই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, জীবন্মৃত জেনেও মাধাই-কে বাঁচাতে ফতেমা ও সুরতুন ব্যগ্র।...আবার উপন্যাসের শেষে বান ভাসিতে বিধ্বস্ত চরণকাশির বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ইয়াজ। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছে সুরতুনকে নিয়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হার স্বীকার করেনি।...দেশময় বিপর্যয়, প্লাবন, মৃত্যু ও বিচ্ছিন্নতার মাঝখানেও একা রামচন্দ্র ভেবেছে: 'একা যেন তাকে গড় রক্ষা করতে রেখে গেছে কেউ'।...মৃতপ্রায় জমিতে ফসল ফলাতে চায়। জীবনের স্বাদে সে পূর্ণ বলেই তীর্থে তীর্থে ধর্মসঞ্চয় তার পক্ষে অর্থহীন। চাষবাসই তার ধর্ম এবং জীবন বলেই সে স্ত্রী সনকাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। সান্যাল মশাইরাও যেখানে জীবন থেকে দূরে, শহরের নিরাপদ সুখে অবলীন হতে চান, সেখানে রামচন্দ্র, মুঙলা, আলেফ শেখ, ইয়াজ মাটির বুকে জীবনকে উদ্ভিদের মত রোপণ করে। (তরুণ, ১৯৮৬: ৪২)

এভাবেই তারা অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। পর পর দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগের মত দুর্যোগ যে মানুষগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, সেই মানুষগুলোই আবার মৃত্তিকাগর্ভে নিজের শেকড়ায়নের ভিত সন্ধানে নতুন করে হাল ধরেছে। এভাবেই *গড় শ্রীখণ্ড* হয়ে ওঠে 'সময়ের ভাঙ্গাগড়ার তীরে মানুষের দলগত বাঁচার শিল্পরূপ' (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ১১১)।

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত চারটি উপন্যাস বিশ্লেষণ করে বলা যায়, অমিয়ভূষণ এখানে বিচিত্রমাত্রিক কালপর্ব নিয়ে কাজ করেছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের এক বিস্তৃত সময়পটের চড়াই উৎরাইয়ের চালচিত্র লিপিবদ্ধ *নয়নতারা-রাজনগর* কিংবা *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে। উপন্যাসগুলোতে বিন্যস্ত কালপর্বের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উপলব্ধি করা যাবে, ব্যক্তি-সময় ও সমাজ-রূপান্তরের এক অখণ্ড ইতিহাস রচনাই ছিল লেখকের অন্বিষ্ট। বৃহৎ কালপটে ব্যক্তি ও সমাজ রূপান্তরের সূত্রগুলো যেমন সহজেই চিহ্নিত করা যায়, সংক্ষিপ্ত কালপটে সেটি সম্ভব হয়ে ওঠে না। কাজেই অমিয়ভূষণ ঊনবিংশ-বিংশ শতকের এক বিস্তৃত কালপট বেছে নেন। সেই সঙ্গে জীবনসংকটের অন্তর্ঘাতগুলোও চিহ্নিত করেন। অমিয়ভূষণসৃষ্ট চরিত্রগুলো টলায়মান কালের অভিঘাত সয়ে কখনো অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে, কখনো শেকড়-বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাসমান জীবন আঁকড়ে ধরে, কখনো বা কোনো চরিত্র বিধ্বংসী কালপ্রবাহের ভিড়ে হারিয়ে ফেলে নিজেকে; পরাজয়ের স্বাদ চেতনায় ধারণ করে রক্তাক্ত হয়। উপন্যাসগুলোতে একাধারে সিপাহি বিপ্লব, নীল বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের প্রেক্ষাপটে বুজরুক-গোবর্ধন-রাজচন্দ্র-সুরতুন-রামচন্দ্র-সান্যালের মত মানুষের অস্তিত্বসংকট দোলাচল-অন্তর্ঘাত, বেদনাভাষ্য রূপায়িত। *নয়নতারা* উপন্যাস থেকেই সমাজ-রূপান্তরের রূপরেখাগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক প্রভাব ক্রমশ প্রকট হতে থাকে *রাজনগর* থেকে *গড় শ্রীখণ্ডে*। দেশীয় রাজন্যদের অন্তর্কলহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কেমন করে আন্তর্জাতিক কলহ ও দ্বন্দ্বে পরিণত হয়, লেখক তার সূত্রগুলো এখানে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তির অস্তিত্বসংকটের মূলে প্রোথিত থাকে কালের ভাঙাগড়ার স্বরূপ। এভাবেই ইতিহাসের বিচিত্রমাত্রিক বৈরি কালপর্বের মুখোমুখি হয়ে অমিয়ভূষণসৃষ্ট ব্যক্তিসত্তা অস্তিত্বসংকটের স্বাদ গ্রহণ করেছে। অমিয়ভূষণ তাঁর এইসব উপন্যাসে ইতিহাসপটে প্রতিস্থাপিত সংকটাপন্ন সেই মানুষগুলোর যাপিত জীবনেরই কথাই বলতে চান।

সহায়কপঞ্জি

অর্ণব সেন (২০০৩)। "অমিয়ভূষণ: উপন্যাসের রূপরেখা", 'নহবত', ৪০ বছর বিশেষ সংখ্যা, একালের বিস্ময় : কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, কলকাতা। পৃ. ৩-১১

অর্ণব সেন (২০১১)। 'অমিয়ভূষণ: উপন্যাসে কল্প-বাস্তবতা', *বাংলা আখ্যান: বহুমাত্রিক পাঠ*, বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী সম্পাদিত, রত্নাবলী, কলকাতা। পৃ. ১৮৯-১৯৬

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০২)। 'নিজের কথা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ১, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০২)। 'গড় শ্রীখণ্ড', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ১, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৩)। 'নয়নতারা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ২, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৩)। 'রাজনগর', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ২, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অলোক রায় (২০০৯)। *বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

অলোক রায় (২০০১)। "রাজনগর: আকাশগঙ্গার সন্ধান", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১৭৮-১৯২

অশ্রুকুমার সিকদার (১৯৮৮)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

আহমদ রফিক (২০১৫)। *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

ইরাবান বসুরায় (১৯৯৪)। "নয়নতারা ও রাজনগর", 'উত্তরাধিকার', চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৩১-৫৪

কার্তিক লাহিড়ী (১৯৮৪)। *সৃজনের সমুদ্র মন্থন*, অন্বেষা, কলকাতা।

জয়া চ্যাটার্জি (২০০৩)। *বাঙলা ভাগ হল*, আবু জাফর অনূদিত, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

জহর সেনমজুমদার (২০০১)। "নয়নতারা, অমিয়ভূষণ ও উপন্যাসের দ্বন্দ্ববীজ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৭০-৯৫

তরুণ মুখোপাধ্যায় (১৯৮৬)। ''গড় শ্রীখণ্ড': বিকীর্ণ মৃত্যুর পটে জীবনের শিল্পরূপ", 'প্রতর্ক', শারদীয়া প্রথম সংখ্যা, অমিয়ভূষণ : গড় শ্রীখণ্ড সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৪০-৪৯

তুষার পণ্ডিত (২০০১)। "কালের মন্দিরা বাজে", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৯৬-১০

দেবেশ রায় (১৯৯৪)। *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

বদরুদ্দীন উমর (২০০০)। *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ (১৪০২)। *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।

বিনয় ঘোষ (২০০০)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা।

ভবেশ দাশ (১৯৯৩)। "অমিয়ভূষণের গড় শ্রীখণ্ডেই আছি", 'কোরক', বর্ষ ১৬, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১১-২২

মৃণালকান্তি ভদ্র (২০০২)। 'গড় শ্রীখণ্ড: প্রমত্তা পদ্মা', *বিংশ শতাব্দীর সমাজবিবর্তন: বাংলা উপন্যাস*, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ২২৯-২৩৮।

রবিন পাল (২০১১)। *উপন্যাস: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

রমাপ্রসাদ নাগ (২০০২)। *স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

রমাপ্রসাদ নাগ (২০১৪)। *অনন্য অমিয়ভূষণ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

রাণা মুখোপাধ্যায় (১৪০৮)। "রাজনগরের পাঠক অথবা পাঠকের রাজনগর", 'শারদীয় শিলীন্ধ্র', ৩৫ বছর পূর্তি সংখ্যা ৩-৪, কলকাতা। পৃ. ৩৯৬-৪০৭

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০০৯)। *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১৬)। *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭১)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৪)। ''গড় শ্রীখণ্ড' : জনৈক পাঠকের ডায়েরী থেকে", 'উত্তরাধিকার', চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৫৫-৬৮

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৫৮)। *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৪৫)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

Marx, Karl (1853). 'British Rule in India', New York Daily Tribune, June 25, 1853, available at:https://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/06/25.htm, accessed on: October 12, 2016.

সাক্ষাৎকার

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯৯৪)। "আমাদের দেশে যদি সমালোচক থাকত তবে লোকে বুঝত কোনটা উপন্যাস, কোনটা উপন্যাস নয়...", অনিন্দ্য সৌরভ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, 'উত্তরাধিকার', অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ. ১-৩২

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৩)। "অমিয়ভূষণের সঙ্গে তিনঘন্টা", গীতাংশু কর ও সৈয়দ জামালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, জুলাই ১৯৮১-তে প্রকাশিত 'এই সময়' পত্রিকা-তরফে, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ২, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ৫৪৯

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৬)। "–অধিদৈবতের প্রস্থান : প্রয়াত অমিয়ভূষণের শেষ দীর্ঘতম জবানবন্দী–", সৌরভ ঘটক, জয়ন্ত চক্রবর্তী, শুভ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার (মুদ্রণ: উতঙ্ক কুমার দে, তন্ময় নাগ), 'সহস্রাব্দ', পঞ্চম বর্ষ জানুয়ারি-জুন, কলকাতা। পৃ. ৫-২৭

তৃতীয় অধ্যায়

অরণ্যপ্রাণ মানুষের কথকতা

অমিয়ভূষণ মজুমদারের বেশ কিছু উপন্যাসে [*দুখিয়ার কুঠি* (১৯৫৯), *মহিষকুড়ার উপকথা* (১৯৭৮), *হলং মানসাই উপকথা* (১৩৯৩), *সোঁদাল* (১৩৯৪) কিংবা অগ্রন্থিত উপন্যাস *মাকচক হরিণ* (১৩৯৮)] অরণ্যপ্রাণ মানব-মিছিলের দেখা পাওয়া যাবে। মানুষ এবং প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর কথাসাহিত্য সেখানে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সমালোচক শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন, 'এই শতকের গোড়ার দিকে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কথাসাহিত্যে মানুষ এবং প্রকৃতির আত্মিক ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিয়ে এক ধরনের উৎকৃষ্ট কাহিনী রচিত হয়েছিল। অমিয়ভূষণের লেখায় যেন তারি কিছুটা স্বাদ পাই' (শিবনারায়ণ, ১৯৯৪: ৩০)। অমিয়ভূষণের এইসব উপন্যাসে ফুটে উঠেছে উত্তরবঙ্গের অরণ্য আর গণমানুষ। জীবন এখানে 'বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪০)। তবু অরণ্য আর মানুষের পারস্পরিক সখ্যই এইসব উপন্যাসের শেষ কথা নয়। গণমানুষ অবলম্বী এইসব উপন্যাসে গভীরভাবে অনুরণিত আরণ্যক জীবনের আদিমসত্তার সঙ্গে আধুনিক কালের যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপের প্রবল দ্বন্দ্ব। এর পরিণতি হয়েছে ভয়ানক–যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে অরণ্যচারী মানবাত্মা উন্মূল হয়েছে, শোনা গেছে তাদের আপাত পরাজয়ের বেদনার্ত কান্না। সময়ের বৈনাশিক অভিঘাতে মানবাত্মার অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের কথকতা এখানে উচ্চকিত। তবে আপাত বেদনার অন্তরালে অমিয়ভূষণ তাঁর রচনাকর্মে রূপ দিয়েছেন গণমানুষের প্রগাঢ় অস্তিত্বসন্ধিৎসা। এইসব আরণ্যক মানবসত্তার অবচেতনে চারিয়ে গেছে প্রবল দ্রোহের বীজ। লেখক বিশ্বাস করেন, তাদের এই দ্রোহের বীজ একদিন অঙ্কুরিত হয়ে অরণ্যচারী আদিম সত্তাকে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি যোগাবে।

উত্তরবঙ্গের কথকতা

অমিয়ভূষণের উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলো কোন বিশেষ ভৌগোলিক মানচিত্রে সীমায়িত করা কঠিন হলেও মোটাদাগে এসব অঞ্চল উত্তরবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলেই চিহ্নিত করা যায়। প্রায় সবগুলো উপন্যাসেরই অঞ্চল চিহ্নিত করতে গিয়ে লেখক যে কথা বলেছেন, তাতেও রয়েছে অনির্দেশ্যের স্পর্শ। আঞ্চলিকতা নয়, বরং উপন্যাসের অবয়বে একটা 'লোকাল কালার' দেয়াই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাসের ভাষাতেও সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই *দুখিয়ার কুঠি* কিংবা *মহিষকুড়ার উপকথা* প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> ১. ...কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলকেও পটভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট করা উচিত হবে না।...পটভূমিকে পরিচিত সভ্যতার প্রান্তে স্থাপন করার তাগিদে একটি আঞ্চলিক ভাষার ধাঁচ কথোপকথনে ব্যবহার করা হয়েছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৮); *দুখিয়ার কুঠি*

২. এই উপন্যাসের ভাষার "যেন একটা লোকাল কালার আছে, কিন্তু কোনো লোকালিটির নয়", কারণ কোচবিহারের ভাষায় 'ডায়লগ' লিখতে থাকলে সেটা বৃহত্তর বঙ্গের অন্য কোথাও কম্যুনিকেট করতে পারবে না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৮); *মহিষকুড়ার উপকথা*

উপর্যুক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুভূত হবে, সর্বজনীনভাবে তিনি উত্তরবঙ্গের প্রান্তজনের কথা বলতে চান। 'নিজের কথা' প্রবন্ধে অমিয়ভূষণ নিজেই তাঁর উত্তরবঙ্গপ্রীতির কথা লিখেছেন:

> উত্তরবঙ্গের উত্তরখণ্ডে আমার বাস। কোচবিহার প্রীতির কথা আগেই জানিয়েছি।...এই টেমপারেট জোন-এর সুখ-সুবিধা, আরাম, উত্তরবঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তৈরি করেছে। কিন্তু আসলে আমি জানি আমার মা যে জেলার মেয়ে, তোমরা নিষাদ, শবর, পুলিন্দ বলবে কিনা ভেবে দেখো, বা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর বোন, তাকে রুগ্ন ছেলেমেয়ের জন্য কলকাতার এক হাঁটু কাদায় গেঁড়িগুগলি তুলতে হয় বটে, কিন্তু তার কপালে সে-সময়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা হিরার মুকুট।...আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদেনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে-ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো...যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে-ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়ো, সেখানে বাঙালিদের দশভাগের সাত ভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি, তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ১৮)

উপর্যুক্ত বর্ণনায় উত্তরবঙ্গের গণমানুষের প্রতি অমিয়ভূষণের গভীর আবেগ ও ভালোবাসা স্পষ্টভাবেই অনুভব করা যাবে। এই আবেগ তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মনে করেন, 'রাজকাহিনী নয়, গণকাহিনীই অমিয়ভূষণের নিজক্ষেত্র' (সরোজ, ১৯৭১: ৩৪২)। ভালুক-ভালুক চেহারার অরণ্যপ্রাণ এই কালো-কালো কৃষকের অস্তিত্বহীন সর্বহারা-সত্তা এবং কালের অভিঘাতে তাদের অস্তিত্বসন্ধিৎসার স্বরূপ অন্বেষণই বর্তমান অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য।

উত্তরবঙ্গের মানচিত্রের সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে অমিয়ভূষণের বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। সমালোচক নির্মল দাশ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন:

> ...ভারতের জাতীয় মানচিত্রে 'উত্তরবঙ্গ' নামে কোন ভূখণ্ডের উল্লেখ নেই...সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইংরেজের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখণ্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভৌগোলিক এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের আত্মপ্রসারণশীল উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মত সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসন কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবেই মূলত ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা-সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাক-রূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে। পরে ইংরেজ তার প্রাশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এই ভৌগোলিক এলাকার ইতস্তত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করেছে। ফলে কোনো কোনো এলাকা পার্শ্ববর্তী বঙ্গেতর প্রদেশের

(যথা, পশ্চিমে বিহার ও পূর্বে আসাম) অন্তর্গত হয়ে সাধারণভাবে বঙ্গীয় এলাকার বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। এছাড়া, যেসব এলাকা ব্রিটিশ আমলে কখনো বঙ্গ সীমান্তের বাইরে যায় নি, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের জন্য সেইসব এলাকারও অভ্যন্তরীণ পরিচয় মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে।... ১৯৪৭ সালের পরও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গের চেহারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে; ১৯৫০ সালে প্রাক্তন করদ মিত্র রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা হিসাবে গণ্য হয়েছে; অন্যদিকে ১৯৫৬ সালে বিহারের পুর্ণিয়া জেলার কিছু অংশকে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ভৌগোলিক দিক থেকে এই অংশ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর এলাকার অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তা উত্তরবঙ্গেরও অঙ্গীভূত।...উত্তরবঙ্গের এখন একটা ভৌগোলিক এলাকা মোটামুটি স্থিরিকৃত হয়ে এসেছে, প্রশাসনিক দিক থেকে যা পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর আর মালদহ এই পাঁচটি জেলার সমুচ্চয়। (নির্মল, ২০০১: ১-২)

এই উত্তরবঙ্গই উঠে এসেছে অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্যে। যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে অরণ্যপ্রাণ মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পাঠককে যে বার্তা তিনি পৌঁছে দিতে চান, সেটি জরুরি। বৈনাশিক যন্ত্রসভ্যতার প্রতিপক্ষে আরণ্যক জীবন আর কৃষি-সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যে প্রবল সংগ্রাম, সেটি রূপায়ণে অরণ্যজীবনপটে ক্রম-বর্ধমান নগর-সভ্যতার ক্রূর ছায়াপাত প্রয়োজন ছিল; প্রয়োজন ছিল বিচিত্র অরণ্যবাসী মানুষের নিজস্ব জীবনাচারের প্রকাশ এবং সময়ের ক্রমরূপান্তরিত স্বরূপের উন্মোচন। উত্তরবঙ্গে এর সবটাই মেলে।

কুচবিহার সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ বলেছেন, 'কুচবিহারের আঞ্চলিক-ইতিহাস নামমাত্র প্রয়োজন। কুচবিহারের যে বিভিন্ন জাতি লোপ পাওয়ার মুখে, নিজেদের নাম ভুলে যাওয়ার মুখে, এই জাতিগুলোকে চেনা দরকার' (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ১)। অন্য আরো একটি তথ্য জরুরি; অমিয়ভূষণ তাঁর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। তাঁর চাকুরিজীবনের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির অরণ্য-প্রকৃতি এবং জনজীবনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সখ্য হয়েছিল সেই সময়, যখন তিনি এসব এলাকায় ডাকবিভাগের টাউন ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব পালন করতেন। 'উত্তরবঙ্গ তাঁর চারণভূমি, তাই অঞ্চল-নিষ্পন্ন জীবনের সূক্ষ্ম ও গভীর সংবেদনা অনায়াসে উঠে আসে লেখায়' (তপোধীর, ২০১০: ১৭১)। শিক্ষক ঊষাকুমার দাস তাঁর *দুখিয়ার কুঠি* পাঠ করে সেই গাঢ়-সংবেদনার প্রকাশ অনুভব করে মন্তব্য করেন:

ডাকঘরের চাকরিতে শহর থেকে দূরে এখানে ওখানে ঘুরে...ঐসব অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত অঞ্চলের প্রবহমান জীবনস্রোতকে প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছো, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছো, তোমার সাহিত্যিক প্রতিভায় এ দিয়ে গড়ে তুলেছো একটি অক্ষয় কথামালা। (ঊষাকুমার, ২০০৮: ৫৪৮)

নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সময় ও ব্যক্তিঅস্তিত্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রকাশের পট হিসেবে এসব কারণেই তিনি বেছে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গকে।

বাংলা সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের জনজীবনের চালচিত্র রূপায়িত হয়েছে বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিকের হাতে। এঁদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র পাল, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, মহাশ্বেতা

দেবী, দেবেশ রায় এবং সমরেশ মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। সমালোচক মনে করেন, 'উত্তরবঙ্গে যে বৈচিত্র্যময় পটভূমি ও জনসমাজের অস্তিত্ব আছে তা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় গঙ্গা-বিধৌত সমভূমি থেকে উত্তরের জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স এবং হিমালয়সংলগ্ন এলাকার অরণ্যভূমিতে, চা-অঞ্চলে এবং কৃষিনির্ভর বহুবিচিত্র জাতি ও জনজাতির মধ্যে' (অর্ণব, ২০১৪: ৭৫)। এইসব অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় জনজীবনের চিত্রচ্ছবি ভাষা পেয়েছে অমিয়ভূষণের উপন্যাসে।

অমিয়ভূষণের চারটি উপন্যাসের স্থানপট চিহ্নিতকরণে উপলব্ধি করা যাবে, *দুখিয়ার কুঠি* উপন্যাসে গদাধরপুর মূলত গদাধর নদীর নিকটবর্তী কোচবিহারের তুফানগঞ্জ শহরের আদলে কল্পিত এক মহকুমা শহর। অন্যদিকে, *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসের পটভূমি কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার অঞ্চল। যদিও বলা হয়, মহিষকুড়ার মানচিত্র অমিয়ভূষণের মনোভূমে অবস্থিত। অন্যদিকে, *হলং মানসাই উপকথা*-য় বেছে নেয়া হয়েছে উখুণ্ডি নামক এক গ্রামকে। স্পষ্ট করে না বললেও হলং নদীর নামকরণ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ উপন্যাসে ব্যবহৃত পটপ্রান্ত উত্তরবঙ্গের। *মহিষকুড়ার উপকথা*-র মত *সোঁদালে* তুরুককাটা গ্রামের ছবি মেলে, যে তুরুককাটা কোচবিহার জেলার দিনহাটা অঞ্চলে অবস্থিত। এভাবেই উত্তরবঙ্গ সুচিহ্নিত তাঁর উপন্যাসগুলোতে।

উত্তরবঙ্গের আদিপ্রাণ নৃগোষ্ঠী

উত্তরবঙ্গের অস্তিত্ববান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে অমিয়ভূষণ 'আদিবাসী' নামে আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচক সুবোধ ঘোষের মতে, এরা ঠিক আদিবাসীর পর্যায়ভুক্ত নয়। তিনি মনে করেন,'এদের জীবনযাত্রা বর্তমানে আর গোষ্ঠীবদ্ধ প্রথায় চলে না। তবে অতীতে তারা আদিবাসী সমাজের লোক ছিল সন্দেহ নেই' (সুবোধ, ১৩৫৫: ২৩৮)। তিনি মনে করেন, এদের উপসমাজ কিংবা উপ-জাত (subcaste) বলা যেতে পারে। 'উপ-জাত' শব্দটি বিতর্কিত এক শব্দ। 'উপজাতি বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় একটি জাতির 'উপ' অর্থাৎ যারা পুরোপরি জাতি হয়ে ওঠেনি...এবং 'উপজাতীয়' সমাজ বলতে প্রাক-পুঁজিবাদী এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়' (মেসবাহ এবং অন্যান্য, ২০০১: ৪৪-৪৫)। মূলত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার ধারক। কাজেই অরণ্যপ্রাণ এইসব মানুষকে 'উপ-জাত' হিসেবে আখ্যা দেয়া সমীচীন নয় বলেই মনে হয়।

কারো কারো মতে, 'আদিবাসীদের এই নামে ডাকা হয়, কারণ তারাই পৃথিবীর আদি মানব। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে যে মানবভূমি গড়ে ওঠে, তারা ছিল সেই অঞ্চলের প্রথম নাগরিক' (হাসান, ২০১৪: ৩৮)। নৃতাত্ত্বিক তানিয়া লি'র মতে, যারা অস্তিত্ব রক্ষায় প্রতিনিয়ত সংগ্রামশীল এবং একটি দেশের মূল জনস্রোত থেকে মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবিতে পিছিয়ে আছে, সেইসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। নৃতাত্ত্বিক তানিয়া লি'র সংজ্ঞার্থের আলোকে অমিয়ভূষণের উপর্যুক্ত উপন্যাসে বিধৃত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রামরত বলে এদের 'আদিবাসী' অভিধায় চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে মহকুমা সদর গদাধরপুর আর গদাধর নদীর ওপারের দুখিয়ার কুঠি গ্রামের মানুষেরাই মুখ্য (প্রোটাগনিস্ট) চরিত্র। বিশেষ করে ভোট বা ভুটিয়া জাতিগোষ্ঠীর বিচরণকেই লেখক এ উপন্যাসে অস্তিত্ববান করে তুলেছেন। রাজার সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ আর ডাকাতি কিংবা স্বাধীন ব্যবসা করে বেঁচে থাকা এই জনগোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁচার জন্যই রাজা শরণ নিয়েছিলেন কোম্পানির। কোম্পানির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে পালানো একটি ভুটিয়া দলই অরণ্যে আত্মগোপন করে পরে গদাধরের তীরে একটি ভোট গ্রামের পত্তন করে। পরবর্তীকালে ভোটবস্তির প্রান্তিক মানুষগুলোর সঙ্গে আরও একবার রাজার প্রতিনিধি দলের লড়াই হলে তাদের নির্মূল করার শক্তিমত্তা দেখায় কেন্দ্র। কিন্তু প্রান্তিক গণমানুষের সংঘবদ্ধ শক্তি কখনো নিঃশেষ হয় না। কাজেই অমিয়ভূষণ সগৌরবে ঘোষণা করেন:

> ভোটরা নির্মূল হলো। এ রকম মনে করার যুক্তি আছে তাদের বস্তির চারিপাশের গ্রামের তুলনায় তারা অগ্রসর ছিল। তাদের সভ্যতার কোনো নিদর্শন অবশ্য এ অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো বা তাদের সমাজের কোনো প্রথা বর্তমানে একান্ত আঞ্চলিক কোনো সংস্কারের গোড়ায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একটা বিষয়ে তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন কখনো কখনো চোখে পড়ে। এদিকের ইতস্তত ছড়ানো গ্রামগুলিতে ভোট ছাঁদের মুখাকৃতি পাওয়া যায়। আর ভোট বস্তিটার সীমার মধ্যে পড়ে যে গ্রামটা গড়ে উঠেছিল সেখানে কিছুদিন আগেও হলুদ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের সন্ধান পাওয়া যেত। এই গ্রামেরই বর্তমান নাম দুখিয়ার কুঠি।... গ্রামের নাম যারা দুখিয়ার কুঠি দিয়েছিল তারা সকলেই বাইরের লোক নয়। সেই গ্রামেই এমন কিছু মানুষ থেকে গিয়েছিল যারা ক্রমশ এই দুঃখের নামটাকে মেনে নিয়ে নিজেদের ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে বাস করত। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ২৩)

উপন্যাসে দুখিয়ার কুঠি গ্রামে রাভা, রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়েরও দেখা মেলে। তবে সমালোচক মনে করেন, ডাঙ্গর আই, মাতালু, কাঁকরু, রংবর, ফুলমতী–এরা এইসব সম্প্রদায়গুলোর ঠিক কোনটির অন্তর্গত, সেটি উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। লেখক মনে করেন, আই হয়তো কোচ-মেচ কিংবা বাহে। এদের চেতনার চোখেই লেখক যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে ধ্বস্ত অরণ্য আর কৃষিসভ্যতার বিনষ্টিকে দেখতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে, *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসে পুরনো মহিষকুড়া নদীর প্রবহমানতায় আড্ডা জমত বুনো মোষের, যাদের ধরতে শীতকালের শুকিয়ে যাওয়া নদী খাতে আসত 'বেদিয়া'রা। এরা ছিল যাযাবর। কাজেই তাদের স্থানীয় বাসিন্দা বলাটা প্রশ্নসাপেক্ষ। উপন্যাসের আদি নৃগোষ্ঠী হিসেবে যারা এখনও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, তারা রাজবংশী। এখানে, একদিকে যেমন আসফাকের মত অরণ্যপ্রাণ রাজবংশী মুসলমানের কথকতা রচিত, তেমনি, চাউটিয়া বর্মণ বা তার পিতার মত হিন্দু রাজবংশীরাও এ এলাকার আদিপ্রাণ হিসেবে উপন্যাসে চিহ্নিত। সমালোচক উদয়শংকর বর্মা মনে করেন, এ উপন্যাসে 'রাজবংশী মুসলমান সমাজের যেটুকু ছবি পাচ্ছি তাতে কোনও জনজাতির অভ্যাস-বিশ্বাস–সংস্কার নেই।...একটি নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ইতিহাসের আভাস আছে এখানে। ফান্দী চাউটিয়া, উচ্ছেদপ্রাপ্ত হালুয়া (বর্গাদার) আসফাক, বেদেনী কমরুন সবাই মিলে এই অঞ্চলের একটি বিলুপ্ত সময়কে তুলে ধরেছে' (উদয়শংকর, ২০০৮: ৪৯)। চাউটিয়ার পিতার মোষ ধরা ফান্দি-বৃত্তি তাদের আদিমসত্তাকেই প্রকাশ করে। আর এভাবে, বিপজ্জনক মোষ ধরার কাজকে কেন্দ্র করে এ

গ্রামের নাম হয়েছে 'মহিষকুড়া'। উপন্যাসে কমরুন যাযাবর দলের প্রতিনিধি। এমনকি জোতদার জাফরুল্লার পিতা প্রসঙ্গেও আড়ালে উচ্চারিত হয় যে, তার পিতা ছিল 'ভৈষ-বাউদিয়াদের দলপতি'।

হলং মানসাই উপকথা-য় যে আদিম মানবসত্তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়, তাদের পরিচয় হলং নদ বা নদীর জন্মকথার সঙ্গে যুক্ত। উপন্যাসে উত্তরের আদিপ্রাণ মানুষের তুলনায় স্পর্ধিত সত্তায় অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে দক্ষিণ থেকে আগত বাঙালিরা। অরণ্য আর নদী ধরে চলা এই মানুষগুলো অমিয়ভূষণের উপন্যাসে 'কখনো কোচ, কখনো রাভা, কখনো রাজবংশী বলে নিজেদের' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৬) পরিচয় দেয়। তাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে নিজেদের নানা নামে তাদের বিভক্ত করে ফেলার প্রবণতা। অমিয়ভূষণ মনে করেন, তারা আসলে একই জনগোষ্ঠী, যারা একত্র হয়েছিল। উত্তরের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই তারা একক এক গোষ্ঠী গড়ে তুলে হলং-এর পাড়ে বসতি গড়ে তুলেছিল।

এছাড়া, *সোঁদাল*-এ যে মানুষগুলোর দেখা মেলে, তারা কেউ কেউ সেই মাটির গভীরে শেকড়চারী মানুষ, কেউ বা বহিরাগত। তবে গ্রামগুলোর যেসব নাম মেলে উপন্যাসে, সেগুলো স্থানীয় মানুষের দেয়া নাম। এ উপন্যাসে মাতৃতান্ত্রিক রাভাগোষ্ঠীকে লেখক তুলে এনেছেন, যাদের কথা বলতে গিয়ে অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন:

> ধান উৎপাদনের পদ্ধতি যে কোনো সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদিকে নির্ধারিত করে, সে তো এখানকার নানা অধিবাসীদের মধ্যে রাভাদের লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। তারা তো বলে, 'নাং কোচা'–আমরাই কোচ। আর গারো পাহাড়ের আদিবাসীরা শৌর্যেবীর্যে সকলকে ছাপিয়ে উঠতে থাকলেও (তারা তো তখন পশুপালক পশুশিকারীর স্তরে) পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ ছাড়া কিছু জানত না। তারা এই সমতলবাসী কোচদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ধান চাষ শিখতে–এই ডাক থেকেই, রব থেকেই তারা রাভা। আর সেজন্যই ধানজমি আর রাভাকন্যা আর রাভাগৃহ, এক থেকে অন্যটা পৃথক হয় না। জমি আর কন্যা একই আত্মার দুই পৃথক রূপ, কন্যার গৃহও তাই। পুরুষ লাঙ্গলের ফলা হতে পারে; তারপর তো সে এদিক ওদিক চলে যাবে, কন্যা ছাড়া কে লালন করবে ধান! পুরুষ জঙ্গল থেকে বাঁশ, কাঠ, ছন এনে ঘর তুলতে পারে, কিন্তু সেই ঘর যদি একটা রাভাকন্যার শরীরও না হয়, কোথায় আশ্রয় পাবে পুরুষ! সেজন্যই ধানের জমি আর ধান, গৃহ আর সন্তান সবসময়েই রাভাকন্যার, রাভাপুরুষের নয়। পুত্রই হোক অথবা কন্যা, মায়ের পরিচয়েই পরিচয়, মায়ের গোত্রই গোত্র। জমি ধ্রুব, গৃহ ধ্রুব, জননী ধ্রুব। এই ধ্রুবতার আশ্বাস ছাড়া ধান আর সন্তান ভালো হয়? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০)

জমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যচারী হবার ক্ষেত্রেও বাধা এল। যেহেতু অরণ্য এখন যন্ত্রসভ্যতার চাপে বিলীয়মান। এভাবে উপন্যাসের শুরুতে অরণ্যচারী মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট চিহ্নিত করেন অমিয়ভূষণ। রাভা, যারা কিনা আদিতে কোচ ছিল, তাদের অরণ্যপ্রাণ বিনষ্ট, যন্ত্রসভ্যতার স্ফুরিত শক্তির নেতিবাচকতায় তাদের বিহ্বলতা, বেদনা আর রূপান্তরিত সময়স্রোতের তীব্রতাকে লেখক এ উপন্যাসে ধারণ করেছেন। মোন্নাথ বা মোদনাথ, মলগুঁ দাস, তিন্নি কিংবা পঙ্কিনী রাভা–এরা সবাই নিজের ভেতর প্রগাঢ়ভাবে অরণ্যকে লালন করে। তবে, রাভাসত্তার ধীরগতির রূপান্তরিত স্বর শুনতে পান লেখক। অনুভব করেন কেমন করে শাহরিক চাহিদা তৈরি হচ্ছে তাদের সত্তায়। বিলুপ্তপ্রায় এক অসুর জাতির কথা উদাহরণ হিসেবে টানেন তিনি। এ এলাকারই

উত্তর অংশে বা সদর শহরের পশ্চিমে চলা পথ ফেলে স্পর্শ করা এক মহাবনে বুনো মানুষের গোষ্ঠী থাকত। অগম বনের অন্তঃস্থলের সেইসব বুনোগোষ্ঠী, যারা অসুর বলে পরিচিত ছিল, কিংবা বনের শ্যামলতার সঙ্গে মিল রেখে একদা যারা শ্যামল সাঁওতাল নামে পরিচিত ছিল, অমিয়ভূষণ মনে করেন, সেই মহাবনে বাস করতে এসে তারা যেন জাত বদলে ফেলেছে: 'অরণ্যের অধিবাসীরা ভয়ে ভয়ে দূরে চলে গেল, হাতি, গণ্ডার , মোষ, মানুষ। কিন্তু ধরাও পড়ে, পোষও মানে। সেই চা বাগানগুলোয় কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালী, মুণ্ডা সব মিলে একটা নতুন পোষা মানুষজাতি তৈরি হচ্ছে, হয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৩)। অমিয়ভূষণের প্রশ্ন হলো, 'সেই মোষগুলি কিংবা সেই মানুষগুলি কোথায় গেল, কেউ জানে না?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪১)। না জানার বিষয়টি বেদনার। আদিবাসী অরণ্যপ্রাণ মানুষের অস্তিত্ব বিলীনের নীরব কথকতা এভাবেই বাঙ্ময় করে তোলেন অমিয়ভূষণ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক স্বরাজ গুছাইতের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> আরণ্যক সভ্যতা ভেঙে গেলে সেখানকার মানুষ ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে। মানুষ নিজেই বন্য থেকে পোষ্যবিশেষ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ নিজের অজান্তেই 'পোষা মানবজাতি তৈরি' করে। যেমন পার্বত্য প্রদেশের 'চা বাগানগুলোতে কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালি, মুণ্ডা সব মিলে একটা নতুন পোষা মানুষজাতি তৈরি হচ্ছে, হয়েছে। (স্বরাজ, ১৯৯৭: ৩৬)

এই রূপান্তরপ্রক্রিয়া অমিয়ভূষণ শুধু অরণ্যসভ্যতার ভেতর দেখেননি, দেখেছেন সময় ও প্রকৃতির ভেতরেও। আর তাই *দুখিয়ার কুঠি* উপন্যাসে বাঁকা-ত্যাড়া মহকুমা শহরের ঘাসে ঢাকা চত্বরের বর্ণনায় শুধু বলেন, 'দপ্তরের চারিদিকে ঘাসে ঢাকা ঢেউতোলা মাঠ। ঘাসগুলো দূর্বাজাতীয় কিন্তু রোদে পুড়ে শক্ত ও কর্কশ হয়ে যেন জাত বদলাচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৯)। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য আরো একটি বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই অমিয়ভূষণ মহকুমা শহরটির যে বিবর্ণ ছবি আঁকেন, সেখানে তিনি 'দেখাতে চাইছেন যে সমস্ত অনুপুঙ্খে অনভিজাত তুচ্ছতার চিহ্ন নিয়ে গড়ে উঠছে এক বিকল্প বাস্তব অবস্থানের খাঁটি লোকায়ত চলচ্ছবি।...পৌর সমাজের ভূগোল-ইতিহাস-প্রত্নকথা-সমস্তই অন্তেবাসীর মাপে পুনর্নির্মিত' (তপোধীর, ১৯৯৫: ৯৮)। অর্থাৎ তাঁর ভাবনায়, অমিয়ভূষণ কেন্দ্রশক্তিকে প্রান্তজনের দৃষ্টিতে দেখতে সচেষ্ট, যে পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রশক্তির আপাত আভিজাত্য ভেঙে গিয়ে অনভিজাত তুচ্ছতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই কেন্দ্রশক্তির আভিজাত্যবোধের পরিবর্তে তিনি দুখিয়ার কুঠির মাতালু, রংবর কি কাঁকরুর আঞ্চলিক জীবনবোধকেই মুখ্যভাবে রূপায়িত করতে চান।

অরণ্যের সবুজ এখন যন্ত্রসভ্যতার লোভের আগুনে দগ্ধ বলেই অনুজ্জ্বল আর কঠিন। প্রযুক্তি ও পুঁজিবাদের লোভের থাবায় আরণ্যক জীবনের বিনষ্টি, অরণ্যপ্রাণ মানবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম, তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনমূল থেকে বিচ্যুতি, কখনো তাদের শেকড়বিচ্ছিন্ন পরাজিত সত্তার হাহাকার, সেই সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতা আর কৃষিসভ্যতার মধ্যকার দ্বান্দ্বিক লড়াই, উঠতি পুঁজিপতিদের কালো হাত ধরে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জাত ক্ষয়িষ্ণুতার নানা রূপ, অর্থাৎ সমকালের পটে তাদের অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ অমিয়ভূষণের এই চারটি উপন্যাসে প্রবলভাবে মূর্ত।

অরণ্য, কৃষিসভ্যতা বনাম যন্ত্রসভ্যতা

ইতিহাসপাঠে উপলব্ধি করা যাবে, ভারতে আর্যদের আগমনে অরণ্যবাসী মানুষের ভূমিচ্যুতি ঘটে। ফলে, আর্য আর আদিবাসীদের ভেতর এক বিশাল ব্যবধান রচিত হয়। 'আর্য-ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল' (সুকান্ত ও অন্যান্য: ২০০৭: ১০), সেই ব্যবধান আজও বিদ্যমান। পরবর্তীকালে এ ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। আর্যদের আগমনের পর আদিবাসী সমাজে পরিবর্তমানতার সূত্রপাত ঘটলেও তার গতি ছিল বেশ ধীর। ব্রিটিশ শাসনামলে দ্রুততর প্রক্রিয়ায় ব্রিজ-রাস্তা কিংবা রেলপথের প্রসার-সরকারি জঙ্গলের সীমা নির্ধারণে অরণ্য সংরক্ষণের আইন, আদিবাসী অঞ্চলে খনির কাজের প্রসার, জমিসম্পর্কিত আইন ও ভূমিকর প্রথার প্রবর্তন, ঋণ সম্পর্কিত আইন আদিবাসী জীবনে নানা সংকটের জন্ম দেয়।

অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী জীবনে অস্তিত্বসংকটের যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছেন, তার ভেতর অরণ্যহীন এক আগ্রাসী সভ্যতার প্রতিচ্ছবিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, 'কীভাবে এই সুবিশাল অরণ্য ক্রমে সংকীর্ণ 'রিজার্ভ ফরেস্ট'-এ রূপান্তরিত হয়েছে,...যে অরণ্য একদিন তাদের মাতৃসম আশ্রয়স্থল ছিল, কীভাবে সেই অরণ্য তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে আশ্রয়হীন করে তোলা হয়েছে, তাদের বিশ্বাস-রীতি-জীবিকার পথ সঙ্কুচিত হতে হতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে',...(উর্বী, ২০১৬: ২২)। অরণ্য সংরক্ষণ আইনের মধ্য দিয়েও আদিবাসী মানুষের অধিকার খর্ব হয়। ১৮৭১ সনে সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের অরণ্য 'সংরক্ষিত জঙ্গল' বলে ঘোষিত হবার পর জঙ্গলের গাছ সংরক্ষণের নীতি কার্যকর হতে থাকে। সংরক্ষিত হলেও অরণ্যে আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকারবোধ বজায় থাকবে–এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কার্যত জঙ্গল বিভাগই এর বিরোধিতা করে। ধীরে ধীরে এই সংরক্ষিত জঙ্গল 'খাস সরকারি জঙ্গলে' পরিণত হয়। অরণ্যখেকো দুষ্টচক্রের বৃক্ষনিধন আদিবাসীদের অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এছাড়াও অরণ্যপ্রাণ আদিবাসীদের স্বভূমিচ্যুতি প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> ভারতের সামন্ততান্ত্রিক-আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুষ্ট তথা ইংরেজ শাসকবর্গের প্রশ্রয়ে জমিদার-মহাজন-পুলিশ, ঠিকাদার-আড়কাঠিদের অত্যাচার-খাজনা, শ্রমশোষণ ও তাদের জঘন্য স্বার্থপরতার শিকার আদিবাসীসমাজ ক্রমে 'শ্রমদাস'-এ রূপান্তরিত। জমিদারদের শোষণ পীড়ন, প্রতারণা মূলত আদিবাসীদের অরণ্যকেন্দ্রিক ভূমিকে কেন্দ্র করেই।...অরণ্য-পাহাড়ে আজন্ম লালিত-পালিত আদিবাসীরা অক্লান্ত শ্রমে অরণ্য সাফাই করে কিংবা পাহাড় কেটে বসত গড়ে তোলে, তৈরি করে চাষাবাদের যোগ্য জমি। কিন্তু ...তাদের...'ভুঁইহারি' জমি...রক্তে ফলানো ফসল বিনিময় প্রথায় অপহরণ করতে দ্বিধা করে না বহিরাগত 'ইলাকদাররা'।
>
> ...আদিবাসী সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দিয়ে শোষণের মূল প্রোথিত করে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী।...আদিবাসীদের বিচরণক্ষেত্র বসত অঞ্চলের মধ্যে ইংরেজ রেললাইন বসিয়েছে, স্থাপন করেছে 'নীলকুঠি', 'রেশমকুঠি', মিশনারিরা গড়ে তুলেছে পার্বত্য এলাকায় এক এক করে তাদের 'মিশন'। ঠিক এভাবেই জমির মালিকানার রূপান্তর, বেদখল 'খুটকাট্টি' গ্রাম থেকে উচ্ছেদ বা বাস্তুত্যাগ, 'মহাজন-জমিমালিক-ঠিকাদার' ও সরকারি আমলাদের নির্লজ্জ শোষণ, ভূমিদাস প্রথা'-র প্রবর্তন, আদিবাসী রমণীদের

> নিয়ে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করানো, স্বকীয় সংস্কৃতি ও তাদের সমাজবন্ধন-ধর্ম-অনুশাসন ভেঙে দেওয়া...ইত্যাদি কারণে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ব্যাপক 'আদিবাসীকৃষি বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়। (সুবোধ, ২০১০: ১১-১২)

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই আদিবাসী মানব-চেতনায় অস্তিত্বসংকটের বীজ রোপণ করে।

যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপ্রসারণকে অমিয়ভূষণ সময়ের 'অনিবার্য সম্মুখবেগ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। *দুখিয়ার কুঠি* উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের অনিবার্য সম্মুখবেগেও একটি বেদনা লুকানো থাকতে পারে, এর বেশি কিছু বলার নেই' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৮)। শুধু দুখিয়ার কুঠিতেই নয়, অনিবার্য সম্মুখগতির পেছনে লুকানো বেদনা তিনি অনুভব করেছেন *হলং মানসাই উপকথা*, *সোঁদাল* আর *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসেও। অরণ্য ধ্বংসকারী সভ্যতার অনিবার্য অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে চারটি উপন্যাসেই তাই কালো পিচের পথকেই প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন, 'সভ্যতার 'অগ্রগতি' যে বর্গবিভাজনকে আরো প্রকট করে দিল, কৌম সমাজের প্রেক্ষিতে বিষাক্ত আরো–তাতে 'কালোনদী'র প্রতীকে উপস্থাপিত সড়ক কৃষক জীবনে কার্যত নিয়ে এল অন্ধকার, বিপর্যয় আর আত্মিক অবলুপ্তি। অমিয়ভূষণ প্রতিবেদনে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি নানাভাবে পুনরাবৃত হয়েছে' (তপোধীর, ২০১০: ১৮৩)। নতুন আর পুরোনো পথের তুলনার মধ্য দিয়ে লেখক সামাজিক আর অর্থনৈতিক রূপান্তরের আভাস স্পষ্ট করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে:

> গদাধরপুরের সঙ্গে সংযোগ রাখতে রাজধানী থেকে এগিয়ে আসছে পিচের রাস্তা।...সভ্যতার জোয়ার দুখিয়ার কুঠিকে অতীতে দুবার স্পর্শ করে গেলেও তাদের জীবনে শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনকে এবার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে রাস্তা ও ব্রিজ বানানোর হট্টরোল। পুরনো পথ চলত চাষের জমিকে বাঁচিয়ে। কিন্তু নতুন সড়ক সোজা ধেয়ে চলেছে আদিবাসীদের সম্পদের প্রধান উৎস ধানজমির উপর দিয়ে। (অনিন্দ্য, ২০০১: ৮৬)

ভূমিই তাদের শেকড়ায়নের মূল ভিত্তি। কাজেই ভূমিবিচ্ছিন্নতার অর্থই হলো অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্নতা।

আত্মবিস্তারের তাগিদে অরণ্য যে কৃষিজমিতে পরিণত হচ্ছে, কিংবা কৃষিজমি যে পরিণত হচ্ছে সড়কে, তার বেশ কিছু প্রকাশ লক্ষ করা যাবে *দুখিয়ার কুঠি* উপন্যাসে। রাজধানী থেকে 'দ্যাখ দ্যাখ করে এগিয়ে' আসা এক পথ আরণ্যক জীবনে যেমন বুনে দিয়েছে অস্বস্তির বীজ, তেমনি কৃষিজীবী সমাজেও এনেছে এক অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। সড়কের আত্মবিস্তারে আবাদী জমির ওপর আকস্মিকভাবে স্তূপীকৃত উঁচু প্রাকারের চাপে শিষসমেত কাঁচা ধানের ছড়ার নোয়ানো মাথা যেন যন্ত্রসভ্যতার কাছে কৃষিসভ্যতার পরাজয়কেই প্রতীকায়িত করে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের অস্তিত্বগত টানাপড়েনও উচ্চকিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসে অরণ্যপ্রাণ মাতালুর চোখে কৃষিসভ্যতা আর যন্ত্রসভ্যতার মধ্যকার পারস্পরিক বৈপরীত্য প্রকট হয়ে ওঠে পুরোনো আর নতুন পথের স্বভাবগত তারতম্যে:

> নতুন সড়ক পুরনো পথ ধরে চলছে না। এ দুটির চালই যেন আলাদা। পুরনো পথ চলত এঁকেবেঁকে, দু'পাশের জমিকে বাঁচিয়ে। জমির শস্য বহন যে করবে, সে কর্তব্য পালন করাই যার পরম গৌরব, সে

> জমিকে খাতির না-করে পারে না। কিন্তু নতুন সড়ক সোজা ধেয়ে চলেছে। তার গতি দেখে মতি বোঝা যায় না। মনে হয় আর যে উদ্দেশ্যই তার থাক, সেটা জমি এবং ফসলকে খাতির করা নয়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৩৬-৩৭)

কালো সড়ক যন্ত্রসভ্যতা বিস্তারের প্রতীক; 'কথাটা সভ্যতা এবং তার অগ্রগতি। এক্ষেত্রে রাজপথের অগ্রগতিতে সভ্যতার গতিটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৪)। যদিও এই একই সড়ক হয়ে উঠেছে অরণ্যপ্রাণ আর কৃষিজীবী গণমানুষের শেকড়ছিন্নতারও প্রতীক। মাতালুর খালি পায়ের নিচে সদ্য মাড়ানো ধানের শিষ প্রগাঢ় এক আবেগের জন্ম দেয়। লেখক মাতালুর নগ্ন পা আর মালতির দাদার জুতো পরিহিত পায়ের মধ্য দিয়ে কৃষিজীবী আর উঠতি পুঁজিপতির জীবনের মধ্যে ভেদরেখা টেনে দিয়েছেন। জুতো একটা খোলস, সভ্যতার চাকচিক্যের অংশকে উপন্যাসে ভাটিয়ারা ধারণ করেছে, যারা যন্ত্রসভ্যতার ধারক। তাই পথই শুধু পাল্টে যায়নি, এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে জুতোও। যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিকতা কালো নদীর রূপকে কৃষকজীবনে ভাঙন সূচিত করেছে। এটি প্রতীকায়িত করেছে কালের বৈনাশিকতাকেই ।

কালো পথ নিয়ে এল নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীন এক যন্ত্রজীবী সভ্যতা। প্রতিকারহীনতার বেদনায় মাতালু দুখিয়ার কুঠির গভীরে চারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বের মূলে টান অনুভব করে। এ যেন শেকড় ওপড়ানোর বেদনা তার। আদিবাসী কৃষিজীবী মাতালু, রংবর কিংবা কাঁকরুর বেদনা এজন্য যে, এ পথ কৃষিজীবীদের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনেনি:

> অনির্দেশ্যকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে এই কালো-পথ। ওরা নিজেরাই কি জানে এই পথ ওদের কোথায় নিয়ে যাবে?...যে আদিবাসীদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই এই পথের, তাদের ভাগ্যদোষেই যেন পথটা এত কাছে অবস্থান করছে। আর সে অবস্থানের ফলে গদাধরের জলের মত এই কালো প্রবাহও তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে যাবে। কিন্তু গদাধরের গেরুয়া জল রক্তধারাকে মলিন করে না। তার প্রবাহ কালো নয়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৫)

অরণ্য মানুষের জন্য শুশ্রূষার। কালো পথের কলুষতা নেই তার। কালো পথ যেমন সভ্যতার জন্য জীবিকার যোগান দেয়, তেমনি কৃষিজীবী অরণ্যবাসী-মনস্তত্ত্বে তাদের শেকড়হীনতায় অস্তিত্বসংকটের ঝুঁকি তৈরি করে; তৈরি করে অভাববোধ। কাঁকরুর চোখে এ অভাববোধ যেন 'বিশ্বজোড়া'। মানুষের সত্তায় এক বাণিজ্যিক লোলুপতার বীজ রোপণ করেছে এ পথ। তাদের মনে হয়, 'শহরের লোকের লোলুপতা...আকস্মিকভাবে বেড়ে উঠেছে। আর সে-লোলুপতার সঙ্গে...এই কালো সড়কের যেন কোথায় একটা ঐক্য ধরা পড়েছে, যে-সড়ক চলমান কোনো সত্তার মত গ্রাস করেছে তার জমি। সব ফুরিয়ে গেলে মানুষ খাবে নাকি তারা?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৭)। সমালোচক শুভঙ্কর ঘোষ মনে করেন, এভাবেই অমিয়ভূষণ 'সভ্যতার' অগ্রগতির শ্লেষাত্মক' (শুভঙ্কর, ২০০১: ১০৮) প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে। পথ যেমন গ্রাস করেছে জীবিকার উৎস, তেমনি শহুরে মানুষের সীমাহীন লোলুপতা কি শেষপর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের মানবিক-সত্তাকে গ্রাস করবে না? এরকম একটা অব্যক্ত প্রশ্ন থেকেই যায়। কালো পিচের পথের যেমন সর্বগ্রাসী লোলুপতা, ভাটিয়াদের কন্যা মালতীর চোখেও যেন তেমনি এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। অমিয়ভূষণ মনে করেন, 'এই অতৃপ্তিই যেন ভাটিয়াদের বৈশিষ্ট্য'

(অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৫৯)। ভাটিয়াদের সম্পর্কে ডাঙ্গর আইয়ের মূল্যায়নটাও অনেকটা এরকম। আইয়ের পুরোনো স্মৃতি থেকে উঠে আসে ভাটিয়া ও আদিবাসীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস:

> কোনো একদিন কোনো এক বড় যুদ্ধে বিজয়ী ভাটিয়ারা শক্তির এমন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে বাধা দেয়ার কথা আর চিন্তা করেনি আদিবাসীরা । তারা পালিয়েছিল। ভাটিয়াদের রক্তে এখন আর সেই শক্তি নেই, কিন্তু নির্মমভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা জন্মেছে। যার ফলে বুঝে না-বুঝে তারা নির্দয় ব্যবহার করে। আর সেই পলায়নের পর থেকে আদিবাসীদের স্বভাবের মূলেও একটা পলায়নের সংস্কার জন্মেছে। যদি উপমা দিয়ে বুঝতে হয় তবে ভাটিয়ারা স্রোতস্বতী নদী, আর আদিবাসীরা সরোবর। বদ্ধ জল বলতে পারো; কিন্তু জলের নিচে যেমন পঙ্ক, জলের বুকে তেমন কহ্লার কুমুদও ফোটে দু-একটা। শান্তির কথা মনে হয় তার পাশে দাঁড়ালে। একদিন সুতীব্র গতি পারভাঙা নদী আবর্তে আবর্তে মকর কুম্ভীর নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত দেখে কোনো কবি বলতে পারে, নদীর চুম্বনে সরোবরের বুকে আলোড়ন জাগছে, তারপর একসময়ে কুমুদিনীরা হারিয়ে যায়, সরোবরের চিহ্নমাত্র থাকে না। প্রবল নদী সেই সরোবরের সবটুকু আত্মসাৎ করে নেয়। নদীর গতিপথে সরোবর নিঃশেষে লোপ পেয়ে যায়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৮১-৮২)

ভাটিয়াদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার নিয়তির টানে আদিবাসীদের অস্তিত্বগত বিনাশ ও বিলুপ্তিকেই লেখক এখানে প্রতীকায়িত করেছেন। শহুরে টানে এভাবেই যান্ত্রিকজীবনের বিনাশী স্রোতে গা ভাসিয়ে আদিবাসী মানুষ তাদের জীবিকা, ধর্ম, সংস্কৃতি তথা শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যন্ত্রসভ্যতার লেলিহান লোভের আগুনে তাদের সব নিঃশেষিত। এর বিপরীতে দাঁড়ানো আদিবাসী প্রাণে লোভ নেই। বরং লোভকে তারা অপদেবতার মত ভয় পায়। আইয়ের মনে হয়, লোভকে 'দেখতে নাকি সাপের মত, সাপ আবার কখনো ভাটিয়াদের সড়কের মত। হুস হুস করে একদিক চলে যেতে থাকলেই হলো, বাড়তে থাকলেই হলো। লোভ, সড়ক, সাপ কাকে দেখে শেখে বলা যায় না' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৮৭)। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> আধুনিকতার কালো রঙের সড়ক জমি আর ফসলকে পরোয়া করে না। ফুলবর তাই সড়ককে সাপের মত দেখে। লোভ, সড়ক আর সাপ এদের মধ্যে তফাৎ করা যায় না। রাস্তা তৈরির স্টিমরোলার নির্মম ভঙ্গিতে সব বাধাকে চূর্ণ করে এগিয়ে যায়। বিদেশী মানুষের স্রোত এগিয়ে আসছে গদাধরপুরের দিকে। ... বিশ্বজোড়া অভাববোধের সাথে যুক্ত হয়ে গেল দুখিয়ার কুঠির মানুষজনের বিপন্নতা। জন্ম নিল আধুনিকতা। বেদনা- বিপন্নতা-বিচ্ছিন্নতা-নিঃসঙ্গতা যার অন্য একটি নাম। (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ১০৫)

লেখক রূপান্তরিত সময়ের স্বভাবস্বর ধারণ করতে গিয়ে কাঁকরু আর রংবরের অভিজ্ঞতার সাযুজ্য টেনেছেন। রংবর আর কাঁকরু দুজন দুই সময়ের মানুষ হলেও শোষণের চিত্র কালে কালে এক। রংবর ভাবে:

> সেই সেটেলমেন্টের সময়ে যখন অনেক ভাটিয়া এসে জমিতে লোহার শিকল ফেলে ফেলে জমিগুলোকে ছোট করে দিচ্ছিল, তখনও একবার আহার্য সংগ্রহ করার একটা উত্তেজনা গ্রামে দেখা দিয়েছিল। তখন সংগ্রহকারীদের কেউ কেউ নামমাত্র মূল্যও পেয়েছিল তাদের শ্রমের, কেউ বা পায়নি। এবার সংগ্রহকারীরা দাম পাচ্ছে এবং কখনো শ্রমের তুলনায় নগণ্য হলেও, সংগ্রহের প্রকৃতিজাত জিনিসগুলো এতদিন মূল্যহীন ছিল বলে সে-দামকেই কল্পনাতীত মনে হয়। আর সংগ্রহকারীদের একটা চারিত্রিক প্রবণতাও ধরা পড়ছে রংবরের কাছে–খুচরো পয়সা হাতে পাওয়ার যে মোহ একটা কৌতুকের খেলার মত শুরু হয়েছিল, সেটাই

> যেন এর মধ্যে প্রয়োজনের হয়ে দাঁড়িয়েছে।...এরই ফলে কি সবকিছুর দামই বাড়বে না? শহরের জন্য কি ধানও দরকার হবে না?...যে চড়া দামে ধান বিক্রি হয়, কিনবার সময়ে চাষীকে তার চাইতেও বেশি দাম দিতে হয়। মুদ্রার প্রচলন হবার পর থেকেই এটা হয়েছে। এবারও যদি ধানের দাম চড়ে যায় তাহলে চাষীরা কি খাওয়ার ধানের কথা ভুলে যাবে না?...(অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৭)

লেখক মূলত পুঁজিবাদী সমাজ ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশমান অবস্থাকেই এখানে তুলে ধরেছেন। মুদ্রা কেমন করে কৃষিসভ্যতাকে আত্মসাৎ করে সেটি এখানে স্পষ্ট।

গদাধরপুরে ক্রমবিকশিত নগরসভ্যতার নির্মাণ-শ্রমিক ও মালিকের যাপিত জীবনের অনৈতিক আখ্যান ধীরে গ্রাস করে দুখিয়ার কুঠির অরণ্যপ্রাণ কৃষিজীবী জীবনকে। ব্রিজ তৈরিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শ্রমিক বস্তি, শ্রমিক উপনিবেশ। এক শৃঙ্খলাহীন অরাজক শ্রমিক বস্তির মূর্তিমান আবির্ভাব ক্রমশ কাঠামো পাচ্ছিল:

> পাড়ায় পাড়ায় বিচিত্র কোলাহল, মানুষের কণ্ঠের, তার কাজের। হাতুড়ি পড়ছে পাথরে লোহায় ঠন্‌ঠনাস। ...দড়ি টেনে টেনে আস্ত শাল গাছের খুঁটি পুঁতছে মজুররা।...সাহেবপাড়ায় এঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ারদের বাংলো উঠেছে। সেখানে রাস্তাগুলো এখন সব পিচে বাঁধানো। মজুর বস্তিগুলোর সামনের পথে একহাঁটু ধুলো। বর্ষায় মানুষের পায়ে-চষা জমির মত চেহারা নিয়েছিল পথগুলো। গাড়ির চাকায় চাকায় সে কাদা সরে গিয়ে খানাখন্দ হয়েছিল এখানে সেখানে। এখন শুকিয়ে-যাওয়া মাটি ধুলো হয়ে উড়তে থাকে মানুষের পায়ে পায়ে। খানাখন্দগুলিতে পাশের বস্তি থেকে জল এসে জমা হয়। ট্রাকগুলি সে জল বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে টালমাটাল করে, মবিল ভাসা কাদাজল ছিটকে ওঠে, তবু গতি কমে না তাদের।
>
> সন্ধ্যাতেও বিরাম নেই... তাঁবুতে তাঁবুতে ডে-লাইটের আলো জ্বলে। লোহার মিস্ত্রিদের পাড়ায় এসেটিলিনের চোখ-ধাঁধানো আলোয় ওভারটাইমের কাজ হয়। শ্রমিকদের কোনো কোনো মহল্লায় বসে জুয়ার আড্ডা। কোথাও ঢোল পিটিয়ে তারস্বরে গান করে তারা।...বেশ্যাপল্লিতে হট্টগোল শুরু হয়।...এসবের মধ্যে থেকে কোনো মুসলমান শ্রমিক অকস্মাৎ আজান দিয়ে ওঠে চিৎকার ক'রে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৬১)

নায়েব-আহিলকারের মনে হয়েছিল যেন এই শ্রমিক উপনিবেশের চাপে শহরটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে ওভারসিয়ার আর ইঞ্জিনিয়ারের রংচঙে ক্রম-বর্ধমান বাড়িগুলো ক্রমশ নায়েব আহিলকারের অসহায়ত্বকেই চিহ্নিত করে দিচ্ছিল। তাই অস্তিত্বসংকটের বোধ শুধু রংবর, মাতালু আর কাঁকরুর ভেতরেই ছিল না–তাকেও কুরে কুরে খাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, 'সে যেন কোনো কৃষিভিত্তিক সভ্যতার নায়ক ও নেতা; বলবত্তর আর এক সভ্যতার কাছে চূড়ান্তভাবে হার মানতে বাধ্য হবে, এই তার ভাগ্য' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৯)। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটকের কথা। সেখানেও মেলে শ্রমিকদের ঘিঞ্জি বস্তি, যেখানে মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দিরের পাশাপাশি অবস্থান। কয়েদখানার মতই অন্ধকার যক্ষপুরিতে আকাশের আলো পৌঁছায় না। কেবল জঞ্জালের পেছনে এখনও ধুকে ধুকে বেঁচে আছে রক্তকরবী, যা এখানে প্রাণের প্রতীক; পৃথিবীর বুক চিরে যে ধনের খোঁজ চলছে, সেই মরা ধনের প্রেতের শক্তি মানব-অস্তিত্বকে গ্রাস করছে। মানুষের মানবিক অস্তিত্ব গ্রাস করে পুঁজিবাদ সেখানে তাকে সংখ্যায় পরিণত করেছিল। 'মা বসুন্ধরার আঁচল ছেঁড়া'র দল এই পুঁজিবাদী সভ্যতা। এর শক্তি আছে কিন্তু প্রাণের জাদু নেই। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই

কৃষিসভ্যতার নবান্ন উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে যন্ত্রসভ্যতা থেকে কৃষিসভ্যতায় ফিরে যাবার আকুতি প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক সত্তার বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন।

অমিয়ভূষণ শ্রমিক-উপনিবেশসংবলিত একটি ক্রমবর্ধমান শহরের গতিচারিত্র্যকে ধারণ করতে গিয়ে যেন সময়কেই ধারণ করেছেন। তাঁর মনে হয়, 'একটা কেন্দ্রীয় গতির চারিদিকে শহরটাই যেন গতিমান হয়ে উঠেছে।...তাড়াতাড়ি চলছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৯)। চলমানতার মধ্যেই সময়ের স্বভাবস্বর উচ্চকিত হয়ে ওঠে। অরণ্যজীবনের সময়চেতনা, কৃষিসভ্যতার সময়বিন্যাসের সাথে ক্রমবিবর্তিত যন্ত্রসভ্যতার সময়ধারণার তারতম্য বিস্তর। এ সভ্যতায় সময়ই বিত্ত। আর এ ধারণার মুখোমুখি হতে গিয়ে অরণ্যবাসী কিংবা কৃষিজীবী মানুষের অস্তিত্ব তাল মেলাতে ব্যর্থ। পরাজয়ের এক গোপন বেদনায় তারা মুহ্যমান। যন্ত্রসভ্যতার কাছে তাদের অনিবার্য পরাজয়ের ক্রমোপলব্ধিই এই বেদনা বয়ে আনে। মাতালুর অনুভবে এ বেদনা প্রগাঢ়:

> প্রায় সকলেই হার মানছে। স্বকীয়তাকে রক্ষা করার সহজ প্রবৃত্তিটা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে বুকের মধ্যে কান্নাকাটি চেঁচামেচি করে, একের পরাজয়ে অন্যে হয়তো-বা সমবেদনা অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, অন্তত কথা দিয়ে তা নির্দিষ্ট হয় না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৫৮)।

এভাবেই দুখিয়ার কুঠিতে সভ্যতার স্রোত সন্তর্পণে প্রবেশ করেছে।

অরণ্যগ্রাসী কৃষিজমির প্রতীকে যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসে। উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই অমিয়ভূষণ আরণ্যজীবনে অনুপ্রবিষ্ট সভ্যতার বৈনাশিক রূপ আঁকতে চেয়েছেন। মহিষকুড়া গ্রাম লেখকের চোখে 'বিস্তীর্ণ সবুজ সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৩৯) সদৃশ, যে দ্বীপের চারদিকে অরণ্যের বুক চিরে রয়েছে সভ্যতার ছাপ–কালো পিচের রাস্তা। অরণ্যই গ্রামটির প্রধান পরিচয় ছিল এককালে, যখন এ অরণ্য মুঘল-তাতার-তুর্কির মত বর্হিশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা। একালে সেই বীর্যবন্ত অরণ্য তার আশ্রিতের হাত থেকেই নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। 'মুঘল-তাতার-তুর্কি যার কাছে হার মেনেছিল সেই বন যেন সাধারণ মানুষের ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছে।...এখন সে অরণ্য মানুষের কব্জায়। তার বুকে, যেন এক শত্রুরাজ্যকে শাসনে রাখতে, লোহার শিকল পরানোর মতই বা, কালো কালো পীচের রাস্তা সড়ক।...কিন্তু এত শাসন সত্ত্বেও কোথায় যেন এক চাপা অশান্তি ধিক্ ধিক্ করে, যেন বিদ্রোহ আসন্ন' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৩৯-৪০)। উপন্যাসে বর্ণিত এই চাপা ক্ষোভ অরণ্যগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে আদিম অরণ্যের। অরণ্য যে মানুষগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল, তারাই আজ 'লোভের লাঙ্গলে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪০) চাষের জমির জন্য তার উচ্ছেদ সাধন করেছে। সভ্যতার অগ্রগতি কখনই কৃষকশ্রেণি বা অরণ্যবাসী বা সর্বহারাদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনে না। উন্মূলিত অরণ্য আর সর্বহারা উন্মূল মানবাত্মা যেন অমিয়ভূষণের সাহিত্যে একাকার–কেননা অরণ্যের মতই 'ধনতান্ত্রিক আধুনিক সভ্যতার নির্মম অগ্রগতির পথে চোরাবালি তো তৈরি হয়েই থাকে বাতিল ব্রাত্যজনকে গ্রাস করার জন্যে' (তপোধীর, ২০১০: ১৮২)।

আসফাক তার অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে, '...বন কোথায় আর?...এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, এক হাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কি?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৮০)। এ উপন্যাসে জাফরুল্লা যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি, যার লেলিহান লোভ একে একে গ্রাস করেছে অরণ্য, অরণ্যবাসী মানবাত্মার স্বপ্ন আর তাদের অস্তিত্ব। 'জমির আকর্ষণ অরণ্যকে ধ্বংস করছে।...তাঁর জীবনবোধ কৃষি সভ্যতার মধ্যেও শোষণ আর শাসনের চরিত্র দেখতে পান। জাফরুল্লার কর্মচারীদের মধ্যে চাউটিয়া, আসফাক, ছমির, সাত্তার, নসির-এর জীবনযাপনের মধ্যে মজুমদার বুনতে থাকেন পোষমানা বুনো মানুষগুলিকে (বিজিতকুমার, ২০০১: ১৫৬) এবং এই আদিম-অরণ্যপ্রাণ মানুষগুলোর মুখনিঃসৃত নির্মোহ সত্যেই উন্মোচিত হয় জাফরুল্লার লোভী মুখোশ:

> জাফরুল্লাই বনের মধ্যে ঢুকেছে। আগে এদিকে কার কতটুকু জমি আর কতটুকু বন তার খোঁজ কেউ রাখত না। গাছ কেটে চাষ দিলেই হলো। কোন্ আমলা এতদূর এসে জমির মাপ দেখে খাজনা নেবে। সেইবার সেটেলমেন্ট হলো। আর তখন সেই এক কাননগো এসছিল। জাফরুল্লার বাবা ফয়জুল্লার সঙ্গে তার ফিস্‌ফাস ফুস্‌ফাস ছিল। এখানে ওখানে বনের মধ্যে ঢুকে বনের জমিকে চাষের জমি বলে লিখিয়ে কি সব করে গিয়েছে।...ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এদিকে কোথায় বন, কোথায় তার সীমা, কোথায় কার কতটুকু জমি কেউ জানত না। একবার বন এগোত, একবার চাষের খেত। বনই পিছিয়ে যেত বেশির ভাগ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৫৫-২৫৬)

কেমন করে অরণ্যবাসী আদিমপ্রাণ শেকড়-বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় সংকটে পতিত এবং শেকড়সন্ধিৎসা হয়ে ওঠে তাদের যন্ত্রণামুক্তির একমাত্র হাতিয়ার–এ উপন্যাসগুলোতে সেই বিষয়গুলোর ওপরেই জোর দিয়েছেন অমিয়ভূষণ। লেখক এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এক একটি চরিত্র বেছে নিয়েছেন, যাদের চোখে তিনি সময়ের-সভ্যতার এবং ব্যক্তিসত্তার ক্রম-রূপান্তরকে ধরতে চেয়েছেন। আরণ্যক সভ্যতাকে আদিপ্রাণ মানুষের কেন্দ্র বিবেচনা করলে অনুভূত হবে, 'নব্য প্রযুক্তি ও যন্ত্রসভ্যতা নিম্নবর্গীয় মানুষজনের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিয়ে এভাবেই তাদের প্রান্তসীমায় সরিয়ে দেয়' (দেবাশিস, ২০০৪: ৭৫)।

কালো পিচের পথ গ্রাস করেছে *হলং মানসাই উপকথার* কৃষিজীবী মানুষের অস্তিত্ব। মৃত্তিকার গভীরে চারানো শেকড় বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাও এনে দিয়েছে সেই কালো পিচপথ।

হলং নদ বা নদীর জন্মকথা দিয়ে *হলং মানসাই উপকথা* উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে, যেখানে এসেছে পাহাড় বা পাহাড়িদের জীবনপ্রসঙ্গ। একালের যন্ত্রসভ্যতাচারী মানুষের সঙ্গে শুরুতেই অমিয়ভূষণ পার্থক্য টেনে দেন অরণ্যচারী প্রাণের, যারা নদীকেই পথের প্রাণ ভাবত। অন্যদিকে, অরণ্যপ্রাণবিনাশী সড়ক ধরেই বাঙালির চলাফেরা। হলং নদ যেখানে মানসাই নদীকে স্পর্শ করতে চায়, তার খুব কাছেই নব্য শহর হয়ে ওঠার ঝোঁকে ব্যগ্র এক গ্রাম 'উখুণ্ডি'কে কেন্দ্র করেই এ উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত। অমিয়ভূষণ উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই অরণ্যময় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপ নির্লিপ্ত ও অনুপুঙ্খ দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত করেন:

> ...মাটি পুড়িয়ে ইট, এমন সে পোড়ানি যে মাটির হয় আগুনে রঙ।...পাথর পুড়িয়ে চুন, পাথর পুড়িয়ে সিরমেট। তাই দিয়ে সড়ক, বাড়ি-ঘর।...সেই ইটের সড়কের উপরে ধোঁয়া ওঠা আগুনে গরম সেই এক, যাকে কালো আগুনও বলতে পারো।... পিচের সড়ককেই যদি ততো গরম বলা হয়ে যায়, সেই পথে ছোটা ফুটন্ত পেট্রলের বাসের আর আকাশের গায়ে বসানো ইলেকট্রিক তারের উত্তাপ বোঝাতে কোনো শব্দই অবশিষ্ট থাকবে না।... সভ্যতা আর আগুন কি প্রায় সমার্থক নয়? সুতরাং বাঙালিদের আগুন কি কোচ, কি রাজবংশীতেও ঢুকে পড়ছে।...এখন গ্রামগুলো নদী বরাবর বসে না, বসে সড়ক বরাবর আর যদি বা নদীর কাছে আসে সে সড়ক তবে তো কথাই নেই; যে গ্রামের মাঝ দিয়ে সে সড়ক সে গ্রাম তো ফুলে ফেঁপে শহর। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৬)

উখুণ্ডিও এমনই এক শহর। উঠতি এই শহর কাম গ্রামে চাষের জমিতে করাতকল, ধানকল, বয়লার, শিক্ষিত হবার জন্য স্কুল, পঞ্চায়েত কি পুলিশের তাঁবু এমনকি বিনোদনের জন্য তিনঘরের বেশ্যাপল্লীও মজুদ রয়েছে। অমিয়ভূষণ খুব সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরের রেখাগুলো টানেন। শুধু *হলং মানসাই উপকথা*-তেই নয়, *দুখিয়ার কুঠি* কিংবা *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসেও রূপান্তরের এই চিত্র এঁকেছেন তিনি। যে অরণ্য গণমানুষের শেষ আশ্রয়, যে অরণ্য নিজের গহিনে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল, তারাই আজ লোভের হাত বাড়িয়ে চাষের জমির জন্য গ্রাস করছে তাকে। মাঝে মাঝে আবার উল্টোটাও ঘটে। প্রকৃতিও যন্ত্রসভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। বার বার মন বদলানো মোচড়-খাওয়া হলং নদী সড়ক আক্রমণ করেছে। 'কখনো হলং তার কাঠের সাঁকোর পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, কখনো মানসাই চর ডুবিয়ে সরে এসে সড়ককে বিপন্ন করেছে। সড়ক সরলে দেখা যায়, এক-মাইল আধ-মাইল বাঁধানো সড়ক পড়ে থাকল, আর নতুন আর পুরনো সড়কের মধ্যে বন জঙ্গল তৈরি হচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৭)। কিংবা, '...পরিত্যক্ত পথটার ফুট পঞ্চাশ চওড়া, একশো ফুট লম্বা অংশ এখনও পিচে বাঁধানো। এই অংশটার দক্ষিণে সড়কটা কীভাবে ভেঙেছিল, সেখানে ইতিমধ্যে একটা বন গজিয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩০-৩১)। কাজেই অরণ্য তার চাপা ক্ষোভ থেকেই অগ্রসরমান সভ্যতাকে গ্রাস করে তার পুরোনো রূপে ফিরে যেতে চায়। লোভের আগুনে যতই অরণ্য বা অরণ্য-অবলম্বী প্রাণের বিনাশ ঘটানো হোক না কেন, অমিয়ভূষণ মনে করেন, 'বন পুড়িয়ে ফেলেও এখন আর তুমি কিছু করতে পারো না। বনের বিশ্বাসঘাতকতায় রাগ না ভয়, কোনটা বেশি হওয়া উচিত, তা কেউ বলতে পারবে না' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪৯)। কিন্তু তবুও বনই আদিবাসী অরণ্যচারী প্রাণের আশ্রয়। 'বন না থাকলে মানুষ কোথায় মুখ লুকাতো?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬১)

হলং বন আর মানসাইঘাট শহরের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক রূপান্তরশীল সময়কে ধারণ করেন। সেই সময়, যখন আদিম অরণ্য যন্ত্রসভ্যতার জাঁতাকলে বন্দি। অরণ্য তার বীর্যবন্ত সত্তা নিয়ে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠেছে উঠতি শহর মানসাইঘাট। লেখক অরণ্য আর সভ্যতার দ্বন্দ্ব রূপায়িত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'বনের মধ্যে দিয়ে পুরনো সরু রাস্তা ছিল। পরে বাসট্রাকের সড়ক করতে গিয়েই বন কাটা হচ্ছিল। বারে বারে সড়ক সরতেই বন আবার তার পুরনো জমি দখল করছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৮)। এই দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত যন্ত্রসভ্যতাই জয়ী হয়।

দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসের মত মানসাই নদীর ওপর পাঁচ বছর ধরে ব্রিজ নির্মিত হচ্ছে, এই বছর পাঁচেকের পরিবর্তনের চিত্রচ্ছবি রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসে:

> উখুণ্ডির জীবনের ভারসাম্য ইতিমধ্যে নষ্ট হতে বসেছে।...সেখানে যে মানুষজনের ভিড় তার সংখ্যা উখুণ্ডির জনসংখ্যার পাঁচ-ছয়গুণ তো হবেই। হুড়হুড় করে একটা শহরই গড়ে উঠেছে।...সেখানে সব মানুষ যেন একই টানে কাজ করতে ছুটে চলেছে, অথচ কেউ কাউকে চেনে না। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৭)

কেউ কাউকে না চিনবার বিষয়টিতে কৌমজীবনের ভগ্ন স্বরই উচ্চকিত, যে জীবনের সময়গুলোও খণ্ডিত (period)।

সোঁদাল উপন্যাসেও সভ্যতার এই অনিবার্য সম্মুখবেগ লক্ষ করা যাবে। বড় গ্রাম কি শহর রূপান্তরের গন্ধ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। একটি মহকুমা শহরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটলেও এখানকার শহর আর গ্রামে তেমন ব্যবধান দেখানো হয়নি। বরং গ্রাম কিংবা শহর এখানে একইরকমভাবে পরিবর্তনশীল। এবং অরণ্যহীনতায় গ্রাম আর শহরের ভেতর আর কোন আব্রু আড়াল থাকছে না। গ্রাম যে শহরের অভিমুখী, সেটিও উপন্যাসে স্পষ্ট করে দিয়ে লেখক লিখেছেন:

> অন্ধকার, অন্তত আধো-অন্ধকার, সবুজ মেশানো কালচে অন্ধকার থেকে হলুদ-ধূসর-উজ্জ্বল সূর্যালোকে, আদিমতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে জেলাকে জেলা। আর সবই এই গত কয়েকটা বৎসরে । গ্রামগুলোর মধ্যে মধ্যে, গ্রাম আর শহরের মধ্যে এই অবস্থায় আড়াল, আবডালও থাকে না। গ্রামের লাগালাগা বন দূরের কথা, বনের সঙ্গে লাগালাগা দু-চার হাজার একরের ছোট বন ঠিক দু-বছরের মাথায় ধানখেত, পাটখেত, গ্রাম আর গঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুতভাবে, অলস, ভবিষ্যৎদৃষ্টিহীন, আদিম মনের মানুষেরা ছিল এখানে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৭৮)

আদিম মনের আরণ্যক মানুষেরাও আজ নিশ্চিহ্নপ্রায় কিংবা ক্রমপ্রসারমান সভ্যতার প্রভাবে মিশ্র এক সংস্কৃতির সন্তান হয়ে বেঁচে আছে, কিংবা অস্তিত্বসংকটে ভুগছে। অরণ্যবাসী মানুষ এককালে যে উদ্বেগহীন জীবন যাপন করেছে, ধীরে ধীরে সে জীবনে কালো সড়ক এনেছে জটিলতা। এক অরণ্যঘন সমৃদ্ধ জীবন আজ অতীত বলেই হয়ত অমিয়ভূষণ নির্মূল-প্রায় অরণ্যের বর্ণনায় 'ছিল' শব্দ ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি ঘটান। বন এখন মানুষের লেলিহান লোভে উজাড়। কেননা, তারা তাদের লোভী সত্তায় লালন করেছে আরো বেশি খাদ্যের নিরাপত্তা। লেখকের ভাষায়:

> এক মেহগ্নি থেকে আর এক তেমন মেহগ্নি হতে দুশো বছর লেগে যেতে পারে, একটা বন হতে হাজার বছর লেগে যায়। একটা ধানখেত তৈরি হয় এক বছরে। এক মরসুমে হাজারটা ধান আনে। এই আবিষ্কার থেকেই তো মানুষ মানুষ হলো। যদি এক মুঠো ধান লাগালে গোলা ভরে ওঠে...বনের মধ্যে কোদালের জুমচাষের চাইতে বন হাসিল করে লাঙ্গলের চাষ অবশ্যই ভালো । (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০)

এভাবেই অরণ্য উচ্ছেদ হয়ে যায়। রাভা গোষ্ঠীর ভূমিকেন্দ্রিক অস্তিত্বসংকটও মূর্ত হয়ে ওঠে উপন্যাসে। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন:

> অমিয়ভূষণ রাভা উপজাতির অস্তিত্বের সংকটকে বিভিন্ন দিক থেকে উপস্থাপিত করেছেন। রাভা উপজাতি কীভাবে ক্রমবিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা দেখানোই তাঁর অভিপ্রায়। সর্বাধিক সংকট হলো ভূমির অধিকারের সংকট। আদিবাসীরা একসময়ে মনে করতেন আকাশ, মৃত্তিকা, অরণ্য, পর্বত, নদী, প্রান্তর–এসবের কোনো মালিক নেই। সকলের ব্যবহারের জন্যই এইসব। তাই ভূ-সম্পত্তির অধিকার এবং সেই অধিকারের ভাগাভাগি সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না। অথচ মানবসভ্যতার বিবর্তনে দেখা গেল বিত্তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ভূ-সম্পত্তি। জমির দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। জমি অধিকার করবার জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে সম্পত্তি-সন্ধানী মানুষে। আদিবাসীরা বহুদিন পর্যন্ত এসব বুঝতেন না বলে যে কোনো জায়গায় সুবিধামত ফাঁকা জমি কিনে নিয়ে গড়ে তুলতেন কুঁড়ে ঘর, চাষ করতেন, বংশবৃদ্ধি হত। কিন্তু এভাবে অধিকার কায়েম করা যায় না। তাঁদের কোনো জমির পাট্টা নেই। তাই তাঁরা সহজেই হয়ে গেলেন ভুমিহীন। সরল মানুষগুলিকে কখনো উৎখাত করে, কখনো সামান্য কিছু টাকা দিয়ে তাঁদের উদ্বাস্তু করে দেয় লেখাপড়া জানা মানুষ। এভাবেই সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, শবর এবং রাভা–সকলেই হারিয়েছেন তাঁদের জমি। (সুমিতা, ২০০১: ২৭০-২৭১)

মোন্নাত অরণ্যসভ্যতা থেকে কৃষিসভ্যতা আর কৃষিসভ্যতা থেকে যন্ত্রসভ্যতার এই ক্রমরূপান্তর অনুভব করতে পারে। তার উপলব্ধি, 'ধান উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে পরিবর্তন আসে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০)। ধান উৎপাদন পদ্ধতিতে অরণ্য কেটে চাষের জায়গা হলো। উত্থান ঘটল কৃষিসমাজের। আবার লাঙলের পরিবর্তে যন্ত্র এলে ক্ষয়িষ্ণু কৃষিসমাজের স্থলাভিষিক্ত হলো যন্ত্রসভ্যতা। যন্ত্রসভ্যতায় অরণ্যহীনতা রাভা সমাজের পুরুষকে করে তোলে কর্মহীন। কারণ রাভা সমাজে নারীরাই জমির মালিক। নারীর শরীরের শান্তি পেতে রাভা পুরুষেরা তাদের কাজে সহায়তা করে। যখন সেই নারীই নেই, তখন পুরুষের আশ্রয় হয়ে ওঠে অরণ্য। কিন্তু সভ্যতা এখন অরণ্যগ্রাসী। কাজেই রাভা পুরুষেরা অস্তিত্বসংকটে পতিত, নিরাশ্রয়। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ *সোঁদাল* উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'বন অথবা বনের পাশের জমিকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা তার আশ্রয় হয় নারী না হয় বন' (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ৯২)। সমালোচকের এ মতের সঙ্গে একমত পোষণ করা দুরূহ। কারণ সভ্যতার আশ্রয় কখনো বন হতে পারে না। বরং প্রকৃতিকে বিনাশের মধ্য দিয়ে সভ্যতা তার কলেবর বৃদ্ধি করে। বলা যেতে পারে, ক্রমপ্রসারমান যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে বিনষ্ট আদিপ্রাণ মানুষের আশ্রয় হয়ে ওঠে অরণ্য, কিংবা অরণ্যগন্ধী নারী। *সোঁদালে* যেমন তিন্নি। সোঁদালের হলুদে জড়ানো তিন্নি অরণ্যের আরেক নাম।

অরণ্যবাসী মানুষের প্রান্তিকতম যাপিত জীবনের ছবি ধরা পড়েছিল এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মোন্নাতের চোখে। অরণ্যে চলতি পথে বনবিভাগের দয়ায় প্রাপ্ত কুঁড়েগুলো দেখে মোন্নাত উপলব্ধি করেছিল, তারা আর বনের মানুষ নয়। 'বনবিভাগের দয়ায় পাওয়া ছোট ছোট জমিতে তারা মকাই ফলায়, নিজেদের হাতের তৈরি কাঠ, খড়, বাঁশের তৈরি বাড়িতে হলুদ আর শীর্ণ হয়ে হয়ে বাস করে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৮)। আদিবাসী যারা, তাদের সত্তায় এখন শহুরে গন্ধ। মৈচন্দ্রের মেজ ছেলেও মনে করে, কৈচন্দ্র আর রাজবংশী নেই, সে এখন সাহেব। পিচঢালা সড়কের হাত ধরে তাই আধুনিকতার আগমন ঘটে–বনবাসী আদিম মানুষ হয় শেকড়হীন।

বাংলা সাহিত্যে যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনের চিত্র শুধু অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্যেই উঠে আসেনি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অরণ্যবহ্নি* (১৯৬৬), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭), কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* (১৩৩৯), মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৯) উপন্যাসের কথা। *আরণ্যক* উপন্যাসে বর্ণিত আজমাবাদ-লবটুলিয়া-ফুলকিয়া-স্বরস্বতী কুণ্ডর ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্যের রহস্যময়তাও একসময় সভ্যতার ক্রমপ্রসারণে ধ্বংস হয়। সত্যচরণ যে অরণ্যদেবীর শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছিলেন, নিজের হাতেই তার সৌন্দর্য হরণ করতে গিয়ে বেদনার্ত হন তিনি। প্রকৃতি দেবীর মোহনীয়তার পাশাপাশি সভ্যতার কুৎসিত মুখ তাকে ক্লান্ত করে:

> প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়া ঝাঁকার নিভৃত লতা-বিতান কত স্বপ্নভূমি জনমজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল একদিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।
>
> নাড়া বইহারের নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। (বিভূতিভূষণ, ১৪০৫: ১৪২)

সত্যচরণের গাঢ় উপলব্ধি সভ্যতার অনিবার্য অগ্রসরমানতা 'ধরণির মুক্তরূপ...কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া' (বিভূতিভূষণ, ১৪০৫: ১৪২) বস্তিতে পরিণত করেছে। উপন্যাসশেষে তাই প্রায় অবলুপ্ত অরণ্যের কাছে নতজানু প্রাণে তার ক্ষমা প্রার্থনা, 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়' (বিভূতিভূষণ, ১৪০৫: ১৬৭)। কিন্তু অরণ্য কি আদৌ ক্ষমা করে? যার বুকের ওপর দিয়ে 'হুড়মুড় করে বাস চলে, ঝরঝর করে লরি-ট্রাক, কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়ে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৩৯-৪০)–তার বুকে কী চাপা অশান্তির আগুন ধিক্ ধিক্ কওে জ্বলে না? অমিয়ভূষণ উপলব্ধি করেন, অরণ্যের 'কোথাও এমন আদিম গভীরতা আছে যা একটা মানবগোষ্ঠীকে নিঃশেষে গ্রাস করে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪০)। অরণ্য তাঁর কাছে অবচেতন মনের মত জটিল, রহস্যময়। তবু সেই রহস্যঘন অরণ্যে এক চিলতে অস্ফূট আবেগের মতই আরণ্যক মানুষ তার জীবন গড়ে নেয়। মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে যেমন কালো মানুষ 'হাজার হাজার বছর ধরে অরণ্য-প্রকৃতিতে বাস করে রচনা করে নেয় বেঁচে থাকার আশ্রয়-অবলম্বন, সে অরণ্য মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভীলদের কাছে আদিমাতা। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় সেই আশ্রয়দাত্রীকে কর্ষণের নামে ধর্ষণ করে জমিদার-মহাজন-দিকু-বেনে-আড়কাঠি সাহেব। তবু ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী বিশ্বাস করেন, বীরসার মত অরণ্যপ্রাণ মানুষ 'অরণ্যকে ছিনিয়ে নেবে দিকুদের কাছ থেকে দখল । অরণ্য মুণ্ডাদের মা, আর দিকুরা মুণ্ডাদের জননীকে অপবিত্র করে রেখেছে' (মহাশ্বেতা, ২০০৩: ৭৭)। এই অশুচিতা দূর করার আকাঙ্ক্ষা মুণ্ডাপ্রাণে প্রবল। কারণ, 'অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ ভারতের কালো মানুষরা জঙ্গলকে মা বলে জানে' (মহাশ্বেতা, ২০০৩: ১২০)। শুধু *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসেই নয়, *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* উপন্যাসেও ধানীর বক্তব্যে একই বেদনার অনুরণন ঘটেছে। ধানীর মনে হয়, 'জঙ্গলটা কাঁদত। তারে বলত, দিকুতে-মালিকে-সাহেবে–সব মিলে মোরে অশুচ, লেংটা, বেবস্তর করে দিয়াছে...' (মহাশ্বেতা, ২০০৩: ৩১)। মহাশ্বেতা দেবী,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অমিয়ভূষণ এভাবেই আরণ্যক জীবনের বিনষ্টির চিত্র রূপায়িত করেন উপন্যাসে।

সময়ের অভিঘাতে আদিপ্রাণ মানুষের অস্তিত্বসন্ধিৎসা

সমালোচক সুবোধ ঘোষ লিখেছেন:

> রিভার্স নামক বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মেলানেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের বংশাবনতির কারণ সম্বন্ধে তাঁর লেখার মধ্যে এই মতবাদ প্রচার করেন যে–উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে মেলানেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের জনসংখ্যা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে।...উন্নত সভ্যতার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলেই আদিবাসীরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, মনোবল হারিয়েছে ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলছে। (সুবোধ, ১৩৫৫: ১০১)

রিভার্সের এই তত্ত্ব থেকেই নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ের এলুইন মনে করেন যে, আদিবাসী অঞ্চলের রেল, পুল, সড়ক ইত্যাদি আদিবাসীদের সামাজিক সংহতি (Tribal Solidarity) বিনষ্ট করে। (The souls of The people are solied and grimy with the dust of passion motor buses)

সুবোধ ঘোষ মনে করেন, সড়কের জন্যে কোনও আদিবাসী সমাজ ভেঙে পড়েনি। সড়ক হলে হয়তো আদিবাসী অঞ্চলে বাইরের ব্যবসায়ী ও মহাজনের আবির্ভাব সহজ হয়ে পড়ে, যার ফলে আদিবাসীদের আর্থিক শোষণ সহজ হয়। কিন্তু, সড়কহীনতা আদিবাসীর পক্ষে রক্ষাকবচ নয়। সুবোধ ঘোষের এই মতের সঙ্গে একমত হওয়া দুরূহ। কারও কারও মতে, সভ্যতা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ নয়। বরং সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অরণ্যপ্রাণ মানুষের কুপ্রথা দূর হয়ে তারা সভ্য হয়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আদিবাসীদের কৌম জীবন-জীবিকা আর মূল্যবোধ-সংস্কৃতির প্রতি যন্ত্রসভ্যতা এক বিনষ্টির জন্ম দেয়। অমিয়ভূষণ মনে করেন, আরণ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে জীবনচর্যায় অভ্যস্ত, তাদের সেই আটপৌরে যাপিত জীবনে সভ্যতার সম্মুখগতি নানা নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে। শুধু আর্থিক শোষণই নয়, মূল্যবোধগত অবক্ষয়, নাগরিক জীবনযাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সভ্যতার ক্রমপ্রসারণে অরণ্যহীনতা এবং কৃষিজমি ও কৃষিজমির বিলোপ সাধনে যন্ত্রসভ্যতা খুব সন্তর্পণে আদিবাসী জীবনের সংহতি বিনষ্ট করে। এভাবেই অমিয়ভূষণ ভাবতে চেয়েছেন, এবং সেই ভাবনা সঞ্চারিত করেছেন পাঠক চেতনায়।

দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে কৃষিসভ্যতা আর যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্বে ক্ষতাক্ত মাতালুর চাইতেও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত চরিত্র কাঁকরু। কাঁকরু এবং কাঁকরুর মত যারা সভ্যতার আগ্রাসনে নিঃস্ব হয়েছে তাদের শেকড়হীন উন্মুল-সত্তার কান্না গভীরভাবে অনুভব করেছে মাতালু ।

সুস্পষ্টভাবে কোন সময়ের উল্লেখ না থাকলেও কয়েকটি চাবিশব্দ দিয়ে এ উপন্যাসের সময়কাল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উপন্যাসের নানা ঘটনা থেকে বোঝা যায়, দুখিয়ার কুঠিতে উল্লেখিত রাজধানী শহরটি মূলত ব্রিটিশ আমলের কোচবিহার। হেরম্ব গোঁসাইয়ের গদাধরপুর মহকুমায় আগমন প্রসঙ্গে লেখক সন্তর্পণে উপন্যাসটির অতীতকাল চিহ্নিত করেন এভাবে: 'কোম্পানির রাজত্ব থেকে অনেক লোক এ রাজ্যে নানা কাজ

নিয়ে অনুপ্রবেশ করতেন এর কিছুদিন আগে থেকেই। বড় বড় রাজপুরুষ থেকে পেয়াদা চাপরাসির পদে পর্যন্ত তার নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। অগত্যা হেরম্ব গোঁসাই মহকুমা শহরে এসে বাঁধি কারবার ধরল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ২৯)। এ অঞ্চলে মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল, যা বিনিময় প্রথার অবলোপ ঘটায়। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'হেরম্ব এ অঞ্চলে আসার আগেই মুদ্রার প্রচলন কিছু কিছু হয়েছিল। ঝুটি-বাঁধা রানীর ছবি আঁকা টাকার মূল্যকে এরা বিশ্বাস করতে শিখেছে তার কারণ তহসিলদারও সে টাকাকে মূল্য দেয়।...হেরম্বই এ অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন করে। অন্তত দুখিয়ার কুঠিতে সে এ বিষয়ে একটা বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৩০)। মুদ্রা প্রচলনের ইতিহাস থেকে জানা যাবে, ভারতে ১৮৫৮ সনে রাণীর মুখচ্ছবিসংবলিত মুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল। 'আদিবাসী সমাজে বিনিময় প্রথাভিত্তিক আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি খাজনা আদায়ে বিনিময় প্রথা নস্যাৎ করে, তারা চালু করে মুদ্রার ব্যবহার।...যদিও এহেন আর্থনীতিক প্রক্রিয়া আদিবাসী সমাজ জীবনের গতিশীলতায় উত্তরণ, তথাপি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা আদিবাসী সমাজের বুকে এক চরম আঘাত...' (সুবোধ, ২০১০: ১১)। এরও আগে উপন্যাসে দুখিয়ার কুঠির প্রাচীনতম অধিবাসী রংবরের স্মৃতিতে মুদ্রিত সেটেলমেন্টের কথা বলা হয়েছে। সেটেলমেন্টের ইতিহাস থেকে জানা যায়, 'কৃষকেরা আত্মবিস্তারের তাগিদে রাজার সংরক্ষিত বন থেকে ক্রমাগত চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছিল। সেটেলমেন্ট বনের ধারের অনেক জমিই আবার বনের সীমায় ঢুকিয়ে নিয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৩২)। এছাড়াও খাস জমি বন্টনের সময় একটি দেশের মূল জনস্রোতকে যতটা প্রাধান্য দেয়া হয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে ততটা প্রাধান্য দেয়া হয় না। বরং তাদের ওপর এমনভাবে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়, যাতে তারা সেই অঞ্চল থেকে আরও প্রান্তে চলে যায়। এভাবেই অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী মানবের ভূমিচ্যুতি ঘটে এবং তারা হয়ে ওঠে প্রান্তিকতম। একে 'Ghettoization' প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে, যে প্রক্রিয়ায় কোন সংখ্যালঘু শ্রেণিকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলে ঠেলে দেয়া হয়।

একাল আর সেকালের এইসব তুলনামূলক সাযুজ্যের মধ্য দিয়ে লেখক দুই কালের স্বভাবচারিত্র্য আর শোষক-শোষিতের চিত্র এঁকেছেন। যদিও এই কাল উপন্যাসের প্রবহমান বর্তমান নয়। বর্তমানের নিদারুণ অসহায়ত্ব পুরনো দিনের এই স্মৃতি খুঁড়ে বের করেছে। চরিত্রের প্রবহমান জীবন উপন্যাসের বর্তমান সময়কে নির্মাণ করে। আর তাদের স্মৃতি নির্মাণ করে অতীতকে। যন্ত্রসভ্যতার গ্রাসে মাতালুর অসহায়ত্ব-মনোদ্বন্দ্ব, মালতীর প্রতি তার আকর্ষণ, মালতীর মনোবেদনা–সময় ও সময় রূপান্তরের সঙ্গে এই চরিত্রের পথ-চলার মধ্য দিয়ে বর্তমান যেমন অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। তেমনি রংবর, ফুলমতী কিংবা মাতালুর মা ডাঙ্গর আইয়ের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে অতীত। ডাঙ্গর আই যখন খেদোক্তি করে, 'বিশ-বাইশ বছর আগেকার ঘটনা। সেটেলমেন্টের দু-এক বছর আগেই হবে।...পরিবর্তনও হতে থাকে। সেটেলমেন্টের পরে সড়ক। সড়কের পরে ব্রিজ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৮৬),–তখন ক্রমান্বয়ে সময়ের ক্রমরূপান্তরকে অনুভব করা যায়। অতীত আর বর্তমানের সহাবস্থানেই নির্মিত এ উপন্যাসের সময়কাঠামো। গদাধরপুরের টিকে থাকার আখ্যানে লেখক যুক্ত করেন বিশ-ত্রিশ বছর সময়কালকে। যখন তিনি উচ্চারণ করেন, '...গদাধরপুর তার যৌবনদশার দিকে এগোচ্ছে। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পিচ ঢালা পথ দিয়ে সদর মহকুমার সঙ্গে গদাধরপুরকে

সংযুক্ত করার চেষ্টা। নদীর ওপারে শহর থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে মাটি তুলে রাস্তা চওড়া করার কাজ চলেছে এখন, তারও মাইল দু-এক পিছনে পাথর পড়েছে রাস্তায়...' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ২০)-তখন এর ভেতরেই লেখক রূপান্তরিত সময়ের কণ্ঠস্বর গুঁজে দেন। বর্তমানটিও যে কোম্পানির শাসনেই অতিবাহিত, সেটি চিহ্নিত হয় নির্মীয়মাণ রাস্তার অন্তরালে কাঁকরুর জমি বিলীয়মান হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে। কাঁকরুর জমিসংক্রান্ত নালিশ নিয়ে তহশীলদারের কাছে যাবার সময় এবং সেখান থেকে ওভারসিয়ারের সঙ্গে একপথে ফেরা মাতালুর মনোভঙ্গি এখানে উল্লেখ্য:

> বিষয়টির পরিসমাপ্তিতে খানিকটা নাটকীয়তা দেখা দিল। মাতালু ও ওভারসিয়ার একই খেয়াতে গদাধর পার হয়েছিল,...প্রথমে অপরিচিত একটা তীব্র শব্দ শোনা গেল, তারপরে সেই শব্দকে অনুসরণ করে ঘটনাটা ঘটে গেল।...একখানি লাল রং-এর মনোপ্লেন যেন সেই গাছগুলোর উপরে নেমে পড়বার জন্য ছুটে এল।...ওভারসিয়ার...এরোপ্লেন দেখে...বুঝতে পেরেছিল কানাঘুষোয় যে কথাটা শোনা যাচ্ছিল এতদিনে সেটা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ পথের অগ্রগতি দেখবার জন্য রাষ্ট্রপালক নিজে বেরিয়েছেন।...ওভারসিয়ার টুপি খুলে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে গদগদ ভঙ্গিতে হাতজোড় করে বলল, 'কিছু বললেন, স্যার? হ্যাঁ, এদিকের খবর সব ভালো। শীতের আগে গদাধর নদীতে পৌঁছে যাব, ইওর ম্যাজেস্টি'। কথাগুলো সে প্রাণপণ চিৎকার করে বলতে লাগল। যেন সে এরোপ্লেনের প্রবল শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বক্তব্যকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। অতি সম্ভ্রমবোধ থেকে তার পা কাঁপছে ঠকঠক করে। মাতালু তার সব কথা শুনতে না পেলেও তার ধারণা হলো...আজ সকালেই দুখিয়ার কুঠিতে একটা গোলমাল হয়েছে,...স্বাভাবিকভাবেই সে খবরটাই সে দিয়েছে।...নতুন এই চিন্তা তার মনে দেখা দিল: ওভারসিয়ার তাহলে হার স্বীকার করবে না। বরং এই এরোপ্লেনের ঘটনা থেকে বোঝা গেল অসীম শক্তিমান আকাশপথযাত্রী রাজশক্তি তার পৃষ্ঠপোষক। হায়, বাটুল দিয়ে তুমি পাখি মারতে পারো, কিন্তু লোহার তৈরি ওই আকাশরথের কী করতে পারবে? অসহায় পরাজয়ের বেদনায় মাতালুর অনুভবগুলি ডুবে যেতে লাগল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪২-৪৩)

বোঝা যাচ্ছে রাষ্ট্রপালক 'ইউর ম্যাজেস্টি' মানেই কোম্পানি শাসনামলের কোন হর্তাকর্তা। খুব সহজেই বহিরাঙ্গিক সময়ের হিসেবটা বেরিয়ে আসে। ঘটমান বর্তমান কালের হিসেবে উপন্যাসে প্রায় বছরখানেকের চালচিত্র আঁকা হয়েছে। এই সময়পটে সংঘটিত যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাত ব্যক্তি-অস্তিত্বে যে সংকটের জন্ম দিয়েছে, উপন্যাসে তার রূপচিত্র নির্মাণে সচেষ্ট অমিয়ভূষণ।

এ উপন্যাসে কেন্দ্রশক্তির মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে নির্লিপ্তভাবে। উপন্যাসের শুরুতেই গোঁসাইদের কথা লিখেছেন অমিয়ভূষণ। দুখিয়ার কুঠির কৌমজীবনে যে বিনিময়প্রথা প্রচলিত ছিল, বড় গোঁসাই কর্তৃক মুদ্রা প্রচলনের মধ্য দিয়ে সে ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়। মানুষের জীবনে মুদ্রা সুবিধা-অসুবিধা দুটোরই জন্ম দেয়। বড়ো গোঁসাই 'হেরম্বর ব্যবসাকে অবলম্বন করে সভ্যতার নিদর্শনী একটা প্রথা দুখিয়ার কুঠিতে এইভাবে এসেছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৩০)। দুখিয়ার কুঠিতে আরও বিপ্লব নিয়ে এল হেরম্বর ভাই গজানন। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> বিনিময়-প্রথায় ধীরমন্থর গতি থাকে ধনের। মুদ্রা-প্রথায় গতিটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আগে যে কৃষকরা শহরে ধান নিয়ে গিয়ে বিনিময়ে প্রয়োজনের জিনিস সংগ্রহ করত তারা সহজে গাড়িতে ধান বোঝাই করার পরিশ্রম

> স্বীকার করতে আর চাইত না। কিন্তু মুদ্রা নিয়ে খালি হাত-পায়ে শহরে যাওয়া অন্য ব্যাপার। এর ফলে তাদের রাজধানীতে যাওয়া বেড়ে গিয়েছিল; দশটা চিত্তহারী জিনিস দেখলে তার কিছু নিজস্ব করতে ইচ্ছা যায়, তার ফলে কৃষকদের খরচের হাতটাও বেড়ে গেল। রাসমেলার উপলক্ষ ছাড়াও তারা খাজনার জন্য জমিয়ে রাখা টাকা পর্যন্ত খরচ করে ফেলত। সেই সুযোগে গজানন তেজারতি কারবার করা শুরু করল। এবং এদের দুখ-ধন অর্থাৎ বন্ধকি সম্পত্তি প্রভৃতি গ্রাস করে অতি দ্রুত আর্থিক আভিজাত্যের দিকে অগ্রসর হলো। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৩১)

দুখিয়ার কুঠি-তে এভাবেই সভ্যতার একটি ধারা প্রবেশ করে আদিবাসী মানুষের জীবনে মহাজনী-কারবারের সূত্রপাত ঘটায়। এরও প্রায় বিশ বছর পর পিচের সড়কের হাত ধরে সভ্যতা নামক এক প্রহসনের অনুপ্রবেশ ঘটে এ অঞ্চলে। 'বহিরাগত লোকজন বয়ে আনল নগর সভ্যতা। সেই বহিরাগত নাগরিকরা আদিম সভ্যতাকে গ্রাস করল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দিয়ে, জমির মাপজোক দিয়ে, আধুনিক সড়ক আর ব্রিজ দিয়ে। বহিরাগত সেইসব লোকজনের সঙ্গে কৌমজীবনের সংঘাত এবং তার অনিবার্য পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা আধুনিক উপন্যাসের মূল সূত্রটিকে পেয়ে যাই' (স্বপন, ২০০১: ৬০)। এই সময়ের পটেই ব্যক্তির সংকট ও অস্তিত্বসন্ধিৎসার বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উপন্যাসে কালো সড়ক কাঁকরুকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। সন্ধ্যার আঁধারে মাতালু নতুন সড়কের চাপে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কাঁচা ধানের ছড়া খালি পায়ে মাড়িয়ে এক গভীর বেদনা অনুভব করে:

> দুপাশের গ্রামের চাপে নিশ্চিহ্ন-প্রায় আদিম না হোক বহু পুরাতন অরণ্যের শেষ কয়েকসারি গাছ। তাদের সাধ্য কি কালো-নদীর গতিপথ রুখে দেয়ার! ওপারে গ্রামের বেদনার কথা পরোক্ষভাবে কানে আসে, প্রত্যক্ষভাবে কানে আসে রোলার ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকার, বনের গাছে কুড়ুল মারার শব্দ। একটা অস্বস্তি বোধ করছে চাষীরা। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৩৮)

কাঁকরুর জীবনেও প্রত্যক্ষভাবে এসে হানা দেয় এই মূর্তিমান অস্বস্তি। অমিয়ভূষণ অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী মানুষের শেকড়বিচ্ছিন্নতার প্রাথমিক চিত্রগুলো আঁকতে থাকেন:

> চাষীরা অপরিপক্ব ধান কেটে ঘরে তুলছে।...অনেকেরই জমির উপরে এক মানুষ সমান মাটি ফেলেছে রাস্তা-করনেওয়ালারা। জমি এবং সড়কের আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে কারো কম কারো বেশি জমি দখল করেছে সড়ক। নদীর বন্যা একসময়ে নেমে যায়। যখন সে পলির বদলে বালি দিয়ে যায় তখনও চাষীরা ভরসা করে, আর এক বন্যায় ভাগ্য পরিবর্তন হতেও পারে। কিন্তু এই কালো নদীর ক্ষেত্রে তা হবে না।
>
> কাঁকরুর সবসমেত ছ-সাত বিঘা জমি ছিল। সড়কের গতিপথের তলে তার ভাগ্য এবং জমির অধিকাংশ চাপা পড়েছে। কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়া ভুক্তাবশেষের মত সড়কের দু'পারে এখানে এক কাঠা ওখানে আধ কাঠা জমি হয়তো-বা সে খুঁজে পেতে পারে। এই গ্রামে কাঁকরু ভূমিহীন হয়ে গেল। তার কথায় লোকের আবার সেটলমেন্টের কথাই মনে পড়ে। অরণ্য থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার সে সুযোগ আর নেই যে ভূমিহীন নিজের বাহু দুটিকে ভরসা করে আশ্বাস পাবে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৩)

ভূমি কাঁকরুর আশ্রয়, তার অস্তিত্বের নামান্তর। কাজেই ক্ষতিপূরণের কথা যখন এল, তার কেবল একটি কথাই মনে হয়েছিল, '...স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে তার বদলে কেউ যদি তোমাকে টাকা দিতে চায়?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫:

৪৩)। অমিয়ভূষণের উপন্যাসে ভূমি আর নারী সমার্থক–আশ্রয়ের প্রতীক। *সোঁদাল* উপন্যাসে অমিয়ভূষণ যখন লেখেন, 'জমি আর কন্যা একই আত্মার দুই পৃথক রূপ' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮০), কিংবা *মহিষকুড়ার উপকথা* প্রসঙ্গে যখন তিনি লেখেন, আসফাক নামক 'এক অকিঞ্চনের একমাত্র রত্ন সেই রমণী ও তার গর্ভজাত আত্মজকে হারিয়ে ফেলা।...ভাষা-উলঙ্গ এক নিছক মানুষের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা (Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেত) হারিয়ে ফেলা' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৮), তখন কিন্তু মানুষের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা হয়ে দাঁড়ায় তার নারী। আর নারী ভূমির সমার্থক বলেই অমিয়ভূষণ এই দুই উপাদানকেই ব্যক্তির অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার প্রধান নিয়ামকশক্তি বলে মনে করেন। ভূমিহীন কাঁকরু এভাবেই উপন্যাসে অস্তিত্বসংকটে পতিত হয়, শেকড়-বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় ভোগে। কাঁকরুর সাংসারিক অভাববোধ, স্বাস্থ্যহীন স্ত্রী-সন্তান তাকে উপলব্ধি করায়, অনেকেরই সর্বহারা অবস্থার জন্য সড়কের লেলিহান লোভ দায়ী। যন্ত্রসভ্যতার আশু অগ্রগতির যাঁতাকলে কাঁকরুর মত ভূমিহীনদের কথা বিলীন হয়ে যায়। মাতালু অনুভব করে, ভাটিয়াদের সঙ্গে 'কোথায় যেন একটা আত্মিক যোগ আছে...ওই সড়কের।...কথাটা সভ্যতা এবং তার অগ্রগতি। এক্ষেত্রে রাজপথের অগ্রগতিতে সভ্যতার গতিটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু কী লাভ তাতে, কাকে সে লাভবান করে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৩-৪৪)। অরণ্যপ্রাণ কৃষিজীবী মানুষের লাভের পরিবর্তে সভ্যতার এই সম্মুখবেগে ক্ষতির ভাগটাই বেশি। কাঁকরুর মত ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, কিংবা, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, কালো পিচের এই সড়ক তাদের লাভবান করে না।

পিচের পথকে কেন্দ্র করে নতুন করে দুখিয়ার কুঠির প্রান্তিক মানুষ কেন্দ্রজনের চারিত্র্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। নায়েব আহিলকার এবং ওভারসিয়ারের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করে শাসকশ্রেণির কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে। অমিয়ভূষণ যদিও স্পষ্ট করে বলেন, 'জমি বেদখল বা ধান নষ্ট করার নালিশ রাজপুরুষদের কাছে খুব বেশি আমল পায় না' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪১)। কিন্তু নায়েব আহিলকার কাঁকরুর জমি নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ পোষণ করে। এর কারণটিও স্পষ্ট করেন অমিয়ভূষণ, এর পেছনে লুক্কায়িত ছিল ব্যক্তিস্বার্থ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রেষারেষি থেকেই তিনি ওভারসিয়ারকে বিপক্ষে রেখে কৃষকদের পক্ষাবলম্বন করেন। পরবর্তীকালে শ্রমিক-উপনিবেশ গড়ে উঠলে অসহায় নায়েবের এতকালের আত্মপ্রসাদ ধুলায় মিশে যায়। কারণ:

> ওভারসিয়ারদের ঝকঝকে বাংলো তার পদমর্যাদাকে অসম্ভ্রমের ইঙ্গিত করতে লাগল।...সে কি সদরে লিখবে সম্মান ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে তার শহরে তার কুঠি ও দপ্তরের চাইতে অন্য কোনো কুঠি ও দপ্তর বেশি রংদার হওয়া উচিৎ নয়? নিরুপায় ব্যথায় সে স্থির করল, তা করে সে সদরের অফিসারদের কাছে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করবে। সে যেন কোনো কৃষিভিত্তিক সভ্যতার নায়ক ও নেতা; বলবত্তর আর এক সভ্যতার কাছে চূড়ান্তভাবে হার মানতে বাধ্য হবে, এই তার ভাগ্য। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৯)

ক্রমপ্রসারিত যন্ত্রসভ্যতা সেই বলবত্তর সভ্যতা–যার চাপে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার কেন্দ্রজনও অসহায় বোধ করে। তবে সব সভ্যতাতেই শাসকের চারিত্র্য সুবিধাবাদী বলেই কৃষিসভ্যতা আর তার চেয়ে বলবত্তর যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্রজন নিজেদের স্বার্থে একত্র হয়ে প্রান্তজনের বিপক্ষ শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এ উপন্যাসেও

এমনটিই ঘটেছে। অনন্তকাল টিকে থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গদাধরের ওপর পাতাল থেকে যে ব্রিজ গড়ে উঠছিল, সেই ব্রিজের রং চুরি করেই নায়েব আহিলকারের বাংলো রঙিন হয়ে ওঠে। আর বিনা অনুমোদনে সেই রং পাওয়াতে মর্যাদা ও বেতনে ওভারসিয়ার নায়েব আহিলকারের সমকক্ষ হয়ে ওঠে খুব সহজে। তাই আর কোন খেদের কথা শোনা যায় না নায়েবের মুখে। এভাবেই স্বার্থগত দিক থেকে কেন্দ্র-শাসকেরা হয়ে ওঠে প্রান্তজনের বিপক্ষ শক্তি ।

এ উপন্যাসে কাঁকরুর মতই মাতালু, মালতী, ডাঙ্গর আই কিংবা রংবর-ফুলমতীর দৃষ্টিতেও সভ্যতার নেতিবাচক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। গোঁসাইপুত্র মালতীর মেজদার আত্মহত্যা মালতীকে সভ্যতার নেতিবাচকতা উপলব্ধি করতে শেখায়। সে উপলব্ধি করেছে, সভ্যতার সবটুকুই বিষ নয়, অথচ তার ভাগ্যে সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো গরল দিয়ে। সে গরলে বুক জ্বলে জ্বলে ওঠে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৭৫-৭৬)। মেজদার আত্মগ্লানি, আত্মহত্যা, যন্ত্রণা, মাতালুর মনোযন্ত্রণা, কিংবা মালতীর লজ্জাকাতরতার পেছনে রয়ে গেছে এই কালো সড়ক। রংবর উপলব্ধি করেছে, এই কালো সড়কের হাত ধরেই নানা আধিব্যাধি, মৃত্যু, অনৈতিকতা এসে পৌঁছেছে দুখিয়ার কুঠিতে। মাতালু, রংবর, কাঁকরু জানে:

> অনেক মৃত্যুর কথা...জানে কিন্তু দুখিয়ার কুঠিতে নিজের জীবনের উপরে কেউ হাত দেয়নি আজ পর্যন্ত... গদাধরের ব্রিজ যেমন আকাশকে স্পর্ধা করে দ্যাখো দ্যাখো করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে, তার সঙ্গে যোগ রেখে নাকি অনেক বেদনা, নতুন আধি-ব্যাধি দেখা দেবে এ অঞ্চলে। দুখিয়ার কুঠি বাঁচবে না তার হাত থেকে । বরং যেভাবে দুখিয়ার কুঠিতে অনিবার্য একটা শহরমুখো টান ধরেছে, তাতে মনে হয় অন্যান্য গ্রামের চাইতে দুখিয়ার কুঠিতেই এই নতুন বেদনাগুলি আগে আসবে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৬৫-৬৬)

শুধু একালই নয়, আইয়ের চেতনায় ফিরে ফিরে আসে সভ্যতার ক্রমরূপান্তরের নানা ইতিহাসের কথা। সড়ক আর ব্রিজের সঙ্গেই তো এইসব অচেনা দূরের মানুষগুলোর এখানে আসা, যে দূরত্বে চিহ্নিত হয় নতুন সময়-সমাজ আর সভ্যতার শেকড়ায়ন। আইয়ের চোখে মালতী ও তার পরিবার পুরনো ভাটিয়ার অংশ, কমলা নতুন ভাটিয়া। মালতী আর কমলা যদিও একই স্রোতের দুই সত্তা, আই ভাবে, '...এই স্রোত সেই স্রোত করতে মাঝে দাঁড়ানোর মাটি অনেক সময়ে চোরাবালি হয়' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৮৮)। আই কথিত এই চোরাবালিরূপ সভ্যতাই শেষপর্যন্ত গ্রাস করেছে মাতালুকে।

গদাধরের ওপর নির্মিয়মান ব্রিজকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা শ্রমিক উপনিবেশের শ্রমিকদের প্রতি মাতালু একধরনের মমতা অনুভব করে। তার মনে হয় 'ওরা যেন একটা জালে ধরা পড়েছে, যার জন্য এত শ্রমশক্তি আর বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে, ছেলের মাকে ছেড়ে এই বিদেশে আসতে হয়। অবাক কাণ্ড এই, সেই জাল কেটে বেরুতে এরা চায় না যেন' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৬৬)। অর্থের নেশা এতই মারাত্মক। *রক্তকরবী*'র শ্রমিক-মানুষগুলো যেমন ধনের নেশায় সবুজ ভুলে মদ আর আফিম বেছে নিয়েছিল, এইসব শ্রমিক উপনিবেশের মানুষগুলোর কাছেও তেমনি অর্থ নেশাসম। *রক্তকরবী*-র বিশুর ভাবনায় মাতালুর উপর্যুক্ত বক্তব্যের অনুরণন ঘটেছে :

> এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে।...এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘন্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে।...তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।...সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে,...সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯: ৩৬৫-৩৬৬)

ক্রমস্ফীত পুঁজিবাদ শ্রমিকদের এভাবেই অর্থ-নেশায় বুঁদ করে রাখে। এছাড়াও সভ্যতার গতিময়তাও একটা আকর্ষণ। স্থবিরতার পরিবর্তে ছুটে চলার এক গভীর নেশা এদের জালে আবদ্ধ করেছে। শহরমুখো টান মাতালুকেও কিছুটা রূপান্তরিত করে। সদরের জাঁকজমকপূর্ণ রাস মেলার স্বর্গপুরীর ভেতর অকারণে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে তার। যে জলপরীদের প্রতি একটা নিষিদ্ধ কৌতূহল ছিল, খুব সহজেই সেটি তার হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয়। স্বচ্ছল আদিবাসী রমণী ডাঙ্গর আইয়ের পুত্র মাতালু ধনী শরীরে ভোট-রাজবংশী রক্ত বহন করেছে বলেই কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে সে গভীরভাবে প্রতিবাদী। উপন্যাসের শেষে মাতালুর ট্র্যাজিক পরিণতির বিপরীতে লখাইয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি বিলীয়মান কৃষিসভ্যতার বিপরীতে যন্ত্রসভ্যতার প্রগাঢ় ঝলমলে অস্তিত্ববান সত্তাকেই প্রতীকায়িত করে। গোঁসাইদের মামলায় সাক্ষ্য দেবার ক্ষেত্রে তার সত্যভাষণ চিহ্নিত করে তার প্রতিবাদী সত্তাকে। যন্ত্রসভ্যতার অনৈতিক, বিবেকবর্জিত, মানবতাহীন সত্তার লোলুপ গ্রাসে কাঁকরুর সংকটেপড়া সত্তাকে সাহস জুগিয়েছে সে। কখনো বা অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েছে। মাতালুর দুর্বলতার জায়গাটা ছিল গোঁসাইকন্যা মালতী, যে মুগ্ধতা তাকে শেষপর্যন্ত কাতর করেছে। বৃদ্ধ ফুলমতীর কাছে মালতীর, 'টানা টানা চোখ দুটিতে যতই কাজল আঁকা থাক–সেখানে প্রশান্তি নেই। বরং একটা ক্ষুধার আভাস। এ ক্ষুধাই যেন, এই অতৃপ্তিই যেন ভাটিয়াদের বৈশিষ্ট্য' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৫৯)। যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসী সত্তার সঙ্গে মালতীর সত্তা একাকার হয়ে যায়। ভাটিয়ারা আদিবাসীদের কাছ থেকে একদা উপকৃত হলেও আদিবাসীদের প্রতি তাদের নেতিবাচক আচরণ এক দুস্তর ব্যবধান তৈরি করে । অসাধারণ এক প্রতীকে লেখক মাতালুর চেতনাগত শূন্যতাকে বিবৃত করেন। অরণ্য থেকে পাখি ধরে পুষতে চাইলে লেখক কাঁকরুর অন্তর্কথনে যে ভাবনা-বীজ রোপণ করেন, সেটি মাতালুর নিঃসঙ্গতাকেই চিহ্নিত করে। তার মনে হয়, 'বন থেকে পাখিনী ধরতে পারলেও মানুষিনীর অভাব ঘোচেনা' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৯৪)। মাতালুর চেতনায় মালতীর অভাববোধ অপূরণীয়। নাগরিক জীবনাকর্ষণে রূপোপজীবী কমলার সঙ্গে তার পরিচয় ও সখ্য গড়ে উঠলেও মালতীর প্রতি সংগুপ্ত প্রণয় তাকে বার বার বিবাহিত মালতীর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। নীরবে সে উপলব্ধি করে, যন্ত্রসভ্যতার কাছে, 'প্রায় সকলেই হার মানছে। স্বকীয়তাকে রক্ষা করার সহজ প্রবৃত্তিটা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে বুকের মধ্যে কান্নাকাটি করে, একের পরাজয়ে অন্যে হয়তো-বা সমবেদনা অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়,...' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৫৮)।

উপন্যাসশেষে লখাই চক্রবর্তীর সঙ্গে লড়াইয়ের এক পর্যায়ে লখাই তাকে 'পুত্র' বলে সম্বোধন করলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয় মাতালুর চেতনায়। তার স্খলিত হাত থেকে লখাই পালিয়ে যায়। লখাইকে ধাওয়া করতে

গিয়ে শেষপর্যন্ত দুর্গম অরণ্যের বুকে জেগে থাকা হাতিগেলা চোরাবালি গ্রাস করে মাতালুকে। নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সে; কাঁকরুর প্রতি মাতালুর শেষ প্রশ্নের ভেতরে তার অবচেতনে প্রোথিত আকাঙ্ক্ষার অনুরণন অনুভূত হয়, 'বন্ধু রে, মোর ছাওয়া আছে নাকি জলপরীর ঘর?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১০১) মাতালু তার ঔরসজাত সন্তানের ভেতরেই নিজের বীজ রেখে যেতে চায়। কিন্তু স্বৈরিণী কমলার গর্ভে তার সন্তান ধারণের বিষয়টি শেষপর্যন্ত অনিশ্চিত এক প্রশ্নই থেকে যায়। উত্তর মেলে না। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই মনে করেন:

> বহুসেবিকা কমলার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয় না বিলীয়মান কৌম সমাজের শাখা-প্রশাখা। ধনতান্ত্রিক আধুনিক সভ্যতার নির্মম অগ্রগতির পথে চোরাবালি তো তৈরি হয়েই থাকে বাতিল ব্রাত্যজনকে গ্রাস করার জন্য। (তপোধীর, ২০১০: ১৮২)

উপন্যাসে মাতালুকে গ্রাস করা চোরাবালি মূলত সভ্যতার চোরাবালিরই প্রতীক। উপরে ঝা-চকচকে–বর্ণচোরা সভ্যতার মতই এই চোরাবালি। লখাইয়ের মুখে পুত্র সম্বোধন আদিপ্রাণ মাতালুর চেতনায় রোপণ করে সভ্যতার বর্ণচোরা মুখোশের চেহারা-চারিত্র্য:

> কেমন যেন একটা গোলমাল লাগছে মাতালুর।...মালতীর স্বামী লখাই, এই কথাটাই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই মৃদু আলোর চার দেয়ালের মধ্যে মালতীর কাছে অবাধ গতিবিধি যার। একটা বিদ্বেষ পোষণ করার ইচ্ছা হচ্ছে মনে, পরক্ষণে সেটা মিলিয়েও যাচ্ছে। মালতী সভ্যতা সম্বন্ধে ফিসফিস করে কী সব ধিক্কার দিয়েছিল সেই রাত্রিতে, তার কথাও মনে হচ্ছে। সভ্যতার একি চোরাবালির মত ব্যবহার। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১০০)

বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই ধোঁয়াশা দিয়ে ঘেরা আধুনিক সভ্যতা এবং এর মানুষকে।

কেন্দ্র তার নিজের স্বার্থে প্রান্তবাসী মানুষকে ব্যবহার করে। কাঁকরুকেও এভাবেই প্রয়োজন পড়ে সরকারের আবগারি বিভাগের। গদাধরপুর আর তার আশেপাশের গ্রাম্যপথগুলোতে আন্তঃপ্রাদেশিক আফিম চালানের চোরাকারবারের মূলোচ্ছেদে প্রয়োজন পড়ে কাঁকরুকে । এইসব পথ অরণ্যপ্রাণ কাঁকরুর নখদর্পণে। কাজেই কাঁকরু একে স্বীকার করে নিলেও তার ভেতরের খেদ আরও ফেনিয়ে ওঠে। সে আঁকড়ে ধরে তার স্ত্রী আর বাদ্যযন্ত্র দোতারাকে, যারা তার বাঁচার অবলম্বন। যন্ত্রসভ্যতা হয়তো তার ভূমি কেড়ে নিয়ে তাকে শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, কিন্তু তার সংস্কৃতি থেকে মূলোৎপাটন করতে পারেনি। সে বোঝে:

> সে আগের চাইতে ভালো বাজায়, বেশিবার বাজায়...আর এসবই হয়েছে সেই কালো সড়ক তেমন করে জমিটাকে চেটে দিয়ে গেছে, সে যেন স্ত্রীর ভালোবাসার আরো গভীরে পালাতে চায়, সুরের চঞ্চল তীব্রতায় নিজেকে নিমজ্জিত করতে চায়।...সে তার ছোট বাড়িটার প্রায় চারদিকে ঘিরে এমন কলা গাছ লাগিয়েছে যে সূর্য যেন তাকে আর দেখতে না পায়।...কাঁকরুকে আজকাল একটু শীর্ণ দেখায়, কিন্তু তার দৃষ্টি যেন শাণিত হয়েছে। রাত্রিতে সে আজকাল ঘুমায় না। পরনে নেংটি, কাঁধে কালো সুতোর কম্বল, পায়ে মোটা চামড়ার জুতো। কোনো দিন হাতে গুড়াল বাঁশ থাকে, কোনো দিন থাকে না। কিন্তু দোতারা থাকে। রাত্রিতে একা একা বনে জঙ্গলে ঢুঁড়ে বেড়াতে হয় তাকে, তখন দোতারার মত সঙ্গী আর কে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৯৩)

কলাগাছের দেয়াল কাঁকরুর অপমানাহত সত্তাকে আড়াল করার প্রতীক হলেও কাঁকরুর যন্ত্রণার গাঢ়ত্বের তুলনায় সেটি খানিকটা তুচ্ছতর। অন্যদিকে, তার অপমানাহত সত্তার আশ্রয় তার স্ত্রী, তার দোতারা আর অরণ্য। যে চাকরি ভাটিয়ারা তাকে দিয়েছে, সে চাকরির সঙ্গে অরণ্য যুক্ত ছিল বলে সে তাকে এত অনায়াসে গ্রহণ করে। অমিয়ভূষণ মনে করিয়ে দেন, অরণ্য মানুষের আশ্রয়। '...অরণ্যের নিস্তব্ধতায় বোধ হয় শান্তির একটা রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; সে রূপ আদিম হতে পারে, তবু মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় সুদূর অতীত থেকেই আরণ্যস্তব্ধতার প্রতি তার একটা আকর্ষণ আছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৯৪)। কারণ আদিম মানুষের অরণ্যচারিতা এখনো মানুষের নির্জ্ঞান মনে গাঢ়ভাবে বিরাজমান।

অমিয়ভূষণ কিন্তু এদের আদিপ্রাণশক্তিতে বিশ্বাস হারান না। কাঁকরুর শস্য-সমৃদ্ধ জমির ওপর যখন সেই কালো পিচের পথের এগুবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন রক্ত গরম হয়ে গেল কাঁকরুর। জমির ওপর টাঙানো শক্ত কাতার দড়িতে হাত ছড়ে গেলেও সে টেনে ছিঁড়ল দড়ি। প্রকৃতিচারী মানুষের সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার যেন এটাই প্রথম লড়াই। অসংখ্য শ্রমিককে ছত্রভঙ্গ করে দিল আড়াল থেকে ছোঁড়া তার বাঁটুলের গুলির আঘাত। যন্ত্রসভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আত্মরক্ষায় এভাবেই আদিপ্রাণশক্তি (elemental force of life) প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আদিমানবের সহজাত আত্মরক্ষাশক্তি তাকে অস্তিত্ববান করে তোলে। কাঁকরুও এভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে শামিল হয়। যদিও তারা বেশ গভীরভাবেই যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্র-শক্তিকে জানে। নৃবিজ্ঞানী জেমস স্কট তাঁর *Weapons of the weak: Eeryday forms of peasant Resistance* (1985) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, প্রান্তিক কৃষকদের একালে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে টিকে থাকতে হয়। ফলে প্রতিপদে জীবনীশক্তি-বিনাশে কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে বড় কোন বিদ্রোহে উপনীত হওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এ উপন্যাসেও কাঁকরু, চ্যারকেটুর মত আদিপ্রাণ মানুষের পক্ষে বড়ো কোন বিদ্রোহে উপনীত হওয়া হয়ে ওঠে না। আর তারা এও জানে, 'যারা কালো-নদীর প্রবাহপথের বাধা দূর করে করে রাজধানী থেকে এতটা পথ এগিয়ে এসেছে তারা পাখি নয়...যে পাখি-তাড়ানো বাঁটুল দিয়ে তাদের তাড়ানো যাবে। তারা একটা গভীর অন্যায় করছে, কিন্তু কোথায় এর প্রতিকার?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৩৯)। কাজেই অসহায় কাঁকরু এবং অন্য কৃষকের আর কোন পথ থাকে না আধপাকা ধান কাটা ছাড়া। কেন্দ্র সবসময়েই কেন্দ্রের পক্ষেই কাজ করে। সেদিক থেকে কাঁকরু চ্যারকেটু কিংবা মাতালু প্রান্তজন। তাদের পক্ষাবলম্বনের পেছনের কাহিনিটুকুও অমিয়ভূষণ তাই স্পষ্ট করে দেন। সেই সঙ্গে ফেরার পথে ওভারসিয়ারের 'টুপি খুলে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে গদগদ ভঙ্গিতে হাতজোড় করে' উড়ন্ত মনোপ্লেনের প্রতি নত হবার এই চিত্রচ্ছবি মাতালুর কাছে স্পষ্ট করে দেয় লোহার তৈরি আকাশপথযাত্রী রাজশক্তি যে যন্ত্রসভ্যতার পৃষ্ঠপোষক, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব। সে কারণেই তাঁর উপন্যাসে এদের আপাত অস্তিত্বহীন সত্তার ভেতর লেখক গুঁজে দিতে ভোলেন না তাদের বীর্যবান-অস্তিত্বের বীজ। ফলে, *মহিষকুড়ার* আসফাক কিংবা *দুখিয়ার কুঠি*-র কাঁকরুর প্রতিবাদ ইতিবৃত্তের মোড় ফেরায়। *দুখিয়ার কুঠি*-তে 'শুধু রাস্তার জন্য জমি দখল করা নয়, ছাউনির জন্যও তারা যেখানে-সেখানে জমি দখল করত, চলাচলের জন্য তারা সে-জমির উপর দিয়ে পথ করে নিত। দুখিয়ার কুঠিতে তারা এ স্বেচ্ছাচারগুলি থেকে বিরত হয়েছে।...দখলকারী শত্রুসৈন্যের মত শ্রমিকরা ঘোরাফেরা করে না দুখিয়ার কুঠিতে যেমন অন্য গ্রামে করত,

বরং কষ্টে দখল করা নালায় সন্তর্পণে বাস করছে যেন' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ৪৪)। অমিয়ভূষণ চমৎকারভাবে ক্রমবর্ধমান নগরসভ্যতার পরাজয়কে চিহ্নিত করেন। আপাত পরাজয়ের বিপরীতে এ যেন কাঁকরুর জয়।

মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে আসফাক নামক এক অস্তিত্বসংকটে পতিত নিরাশ্রয়ী মানুষের কথকতা। জোতদার জাফরুল্লার বাথানে কর্মরত চাউটিয়ার মুখনিঃসৃত উপকথায় 'উত্তেজিত ক্রুদ্ধ একটা পাহাড়সদৃশ মোষের রূপ এঁকেছেন লেখক–যার বীর্যবন্ত সত্তার ক্রোধ ও অবিনাশী শক্তিমত্তার কথা গ্রামে এখনও 'দেয়াসী' বা 'দেবাংশী' হিসেবে মুখে মুখে ফেরে। অমিয়ভূষণ উপকথার এই বীর্যবন্ত বাইসনসদৃশ মোষের ক্রোধান্বিত সত্তাকে অকিঞ্চন আসফাকের অবহেলিত ক্রোধান্বিত সত্তার সঙ্গে সমীকৃত করে তুলেছেন, যে তুচ্ছ ব্যক্তির আবেগী-স্বপ্নটুকু পর্যন্ত লুণ্ঠন করেছে যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি জাফরুল্লা।

উপন্যাসে মহিষকুড়া গ্রামের নামকরণ অথবা 'দেঁয়াসি' এক ভৈষের উপকথায় বছর দশেক আগের এক অনির্দিষ্ট সময়কাল অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী-ঐতিহ্য পুনঃনির্মাণসূত্রে বীর্যবন্ত এক মোষের প্রতিরূপক প্রতিস্থাপিত হয় নির্বীর্য আসফাকের ক্রমঅস্তিত্ববান সত্তায়। উপন্যাসে লেখক সুস্পষ্টভাবে সময়ের উল্লেখ না করলেও কয়েকটি গল্পসূত্র এর সময় চিহ্নিত করতে সহায়ক। বহিরাঙ্গিক সেই সময়পট উপস্থাপনে অমিয়ভূষণ অরণ্যময় এক জীবন আঁকেন:

> ১৯৫০-৫২-তে কোচবিহার শহরেই এক বাইসন এসেছিল। আর রাজামশাই তাকে গুলি করে মেরেছিল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪৭)

এই বাইসনই যে চাউটিয়ার উপকথার সেই দেঁয়াসী বুনা মোষ, সেরকমই এক ইঙ্গিত মেলে উপন্যাসে। বছর দশেক আগ থেকেই লেখকের মতে অরণ্য আর অরণ্যপ্রাণের নিধন-যজ্ঞের সূত্রপাত। আর সেই হিসেবে মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসের বর্তমান কালপট ধরা যেতে পারে ১৯৬০ থেকে '৬২ পরবর্তী কাল। অমিয়ভূষণের প্রায় সবগুলো উপন্যাসেই সমকালের অভিঘাত ধারণে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে। এ উপন্যাসেও অরণ্য বনাম কৃষিসভ্যতার দ্বন্দ্বের পাশাপাশি জোতদার বনাম সর্বহারা কৃষকের দ্বন্দ্ব রূপায়ণে নকশাল আন্দোলনকারী বামপন্থী রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত হয় আসফাকের চোখে। লেখক লিখেছেন:

> মাস ছয়েক আগে শহর থেকে আট-দশ জনের এক দল এসেছিল।...লাঠির ডগায়, দুই লাঠির মধ্যে, লাল ফালি কাপড়,... ছমির, নসির, আসফাক, চাউটিয়া, মোটকথা জাফরুল্লার যত লোক, গ্রামের অন্য পাঁচজনও জানতে পারল, নাকি আইন হয়েছে প্রতিদিনের কাজের জন্য সাড়ে আট টাকা করে পাওয়া যাবে। গ্রামের যত জমি দেখো, গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। তার চাইতেও মজার কথা, গিরিগৃহস্থ-আর আধিয়ার–এরা নাকি দুই জাত! তাদের মধ্যে গিরিরাই আধিয়ারদের সঙ্গে শত্রুতা করে। আর, যারা এসেছিল সকলেই নাকি এক জাত–আধিয়ার দলের তারা। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪৯)

তেভাগা আন্দোলনের পর ছয়ের দশকের কৃষক আন্দোলন দানা বাঁধার ক্ষেত্রে জমি-কাজ-মজুরি-ঋণের মত অর্থনৈতিক দাবীদাওয়াসহ প্রান্তিক কৃষকের ভেতর রাজনৈতিক চেতনারও বিকাশ ঘটেছিল। কাজেই জোতদার আর কৃষকের মধ্যকার বৈষম্যের অসন্তোষ আসফাকদের মত সর্বহারা আধিয়ারদের চেতনায় ধীরে ধীরে

গাঢ়বদ্ধ হচ্ছিল। তাদের এই চেতনাগত স্ফূরণই বেতন সম্পর্কে আসফাককে মুখ খুলতে বাধ্য করে। কালগত এইসব পরিবর্তন সর্বহারা মানুষকে ক্রমে ভাষিক করে তোলে। এই সময়কালের পটেই আসফাকের অস্তিত্ব-সংকটের চিত্র রচনা করেন লেখক।

এ উপন্যাস চেতনাপ্রবাহরীতি বুনন কৌশলে অভিনব হয়ে উঠেছে। আসফাকের প্রাকবাচনিক স্তরে প্রবহমান চিন্তাকে স্বরিত করবার আকাঙ্ক্ষায় লেখক সময়-কাঠামো নির্মাণে মনস্তাত্ত্বিক সময়চেতনা ব্যবহার করেন। ঘটনাপরম্পরা ও কালপরম্পরা ভেঙে উপন্যাসে মুখ্য করে তোলা হয়েছে আসফাকের অন্তঃচেতনায় প্রবহমান চিন্তাস্তর। অমিয়ভূষণ তাঁর জীবনের শেষতম সাক্ষাৎকারে কালপরম্পরাহীন চিন্তাস্তর সম্পর্কে বলেছেন, 'মনের কাছে টাইম কোথায়...মন...মন...সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চিন্তা করতে পারে...একই সঙ্গে কয়েক জায়গায় আছে। একই মুহূর্তে...এই মুহূর্তেই' (অমিয়ভূষণ, ২০০৬: ১৬) । এভাবে এ উপন্যাসেও তিনি আসফাকের প্রবহমান মনের গতি ধারণে সচেষ্ট। উপন্যাসে প্রায় তিনদিনের সময়পটে লেখক সুকৌশলে প্রোথিত করেন আসফাকের আকৈশোর বঞ্চনার ইতিহাস, কমরুনের সঙ্গে তার মাস তিনেকের আরণ্যক জীবনকাল, জাফরের খামারে কাটানো সাতবছরের মহিষকুড়ার জীবনকাল, জাফরের বিরুদ্ধে আসফাকের মানসগহনস্থিত প্রবল ক্ষোভ এবং সেইসঙ্গে ক্রমসম্প্রসারিত যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে আরণ্যক মানুষের ধ্বংসের কথকতা। সময় চিহ্নায়নে লেখক ঋতুর ব্যবহার করেছেন। শুধু এই উপন্যাসেই নয়, *দুখিয়ার কুঠি*, *হলং মানসাই উপকথা* কিংবা *সোঁদালে*ও লেখক কাল-পরিমাপে ঋতুর ব্যবহার করেন। অমিয়ভূষণ যখন লেখেন, 'তারপর সেই দারুণ বর্ষায়, জাফরুল্লা চুপচাপ নিকা করেছিল কমরুনকে,' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৭২), তখন যেন আসফাকের বেদনা আর কমরুন-জাফরুল্লার গোপন অভিসারের প্রতীক হিসেবে বর্ষাকাল প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। *হলং মানসাই উপকথাতে*ও চন্দানির অরণ্যজীবনে বর্ষা এসেছিল প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে। এভাবেই অনুসময়গুলো যুক্ত হয়ে নির্মিত হয় দশবছরের দীর্ঘ কাল পরিসর এবং সেটি অনুপ্রবিষ্ট হয় তিনদিনের ঘটমান বর্তমান সময়ে। ঐতিহাসিক সময়কালেরও উল্লেখ আছে উপন্যাসে; অরণ্যগহিনে মিরজুমলার হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল যে রাজা, অরণ্য যাকে আশ্রয় দিয়েছিল নিবিড় যত্নে, 'কালবশে সে অরণ্যের হ্রাস হয়েছে নতুবা জেলাগুলির জন্ম হতো না। মুঘল-তাতার-তুর্কী যার কাছে হার মেনেছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৩৯), সেই অরণ্য কালের গ্রাসে এখন রিক্ত। লেখক এভাবেই অরণ্য-ধ্বংসকারী বর্তমান কালকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেন। কালের এই বহুমাত্রিক অস্তিত্বের পট রচিত হয়েছে উপন্যাসে। আসফাককে লেখক বিচিত্রমাত্রিক সময়ধারণার পটে প্রতিস্থাপিত করে কালের অভিঘাত নির্মাণ করতে চান।

মুখ্য চরিত্র (প্রোটাগনিস্ট) আসফাকের আজন্ম সম্পর্ক ছিল না মহিষকুড়া গ্রামের সাথে। মাত্র ছয়বিঘা জমির এক বর্গাচাষীর সন্তান আসফাকের পিতা-মাতার মৃত্যু হলে জমির মালিকের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল নতুন আধিয়ারের আগমনকে ঘিরে। আর তখনও সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ প্রায় ভাষাহীন আসফাক 'শুনতে পাচ্ছিল এবার নতুন আধিয়ার আসবে। এই ছ-বিঘা জমিতে সোনা ফলাবে সে। ও আর আসফাকের কর্ম নয়। কি বলিস আসফাক? দশজনের মুখে শুনে সে বলতো–'হে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৫৪)। আসফাকের এই অস্ফুট 'হে'

শব্দেই তার অস্তিত্বসংকটময় ভাষাহীন সত্তা প্রতীকায়িত। কেননা, 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণি, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন। এমনকি বিদ্রোহের মুহূর্তেও তার চেতনা বহুলাংশে আচ্ছন্ন থাকে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের আবরণে' (পার্থ, ২০১০: ৪)। ভাষাহীন আসফাকও এর ব্যতিক্রম নয়। এসব কারণেই নতুন আধিয়ারের বাড়ি দখলের সময় অজানা এক আশঙ্কায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে অজানার পথে পাড়ি জমায় আসফাক। তার এই অজানার আশঙ্কার আড়ালে লুকিয়েছিল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে তার নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা।

স্বভূমিচ্যুত নিরাশ্রয় আসফাক তার অন্তহীন পথ চলার একপর্যায়ে পৌঁছে গেল এক নিবিড় অরণ্যে। আবিষ্কার করল এক যাযাবর বেদিয়া-দলের মোষ আর তাঁবু। আশ্রয় আর ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ প্রয়োজন হলেও অকিঞ্চন আসফাক জানতো, অরণ্য কিংবা শহর–যে কোনো জায়গায়ই খাদ্য আহরণ সুলভ নয়। অরণ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে ধীরে ধীরে সে বুঝেছিল, 'সব খেত যেমন কারো না কারো, সব বনই তেমন কারো না কারো' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৬৭)। সাত সাল পর জোতদার জাফরুল্লার খামারে কাজ করতে গিয়ে আরো গভীরভাবে তার চেতনায় প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল এই বোধ ।

উপন্যাসের অন্য একটি চরিত্র কমরুনের সঙ্গে আসফাকের সাক্ষাৎ ঐ গভীর প্রায়ান্ধকার অরণ্যে। দল-পরিত্যক্ত বেদিয়া কমরুন তখন বসন্ত রোগে সদ্য স্বামীহারা। কাজেই অন্ধকার অরণ্যে দলপরিত্যক্ত স্বামীহারা কমরুনের সঙ্গে প্রায় কৈশোরোত্তীর্ণ নিঃসঙ্গ, উন্মুলিত আশ্রয়হীন আসফাকের জীবনযাপনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো পরস্পরের অস্তিত্বগত চাহিদায়। নির্জন অরণ্যে নিঃসঙ্গ আসফাক আবিষ্কার করেছিল এক আদিম রমণীরত্ন কমরুন আর অরণ্যের সৌন্দর্যকে। লেখকের বর্ণনায় মেলে সেই সৌন্দর্যের রঙ:

> নীলাভ বেগুনী রঙের মত মেঘ মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ মেঘ বনের মাথা। বাদামী রঙের সমান্তরাল সরল রেখার মত গাছের গুঁড়ি, তার কোলে হাল্কা নীল নদীর জল। সেই নদী যেখানে সবুজে নীলে মিশান, কখনো বা মোষ রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়েমানুষের শরীর। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৬৯)।

এই শরীর কমরুনের। নির্জন অরণ্যে মিলন আসফাককে অস্তিত্ববান করে তোলে, যা সদ্য কৈশোর পেরুনো আসফাকের চেতনায় আকাঙ্ক্ষা জাগায় ঘরবাঁধার, নতুন একটি দল তৈরি করার। কিন্তু অভিজ্ঞ কমরুন দলপতি কান্টু বর্মণের মত ভরসা করেনি আসফাকের ওপর। কারণ সে জানতো, বিপদসংকুল অরণ্যে আসফাক জীবনাভিজ্ঞতাহীন–একেবারেই আনাড়ি। বসন্তশেষের এক প্রবল বর্ষায় কমরুনের বাস্তববাদী সত্তা মরিয়া হয়ে নিজের দলের খোঁজ করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছিল মহিষকুড়ার পথ, যে পথ সভ্য জগতের। অরণ্য মানুষের অকৃত্রিম-আদিম সম্পর্ককে সুপুষ্ট করে তুললেও সভ্যতা সেই সম্পর্কের বিনষ্টি ঘটায়; মহিষকুড়াও আসফাক আর কমরুনের যুগল জীবনে ব্যবধানের বিনষ্টি রচনা করেছিল।

মহিষকুড়া গ্রামে অনুপ্রবেশের পর আসফাক আর কমরুনের জীবনে আরো একবার বাঁক বদল ঘটে। জোতদার জাফরুল্লার জমিতে আসফাকের আর অন্দরমহলে কাজ জোটে কমরুনের। অরণ্যের যাযাবর জীবনের সমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কমরুন স্বাদ পেল নিশ্চত গৃহী জীবনের। ততদিনে কমরুনের মাসখানেক কেটে গেছে জাফরুল্লার অন্দরমহলে। আর জাফরুল্লার 'প্রায় কামিয়ে ফেলা হেঁড়ে মাথা' আর হাসির সঙ্গে সে ধীরে ধীরে মিল খুঁজে পেতে শুরু করেছে পুরনো দলনেতা কান্টু বর্মণের। হঠাৎ করেই 'এক সন্ধ্যা থেকে কমরুন আর এল না। তারপর সেই দারুণ বর্ষায় জাফরুল্লা চুপচাপ নিকা করেছিল কমরুনকে। জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। তার একমাত্র উত্তরাধিকারের মা' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৭২) হয়ে উঠেছিল কমরুন। মূলত কমরুনের বাস্তবতাবোধ তাকে শিখিয়েছিল তার নিশ্চিত ও নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য উন্মুলিত আসফাক নয়, বরং মহিষকুড়ার মাটির গভীরে শেকড় চারানো অস্তিত্ববান জাফরুল্লাই সঠিক নোঙর। তাই গর্ভে আসফাকের সন্তান ধারণ করেও সে জাফরুল্লাকেই বেছে নেয়। সমালোচকের ভাষায়:

> সমাজে বাঁচার জন্য যে সামান্যতম রসদ থাকা প্রয়োজন, নিরাশ্রয় আসফাক তা দিতে পারবে না।...তার উত্তরাধিকারীর আগামী লড়াইয়ের পথ প্রস্তুত করার জন্য একটা আশ্রয় থাকা দরকার–এই ভাবনা কমরুনকে নাড়া দিয়েছিল। আশ্রয় যে দিতে পারে যাবতীয় উৎসর্গ তাকে করাই স্বাভাবিক। তাই কমরুন জাফরুল্লা ব্যাপারির চার নম্বরের বিবি হয়ে গেল আর আসফাক জাফরুল্লার মুনিষ।...হাড় চালাক জাফরও কমরুনের মনের অবস্থা ধরতে পেরেছিল। (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ৯৯)

কমরুন এবং জাফর–এদের প্রয়োজন ছিল পারস্পরিক, যেখানে আসফাকের কৈশোরক আবেগ, মুগ্ধতা ছিল একেবারেই মূল্যহীন। যাযাবর কমরুনের প্রয়োজন ছিল শেকড়ায়নের, আর, পুরুষত্বহীন নিঃসন্তান জাফরুল্লার প্রয়োজন গর্ভবতী কমরুনকে, যার ভবিষ্যত সন্তান তাকে দেবে উত্তরাধিকার–নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার। কাজেই দ্বিতীয়বারের মত আসফাক তার স্বপ্নময় রমনীরত্ন আর ঔরসজাত সন্তানলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। আধিয়ারি হারানোর পর এটা ছিল তার দ্বিতীয়বারের মত অস্তিত্বসংকটে পড়া। 'কমরুন যদি হয় তার বাস্তু, তার নির্ভরতা, তাহলে সেই বাস্তু থেকে বিচ্যুত হতে হয় আসফাককে। জাফরুল্লা ব্যাপারির অঞ্চলে ঢুকে পড়তে হয় আসফাক ও কমরুনকে' (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ৫৭)। অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসের:

> গল্পটা এক অকিঞ্চনের একমাত্র রত্ন সেই রমণী ও তার গর্ভজাত আত্মজকে হারিয়ে ফেলা। যে শব্দ জানে না, প্রেম শব্দটাকেই শোনেনি, সুতরাং ভাষা উলঙ্গ এক নিছক মানুষের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা (Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেত) হারিয়ে ফেলা। তার তুলনায় জমি, জিরাত, জমির রাজনীতি এসবই অকিঞ্চিৎকর নয়? প্রবঞ্চনার গভীরতম খাদে পড়েছে আসফাক। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৮)

অমিয়ভুষণের এই উক্তি 'Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেত?'–থেকে অনুভূত হয় কমরুন আসফাকের কাছে Eve-সদৃশ এক নারী, যাকে হারিয়ে আসফাক হয়ে পড়ে মৌলিক অধিকারবঞ্চিত। সমালোচক রবিন পাল লিখেছেন, 'যাকে অধুনা Post Colonial Fiction বলা হচ্ছে তাতে কখনও কখনও তৃতীয় বিশ্বের আদিবাসী, আদিম বাসিন্দাদের জীবন উপজীব্য করে তোলা হয় যাতে Identity সন্ধান একটি সার্বিক

লক্ষণ।...অমিয়ভূষণ এ উপন্যাসে (মহিষকুড়ার উপকথা) বেছে নেন প্রান্তিক জীবন, যা পরিবর্ত্তিত হচ্ছে কালের অনিবার্যতায়।...তবে Identity সন্ধান অমিয়ভূষণের লক্ষ নয়' (রবিন, ২০১১: ১০৫-১০৬)। সমালোচকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া দুরূহ, কেননা অমিয়ভূষণ মনে করেন কমরুন আসফাকের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা। সেই জায়গাটা হারিয়ে ফেলার অন্য নাম আসফাকের মৌলিক অধিকার বিচ্যুতি, যার সঙ্গে মানুষের Identity বা অস্তিত্বের প্রশ্ন প্রগাঢ়ভাবে জড়িত। আসলে আসফাকের অস্তিত্বহীন সত্তার অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার সংগ্রামকেই লেখক উপন্যাসে প্রধান করে তুলতে চান। ফলে, সমালোচক রবিন পাল কথিত 'Identity সন্ধান অমিয়ভূষণের লক্ষ্য নয়'–বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করা কঠিন ।

কমরুনকে হারানোর বেদনা ধীরে ধীরে আসফাকের অবচেতনে ঘনীভূত হতে হতেই চাউটিয়ার মুখনিঃসৃত বীর্যবান ক্রুদ্ধ মোষের গল্প তার মনোগহনে শেকড় গেড়ে বসে, তার ভাষাহীন-প্রতিবাদহীন সত্তায় মোষের আদিম শক্তিমত্তা তাকে ধীরে ধীরে জাফরের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলে, প্রতিবাদের ভাষা যোগায়। কমরুনকে না পাবার ক্ষোভ ভাষা না পাওয়ায় তা রূপান্তরিত হয় জাফরের কাছে বেতন না পাবার ক্ষোভে। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'তার নালিশ 'বেতন না পাওয়ার' ভাষা নেয়, সেজন্য সে নিজেকে সাবাসও দেয় কিন্তু মোষ হয়ে যায়' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৮)। মোষ প্রসঙ্গে সমালোচক রবিন পাল লিখেছেন, 'আসফাককে মহিষ-মানুষ বানিয়ে তার সঙ্গে ভুলুয়া প্রসঙ্গ তুলে লেখক অনেকগুলো ব্যাপার সেরেছেন। একটা আদিম গোষ্ঠীজীবন হওয়া, পশু মানুষের সহাবস্থান, অরণ্যের অনিবার্য উপস্থিতি সব যেমন মিলেমিশে যায়–একটা অখণ্ড আর্কেকিয় পরিবেশ রচিত, উপস্থাপিত হয়' (রবিন, ২০১১: ১১০)। এভাবেই আর্কেটাইপকে ধারণ করে আসফাকের অবচেতন সত্তা বীর্যবান মোষের ক্রোধে ভাষিক হয়ে ওঠে। হাকিমের কাছে নালিশ জানাবার পর উপন্যাসে লেখক আসফাকের অন্য এক সাহসী সত্তার ছবি আঁকেন। জাফরুল্লার জন্য ওষুধ কিনতে শহরে যাবার পথে কালো পীচের সড়কের পরিবর্তে সে বুনো পথকেই বেছে নেয়, ফিরে যায় আরণ্যক জীবনের আদিমতায়। শিরায় শিরায় সে অনুভব করে উপকথার সেই বীর্যবন্ত মোষের ক্রোধ আর শক্তিমত্তা। এভাবেই সে প্রবলভাবে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। আসফাকের রূপান্তরিত মোষ-সত্তার বর্ণনা উপন্যাসে উঠে এসেছে:

> আসফাক ভাবল: সেই বুনো মোষটার কিন্তু জোড়া নেই যে তাকে লাঙ্গলে কিংবা গাড়িতে লাগাবে। সে মাথাটাকে একটু পিছনে হেলিয়ে মুখটাকে একটু তুলে হাঁটতে লাগল। শিং দোলানোর মত একবার সে মাথা দোলালো ।...
>
> আসফাক ভাবল: 'ফান্দি কিন্তুক ভইষাক বান্ধির পায় না।'...আসফাক দেখল তার সামনে একটা ঘাসবন।...সেই ঘাসের গোড়ায় একরকমের লতা। তাতে নাকছাবির মত ছোট ছোট নীল ফুল। আসফাকের মনে পড়ল এই ঘাস মোষেরা খুব পছন্দ করে। একছড়া ঘাস উপড়ে নিল আসফাক। অন্যমনস্কের মত গোড়াটাকে মুখে দিল। চুষে মিষ্টি বোধ হওয়াতেই যেন খুঁত খুঁত করে হাসল।...সে অবাক হয়ে থেমে দাঁড়ালো। তাইতো সে কোথায় এসেছে? নিজের হাতে ঘাসের ছড়া চোখে পড়ল। ঘাস খায় কেন সে? সে আর একটা ঘাস মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে আবার হাঁটা শুরু করল। তাহলে ওটা কি, এসবই কি বুনো মোষের চিহ্ন! অজ্ঞাত একটা ভয়ে শিউরে উঠল সে, আর তার ফলেই যেন ছলাৎ ছলাৎ করে খানিকটা

> কালো কালো সাহস তার বুকের মধ্যে পড়ে গরম করে তুলল সেই জায়গাটাকে।...সে ঘাসবনের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সর সর করে ঘাসের ঢেউ তুলে তুলে সে চলতে লাগল। ঘাসবনের মধ্যে কাঁটাগাছ থাকে,...একটায় লেগে তার পিরহান বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। দ্বিতীয়বার পিরহানে টান পড়তেই সে সেটাকে গা থেকে খুলে ফেলে দিল। খুঁত খুঁত করে হাসল সে।...সে দেখল তার নিজের গায়ে গাছের পাতার ছায়া! এদিকে মোষ থাকতেই পারে, কারণ পায়ের তলার মাটি ঠাণ্ডা, কেমন জল জল ভাব আছে। সে হঠাৎ মাথা তুলে ডাকল আঁ- আঁ-ড়। যেন সে তার মোষদের ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। আর সেই অবস্থায় গাছের পাতার ছায়া যেমন তার গায়ের উপরে ছায়ার ছবি আঁকছিল তার মধ্যেও ভয় আর সাহস, আনন্দ আর উত্তেজনা নানারেখা এঁকে নাচতে থাকল। সে এবার আরও জোরে আরও টেনে 'আঁ-আঁ-আঁ-ড়' শব্দ করে ডেকে উঠল। কান পেতে শুনল প্রতিধ্বনি যেন একটা উঠছে। আর সেই মুহূর্তে সে অনুভব করল সে মোষ হয়ে গিয়েছে। একটা বুনো মোষ সে নিজেই, এই ভেবে তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সে প্রাণ ভরে ডেকে উঠল আঁ- আঁ-ড় । (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪৭-২৪৮)

উদ্ধৃত অংশটুকুতে আসফাকের অরণ্যের অংশ হয়ে-ওঠা রূপান্তরিত সত্তাকে লেখক অসাধারণভাবে সমীকৃত করেছেন উপকথার বুনো মোষের সঙ্গে। একইভাবে সমীকৃত হয়েছে কমরুনের পিতলের নীল মিনা-করা নাকফুলের সঙ্গে ঘাসবনের লতায় নাকছাবির মত ছোট ছোট নীল ফুল। অরণ্যের সঙ্গে একাত্ম হতে হতেই আসফাক সভ্যতার শেষচিহ্ন হিসেবে ঘাসবনে তার পরনের 'পিরহানটুকু' ছিঁড়ে ফেলে দেয়, পুরোপুরি আরণ্যক মানুষ হয়ে ওঠে সে। তীব্রভাবে অনুভব করে তার আদিম সত্তায় কালো কালো গরম সাহসের আনাগোনা, গায়ে পাতার আলোছায়ার খেলায় ভয়-সাহস আনন্দ আর উত্তেজনার নানা রেখা। অমিয়ভূষণের ভাষায়, 'আদিম পুরুষের যন্ত্রণায় আঁড় আঁড় করে ডেকে উঠে, সে কি জমিজিরাত–বেতনের যন্ত্রণায়, নাকি ঘাসফুলে কার পিতলের নাকফুল দেখে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৮)। অমিয়ভূষণের সেই পুরনো প্রশ্নে আবার ফিরে যেতে হয়–'Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেত?' আদম ও ইভের আদিম সম্পর্ক-বীজ নরনারীর নির্জ্ঞান চেতনায় শেকড়ায়িত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই তাই আদিম পুরুষের মত একটি পুরুষ তার নারীর জন্য রক্তে বহন করে অন্ধকাম, সর্বগ্রাসী প্রণয়–নারীর ভেতর আশ্রয় খোঁজে সে। সেই নারী যখনই অন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, পুরুষের নির্জ্ঞান সত্তায় সংগুপ্ত আদমের ইভকে হারানোর বেদনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উপন্যাসে লেখক আসফাককে সেই আদিম পুরুষের যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ করে তোলেন, যেহেতু আরণ্যক জীবনের আদিমতা সে বহন করেছে অবচেতনে। উপকথার বীর্যবন্ত মোষের গল্পে যে যৌনতার ছায়াপাত ঘটেছে, তার সঙ্গে লেখক আদিম পুরুষ আদম ও ইভের যৌন জীবনকে সমীকৃত করে তোলেন। আদম-বীর্যবন্ত মোষ আর আসফাকের অন্ধকামের যন্ত্রণা উপন্যাসে একীভূত। জমিজিরাতের মালিক জাফর কমরুনকে ছিনিয়ে আসফাককে নপুংসক (ক্যাসট্রেটেড) করে দেয়। অমিয়ভূষণ মনে করেন, উপন্যাসে আসফাকের বিদ্রোহটা 'জমিজিরাতের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, জমিজিরাত যার খোলস হতে পারে সেই ভিতরের মানুষটার castration এর যন্ত্রণা' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৮)–যে যন্ত্রণা একমাত্র ইভ-বিচ্ছিন্ন আদমের যন্ত্রণার সঙ্গেই তুলনীয়। আসফাকের মনোযন্ত্রণা পুরো উপন্যাসেই কমরুনকে ঘিরে আবর্তিত। বার বার তাই নীল মিনা করা পিতলের নাকফুলের ইমেজ তার সত্তায় হানা দেয়। প্রতিবাদী করে তোলে তাকে, যে কারণে জাফরের ওষুধ আনতে গিয়ে ইচ্ছে করেই সে রাত পার করে ফিরে আসে ভোরবেলা। প্রতিশোধস্পৃহা আর

পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মিথস্ক্রিয়ায় তার মনোগহনে উচ্চকিত হয়ে ওঠে একটি বাক্য 'মুই অষুধ আনং নাই, তোমরাও মরেন নাই। তামান শুধ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৬৫)। আসফাকের এই প্রতিশোধস্পৃহার অন্তরালে পুরুষত্বহীন জাফরের প্রতি তীব্র ঘৃণার বীজ লুক্কায়িত।

জাফরুল্লার সর্বগ্রাসী সত্তা শুধু ধ্বংসই জানে, সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার নেই। যন্ত্রসভ্যতা যেমন অরণ্য বিধ্বংসী, জাফরুল্লাও তেমন। এ কারণেই জাফরের পুরুষত্বহীন সত্তার অক্ষমতা তার চার বিবির অবদমিত কামনা নিবৃত্ত করতে অপারগ। রাতের অন্ধকারে শরীরী যন্ত্রণায় কাতর আব্রুহীন মেজোবিবি কিংবা পরনে আলগা করে পরা ঘুমের পাতলা শাড়িতে শরীরের রং আর বাঁকের মোহনীয়তা, চোখের জেল্লা আর সুর্মার টানে আঁকা ঝকঝকে চোখে আসফাকের সঙ্গে ছোটবিবির গল্প করার সুতীব্র বাসনা আসফাককে জানিয়ে দেয় জীবনকে ভোগ করার তৃষ্ণা তাদের আকণ্ঠ। তাদের অস্তিত্বসংকটের যন্ত্রণাও প্রকট হয়ে ধরা পড়ে আসফাকের চোখে। কখনো কখনো বিবিদের হাসি-ঠাট্টায়, তাদের জীবন উপভোগ বঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসে বেরিয়ে আসে জাফরের অক্ষমতার নিষ্ঠুর ইতিহাস। কমরুনের সন্তান মুন্নাফ আসফাকের ঔরসজাত, জাফরের নয়। এমন যে কমরুন, এক ভরা বর্ষায় সাত সাল আগে আসফাকের গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে স্বেচ্ছায় বরণ করেছিল জাফরুল্লাকে, সেই কমরুনের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় এক অদ্ভুত অনুরোধ, 'আ, আসফাক ব্যাপারির এক গাবতান ভৈষী ধরি না পলান কেনে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৭৩)। কমরুনের বছর চারেক আগের এই অনুরোধের কথা জাফরের অনুপস্থিতিতে আসফাকের সত্তায় আলোড়ন তোলে, কমরুনকে ঘিরে আবারো তার স্বপ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিনে আসফাকের অরণ্যগন্ধী কমরুন রূপান্তরিত হয়ে গেছে জাফরের চার নম্বর বিবিতে। সে সত্তায় আর বেদিয়া সম্প্রদায়ের যাযাবর ঘ্রাণ নেই। তবু অরণ্যের মতই শৃঙ্খলিত কমরুন ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় আসফাককে মুন্নাফের পিতৃপরিচয়। আসফাক উপলব্ধি করে কেন চাউটিয়া, ছমির, নসির সত্তারের তুলনায় খামারে তার স্থান উঁচুতে। তবু এই উচ্চতা তাকে ক্ষোভ থেকে মুক্তি দেয়নি। বরং কমরুনের রূপান্তর তার মনোজগতে হাহাকার আনে। আসফাকের মনোজগতে উদ্ভাসিত কুমরের অরণ্যগন্ধী সতেজ রূপসত্তা, যা এখন গৃহী সৌন্দর্যের নামান্তর মাত্র, অভিমান জাগায়। সেই অভিমানাহত অন্তর্কথনে অরণ্যসভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্ত রূপটিও উঠে আসে উপন্যাসে:

> এখনও জাফরুল্লার বাথানে গর্ভবতী মোষ আছে। সেরকম একটাকে পেলে ধীরে ধীরে একটা মোষের দল গড়ে তোলা যায় বটে।...কিন্তু সে কথা তুমি তখন বলনি। বললে তিন সাল বাদে। তখন, যখন বুড়ি মোষটা মরল আর আমরা মহিষকুড়ার খামারে, আর বৃষ্টি বাদলে বন ভিজে গিয়েছে, আর জাফরুল্লার মধ্যে তুমি তোমার পুরনো দলপতিকে খুঁজে পেয়েছিলে, বোধহয় আমিও ভেবেছিলাম এটাই ঠিক হলো।...তা, কমরুন, ভাবল আসফাক আসল কথা বাথানে গাবতান মোষ কোথায় আর?...এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, এক হাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কি? এখন বোঝা যাচ্ছে গাবতান মোষ আর গাবতান কুমরকে নিয়ে বনে গিয়েও কিছু হত না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৭৯)

আসফাকের মনোগহনে জন্ম নেয়া এই দার্শনিক বোধ মূলত চাউটিয়া এবং বড়োবিবির অভিজ্ঞতালব্ধ উচ্চারণের প্রতিধ্বনি। চাউটিয়ার মুখ থেকে সত্য কথাগুলো বেরিয়ে আসে নির্মোহভাবে, উন্মোচিত হয় জাফরের লোভী সত্তার মুখোশ:

> জাফরুল্লাই বনের মধ্যে ঢুকেছে। আগে এদিকে কার কতটুকু জমি আর কতটুকু বন তার খোঁজ কেউ রাখত না। গাছ কেটে চাষ দিলেই হলো। কোন্ আমলা এতদূর এসে জমির মাপ দেখে খাজনা নেবে? সেইবার সেটেলমেন্ট হলো। আর তখন সেই এক কাননগো এসেছিল। জাফরুল্লার বাবা ফয়জুল্লার সঙ্গে তার ফিস্‌ফাস ফুস্‌ফাস ছিল। এখানে ওখানে বনের মধ্যে ঢুকে বনের জমিকে চাষের জমি বলে লিখিয়ে কি সব করে গিয়েছে। এখন এই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর জট খোলা কঠিন। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এদিকে কোথায় বন, কোথায় তার সীমা, কোথায় কার কতটুকু জমি কেউ জানত না। একবার বন এগোত, একবার চাষের খেত। বনই পিছিয়ে যেতো বেশির ভাগ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৫৫-২৫৬)

জাফরুল্লার মত জোতদার শ্রেণির হাতে এভাবেই অরণ্যগ্রাসী সভ্যতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। চারবিবিরও অজানা নেই তার এই ক্ষমতায়নের কথা। বড়োবিবির কণ্ঠে তাই উচ্চকিত হয়ে ওঠে ক্ষোভ:

> 'তা আসফাক, এই পিথিমিতে যত জমি দেখ তা সবই কোন না কোন জাফরের। এই যে বন দেখ তাও একজনের।...এই দেশের সীমার মধ্যে যত কিছু দেখ সবই কারো না কারো। বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যতদূরে যেখানে যাও বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে সেই বনও ,যাকে তুমি নতুন মনে কর, তাও সেই মালিকের।'...কোথায় যাবে আসফাক জাফরুল্লার এক্তিয়ার ছাড়িয়ে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৬১)

বড়োবিবির এই দার্শনিক উচ্চারণে অরণ্য-সভ্যতার বিনষ্টি প্রকট হয়ে ওঠে। কালে কালে ফয়জুল্লা কিংবা তার পুত্র জাফরুল্লারাই অরণ্যকে ধ্বংস করে। আরণ্যক মানবাত্মা আসফাক জাফরের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে উন্মূলিত হয় অরণ্যের মতই। অরণ্য যেমন শৃঙ্খলিত হয়ে পিছিয়ে গেছে কিংবা জাফরই ঢুকে গেছে অরণ্যের ভেতর, তেমনি অরণ্যের মত আসফাকেরই জাফরের এক্তিয়ারের বাইরে যাবার নিয়ম নেই। এ অরণ্যে আর যাযাবরগন্ধী কমরুন কিংবা তার সন্তানকে নিয়ে বাঁচার মত এক চিলতে ফাঁকা জমি অবশিষ্ট নেই। উপন্যাসে অরণ্য ও আসফাক যেন এক সত্তায় সমীকৃত। সমালোচকের ভাষায়:

> কামনায় মাদি মোষের ডাকে বুনো মোষের জান্তব শক্তি মানুষের মধ্যে এসে মিশেছে প্রতীকের আভায়। তাই আসফাক বুনো মোষের ডাক ডাকে বনের ভেতরে একা, সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জাফরুল্লাকে হার মানাতে চায়। জাফরুল্লার মধ্যে বনের ও প্রকৃতির আদিম শক্তি নেই, প্রাণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা নেই বলেই ওষুধ খায় এবং যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে আধিপত্য বাড়ায়। প্রাণের শক্তির অভাবেই যান্ত্রিক শক্তিতে তার প্রভুত্ব।...আদিমতার সঙ্গে যন্ত্রযুগের বিরোধই এই উপন্যাসে নতুন রূপ পেয়েছে। সভ্যতা মানেই প্রকৃতির আগ্রাসন। ভোটে, পঞ্চায়েতে, লরিটাতে বন যতো ভরে উঠেছে, বনের আদিম প্রাণ ততো কেঁদে উঠছে। (ডোরা, ১৯৮১: ১২৩-১২৪)

এ উপন্যাসে অমিয়ভূষণ ব্যক্তির অন্তর্যন্ত্রণা ও ক্ষোভের পাশাপাশি যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে আরণ্যক জীবনের বিনষ্টিকেও চিহ্নিত করেছেন, যে আগ্রাসী শক্তির প্রতিভূ জোতদার জাফরুল্লা। একদিকে আরণ্যক মানুষ আসফাক এবং অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি জাফরুল্লার মধ্যকার দ্বন্দ্ব উপন্যাসে প্রোজ্জ্বল। আসফাক জানে জাফরের বন্দুকের চকচকে নল থেকে বেরুনো 'পায়োরে'র (পাওয়ার) 'ফুলকিতে আকাশে ছোটা হরিণ নিথর হয়ে যায়' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪৪)। দহের জল উথলে ওঠে তার হুকুমে, নতজানু হয় অরণ্য। শহর

থেকে জাফরের লেল্যান্ড ট্রাক কেনা কিংবা পঞ্চায়েত প্রধান হবার সংবাদের মধ্যে দিয়ে লেখক উপন্যাসে জাফর শ্রেণির আরও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠাকে প্রতীকায়িত করে তোলেন, যে শ্রেণির ক্ষমতা কিংবা সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের আবেগি জীবনকেও করায়ত্ত করার ক্ষমতা বাড়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ধীমান দাশগুপ্ত লেখেন:

> উপন্যাসের শুরুতে যে কালো, বুনো, মর্দা মোষের কথা তাকে সমাপ্তিতে জাক্সটাপোজ করা হয় এক কালো, প্রকাণ্ড, যান্ত্রিক বস্তুর সঙ্গে। লেল্যান্ডের ট্রাক। চারদিকে এক মানুষ দেয়াল তোলা। মানুষের কাঁধ সমান উঁচু উঁচু চাকা। কুচকুচে কালো রং। দেখে আসফাক বলে, বাব্বা ইয়ার সাথত কাঁউ পারে? সে বলতে চায় এ কলের মোষের সঙ্গে কোন মোষেরই লড়াই জেতার ক্ষমতা হবে না। আর তখন আমাদের মনে পড়ে আজ শিল্প শুধু আর্ট অর্থে নয়। ইন্ডাস্ট্রি অর্থেও।...সামাজিক-প্রাকৃতিক ঐতিহ্যেও এমন আধুনিক আত্মনির্ণয় (ইন্ডাস্ট্রি ভার্সা নেচার– ...) বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি হয়েছে কি? (ধীমান, ১৯৯৪: ১৪-১৫)

আসফাকের মত উন্মূল-অস্তিত্বহীন-সর্বহারা শ্রেণির মনে শেকড় গাড়ে আরো গভীর বিশ্বাসে, দার্শনিক প্রত্যয়ে:

> ...সব বনই কারো না কারো যেমন সব জমিই কারো না কারো। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য তুমি বুনা ষাঁড় মোষ হতে পার, কিন্তু বন আর বনের নয়, তাও অন্য একজনের,...সেই যে এক সাহেব গল্প করেছিল, কুচবিহার শহরে এক রাজা শেষ বাইসন মোষটাকে গুলি করে মেরেছে। তারপর আর বুনো মর্দা মোষ কারো চোখে পড়েনি। এদিকে বুনো মোষ নিশ্চিহ্ন। এতো বোঝাই যাচ্ছে শহরের রাজারা যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছামত বনে চরতে আর কোনদিনই দেবেনা। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮ : ২৮২)

না দিলেও সর্বহারা আদিম আরণ্যক মানুষগুলোর রক্তের ভেতরেই গর্জে ওঠে এইসব বীর্যবান মোষেরা। এভাবেই উপন্যাসে সময়ের অভিঘাতে ধীরে ধীরে প্রগাঢ়ভাবে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে আসফাক। লেখকের জীবনদর্শন উপন্যাসে আরণ্যক মানুষগুলোর সত্তায়, তাদের অস্থি-মজ্জায় গাঢ়ভাবে বহমান। আসফাককে এখানে আরণ্যক মানবাত্মার প্রতিভূ করে তোলেন ঔপন্যাসিক, যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে যার শব্দহীন, ভাষাহীন প্রতিবাদ দারুণভাবে উচ্চকিত। সমালোচক অলোক রায় মনে করেন, 'মহিষকুড়ার অরণ্যে বুনো মোষ বা বাইসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু আসফাক বা তার মতো কেউ থেকে গেছে' (অলোক, ২০০৯: ২৭৫)। আসফাকের এই থেকে যাওয়া মানেই অরণ্যজীবনচারী মানুষগুলোর অস্তিত্ববান হয়ে ওঠা। অরণ্যের আদিম সৌন্দর্য একালে শোষকশ্রেণির হাতে বিনষ্ট–আসফাকের এই উপলব্ধি মূলত লেখকের দার্শনিক প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি। লেল্যান্ড ট্রাকের যান্ত্রিকতা একালের যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক। লেখক লেল্যান্ড ট্রাকের সঙ্গে সমীকৃত করেন জাফরুল্লাকে, যাদের দৌরাত্ম্যে ক্রুদ্ধ বুনো বাইসনেরা আজ নিশ্চিহ্ন প্রায়। সমালোচক মনে করেন:

> মহিষকুড়া যুক্ত হচ্ছে দেশকালগত পরিবর্তনের সঙ্গে।...মহিষকুড়ার প্রকৃতিকে মুছে দিচ্ছে যান্ত্রিক সংস্কৃতি।...সভ্যতা মানেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন। বন উজাড় করে ধেয়ে আসছে সভ্যতার চিহ্ন কালো পীচের সড়ক। বলবত্তার কর্তৃত্বের প্রতীক জাফরুল্লার মুঠোয় এই অঞ্চলের জঙ্গল,জমি...এমনকি আসফাকের সন্তান, প্রেম–সব চলে গিয়েছে। রাজনীতিতে, যন্ত্রে পরিবেশ যত উত্তপ্ত হচ্ছে বনের আদিম প্রাণ তত কাঁদছে। (অনিন্দ্য, ২০০৩: ২৬-২৭)।

তবু, অরণ্যজীবনের বিনষ্টিই এ উপন্যাসের শেষ কথা নয়। আসফাকের মত অস্তিত্বসংকটময় অরণ্যপ্রাণ প্রান্তিক মানুষের রক্তে যে দ্রোহের বীজ রোপণ করেন লেখক, যার প্রবল আবেগে যন্ত্রজীবনের বিপক্ষে যে কোনদিন গর্জে উঠবে তারা–সেই আশাবাদের মধ্য দিয়েই লেখক উপন্যাসের সমাপ্তি টানেন ।

হলং মানসাই উপকথা উপন্যাসে কেন্দ্র আর প্রান্তের গল্পটা একটু ভিন্নরকমের। চন্দানি নামক রাজবংশী এক নারী-ব্যক্তিসত্তার টিকে থাকার লড়াইয়ের কাহিনি এটি। অরণ্য আর নগরসভ্যতার দ্বন্দ্ব এখানে রূপায়িত। উখুণ্ডি গ্রামের শহর হয়ে ওঠার ঝোঁকের বিপরীতে একদল মানুষের অরণ্যচারী জীবনে ফিরে যাবার ব্যগ্রতা এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। চন্দানি আর লেদু মিঞার মনোভাবনায় ধরা পড়েছে মানসাইঘাট আর হলং বনের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে হলং বনের পিছিয়ে যাওয়া আর মানসাইঘাটের বিকশিত হবার কাহিনি। হলং নদী স্বেচ্ছাচারী বলেই তাকে বাঁধা সহজ ছিল না। এর আগে নির্মিত পথগুলো হলং এর গ্রাসে পরিত্যক্ত। অরণ্য আর সভ্যতার এই টানাপড়েনে কখনো প্রকৃতি আবার কখনো বা সভ্যতা জয়ী হয়েছে। শেষবার 'সাঁকোটা হলং-এর ভাঙনে মাঝখানে পড়েছিল নদীর। তার প্রমাণ সাঁকোর অবস্থানের দুপারেই এখন অনেকটা করে ভাঙা সেই পথ। তার কাছাকাছি জায়গায়, হলং যে সব নিচের পথটাকে ধ্বসিয়ে নিয়ে ভূমিক্ষয় করতে করতে মানসাই-এর দিকে ছুটতো, তার প্রমাণও পাওয়া যায়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৬)। তবে অরণ্য আর তার পুরনো রূপে ফিরে যেতে পারেনি। যন্ত্রসভ্যতার করাল গ্রাস বার বার আবির্ভূত হয় তার অস্তিত্ব সংহারে। অমিয়ভূষণ তাই মনে করেন, 'এইটুকু এই বন কি আর দুর্গ হতে পারে? পুরনো পথগুলোর যে কোনোটিকে ধরে ভাঙাচোরা অংশের সাপখোপ, লতাকুলের কাঁটায় জঙ্গল পার হয়ে বেপরোয়া মানুষদের বনে ঢুকতে কতক্ষণ?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৬)। তবে *দুখিয়ার কুঠি*'তে যন্ত্রসভ্যতা বিকাশে যে পিচের সড়ক ছিল প্রধানতম প্রতীক, এ উপন্যাসে সেই সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'আসপাতাল' (হাসপাতাল) আর 'হেলথসিন্টার' (হেলথসেন্টার)। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> চন্দানি বিশ্বাস করে, উখুণ্ডির বেড়ে ওঠার কারণ গ্রাম ঘেঁষে পাকা সড়ক চলে যাওয়া নয়, বরং উখুণ্ডির সব বাড়বাড়ন্তর মূলে সেই হলুদ রঙের বাড়িগুলো যাকে 'আসপাতাল', 'হেলতসিন্টার', এসব বলা হয়। এ জন্যই এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে মানুষজন উখুণ্ডিতে আসতে শুরু করে। চারিদিকেই তো রোগ আর রোগ। কে না চায় রোগমুক্তি? আর গ্রামের যে পতন শুরু হলো তাও সেই হেলথ সেন্টারের পতন থেকেই। সড়ক কি করতে পারে? সড়কের জন্য যদি গ্রাম লম্বা-চওড়া হয়েছিল, নতুন সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে গ্রামটা তো আরও চওড়া হতে পারতো। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৮)

১৯৬০ পর্যন্ত যে অরণ্য ডোরাদার বাঘকে নিজের অস্তিত্বের অংশ হিসেবে ধরে রেখেছিল, উখুণ্ডির শহর হয়ে ওঠার তীব্রতায় তার ক্ষয় ক্রমে বাড়ে। একইসঙ্গে সরকারি রাজনীতির নানা অপকৌশল, নানা অনৈতিকতা আধা-শহর উখুণ্ডির গায়ে গেড়ে বসছিল। সরকারি দলের ভোট প্রাপ্তির তাগিদে হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, এর অব্যবস্থা, নেপটিজম বা স্বজনপ্রীতি উখুণ্ডির জনজীবনে উৎকণ্ঠা ছাড়া উন্নতি বয়ে আনেনি। এই অবস্থার ভেতরেই চন্দানির অস্তিত্বসংকট ঘনীভূত হয়েছে।

হলং মানসাই উপকথা উপন্যাসে হলং বন আর মানসাইঘাট শহরের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এ উপন্যাসে বিন্যস্ত সময়কে চিহ্নিত করেন। আদিম অরণ্য একালে যন্ত্রসভ্যতার জাঁতাকলে বন্দি। অরণ্য তার বীর্যবন্ত সত্তা নিয়ে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠেছে উঠতি শহর মানসাইঘাট। লেখক অরণ্য আর সভ্যতার এই দ্বন্দ্ব রূপায়িত করতে গিয়ে লেখেন, 'বনের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা ছিল। পরে বাসট্রাকের সড়ক করতে গিয়েই বন কাটা হচ্ছিল। বারে বারে সড়ক সরতেই বন আবার তার পুরনো জমি দখল করছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৮)। ১৯৬০ পর্যন্ত বন তার আদিম বীর্যবান সত্তা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত পিচের কালো পথের ওপর বাঘ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। লেখক এই উপন্যাসের বহিরাঙ্গিক সময়কালটি এভাবেই চিহ্নিত করেন। উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ টেনে লেখক এ উপন্যাসে প্রথমেই দেশভাগের ইতিহাসকে যুক্ত করে দেন এভাবে, 'সেই দশ সাল আগে ভোটের মুখে সেই জোতদার পার্টির এম.এল. এ জোরজার করে এই গ্রামে ভিত্তির পাথর পুঁতে যায়। তার এরিয়ার মধ্যে রেফুজি প্রধান এই গ্রাম নাকি তেড়া ছিল।...গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি, আর তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং আছেও যে, তাদের দুঃখ-কষ্টের মূলে সেই জোতদার দলেরই রাজনীতি, যারা দেশটাকে ভাগ করেছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৯)। শুধু দেশভাগই নয়, বহিরাঙ্গিক সময়কাঠামো ব্যবহারে লেখক গজেনের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া ধর্ষিতা চন্দানি আর ফালটুর উদ্বাস্তু মানবমিছিলে মিশে যাওয়ার কথার মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এনে উপন্যাসের কাল চিহ্নিত করেন:

> স্টেশনের একদিকে খুব ভিড়। সেই ভিড়ের প্রান্তে একগলা মুখ ঢেকে বসেছিল চন্দানি। আর ফালটু বসেছিল ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে।...একসময়ে ফালটু এসে বলেছিল, জানো এরা সব, এই হাজার হাজার মানুষ, পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু, পালাচ্ছে। ওরা বলাবলি করছে, পালিয়ে পালিয়ে এখানে এসেছিল, আবার এখান থেকেও পালাচ্ছে। চন্দানির আর ফালটুরও সে সময়ের হতবুদ্ধি অবস্থা। এ থেকেই বোঝা যায়, তারা এই অবিরত পলায়মানদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। কোথায় কবে কাদের পালানো শেষ হবে...সেই পালানোর দলের সঙ্গে আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে উদ্বাস্তুদের কুঁড়ে আর তাঁবুর শহরে...। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৯-৪০)

অনুমান করা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বর্ডার পার হয়ে আসা শরণার্থীদের স্রোত এটি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-মেঘালয় আর ত্রিপুরায় স্থাপিত শরণার্থী শিবির তৈরি করে দিয়েছিল। আসাম দেশভাগের সময় যেমন, তেমনি একাত্তরেও বহু উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিয়েছিল। দেশভাগের পরিবর্তে এদের মুক্তিযুদ্ধকালীন শরণার্থী ভাবার আরেকটি কারণ হলো, এ উপন্যাসে লেখক নকশাল আন্দোলনকে সন্তর্পণে জুড়ে দিয়েছেন লেদু মিয়া প্রসঙ্গে, যে আন্দোলনটি ব্যাপকভাবে ১৯৬৭ সনে সক্রিয় ছিল। লেদু মিয়ার নকশাল আন্দোলনে যুক্ততা এবং পরবর্তীকালে তার অনুশোচনার কালটি আন্দোলনের আরও চার বছর পরের ঘটনা। অর্থাৎ চন্দানির সঙ্গে তার অরণ্য-সখ্যের দিনগুলো ১৯৭১ এর পরের কোনসময় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। উপন্যাসে লেখক যদিও একবারের জন্যও 'নকশাল' শব্দটি ব্যবহার করেননি, কিন্তু জোতদার আর কৃষকদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিছু মানুষের কৃষকদের পক্ষে অবস্থান এবং পরবর্তীকালে লেদু মিয়ার জোতদার হত্যা-প্রসঙ্গে অনুশোচিত হবার বিষয়টিই প্রমাণ করে কালটি নকশাল আন্দোলন-পরবর্তী কোন কাল। কারণ ১৯৭০ এর

দিকে চারু মজুমদার ছাত্রদের গেরিলা দল গঠনের ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'এখন আমাদের ছড়িয়ে প্রচার করে বেড়ানো কাজ নয়। উদ্দেশ্যহীন রাজনৈতিক প্রচার নয়, খতম অভিযানকে সফল করবার জন্য রাজনৈতিক প্রচার' (চারু মজুমদার, ১৯৬৯: ২৩)। ১৯৭০ এর দিকেই নকশাল আন্দোলনকারীদের প্রতি নেমে আসে রাষ্ট্রযন্ত্রের স্টিমরোলার। একইসঙ্গে সরকার আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার নানা ব্যবস্থা করে। ছাত্রদের ভেতর নানা হতাশা এসে বাসা বাঁধে। লেদু মিয়াও জোতদার হত্যার পর যে হতাশায় ভুগেছে, সেটিও তাদের চেতনায় রাষ্ট্র দ্বারাই অনুপ্রবিষ্ট হয়। যদিও মূল উপন্যাসে ঘটমান বর্তমান কাল মাত্র কয়েকদিনের, কিন্তু লেখক এর ভেতরেই পুরে দেন দুটো আন্দোলনের চালচিত্র। পুরো উপন্যাস জুড়ে চন্দানির অতীতচারিতায় উখুণ্ডির রূপান্তর, গজেন কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড এবং চন্দানিকে ধর্ষণ, ফালটুর হাত ধরে তার পালিয়ে যাওয়া, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে একবছরের অনির্দেশ্য পথ হাঁটা, আসামে দেড়বছর উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বসবাস, মানসাইঘাটে কুলিমহল্লায় এক বছরের অস্থায়ী সংসার পাতা, গজেনের হাতে ধরা পড়তে পড়তে লেদুর হাত ধরে অরণ্যে পালিয়ে যাবার পুরো ঘটনাগুলোই চন্দানির স্মৃতি। বর্তমান শুধু ছ'সাত মাস অরণ্যজীবনে কাটানোর শেষ ক'দিন। মনস্তাত্ত্বিক সময়বিন্যাসে চন্দানির অতীতচারিতায় উল্লম্ফনধর্মিতা ব্যবহার করেছেন লেখক। বর্তমান আর অতীত এখানে একাকার। চন্দানি অরণ্যে মাছ ধরতে ধরতেই স্মৃতিকাতরতায় নিমগ্ন হয়ে ওঠে:

> চন্দানি আবার ছিপ টানল হাসি হাসি মুখে। এবারও মাগুর। সেই ডাক্তারবাবু–সেই কালো পুলিশের গাড়িটা গ্রামে আসার পরে পরেই ছুটিতে চলে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৩)

এভাবেই লেখক এ উপন্যাসে বহিরাঙ্গিক আর মনস্তাত্ত্বিক সময়পটের মেলবন্ধনে এক গাঢ় নির্মাণ-বুনট তৈরি করেছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি অরণ্যজীবনের বিনষ্টি আর যন্ত্রসভ্যতার আত্মবিস্তারের চিত্র আঁকেন। নদী আর সড়ক ধরে চলা মানুষগুলোর ভেতরকার ব্যবধানবিন্দু, কিংবা অরণ্যময় আর অরণ্যহীন মানুষগুলোর ভেতরকার ব্যবধানবিন্দু অথবা উখুণ্ডি গ্রামের শহর হয়ে ওঠার ঝোঁকে যে রূপান্তরিত সময়ের কথকতা রচিত হয়, অমিয়ভূষণ তাকেই এ উপন্যাসে ধারণ করতে চান।

উপন্যাসে হেলথসেন্টারের নার্সের কন্যা চন্দানি অন্যতম মুখ্য চরিত্র। গজেনের চাইতে বছর দুয়েকের ছোট চন্দানির অস্তিত্বসংকটের সূত্রপাত হয়েছে গজেন কর্তৃক সরিৎ সাহা হত্যার পর থেকে। চন্দানি সরিৎ হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও তার মায়ের সাক্ষ্যই প্রমাণ করেছিল গজেনই সরিতের হত্যাকারী। কাজেই হত্যার পর বেশ কিছুদিন জেলে কাটিয়ে ফিরে আসা ফাঁসির আসামি গজেন হেলথসেন্টারের ডাক্তার আর নার্সের জন্য ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। কেননা সরিৎ এর পক্ষে আর গজেনের বিপক্ষে ফৌজদারি কোর্টে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ডাক্তার। গজেন ফিরে এলে ডাক্তার 'হেলথ সেন্টারকে ডুবিয়ে দিয়ে, আগুনে পোড়ার পরে যেমন বাড়ির কঙ্কাল পড়ে থাকে, তেমন করে দিয়ে চলে গেল– আর তা কাউকে না বলে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৪)। নার্স আর কম্পাউন্ডারের বেতনও বন্ধ হয়ে গেল সরকারি ক্ষমতার জোরে প্রভাবশালী গজেনের প্রভাবে। একমাত্র সন্তান চন্দানির ভবিষ্যত ভেবে মাথা নুইয়েছিল নার্স। চন্দানির জীবনে সর্বনাশ ঘটে সেই পথেই । মূল জটিলতা আরও অনেক আগের। সরিৎ আর গজেন সহপাঠী হলেও পারস্পরিক অহমবোধ তাদের

ভেতরকার দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করে। রোগাপটকা সরিৎকে এক অজানা কারণে সমীহ করতো গজেন, যেন বা ভয়ও পেত। আর সেই ভয় আর হিংসা থেকেই হত্যাকাণ্ড। ড্রামাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তার অভিনয়-অক্ষম সত্তা তাকে সরিৎ এর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। দ্বন্দ্ব মেটাতে তাই গজেন হত্যা করল সরিৎকে। আরো প্রভাবশালী হয়ে গ্রামে ফিরে এলে নার্সকে তার বন্ধ বেতন চালু করতে গিয়ে ড্রামাটিক ক্লাবের জন্য কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হয়েছিল, আর চন্দানিকে হারাতে হলো নারীত্ব। চন্দানির মনে হয়েছিল:

> ...ততক্ষণই হয়তো মা আর বাচ্চা, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু কিংবা ফাঁদ।...সেই রাতে রিহার্সাল শেষে সকলে চলে গেলে নার্স কি দরজা দিতে ভুলে গিয়েছিল? কিংবা...তার প্রথম আর্ত চিৎকারে সেই নার্সের ফোঁপানি কান্না শোনা যায়নি?
>
> পশু নয় তা বোঝা যাচ্ছিল, পশুর হাত থাকে না; ভূত নয় বোঝা যাচ্ছিল, ভূতের জাপটে ধরাও তা বাতাসের ধাক্কার মত হওয়া উচিত,...তা পশু, ভূত, মানুষ মিলে একটা আতঙ্ক যার সীমা থাকে না। হাত-পা ছুঁড়ে, আঁচড়ে কামড়ে তাকে এড়ানোর উপায় ছিল না।...বুঝতে পেরেছিল অসহায়ভাবে চিত হয়ে আছে সে, আর কেউ তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, খুবলে খুবলে খাচ্ছে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৬)

সভ্যতার এক অপশক্তি এই গজেন, যাকে চন্দানি 'হাঁও' বলে সম্বোধন করে। গজেনের হাত থেকে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায়ই অরণ্যচারী হয়েছিল এই নারী। অরণ্য তাকে আশ্রয় দিয়েছে, আব্রু দিয়েছে, শহর দেয়নি। চন্দানি উপলব্ধি করেছে, '...বনে ঢুকে পড়তে পারলে কোমর-সমান ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলার জন্য বেশি বুদ্ধি করতে হয় না। তা ছাড়া সূর্য আর একটু উঠলে, মাথার উপর থেকে ডালপালা–পাতার জালি-ছায়া নকসা নকসা হয়ে গায়ে পড়তে থাকবে। সে কিন্তু নকসাদার শাড়ি বলে মনে হয় দূর থেকে।...আর মানুষের চোখে পড়ে গেলে বনের আড়ালই ছেড়ে যেতে হবে, শাড়ির আড়ালে কত লুকানো যায়?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৭-৩৮)। অরণ্যের আড়াল তাই এই নারীকে অস্তিত্বের টানাপড়েন থেকে মুক্তি দেয়–অরণ্যের সঙ্গে একাকার হয়ে সে শক্তিশালী করে তোলে নিজের অস্তিত্ব।

মনস্তাত্ত্বিক সময়কাঠামোর ব্যবহারে চেতনাপ্রবাহরীতির মাধ্যমে চন্দানির চেতনার গতিকে ধারণ করেছেন লেখক। গজেনের কাছে নিগৃহীত হবার পর চন্দানি মানসিক আর শারীরিক যন্ত্রণার কালটুকু কীভাবে ক্ষেপণ করেছিল, সে স্মৃতি উপন্যাসে টুকরো টুকরো কোলাজের মাধ্যমে চিত্রিত। তার স্মৃতিতে শুধু এটুকুই রেখাপাত করেছিল, তার কোথাও একটা পালানো প্রয়োজন। ভেবেছিল, এই শরীরের বাইরে পালাতে পারলে কিছুটা স্বস্তি মিলত। আর এই সময়ই গজেনের ভাতিজা ফালটু তাকে পালানোর পথ করে দেয়। গজেনের প্রতি ফালটুর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে চন্দানির নিগ্রহ আর নিজের নিগ্রহ একাকার হয়ে ফালটুর চেতনায় দ্রোহের বীজ ডালপালা মেলে। একারণেই নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছিল তারা। প্রথমে আসাম, সেখান থেকে হাজার হাজার শরণার্থীদের সাথে শুরু হয়েছিল তাদের এক বছরের পথ হাঁটা। সভ্যতাসৃষ্ট এক নরপশু গজেন, যার হাত থেকে মুক্তি পেতেই তাদের এই পলায়ন। অস্তিত্বরক্ষার জন্যেই এই ভাবনা, 'তারা এই অবিরত পলায়মানদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। কোথায় কবে কাদের পালানো শেষ হবে, পিছনে একটা কালো হাঁও-এর ছুটে ছুটে আসা বন্ধ হবে, এ তারা ভেবে উঠতে পারে না' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪০)। *নির্বাস* উপন্যাসেও অস্তিত্বহীন,

শেকড়হীন ছেঁড়াখোঁড়া দেশত্যাগী মানব মিছিলে কাল কেটেছে বিমির। শেকড়হীন অস্তিত্বহীন এই মানুষগুলোকে লেখক উপন্যাসে এনেছেন শুধুমাত্র চন্দানি আর ফাল্টুর জীবন পরিস্থিতি ব্যাখ্যায়। শরণার্থীদের সাথে চলতে গিয়ে চন্দানি তার অস্তিত্বসংকট কাটিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল প্রথম। তারা পরস্পর শারীরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এভাবেই লেখকের কলমে গজেন মানুষখেকো বুড়ো বাঘ আর ফালটু ছাগলখেকো উঠতি বাঘের প্রতীক হয়ে ওঠে। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> চন্দানি কি তখনই ভাবতে পেরেছিল, বুড়ো বাঘার সঙ্গে উঠতি বাঘার মারামারি। বোধহয় না। সে তো এই বনে আসার পরে শুনেছিল, এদিকের গ্রামের লোকেরা বলে, সব-উঁচু পথের উপরে যেখানে নতুন সড়ক তৈরির জন্য তখনও ডাইভার্শান ছিল, সেখানে সেই মানুষখেকো বুড়ো বাঘটার সঙ্গে অল্পবয়সী ছাগলখেকো একটার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মারামারি হয়েছিল। একটা অন্যটাকে গ্রামে ঢুকতে দেবে না যেন। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪১)।

ধীরে ধীরে অরণ্যই হয়ে ওঠে তাদের আশ্রয়, যেমন ফালটুর আশ্রয় হয়ে উঠছিল ক্রমশ চন্দানি। চন্দানিকে ঘিরে এক প্রতীকী বাঘের দ্বন্দ্ব রচনা করেছেন লেখক। চন্দানির স্মৃতিচারণায় নির্মিত হয়েছে তার অস্তিত্বসংকটের টানাপড়ন আর দুর্বিষহ জীবনের কথকতা। চন্দানির উখুণ্ডি জীবন, উদ্বাস্তু কুলি মহল্লার জীবন এবং সেখান থেকে উপন্যাসে রচিত অরণ্যচারী জীবনের বলয়। সভ্যসমাজের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিনিয়ত তাদের হয়ে ওঠার পরিসর নির্মাণ করেছে।

মানসাইঘাটে কুলিমহল্লার জীবনে দুটো সন্তান নিয়ে চন্দানি আর ফালটু সংসার পেতেছিল। লেখক স্পষ্ট না করলেও বোঝা যায়, একটি গজেনের ঔরসজাত এবং অন্যটি ফালটুর। মানসাইঘাটে ফালটু বিড়ি বাঁধতো আর চন্দানির চা-রুটি-খাবারের দোকান বেশ চলছিল। এখানেই একদিন গজেন হাঁও হানা দিল। সেই সূত্রে উপন্যাসে উঠে এল লেদু মিঞার প্রসঙ্গ, যাকে লেখক উপন্যাসের শুরুতে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তারের হসপিটালের ইনডোর রোগী হিসেবে। লেদু মিঞার তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে সেবার বেঁচে যায় চন্দানি। লেদুর হাত ধরে শুরু হলো চন্দানির অরণ্যজীবন। অরণ্যজীবনে লেদু আর হলং নাগার ভূমিকাই মুখ্য হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

এ উপন্যাসে অরণ্য, হলং আর লেদু যেন একই সূত্রে গাঁথা। উপন্যাসের শুরুতে লেদুর ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও চন্দানির অরণ্যজীবনে অভ্যস্ত হবার পেছনে তার ভূমিকা গভীর। গজেনের হাত থেকে পালাতে চন্দানিকে লেদু অরণ্যের কথা বলেছিল:

> নয় তো বনৎ চলি যান। সড়ক ধরি উত্তর যান, তো ডাইবার্শন আসি গেইলে বাঁয়ে পুরানা সড়ক ধরেন,
>
> বন আসি যাইবে।
>
> বন? বনৎ বাঘ নাই থাকে?
>
> থাকে তো।

বনৎ দেও নাই থাকে?

থাকির পারে। কাঁয় দেখছে?

তো বনৎ খারাপ মানুষ নাই থাকে?

নাই থাকে, ইটা কবার পাই।

বনে বাঘ থাকেই, ভূত, অপদেবতা থাকতে পারে, কিন্তু খারাপ মানুষ নাই, এ শুনেই যেন চোখের জল মুছে মুখ তুলেছিল চন্দানি। তো যাঙ মুই, বলে সে তার কুঁড়ের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৫)

লেদুর উপর্যুক্ত বক্তব্যে অরণ্যের স্বভাব বুঝে নিয়েছিল চন্দানি। অরণ্যে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া ক্রমশ লেদুর কাছ থেকে শিখে নিয়ে চন্দানি ক্রমান্বয়ে অস্তিত্ববান হয়ে উঠছিল। লেদু তাকে শেখায়, অরণ্যে 'বাঁচতে হলে ধূর্ত হতে হয়, তা মানুষখেকো কিংবা অন্য কোনো রকমের বাঘই হও' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৬)। অরণ্য খুব সহজে সভ্য মানুষকে নিজের কোলে আশ্রয় দিতে চায় না। চন্দানির ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। এখানে তাই চন্দানি বাঁচতে শিখেছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে সন্তান। 'বনে থাকলে মানুষকে ধূর্ত হতে হয়ই। লেদু মিঞাকেও ধূর্ত হতে হয়েছিল। কারণ বন তেমনই জায়গা। একটা পা ভুল নাড়লে, একবার দেখে নিতে শুনে ভুল হলে মৃত্যু' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৭)। সভ্যতা যেমন অরণ্যকে ধ্বংস করেছে, অরণ্যেরও তাই সভ্যতার ওপর রয়েছে চাপা ক্ষোভ। ক্রমশ বন সম্বন্ধে চন্দানি এক নতুন ধারণায় উপনীত হয় পুত্র বটুকে হারিয়ে। সে উপলব্ধি করে, 'বটু মনে করিয়ে দিয়ে গিয়েছে, বন নিশ্চিন্ত হওয়ার নয়। বন পুড়িয়ে ফেলেও এখন আর তুমি কিছু করতে পারো না। বনের বিশ্বাসঘাতকতায় রাগ না ভয়, কোনটা বেশি হওয়া উচিত, তা কেউ বলতে পারবে না' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪৯)। কিন্তু চন্দানি মনে রাখে, বনে মানুষখেকো বাঘের মত বিপদ থাকলেও খারাপ মানুষ নেই। আর মানুষখেকো বাঘই তাকে সভ্য জগতের অসভ্য আঁচড় থেকে রক্ষা করে আশ্রয় দিয়েছে। অরণ্যকে চন্দানি উপলব্ধি করেছে গভীরভাবে। 'যে বনে নিজের পায়ের নিচেই মরা ডাল-পালা ভাঙলে হৃৎপিণ্ড থমকে যায়, কালো বরফ জলের স্রোত ওঠে পিঠ বেয়ে; যে বনে ভয়ে তখন কাঁদতেও পারো না। যে বনে মানুষের ভয়, মানুষখাকিয়ার ডরে, মানুষখাকিয়ামানুষের আতঙ্কে কান্না গিলে থাকতে হয়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৮), সে বন তবু চন্দানি আর লেদুর কাছে হয়ে ওঠে শেষ আশ্রয়। অরণ্যের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে এভাবেই অরণ্যকে জেনেছিল চন্দানি। তার মত বাস্তুহীন, নিরাপত্তাহীন মানুষকে এভাবেই কেন্দ্রচ্যুত হয়ে অরণ্যের কোলে আশ্রয় নিতে হয়। এমনকি রাষ্ট্রযন্ত্রে নিষ্পেষিত কৃষকের পক্ষাবলম্বনকারী নকশাল বিপ্লবীদেরও আশ্রয় হয়ে ওঠে অরণ্য। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'মানুষ যদি আর গ্রামে থাকতে না পারে, তাকে তো বনেই থাকতে হবে। তা হলে সে বনে যত বাঘ থাকে, তত মঙ্গল। মানুষ আসে না তবে। বন না থাকলে মানুষ কোথায় মুখ লুকাতো?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬১)। ধ্বংসপ্রায় হয়েও অরণ্যই যে এখনও গণমানুষের শেষ আশ্রয়, সেই বিষয়টিই লেখক উপন্যাসে বার বার বলতে চেয়েছেন। রিজার্ভ বনের কিন্তু এই চারিত্র্য নেই। লেদু বলেছিল, রিজার্ভ বন:

> ...মানুষে-সাপের রাজত্ব। না হইল্ না হয় মানুষ-সাপ, ভোটবাবু কওয়ার পাইস্, উমরায় ভোট করে, পিরধান, মনতিরি বানায়। গাছ কাটে ভোটবাবু।...গাছ কাটে ভোটবাবু। যেমন গ্রাম তেমন সে রিজাববন, মানুষ নাই বাঁচে। এই সামান্য বন যা ছাড়ি দেওয়া সড়কগুলোর খাঁজে খাঁজে...যার শেষ মালিক কাঁউ–এ না হয়, তাই এই পৃথিবীতে মানুষের শেষ থাকিবার স্থান। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬১)

*মহিষকুড়ার উপকথা*তেও অমিয়ভূষণ দেখিয়েছেন যে, বন আর এখন স্বাধীন নয়, জোতদার জাফরুল্লার মত কারো না কারো কর্তৃত্বে তার বিনাশ ঘটেছে। এ উপন্যাসে অধিকারহীন এই পরিত্যক্ত অরণ্যই কেবল *মহিষকুড়ার উপকথা*-র বাস্তুহারা নিরাপত্তাহীন আসফাক কিংবা চন্দানিকে আশ্রয় দেয়। সরকারি রিজার্ভ বনগুলো এখন ভূমিদস্যুদের করায়ত্ত।

উপন্যাসে বাঘিনী এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। লেখক অরণ্যচারী অন্তঃসত্ত্বা চন্দানির সঙ্গে এক গর্ভবতী বাঘিনীকে প্রতীকার্থে এক করে তোলেন। সার্কাসের কোন এক অল্প বয়সী সিংহী একদিন কোন এক বুড়ো বাঘের কাছে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছিল। এদেরই উত্তরাধিকার সিংধ্রী (বাঘ আর সিংহীর মিলিত নাম) নামক তিনটি ব্যাঘ্রশাবকের বেঁচে যাওয়া দুটি মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলেই যেন জীবিত। উপন্যাসে চন্দানিও যেন গজেনের মত বুড়ো বাঘের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এক সিংহী, যার গর্ভজাত ছোটু আর অনাগত সন্তান অরণ্যের আশ্রয়ে মাতৃলাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার প্রতীক্ষায় ব্যগ্র। এই বাঘিনীর সঙ্গে চন্দানির সাযুজ্য আর পার্থক্য উপলব্ধি করাতে গিয়ে লেখক অরণ্য আর অরণ্য-বহির্ভূত মানুষের ভেতর ভেদরেখা টানেন। অরণ্য এই অন্তঃসত্ত্বা বাঘিনীর সত্তার অংশ, চন্দানি সেখানে বহিরাগত-প্রাণ, সভ্যতার ধারক সত্তা। অরণ্য হয়তো নিরাশ্রয়ী মানবপ্রাণকে আশ্রয় দেয়, কিন্তু তাকে তার সত্তার অংশ করে নেয় না কখনো। লেখক ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে প্রতীকায়িত করে তোলেন। বাঘিনীকে দেখার পর সন্তর্পণে পা চালাতে গিয়ে চন্দানির পায়ে কাঁটা বিঁধলে লেখক মন্তব্য করেন:

> হাঁপাতে হাঁপাতে না ভেঙে যায় তা লক্ষ্য রেখে, সে কাঁটা দুটোকে তুলল। একইসঙ্গে খানিকটা রক্ত আর অনেকটা চোখের জল পড়ল। কেননা, তার পা বাঘিনীর থাবা নয়।...বন থাকলে বাঘ থাকতে পারে। বনের ভয় আর বাঘের ভয় একই কথা।...অথচ বনের বাইরে যেতে পারো না। তা পারো না। তা পারো না। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪৪, ৪৮)।

কাজেই বাঘিনীর সঙ্গে তার সহাবস্থান ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। 'বন, বাঘ, অন্ধকার চন্দানির মন বিদ্বেষে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। একবার বাঘ, একবার অন্ধকার, একবার বনকে প্রতিপক্ষ মনে হতে থাকল' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫১) তার। কিন্তু তারপরেও, অরণ্যের বাইরের গজেন বাঘিলার চাইতে অরণ নিরাপদ তার কাছে।

লেদুর মুখেই চন্দানি শুনেছিল, হাসপাতাল থেকে দিন পনেরোর ভেতর ছাড়া পাবে গজেন। এরও আগে জেনেছিল তার শক্তিমত্তা সম্পর্কে। জেনেছিল, '...গজেন নাকি পিরধান মানুষ এ অঞ্চলে। তাকে পার্সেন্ট না দিয়ে কেউ ইস্টিমেট টেন্ডার দিতে তার ব্লকে ঢুকতে পায় না। দুইখানা ট্রাক আর একটা ফটফটিয়া তার, আর এখন তার বাড়িটায় দোতলা হচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৬)। অনুভব করেছিল কীভাবে ক্রমশ সভ্যতার

আগ্রাসী শক্তিগুলো বীর্যবান হয়ে উঠছে। এসব খবরেই চন্দানি আরও গভীরভাবে অরণ্যকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু একদিন ঠিকঠাক মত লেদুর মারফত ফালটু চন্দানির অরণ্যবাসের খবর পায়। আর সেই সূত্র ধরে গজেন অরণ্যে প্রবেশ করে। বাঘিনী যেমন অরণ্যে প্রবেশ করে মানুষখেকো বাঘকে ডেকে এনেছিল, চন্দানিও যেন তেমনি করেই গজেনকে ডেকে আনে।

চন্দানির অরণ্য জীবনের পাশাপাশি যে লেদুকে লেখক চিত্রিত করেছেন, সেটির সঙ্গে উপন্যাসের শুরুর বোকা-বোকা লেদুকে মেলানো কঠিন। নানা কৌশলে লেখক লেদুর ছদ্মাবরণ উন্মোচিত করেন–যুক্ত করেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের রাজনৈতিক আবহ। নকশালবাড়ি বিপ্লবীদের প্রতি অমিয়ভূষণ মজুমদারের একধরনের দুর্বলতা ছিল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন:

> নকশালরা...ভাঙতে চেয়েছিল। এরা পড়াশুনা করে–ইনটেলেকচুয়াল চিন্তা করে।...এরা কখনই ড্রাগ খেয়ে জীবন থেকে পালাতে চায়নি। এরা বলতে পারে আমরা প্রাণ দিয়েছি, তবু তো এরা বলতে পারে, আমাদের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। বিধ্বস্ত ইউরোপে, ফরাসি দেশে যারা প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছিল তাদের লেখায় যেমন নতুন দিক ফুটে উঠেছিল তেমনি এদেরও সেই দিকগুলো আছে। আমি হয়তো মতবাদের দিক থেকে এদের সমর্থক নই, কিন্তু মানুষ তো, এরা তো জীবন। (অমিয়ভূষণ, ১৪০৮: ৩৮০-৩৮১)

অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন, নকশাল আন্দোলনকারীরা তাদের ক্রোধ তেজে পরিণত করে সফল হবে। নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিল অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী কৃষকদেরও বেশ বড়ো একটি অংশ। নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। সমালোচক বিপ্লব মাজী লিখেছেন:

> নকশাল আন্দোলনে সত্তর দশক মুক্তির দশক হয়নি। গ্রামাঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থানও ঘটেনি। গ্রাম দিয়ে কেউ শহর ঘিরতে পারেনি। বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ অসংখ্য তাজা তরুণ প্রাণ হারান অথবা পঙ্গু হয়ে যান। অথচ এঁরা সত্যি-সত্যিই সামন্তপ্রথা থেকে কৃষকদের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন।...নকশাল আন্দোলনের ছাত্র ও যুবকেরা চেয়েছিলেন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কৃষক জীবনের শরিক হতে।...সরকার কৃষকদের সাহায্যের জন্য গ্রামাঞ্চলে যে অর্থ পাঠালো তাও রাজনীতির দশচক্রে কৃষকদের হাতে না পৌঁছে–সামন্ত প্রভুদের হাতেই পৌছোতে লাগল। জমি কৃষকের নামে কিন্তু তার প্রকৃত মালিক সামন্ত প্রভুরা। কৃষকের নামে আসছে সরকারি ঋণ, আর তা গ্রাস করছে সামন্ত প্রভুরা। সারা ভারত জুড়ে একই চিত্র। এই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ কৃষকদের ক্রমশ দুঃসহ ও অবর্ণনীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দিল।...তাঁদের যা-কিছু প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন আধিপত্যবাদী রাজনীতির চাপের কাছে নতজানু হচ্ছিল। নকশাল আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ায় কৃষকদের দাবি ও সমস্যাগুলি মিডিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে উঠে এল।...চিনের পথ অনুসরণ করে এ-দেশের কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে শহরের ছাত্র ও যুবকরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলেন। স্বাভাবিকভাবেই সে বিপ্লব হবে সশস্ত্র। তাঁরা স্বপ্ন দেখলেন একটার পর একটা গ্রাম দখল করে গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলার।...১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে ভারতের সতেরটি রাজ্যের আটটিতে কংগ্রেস তার ক্ষমতা হারায়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় কমিউনিস্টরা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলকে নিয়ে ক্ষমতায় আসে। এ-সময় নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্থান ঘটায় সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে চলতে চাওয়া বামপন্থীরাও সমস্যা ও সংকটে পড়েন। বিপ্লব কীভাবে আসবে? সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে? না সশস্ত্র বিপ্লবের পথে?...বামপন্থীরা উভয়সংকটে পড়লেন। আর এরই জেরে সিপিআই (এম) পার্টির জঙ্গী কর্মীরা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে নকশাল আন্দোলনের সমর্থক ও পরিচালক হয়ে উঠলেন।...

> নকশালরা বললেন:...জনযুদ্ধই বিপ্লবের একমাত্র পথ।...এঁদের প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত করে সমগ্র ভারতে কৃষিবিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটানো।...গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে তাঁরা বেছে নিলেন সন্ত্রাসের পথ।...তাঁরা মনে করলেন এভাবে শ্রেণী শত্রুদের খতমের রাজনীতি কৃষকদের বিপ্লবী চেতনা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। (বিপ্লব, ২০১২: ৩৯৭-৪০০)

অমিয়ভূষণের কালচেতনা প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। 'কালখণ্ডের যে অভিঘাতে দুলে ওঠে তাঁর আখ্যান, চরিত্রকে সেই কালপরিসরের থেকে অনেক বাইরে, অনেক দূর থেকে তিনি নিয়ে আসেন মূল ঘটনা-আবর্তে। অথবা উলটোটাও ঘটান। ইতিহাসের প্রগাঢ় কোন সময়খণ্ড, তাকে রেখে দেন উপন্যাসের ঘটমান বর্তমান পরিসরের থেকে বেশ খানিকটা দূরে। শুধু ইতিহাসের সেই প্রবল সময়ের আভাসটুকুকেই গ্রহণ করেন' (শুভময়, ২০০১: ১৩৬)। *হলং মানসাই উপকথা* কিংবা *সোঁদাল* উপন্যাসে অমিয়ভূষণ সময়বিন্যাসে দ্বিতীয় প্রবণতাকেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, এ উপন্যাসগুলোতে ঘটমান বর্তমান পরিসর থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রবল সময় বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখে শুধু সেই তরঙ্গায়িত সময়ের আভাসকেই গ্রহণ করেছেন লেখক। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ *হলং মানসাই উপকথা* আর *সোঁদাল*-এ যুক্ত নকশাল আন্দোলন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন:

> ভূমিহীন কৃষকদের বঞ্চনা, সংগ্রাম আর বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সত্তরের দশকে গড়ে উঠেছিল এক কমিউনিস্ট আন্দোলন। উত্তর বাংলার নকশালবাড়িতে প্রথম সূত্রপাতের জন্যে এর নাম 'নকশাল' আন্দোলন। সে আন্দোলনে চাষী কমরেডদের পাশে সংগ্রামে নেমেছিল বহু মেধাবী বুদ্ধিজীবী।... এসব ভাবনা চিন্তার দলিল অমিয়ভূষণের দুটি নভেলেট 'হলং মানসাই উপকথা' আর 'সোঁদাল'। (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ৬১)

হলং মানসাই উপকথা উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনেরও চারবছর পরের এক অনির্দিষ্ট সময় অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে লেদুর হতাশা, ক্লান্তি আর ব্যর্থতার বেদনায়। নকশাল আন্দোলন সত্তর দশকের এক প্রবল আলোড়ন। অমিয়ভূষণ সেই কালের প্রভাবকে গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি এই উপন্যাসগুলোতে ঘটমান বর্তমানে সংঘটিত জীবনালেখ্যকেও জুড়ে দিয়েছেন। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেদু কিংবা মোন্নাতের ব্যক্তিক হতাশাবোধ এবং বর্তমানের জীবনকাল এভাবেই যুক্ত হয়। লেখক ঐতিহাসিক কালপরিসরকে গভীরভাবে বর্তমান কালের সঙ্গে যুক্ত করেন।

এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে লেদু চন্দানিকে বলেছিল তার ক্লান্তির কথা, 'জানো, চন্দানি, মনৎ করি, বনৎ যদি পৃথিমি ফাটি যায়, এমন ফাটল যে সেইটে গেলে আর উঠা না লাগে, পৃথিমির ঠাণ্ডায় ঘুম আসি যায়; ঘুম, ঘুম, ঘুম আর না ভাঙে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬৩)। লেদুর ক্লান্তিতে শেষপর্যন্ত পৃথিবী হয়েছিল চন্দানি। তার শরীরে লেদু খুঁজে পেয়েছিল আশ্রয়। চমৎকার ভাষায় লেখক তাদের শরীরী প্রেম মূর্ত করে তোলেন:

> সে সন্ধ্যার লাল কালচে-নীলে মিলিয়ে যেতে থাকলে প্রায় এসেছে এমন বর্ষার ঝিঁ ঝিঁ কাঁপানো স্নিগ্ধতায়, তেমন করে চুল খুলে দিয়ে পৃথিমি হতে চেয়েছিল সে? ভেবেছিল, সাহস করে পৃথিবী হবে সে? লেদু, ঘুম,

> যা ভাঙে না তেমন ঘুম, এসব বলছিল। সে গায়ে কাপড় রাখেনি। সেই পৃথিমির ফাটল কি মিঞাকে স্নিগ্ধ করেছিল? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬৪)

লেদুর ক্লান্তি এতদিনকার মুখোশ খুলে লেদুকে সমুতে উত্তরিত করেছিল। সভ্যতার সন্তান সমু আর অরণ্যের সন্তান লেদু মিঞা, যারা অরণ্যকে জানে, তারা উপলব্ধি করে 'অনেক চেষ্টা করেও লেদু মিঞা হওয়া যায় না। মানুষখেকোরা খিদে না পেলে মানুষ মারে না। লেদু মিঞারাও বাধ্য না হলে মানুষ মারে না, মানসী। তার চাইতে সমু, সমসের সমরেন যা হয় বলো, তারা মানুষ মারে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬৫)। উপন্যাসে অরণ্যের প্রতীক, গণমানুষের প্রতীক লেদু। আর সমু, সমসের বা সমরেন সভ্য সমাজের প্রতীক–যারা অকারণে মানুষ হত্যা করে। অকারণ এই হত্যাকাণ্ডের সূত্রেই নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার বেদনা লেদুর দীর্ঘশ্বাসে উপন্যাসে ভাষা পায়:

> ইতিহাস আর ভূগোল যে ভাষায় লেখে, তেমনই যেন, সেই ভাষা আর একদিন ছিল লেদু মিঞার। সে বলেছিল, কাউকে বলে যেতে ইচ্ছে করে। কথাটা তার মধ্যে আশ্রয় পাক, এরকম ইচ্ছা হয়। একজন কেউ জানুক, কোথায় থেমে গেল কে। জানো, ডাক্তার ধরা পড়েছে এতোদিনে। আর সে বলেছে, সবই ভুল ছিল। অত রক্ত, অত রক্ত! বলো, ভুল বললে সে মানুষগুলো ফিরে আসে? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬৪)

নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার চিহ্নিত ভুলগুলো শুধরে নেবার আর পথ ছিল না সমু ওরফে লেদুদের। বরং অনুশোচনায় কাতর এই মানুষগুলোর চেতনায় নকশাল আন্দোলনে নিহত মানুষগুলোর রক্তাক্ত মুখচ্ছবি বার বার এসে হানা দেয়। এই অনুশোচনাবোধ থেকেই লেদু ফিরে গিয়েছিল চারবছর আগে তার হাতে নিহত জোতদার মলিন কাজ্জির স্ত্রীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে। লেদুর মনোভাবনায় আলোড়িত অন্তর্কথন নকশাল আন্দোলনকে চিহ্নিত করে। লেখকের ভাষায়:

> কাউকে দেখে তার পৃথিমির গুহার কথা মনে পড়ে। এমন অদ্ভুত ভাবনা বলেই জোতদার বেটিছাওয়ার জমিতে রোয়া গাড়ে। কী? না, জোতদারকে সেই নিজের হাতে মেরেছিল। এটাই সেই অনেক রক্তের কথা। যার সঙ্গে লেদু মিঞা, ডাক্তারবাবু, আর অন্য অনেকে যুক্ত ছিল। নাকি ভুল! কিন্তু ভুল করলে কি তেমন করে ধরা দেয়ার মত করে রাতভর কারো জমির একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে রোয়া গেড়ে, আগুনে গরম নিজের হাতে কারো শ্যাকশ্যাকা পা সেঁকে দিতে দিতে বলতে হয়, সেই সমু? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬৯)

অরণ্য শুধু নগরসভ্যতার অশুভপ্রাণ গজেনের হাত থেকে চন্দানিকে আশ্রয় দেয়নি, বরং রাষ্ট্রযন্ত্রের অযাচিত পেষণ থেকে রক্ষা করতে নকশাল আন্দোলনকারীদেরও আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। উপন্যাসের শেষপর্যায়ে লেদু আর গজেনের পারস্পরিক লড়াই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। লেদুর অরণ্যপ্রাণ অস্তিত্ব শেষপর্যন্ত অরণ্যেই বিলীন হলো।

উপন্যাসশেষে লেদুর মৃত্যুর পাশাপাশি চন্দানির প্রতীক সেই অন্তঃসত্ত্বা বাঘিনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক অরণ্যের আসন্ন ধ্বংস এবং নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতাকে প্রতীকায়িত করেন। চন্দানি কিংবা হলং নাগা সন্ন্যাসির মত অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী মানুষের কাছে অরণ্য নিরাপদ–হলং কর্তৃক সদ্যমৃত বাঘিনীর গর্ভস্থ সন্তানকে চন্দানির হাতে তুলে দেবার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে লেখক আভাসিত করেন এই সত্য। এইসব

অরণ্যপ্রাণ ব্যক্তিসত্তার হাতেই অমিয়ভূষণ অরণ্য রক্ষার ভার সঁপে দিতে চেয়েছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা চন্দানি আরণ্যক মানবাত্মা লেদুর ঔরসজাত সন্তানের জন্ম প্রতীক্ষায় কাল কাটায়। সদ্যোজাত ব্যাঘ্র-শাবক আর চন্দানির অনাগত সন্তান এ উপন্যাসের অরণ্যচারী আদিপ্রাণকে জীবনধর্মী করে তোলে গভীর শক্তিতে। সমালোচক শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন:

> সরকারের শক্তির প্রতীক গজেন বাঘিলা, পশু নয়, ভূত নয়, খুনী, লোভী, নির্বিবেক গজেন বাঘিলা–তাকে বলাৎকার করেছে, কিন্তু জয় করতে পারেনি। অরণ্য আশ্রয় দিয়েছে জীবনধর্মী চন্দানিকে–কারণ বনে বাঘ থাকে, দেও থাকতে পারে কিন্তু খারাপ মানুষ 'বনৎ নাই থাকে'। তবে খারাপ মানুষ আসে, আসছে, মানুষের লোভের গ্রাস থেকে অরণ্যও হয়ত আর বাঁচবে না। কিন্তু অমিয়ভূষণের এই উপকথা হতাশার সুরে শেষ হয়নি। মানুষের পাতা জাঁতাকলে মারা গেল বাঘিনী; তার সদ্যপ্রসূত বাচ্চা দুটোকে দু'হাতের আঁজলায় বয়ে নিয়ে এলো হলং নাগা–চন্দানির পায়ের কাছে রাখলো প্রাণের সেই আশ্চর্য উপহার। (শিবনারায়ণ, ১৯৯৪: ৩১)

এভাবেই অরণ্য আর সভ্যতার দ্বন্দ্বে কখনো অরণ্য, আবার কখনো বা সভ্যতা জয়ী হয়। তবে এ উপন্যাসে চন্দানি অরণ্যকে সঙ্গে নিয়েই শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে প্রবলভাবে অস্তিত্ববান ।

সোঁদাল উপন্যাসে মোন্নাতও এমনই এক চরিত্র, যার রাভা রক্তে আধুনিক সভ্য জগতের কালো ছায়া হানা দিয়েছে। কালের অভিঘাতে রাভা গোষ্ঠীর ভূমিকেন্দ্রিক অস্তিত্ব-বিপর্যয়, তাদের ক্রমবিলুপ্তির কথকতা *সোঁদাল* উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এ উপন্যাসের ঘটমান বর্তমান কাল সত্তর পরবর্তী বলে মনে হয়। সময়ের উল্লেখ না থাকলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ এসেছে সুস্পষ্টরূপে। গত কয়েকটা বছরে গ্রামগুলো আদিমতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছানোর খবর প্রসঙ্গে উপন্যাসে অনির্দিষ্টভাবে বেশ কতগুলো বছরের কথকতা রচিত হয়। এর মধ্য দিয়ে সময় ও সমাজের রূপান্তর প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। সময়ের রংও ধরা পড়েছে লেখকের চোখে। তিনি লিখছেন, 'অন্ধকার, অন্তত আধো-অন্ধকার, সবুজ মিশানো কালচে অন্ধকার থেকে হলুদ-ধূসর-উজ্জ্বল সূর্যালোকে, আদিমতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে জেলাকে জেলা' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৭৮)। অরণ্যময়তা থেকে যান্ত্রিক অরণ্যহীন নাগরিকতায় পৌঁছে যাওয়া ক্রমরূপান্তরিত এই সময়ের রঙ এখন সবুজ থেকে ক্রমশ ধূসর।

সময়ের সাথে সাথে ক্রমপরিবর্তিত ধান উৎপাদন পদ্ধতি রূপান্তর ঘটায় রাভা সমাজে। মাতৃতান্ত্রিক রাভা সমাজে পুরুষের জমির অধিকার নেই বলে একালে বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মান্তরিত রাভা পুরুষ। রাভাদের রাইন্তক, রাভা কন্যার জমির অধিকার–এসবই উজ্জ্বল অতীত হিসেবে উল্লেখিত উপন্যাসে। অতীত আর বর্তমানের ভেতরকার তারতম্যকে লেখক চমৎকারভাবে প্রকৃতি-সমাজ-ব্যক্তি-সংস্কৃতির রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেন:

> তা হলেও এসবই অতীত যার তুলনায় বর্তমানকে বোঝা যায়। মেঘলা দিনকে যেমন চড়া রোদের আলো, রাজাকে যেমন গণতন্ত্র, স্মৃতি-আবেগ-অবচেতনকে যেমন লেখাপড়া আর বুদ্ধি, যেমন বনারণ্যকে কাটতে কাটতে, ভাঙতে ভাঙতে, ঝলসাতে ঝলসাতে, আল টপকে টপকে শত শত মাইল চলে যাবে চষা জমির

> ধূসরতা। বর্তমানের সামনে অতীত উবে যায় না? তা ছাড়া কলকাতায় বন আছে? বর্ধমানে, নদীয়ায়, আসানসোলে? অতীত চলে গিয়ে বর্তমান যখন আসে, তখন তো পরিবর্তনও হতে থাকবে। একদিন সকলেই দেখতে পাবে, পাচ্ছেও তা, সে রাভা, মেচ, কোচ, অথবা রাজবংশী হোক, তার ধানজমির উত্তরে বা দক্ষিণে, পূর্বে অথবা পশ্চিমে যা আছে, তা অন্য অনেকের ধানজমি। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৩)

সময়ের এই রূপ-রূপান্তরের অভিঘাতে যে পরিবর্তন ঘটে, অরণ্য কিংবা আদিপ্রাণ আদি-মানুষ কি তাতে টিকে থাকে? অনেক সময়েই বিলীন হয়ে যায় তাদের অস্তিত্ব। উপন্যাসে উদ্ধৃত এক অসুর জাতিও এভাবেই অস্তিত্বহীন হয় কালের রূপান্তর প্রক্রিয়ায়। আদিপ্রাণ মানব কালের করাল গ্রাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালি, মুণ্ডা মিলিয়ে পোষা এক নতুন মানবজাতিতে পরিণত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় লেখক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মোন্নাতের টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণায় অরণ্যময় রাভা জাতির বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। প্রবহমান বর্তমান সময়ের অন্তরালে অনুসময়কে গুঁজে দিয়ে লেখক এ উপন্যাসের সময়কাঠামো নির্মাণ করেছেন। অতীতের টুকরো ছবি বার বার মোন্নাতের চেতনায় হানা দেয়। সেই স্মৃতিময় অতীতের রং মোন্নাতের কাছে কালচে ধোঁয়াশা রঙের। এটি মোন্নাতের অবচেতনেরই বহিঃপ্রকাশ। তার মনে অতীত যেন পুঞ্জীভূত বেদনার রঙে আঁকা:

> তার স্মৃতি অচেতন হয়েছিল, জাগরূক হচ্ছে;...মানুষমাত্রের স্মৃতিই অচেতনপ্রায় থাকে। মানুষের প্রয়োজনমত তা জেগে জেগে ওঠে যখন যতটুকু যে দিকে দরকার।...তার স্মৃতি যেন অমাবস্যার আকাশের গুহায় আবদ্ধ জলাশয় হয়ে গিয়েছিল, যেন কী এক দুর্ঘটনার নিচ থেকে, যেমন আগ্নেয়গিরির উদগারে হতে পারে, সেই চোখের জলের মত উষ্ণ কিন্তু কালো জল উঠে এসে তার স্মৃতির স্থাপত্যগুলোকে, ভাস্কর্যগুলোকে ডুবিয়ে একটা একটানা তড়াগ হয়েছিল। আবার ছোট ছোট ঘটনায় সে জল কোথাও কোথাও সরে যাচ্ছে, শ্যামল শস্প-আবৃত বনভূমি বা কোনো ভাস্কর্যের কিছু অংশ বা কোনো স্থাপত্যের চূড়া চোখে পড়ছে। এখন মনে পড়ার মত কিছু বিষয় স্মৃতিতে এসেছে, সেগুলো আর সম্ভবত আগের মত একেবারেই হারিয়ে যাবে না। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯০- ৯১)

মোন্নাতের স্মৃতিতেই উঠে আসে নকশাল আন্দোলনে তাদের সক্রিয় যুক্ততা, আন্দোলনকে ঘিরে তাদের হতাশা, মানবহত্যার অনুশোচনাবোধ এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধপ্রসঙ্গ, যার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট এক সময়পটের আদল নির্মিত হয়। অমল তরুরাজ আর কৈচন্দ্রের চোরাচালান ব্যবসা-সখ্য ধরা পড়ে গিয়েছিল মোন্নাতের চোখে। এই মোন্নাতকেই কৈচন্দ্রের মনে হয়েছিল সে যেন বনের পাহারাদার, যেন ছয়পাই ফৌজ, 'সেবার বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে এমন কিছু এদিকে এসেছিল' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৮)। আর আছে রংপুরিয়া এরশাদপ্রসঙ্গ। অনুষঙ্গগুলো নকশাল আন্দোলন, একাত্তর-এর যুদ্ধ এবং একাত্তর-পরবর্তী এরশাদের উত্থানকে মনে করিয়ে দেয়। এছাড়াও আশির দশকের কামতাপুরী ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ (উমরা কইবে কামতাপুর চাই, কামতাপুরী ভাষা চাই, তো আমরা কঙ ফির উমরা দেশভাগ করির চায়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১১৬) এ উপন্যাসের রাজনৈতিক কালপট নির্মাণ করে।

উপন্যাসে শরৎকালের পূজো-মহালয়া, মোন্নাতের অরণ্যজীবন মোটামুটিভাবে বর্ষা-শরৎ-শীত এই ছয়মাসের সময়কাল জুড়ে বিস্তৃত। মোন্নাত আর কৈচন্দ্রের অতীত আর বর্তমান একাকার করে মনস্তাত্ত্বিক সময়কাঠামো

নির্মাণ করেছেন লেখক। অমিয়ভূষণের বক্তব্যে বিধৃত মোন্নাতের কৈশোর, কলকাতার রাজনৈতিক জীবন, পলায়নপর অরণ্যজীবন এবং শেষপর্যন্ত শহুরে জীবনের কথকতা ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো সময়ে গেঁথে উপন্যাসের প্লট নির্মিত। শহর ছেড়ে তিন্নিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার শেষ তিনমাসও ঘটমান বর্তমানেরই অংশ। বহিরাঙ্গিক এবং মনস্তাত্ত্বিক এই দুই সময়পটেই লেখক সাড়হীন ব্যক্তিসত্তা হিসেবে মোন্নাত চরিত্রকে উপস্থাপন করেন।

উপন্যাসের শুরুতে চোরাই কাঠের ব্যবসা দেখে সাড়হীন মোন্নাতকে মুহূর্তের জন্য জাগিয়ে তুলে লেখক প্রকৃতি আর অরণ্যের ধ্বংসপ্রায় অস্তিত্বের কথাও তুলে ধরেন:

> যতই সে চলুক, একই দৃশ্য ঘুরে ঘুরে পথের দুপাশে চলতে থাকবে।...প্রকৃতপক্ষে মুহূর্তের জন্য স্টেনগান, কুড়োল, দড়ির কুণ্ডলী দেখে কিছু যেন মোন্নাতের চোখের মণির চাইতে গভীরে, কানের চাইতেও পিছনে নড়াচড়া করে উঠছিল। সেখানে স্বপ্নের মত কিছু একটা তৈরি হতে যাচ্ছিল। যেন অথৈ জলের থৈ থৈ ঢেউ, আর সেখানে তিমির মত মাছগুলোকে মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছে মানুষেরা। তারপরে সেই গল্পটা তার মনে এগোল না। সেখানে কেউ বলল না, তিমি শিকার যেমন ধনোৎপাদন, বনের বনস্পতিকে কাঠের গুঁড়ি করে ট্রাকে আনাও তেমন ধনোৎপাদন। বলল না, সেই থৈ থৈ ঢেউয়ের সমুদ্র যেমন কারো নয়, অর্থাৎ সকলের, এই বনও তেমন কারো নয়, সকলেরই। সমুদ্রও অসীম। বনকেও তেমন অসীম মনে হয় না? আর দুইকেই কেউ তৈরি করে রেখেছে ধনোৎপাদনের জন্য। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯০)

ক্রমশ পাঠক অনুভব করেন, মোন্নাত পাগল নয়। সে লুকিয়ে আছে এক আচ্ছন্ন ঘোরের ছদ্মবেশে। এই আচ্ছন্নতা চিরে তার অচেতন স্মৃতি জাগরূক হয়ে ওঠে একসময়, আর তখনই জানা যায় মোন্নাতের অতীত । এখানকারই কোন অঞ্চলের এই কিশোর হয়তো কৈশোরে মোদনাথ রাভা নামে পরিচিত ছিল। আর একসময় যুবক হিসেবে কলকাতায় নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে সে। বহুকাল ধরে বঞ্চিত হতে হতে আদিবাসী মানুষগুলো তাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার অন্বেষণে নকশালবাড়ি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে যদিও রাভাগোষ্ঠীর নকশালবাড়ি বিপ্লবে জড়িয়ে পড়বার সত্যতা তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিকও মনে হয় না। এ সম্পর্কে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন:

> ...রাভা জনগোষ্ঠীতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল কি না তার কোনো বিবরণ আমরা কোনো গবেষণা গ্রন্থেই উল্লেখযোগ্যভাবে খুঁজে পাচ্ছি না। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলন কিছুটা বিস্তৃত হয়েছিল, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। কিন্তু রাভাদের সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। তা বলা না গেলেও আমরা অমিয়ভূষণের এই অনুমানকে ইতিহাস-বিরোধী বলতে পারব না। ইতিহাসে যেখানে কোনো তথ্য নেই, সেখানে ঔপন্যাসিক এমন কল্পনার সম্প্রসারণ অবশ্যই ঘটাতে পারেন যেখানে ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে না এবং ইতিহাসে উল্লিখিত কোনো তথ্য অস্বীকৃতও হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত অঞ্চলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের যে বিস্তার ঘটেছিল তা একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালি তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গেরই বাসিন্দা রাভা, কোচ, রাজবংশী যুবকদেরও তা কিছু পরিমাণে আকৃষ্ট করে থাকবে–এতে অসঙ্গত কিছু নেই। (সুমিতা, ২০০১: ২৮৬)

কাজেই *সোঁদালে*-র রাভা মোন্নাতের নকশাল আন্দোলনে যুক্ততা খুব অপ্রাসঙ্গিক কিছু নয়। অমিয়ভূষণ এভাবে লেখেন, 'মোন্নাত তো তেমন একজন যুবকই, যে দুঃস্থ পিতা যখন ভাবছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ ছেলে এসে তার ব্যর্থশ্রমে ভাঙা জীবনটার অবলম্বন হবে, সব কিছু ছেড়ে কী এক আদর্শের পিছনে বেরিয়ে গেল' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২১)। অমিয়ভূষণ নকশাল লিখছেন না কোথাও। কিন্তু জোতদারদের বিরুদ্ধাচারণের বিষয়টিতে তাদের আদর্শের জায়গাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোদনাথ রাভা মূলত কমুনিস্ট পার্টির সেই অংশ, যারা ১৯৬৭ সালে তাদের নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা করে (১৯৬৯ সালে) (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি) একটি পৃথক উগ্রবামপন্থী দল গঠন করেন, যার নেতৃত্ব দেন চারু মজুমদার এবং কানু স্যান্যাল। এ বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে, যারা নকশালবাড়ি গ্রামে কৃষকদের উপর স্থানীয় ভূস্বামীরা ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে অত্যাচার করেছিল।কৃষকেরা ওই ভূস্বামীদের সেখান থেকে উৎখাত করেন। চারু মজুমদার মনে করতেন ভারতের কৃষক এবং গরীব মানুষদের মাও সে-তুঙ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রেণি শত্রুদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা প্রয়োজন। তার কারণ তারাই সর্বহারা কৃষক শ্রমিকদের শোষণ করে। মোন্নাতও এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। কলকাতার ঘরানায় যৌবন কাটানো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, লুকাচ-মুখস্থ এই যুবকের প্রফেসারি ছিল নিশ্চিত। চেয়েছিল মেকি গণতন্ত্রের পথ পরিহার করে সশস্ত্র পথেই শোষণের হাতিয়ার হয়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। তাই বাম রাজনীতিকে বেছে নেয়া, নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া। তারা বিরুদ্ধাচারণ করেছিল পুঁজিপতি ও সামন্তপ্রথার প্রতিনিধি কংগ্রেস সরকারের, সোভিয়েত সংশোধনবাদী সিপিআই-এর, গ্রামের জোতদার ও জমিদারের, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং পুলিশ বাহিনীর। তবে প্রথমে বাম রাজনীতির কলুষিত রন্ধ্রগুলোর হা-খোলা মুখে হোঁচট খেতে হয় তাদের। সংসদীয় রাজনীতির প্রতি আগ্রহী সিপিএম থেকে দল ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন কামনায় বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে মোন্নাত আর তার বন্ধুরা। এ প্রসঙ্গে সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ লিখেছেন:

> রাষ্ট্রব্যবস্থার শোষণে পাগল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মোন্নাত যার আসল নাম মোদনাথ শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে অনুভব করেছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার অসারতার কথা। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। সুপ্রিয়-র মত বন্ধুকে নিয়ে শ্রেণীশত্রুকে খতম করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা পথে পা দিয়েছিলো। বিশ্বাসের ভূমি ছেড়ে পথে নামা উদ্বাস্তু অসহায়তা। চোখে স্বপ্ন নতুন ঘর। শোষণমুক্ত সর্বহারা সুখী সমাজ। কিন্তু সব কি ঠিক হলো? অতি বামবিচ্যুতি তাদের কি জাগরণ থেকে বিচ্যুত করে ফেলল না? (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ৬৫)

হোস্টেল জীবনে মোদনাথ, কালি, সুহাস, রতন কিংবা সুপ্রিয়র আলাপচারিতায় বামপন্থী রাজনৈতিক ঘরানার অন্তঃকলুষতার দিকগুলো উঠে আসে। বাম রাজনীতির জোরে অনেকেরই নীতিহীন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার কাহিনি ব্যক্ত করেন লেখক:

> '...মোদু এই সেমস্টারে সিকস্টিটু পার্সেন্ট পেয়েছে।'...'সুপ্রিয় খবর পেয়েছে।'...'আরে সেই তো করিয়েছে। সেই কমরেড প্রফেসর আর কমরেড রিডারের কাছে বলে এসেছিল, মোদনাথ আর নিরপেক্ষ নেই, দস্তুরমত আমাদের দলে, জেনারেল সিটে দাঁড়াবে এবার। সে রকম পোস্টারও দিয়েছে দু-চারখানা, ওই সুপ্রিয়ই।'...অনেকটা পরে সুহাস বলল, 'কি নোংরা, মাইরি! আমেরিকার মেয়েদের শুনেছি যোনিমূল্যে

এ ক্লাস পেতে হয়। আর এখানে? কোনটা যে বেশি নোংরা!' কালি বলল, 'এটা কি হঠাৎ দেখছ? আর একবার ভেরিফাই মাত্র করা গেল। কোথাকার কোন কলেজের বাংলার মাস্টার যখন ভিসি হয়ে আসে, তখন বোঝনি? অনেক পরে মোদনাথ বলেছিল,...কী নোংরা, একটা জাতের সাহিত্যবোধ, রুচিবোধ, রূপবোধ, রাজনীতির জন্য–'

বেরিয়ে তারা পড়তই। একমাস আগেই সুবল আর রাতুল একদিন বেরিয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে সকলে খসে পড়বে না বলেই একটু দেরি করে করে একে দুয়ে বেরিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। শুধু এই নোংরামি মাত্র দেখেই তারা বেরিয়ে পড়েনি। তা হলেও সেটা যেন সুন্দরের শোভনতার, ন্যায়ের শেষ হিক্কা।

...আর কর্ণিহারের সেই অ্যাকশনের রাতে জঙ্গলের মধ্যে ফিসফিস করে সুপ্রিয় বলেছিল, 'আর মোদু, তোকে আগে থেকে বলি, আমার সম্বন্ধে মনে রাখতে হলে মনে রাখিস–আজকের এই জোতদারও আমার শত্রু নয়, আমার শ্রেণীর শত্রুও নয়, আমাদের আর সকলের মতই একটা উদ্দেশ্যের মার্টার। মহাভারতে কেউ কারও শত্রু ছিল?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২২-১২৩)

নকশালপন্থী ছাত্রদের এই কেরিয়ারিজম সম্পর্কে ২১ আগস্ট ১৯৬৯ সনের দেশব্রতী পত্রিকায় 'ছাত্র যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান' শীর্ষক প্রবন্ধে চারু মজুমদার বলেন, 'কলেজ ইউনিয়নগুলি ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী প্রতিভাকে নষ্ট করে। শ্রমিক কৃষকদের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো হলো বিরাট বাধা। তারই ফলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউনিয়নের নেতৃত্ব সুবিধাবাদে ডুবে যায়, তাদের মধ্যে 'ক্যারিয়ারিজম্' মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, নেতৃত্বের মোহ তাদের নানারকম সুবিধাবাদী 'ঐক্যে'র দিকে টেনে নিয়ে যায়, তাদের বিপ্লবী নীতিবোধকে ধ্বংস করে' (চারু মজুমদার, ১৯৬৯: ২১)। একেই অমিয়ভূষণ বলতে চেয়েছেন বামবিচ্যুতি। বামবিচ্যুতিই একসময় দক্ষিণপন্থায় পর্যবসিত হয়। দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধাচারণ এবং বামরাজনীতির সঠিক পথকে আপোসকামিতার পথ বলে অস্বীকার করে বামরাজনৈতিকেরা ক্রমশ বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়। আর এই বিচ্যুতিজনিত জনবিচ্ছিন্নতাই তাদের হতাশ করে তোলে। মূল আদর্শগত বিচ্যুতি ধীরে ধীরে তাদের দক্ষিণপন্থীদের বদলে সঠিক অবস্থানকারী বামপন্থীদের বিরুদ্ধেই সুদৃঢ় অবস্থানে দাঁড় করায়। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে অঘোষিত এই দ্বন্দ্বে বামহঠকারীরা দক্ষিণপন্থীদের সাথেই একসময় একাত্মতা ঘোষণা করে। *সোঁদালে*ও মোন্নাত এবং তার বন্ধুরা বামবিচ্যুতিগত হতাশা থেকে মুক্তি পেতে, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর সুন্দর, শোভনতা ও ন্যায়ের পথ খোঁজার উদ্দেশ্যে দল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। অন্যায় আর অপরিচ্ছন্ন রাজনীতিকে পরিশোধনের জন্যই যেন তাদের বামপন্থী আন্দোলন। এটাই উদ্দেশ্য।

নকশাল আন্দোলনে যুক্ততার কারণে মোন্নাত আর তার সহযাত্রী সুপ্রিয়কে পুলিশ জেলে পুরেছিল। নানা জেল পেরিয়ে অবশেষে মোদনাথের শহরের জেলে পৌঁছায় তারা। পারস্পরিক কথোপকথনে ভুল স্বীকার এবং মুচলেকা দিয়ে ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই পাওয়া কিংবা মৃত কারো কারো স্ট্যাচু তৈরি হবার দৃশ্যপট উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে আন্দোলনগত ব্যর্থতার বিষয়টি নির্মিত হয়। মিশন শেষ করবার মোহে শেষ পর্যন্ত জেল পালাতে গিয়ে সুপ্রিয়র মৃত্যু হলেও মোদনাথ আহত অবস্থায় পালিয়ে আশ্রয় নেয় অরণ্যে। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে মোন্নাতের সম্পৃক্ততা তার অস্তিত্বসংকটের ঘাত-প্রতিঘাতকেই চিহ্নিত করে।

মোন্নাতের দ্বিতীয় জন্ম হয়েছিল অরণ্যে–রাভা-কন্যা তিন্নির হাতে। অরণ্য তাকে আশ্রয় দিয়েছিল আর তিন্নি দিয়েছিল জীবন। ডান উরুতে গুলিবিদ্ধ মোন্নাত অভুক্ত-জ্বরগ্রস্ত-ক্লান্ত। নকশাল আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা তখন এক 'গুলি খাওয়া বাঘে'র মত মৃত্যুমুখী । মানসিক শক্তিতে সে কেবল চলছিল স্কটের আইভান হো'র কথা ভেবে। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে করতেই তার জীবনে ঘটে যাওয়া শৈশবের এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শৈশবে রায়ডাকের জলে পড়ে যাওয়া মাতৃহীন মোন্নাতকে বাঁচিয়েছিল তার উদাসীন পিতা। সেই স্মৃতি থেকেই চেতনাপ্রবাহরীতির মাধ্যমে একে একে তার অতিক্রান্ত যাপিত জীবনের অনেকখানি অংশ উন্মোচিত হয় উপন্যাসে। অরণ্যে আত্মগোপনের সময় জ্বরগ্রস্ত অবস্থায় তিন্নির দুবছরের শিশুকে এক বীর্যবান বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জল থেকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচায় সে। এক বীর্যবন্ত বাঘের রূপকল্প মোন্নাতের সাহসিকতায় আরোপ করেন লেখক। প্রায় অচেতন মোন্নাতের হা খোলা ঠোঁটের ফাঁকে ঈষদুষ্ণ মোষের দুধ ঢেলে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল তিন্নি; মোন্নাতের কাছে সেটি তিন্নির স্তনের উষ্ণ প্রাণধারাসম। অমিয়ভূষণের সাহিত্যে নারীর স্তন পুরুষের আশ্রয় হিসেবে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। তিন্নি মোন্নাতের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল এভাবেই।

বহুদিনের জমানো সম্বলের সাহায্যে অরণ্যঘেরা এক অন্ধকার মাঁচায় তিন্নি একটু একটু করে বাঁচিয়ে তুলেছিল মোন্নাতকে। অরণ্যে সমাগত বর্ষার মেঘলা আলোতে মোন্নাত আবিষ্কার করেছিল তিন্নিকে এক অন্যরকম সৌন্দর্যে:

> বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে মোষগুলোর শরীর ঝকঝকে, তিন্নির শরীর চকচকে। তার চুলগুলো যেন পাট পাট, আর আরও ঘন কালো।...নদীতে তো জল বেড়েছেই, বনের মধ্যে ঘুরতে ফিরতেও স্নান হয়ে যায়। এখন কালো কালো কদম গাছগুলোতেও হলুদ হলুদ সুগন্ধ ফুলের বর্তুল। কালো তিন্নি হলুদ ছাড়া পরে না।
>
> এই সময়ে গায়ে ঘামের গন্ধ থাকে না। চলতে ফিরতে গায়ে গা লাগলে গরম লাগে না। বরং ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর শিরশির করলে কাছাকাছি বসলে ওম, আরাম। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৫)

অরণ্যে জোর বর্ষা নামার এমনই এক দিনে তিন্নির শুশ্রূষায় ক্রমাগত সুস্থ হয়ে-ওঠা মোন্নাতকে তাই পুরুষ ভাবতে হয়েছিল তিন্নির। হতে পারে এদের পরস্পরকে কাছাকাছি টেনে আনার জন্য সময় ব্যবহারে লেখক বেছে নেন বর্ষাকেই। তিন্নির শিশুটির পিতৃপরিচয় জানতে চাইলে এই নারী বলেছিল 'কাঁয় জানে?...বনর সাহেব হবার পায়, বনর রক্ষী হবার পায়। হইবে একজন' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৬)। মোন্নাত অনুভব করে আদিবাসী এই নারীর অস্তিত্বসংকটের গাঢ়তা। ক্রমশ পুরোপুরি তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মোন্নাত। কিন্তু পরস্পরের মিলনের পথে বাধ সাধল অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। তিন্নি মোন্নাতের প্রেমে পড়েছিল। আর একদিন তাদের যাপিত জীবনের ব্যয় নির্বাহে বিক্রি করে দিয়ে এল তার কালো এঁড়ে মোষের বাচ্চা। মোন্নাত দেখেছিল, নিজের সন্তানসম লালিত মোষের বাচ্চাটিকে নিদারুণ কষ্টে পুজোর আগে আগে হাটে বিক্রি করে তিন্নি। লেখকের ভাষায়:

> মোন্নাত যেন হাঁপাবে কষ্টে। সে মুখ তুলল। তিন্নিকে দেখতে গেল। সে দেখল কুপির আলোয়, তিন্নির বড় বড় চোখে বড় বড় মণিদুটো ফেটে গেল বোধহয়। তার গাল বেয়ে জল পড়ছে। বোঝাই যাচ্ছে,..এসবই তার জন্য। তাকে সুখী করতে। তাই বলে একটা প্রাণ?...চোখের জলে মুখ ধুয়ে যাচ্ছে তখন, তিন্নি হাত

> বাড়িয়ে মোন্নাতের হাঁটুতে হাত রাখল। কিন্তু সেই রাতে মাঁচাটার ঠিক মাঝখানে সেই কালো এঁড়ে মোষটা, তার শিং বেরিয়েছে কি না-বেরিয়েছে, এরকম শরীরটা নিয়ে শক্ত হয়ে থেকে গেল। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৭-৯৮)

একধরনের অনুতাপবোধ থেকেই তিন্নিকে রেখে অরণ্যজীবন ত্যাগ করে মোন্নাত গ্রামে ফিরে গেল। শীত শেষে বাঁদরলাঠির হলুদ ফুল মোন্নাতের স্মৃতিতে ফিরে আসে তিন্নি। যখন সে শুনতে পেল দক্ষিণের অরণ্য কেটে ফেলা হয়েছে, এমনকি অরণ্য-বিনাশে শিকারিও তার তীরধনুক বাঁধা দিয়ে মদ খাচ্ছে, তখন তার মনে হলো অরণ্যহীনতায় অস্তিত্বসংকটে পতিত তিন্নির কথা। মনে হল, 'বন নাই থাকে মানুষ কোটে বা থাকে?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৯)। অরণ্যের সাথে সাথে আরণ্যক মানুষের অস্তিত্ব ধ্বংসের আসন্নতা মোন্নাতের ভেতর হাহাকার জাগায়। কেননা, মোন্নাত জানত, অরণ্য তিন্নির মত বনের মানুষের আশ্রয় হলেও অরণ্যখেকো মানুষেরা যখন অরণ্যে প্রবেশ করে তখন বনবাসী মানুষের অস্তিত্বেও টান পড়ে। তাই ফিরে গেল সে তিন্নির কাছে। ততদিনে অরণ্যের সত্তায় শেকড় চারানো তিন্নির অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখোমুখি। সাফারিস্যুট পরা বনরক্ষীরা চড়াও হয়েছিল তার উপর। তিন্নির অপমানাহত সত্তার ক্রন্দন উপলব্ধিতে অন্তর্সত্তায় মোন্নাত শুনতে পায় নিজের দ্রোহী কণ্ঠস্বর: 'রে মোন্নাত, মোন্নাত রে। তুই দুইহাতে এক মহাজনক, তুই দুই তীরে দুই জোতদারক–রে মোদনাথ' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১০০)–এই পঙক্তিতেই মোন্নাতের নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ততা আভাসিত হয়ে ওঠে। মনোশক্তির জোরেই মোন্নাত তিন্নির ওপর চড়াও দুজনের একজনকে হত্যা করে। অনিবার্য হয়ে ওঠে দুজনের বিচ্ছেদ। অরণ্যখেকো মানবের কাছে আদিপ্রাণ-অরণ্যচারী এক নারীর অস্তিত্বসংকট এভাবেই উপন্যাসে ফেনিয়ে ওঠে।

বনরক্ষীদের কাছে ধর্ষিত হবার পর তিন্নি প্রায় বছরখানেক পথ হেঁটে তুরুককাটা শহরে এসেছিল। নিরাপত্তাহীন তিন্নি শহুরে জীবনে আবারও শিকার হয় ধর্ষণের । তুরুককাটার তিন্নি-আরণ্যক তিন্নির পুরোপুরি বিপরীত এক অরক্ষিত, অস্তিত্বহীন সত্তা; অরণ্যখেকো সভ্যতা আর শহর হয়ে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র শহর তুরুককাটা তাকে তার সন্তান তথা অস্তিত্ব, কাটারি তথা নিরাপত্তা আর ভৈষী তথা অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুরোপুরি পঙ্গু করে তোলে। জীবিকা হিসেবে জোটে বেশ্যাবৃত্তি। অন্যদিকে, তুরুককাটা শহরে ইটালু কিংবা পাগল পরিচয়ে মোদনাথ রাভার তৃতীয় জন্ম ঘটে। অরণ্যহীন শহরে অরণ্যপ্রাণ মানবের বাড়তে থাকে অস্তিত্বসংকট। খুব সন্তর্পণে পাগল পরিচয়ে লুকিয়ে থাকা জেল পালানো মোদনাথ রাভা উপলব্ধি করে যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসন, পুঁজিবাদের বিস্তার, অরণ্যখেকো মানুষের লেলিহান লোভ এবং অরণ্য ও কৃষিসভ্যতার বিনাশ। অমিয়ভূষণের ভাষায়:

> ...বনারণ্যকে কাটতে কাটতে, ভাঙতে ভাঙতে, ঝলসাতে ঝলসাতে, আল টপকে টপকে শত শত মাইল চলে যাবে চষা জমির ধূসরতা।...মোষ তো আছেই, লাঙ্গল টানতে, গাড়ি টানতে, কাঁধে ঘা, বিখাজ, চোখে পিচুটি, হাড় আর চামড়ায় তৈরি তারা।...বনের ছায়া মরলে খালনালা ছোট নদীগুলো শুকিয়ে যাবে, ঘাস হবে না, মোষ কি করে সংখ্যায় আর আকারে বাড়বে? সেই অসুর জাতিটাও যার কালো চেহারার পুরুষরা কখনো ছ ফুট দাঁড়াত, তারাও সংখ্যা আর আকারে কমে যাবে,...হয়তো তাদের কেউ চা বাগানের সেই নতুন জাতে মিশে গেছে, হয়তো তাদের দু একজন আলের পর আল টপকে চলা শত শত মাইল বিস্তৃত ধান

> আর গ্রাম, রেল আর মোটর রাস্তা, ছোট ছোট ফ্যাক্টরি আর দোকান, ইলেকট্রিসিটি আর রাজনীতির ফর্দাফাঁই আধুনিকতায় চলে এসেছে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৩-৮৪)

মোন্নাত আরও উপলব্ধি করে, বুনো মোষ আর বাথানের মোষের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যচারী আদিম মানুষ আর গ্রামবাসী মানুষের পারস্পরিক মিলন আর সংকরায়ণ। উপলব্ধি করে অরণ্যহীনতায় মানুষের নিরাশ্রয়িতার পেছনেও লুকিয়ে থাকা ধনোৎপাদন পদ্ধতির খেলা। উপলব্ধি করে, গ্রাম বন আর বাথানের মধ্যকার পারস্পরিক সখ্যের পেছনে রয়ে যাওয়া ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির সুবিধাবাদ। কেননা, বন বাথানের মোষের খাদ্য জোগায়। আর গ্রাম অর্থনৈতিক দিকটি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আজ বন যখন ন্যাড়া হয়ে গ্রাম থেকে ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে গেছে, তখন বাথানও উঠে যাচ্ছে; আর তিন্নির মত আদিম আরণ্যক মানুষেরা অরণ্যহীন হয়ে পতিত হচ্ছে অস্তিত্বসংকটে ।

শুধু অরণ্যসভ্যতার বিনষ্টিই নয়, ধনোৎপাদনের নানা কৌশল মোন্নাতের চোখে ধরা পড়ে। 'ফাটা কাপড়', 'সমাজভিত্তিক বনসৃজন', 'হংকং এক্সপ্রেস,' কিংবা 'হংকং মার্কেট'–এসব শব্দও অরণ্যহীন নাগরিকের যাপিত জীবনের অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। অমিয়ভূষণ এর ব্যাখ্যা দিয়ে লেখেন, 'ধনোৎপাদনের পদ্ধতি বদলে গেলে সমাজ, সংস্কৃতি আর সেইসঙ্গে ভাষাতেও পরিবর্তন আসে,...' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৬)। কাজেই ধনোৎপাদন পদ্ধতির মহাযজ্ঞে কখনো ওপারের পলিসটার, অ্যাক্রিলিক কাপড়ের মোচড়ানো প্যান্ট শার্টের কাস্টম্‌স ফাঁকি দিয়ে এপারে আসা, যাকে বলা হয় ফাটা কাপড়, কিংবা হংকং একসপ্রেস, যাকে অমিয়ভূষণ সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'যে লোকাল ট্রেনটা কাছের জংশন থেকে ছেড়ে সীমান্ত পর্যন্ত দুবার যায় ও দুবার আসে, যাতে সারাদিনেও কোনো স্টেশনে একটা বা দুটোর বেশি টিকিট কাটা হয় না, অথচ যা বিনা টিকিটের যাত্রীর চাপে ফেটে পড়তে চায়, তাকে বলা হয় 'হংকং একস্‌প্রেস' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৬)। সীমান্তের ফ্রি ট্রেড জোনে চলাফেরার জন্যই ব্যবহৃত হয় এই ট্রেন । সেইসঙ্গে আসে হংকং মার্কেট। অমিয়ভূষণ একেও সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, 'যে কোনো বড় শহরের যে কোনো বড় রাস্তার ধারে, হয়ত পুলিশ থানার একশ গজের মধ্যে, এইসব 'ফাটা কাপড়', চীনা টর্চ, ছাতা, হাত ব্যাগ, কলম, চীনা ও জাপানী পলিস্টার ইত্যাদি থান কাপড় বিক্রির যে বাজার তাকে 'হংকং মার্কেট বলে'' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৬)। মোট কথা হংকং একসপ্রেস ধরে এপারে এসে এই লোকগুলো হংকং মার্কেটে ফাটা কাপড় বিক্রি করে। মোন্নাত পাগলের ছদ্মবেশে তুরুককাটা শহরে ধনোৎপাদন পদ্ধতির এইসব ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলোর সাথে পরিচিত হতে থাকে। নিজেও সে অরণ্যধ্বংসী ইট-ভাটায় কাজ করে আর অনুভব করে, 'বাস ভাড়ায় টাকা তৈরি হচ্ছে, ফাটাকাপড়ের বিক্রিতে টাকা তৈরি হচ্ছে, মাটি কাটা, ফ্লাড, খরা, ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্সে ধনোৎপাদন হচ্ছে, আর বনে এমন গাছও আছে যার যে কোনো একটা ত্রিশ হাজার করে টাকা বানায়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১০৯-১১০)। অরণ্য ধ্বংস করে ধনোৎপাদনের চলমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কৈচন্দ্রের মত অনৈতিক মানুষেরা। তিন্নির ধর্ষক হিসেবে না হলেও কৈচন্দ্র তার কাছে অরণ্যখেকো হিসেবে নতুন করে পরিচিত হয়ে ওঠে। অমিয়ভূষণের ভাষায়, 'যারা একটা লোকাল ট্রেনকে কবজা করে ফেলেছে, যারা সীমান্তের সীমান্তরক্ষী ও কাস্টমস সাহেবদের পরোয়া না করে সীমান্ত টপকে মাল নিয়ে আসা যাওয়া করে, তারা নির্জীব, নির্বীর্য নয়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৬)। তবু এদের ওপর ছড়ি ঘোরানোরও লোক আছে, যারা অরণ্যখেকো, যারা গুন্ডামি

করে বেড়ায় এবং যারা এই পার্টির বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী। রাজনীতির সঙ্গে এদের অন্তরঙ্গ যোগ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক স্বরাজ গুছাইত লিখেছেন:

> 'ফাটা কাপড়'-এর ক্ষুদ্র প্রকল্পের মানুষদের কোনওরকম আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই; কারণ তারা 'হংকং একস্প্রেসে' যে 'পার্টির রবরবা' সেই পার্টিকে অকপটে, নির্ভীক হৃদয়ে সমর্থন করে; অথচ দু'জন অল্পবয়সী 'ফাটা কাপড়' প্রকল্পের মানুষ যেভাবে খোকনেন্দ্র দাসের শক্ত ও উদ্যত ছোরার মুখোমুখি হয়েছে তাতে এটা সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে, দেশে আর এক প্রকার গুণ্ডাবাজ পার্টি আছে, তাদের ক্ষমতাও অফুরন্ত; শিক্ষা আছে কিন্তু মূর্খ বলে তারা অঞ্চলপ্রধানের নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে না; আসলে, তাদের বুদ্ধি আছে কিন্তু মাথা নেই। (স্বরাজ, ১৯৯৭: ৩৮)

এভাবেই উপন্যাসে উপস্থিত হয় খোকনেন্দ্র দাস। লেখক খোকনেন্দ্রর শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার মর্যাদাবান পরিচিতিকেও তুলে ধরেন তির্যক ভাষায়:

> গতবারের অঞ্চল প্রধানের নির্বাচনে খোকনেন্দ্র দাঁড়াতে পারেনি কারণ সে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার নয়। তারপরেই মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে জিতে সে ইতিমধ্যে এস ডি ও, এস ডি পি ও ইত্যাদির সমান মানের মর্যাদায়। এম এল এ হওয়াটা নানা কারণে কঠিন। একই কথা। সে প্রাইমারি পাশ নয়। কিন্তু এ অঞ্চলটায় এখন তাদের পার্টিরই প্রাধান্য, যার মূলে সে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৭)

যে গ্রামের নাম ছিল দলদলি, সেটি এখন খোকনেন্দ্র দাসদের ক্ষমতার আওতাভুক্তি পেয়ে নতুন নাম পেয়েছে 'নয়াবস্তি'। গ্রাম হয়ে উঠছে বস্তি। দক্ষিণবঙ্গের ব্লক অফিসের পিওন খোকনেন্দ্র দাস, স্বরাজ গুছাইতের ভাষায়, 'খোকনেন্দ্র দাস বা খোকনচন্দ্র দাস একজন 'অলৌকিক-প্রকল্পের' ভাড়াটে গুন্ডা; সে ব্লক অফিসে পিওনের কাজ করে আবার খুন-খারাপিও করে;' (স্বরাজ, ১৯৯৭: ৩৭)। এ নামটির সঙ্গে লেখক ক্ষমতার যোগ ঘটিয়ে সময় ও সমাজ রূপান্তরের আরেকটি মাত্রা উন্মোচিত করেন। অরণ্যখেকো কৈচন্দ্র আর খোকনেন্দ্রর অরণ্য উজাড় প্রকল্প আর চোরাই কাঠের ব্যবসা উপন্যাসে ধ্বংসপ্রায় অরণ্যের বাস্তবচিত্র রূপায়ণে সাহায্য করে। কৈচন্দ্র আর অমল তরুরাজ বিপরীত পার্টি আর ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের হলেও চোরাই কাঠের ব্যবসায় স্বার্থগত দিক থেকে এরা এক। অমিয়ভূষণ তির্যক বাক্যে উচ্চারণ করেন,'... যদিও অমল তরুরাজের একটা ব্যাপার এই আছে, সে সব পার্টির সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলে।...এখানে শহরের কেউ কৈচন্দ্রকে অমল তরুরাজের মত মহাজনের সঙ্গে এক দেশলাই কাঠি থেকে সিগ্রেট ধরাতে দেখবে না' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৮)। কৈচন্দ্রের ভাবনা মিথ্যে হয়। মোন্নাতের চোখে ধরা পড়ে তাদের এই স্বার্থগত সখ্য।

উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কৈচন্দ্র সরকারি দলের পাণ্ডা। জাতে রাভা হলেও তার এই পরিচয়ে সংকরায়ণ ঘটে গেছে। তাকে আর এখন রাভা হিসেবে আবিষ্কার করা দুরূহ। জন্মগতভাবেই তার অস্তিত্ব-সংকট উপলব্ধ হবে উপন্যাসে। সতালু দাদা মৈচন্দ্রের ঔরসজাত কিনা সে, এই সন্দেহ তার চেতনায় গাঢ় হয়ে ওঠে প্রায়শই। তার মনোভাবনায় হানা দেয়:

সে তার সতালু দাদাকে ভালবাসে, কিন্তুক–। বাপের মত স্নেহ কিংবা তার চাইতেও বেশি স্নেহে মৈচন্দ্র তাকে মানুষ করেছে। সেইটাই–। তার নিজের যদি চল্লিশ হয়, মৈচন্দ্রর পঁয়ষট্টি হবে। সেইটাই–। কৈচন্দ্রর মনের মধ্যে কেউ বলল, সেই পাপে তোমার নিজের একটাও ছেলেমেয়ে নেই।...পাপ কি করে বলবে, কী প্রমাণ? হতে পারে, সে তার পিতার মৃত্যুর পরে জন্মেছে;...যে ঘরে সে আর তার মা ঘুমত, সেই ঘরেই তার সতালুদাদাকে সে ঘুমতে দেখেছে অনেক সকালে ঘুম ভাঙার পরে। তার মাও এখন পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি। সে নিশ্চয় তার সতালুদাদা মৈচন্দ্রকে ঘৃণা করে। 'না, না ঘৃণা কেন? সেই ঘরই তো বাড়ির সব চাইতে মজবুত ঘর, আর কাঠের সিন্দুক চৌকিটাও সেই ঘরে। তো ঘরের অধিকার কাঁউ ছাড়ে নাই। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১০২-১০৩)।

জন্ম নিয়ে তার এই সংশয় এবং মৈচন্দ্রের প্রতি এক অব্যক্ত প্রতিযোগিতা তাকে মানসসংকটে ফেলে। রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকেও তারা ভিন্ন পথের। মৈচন্দ্র জোতদার পার্টির আর কৈচন্দ্র সরকারি দলের। মৈচন্দ্র আর কৈচন্দ্রের পারস্পরিক বিতর্কে রাজনীতির রূপান্তরিত স্বভাবস্বর উচ্চকিত হয়ে ওঠে। মৈচন্দ্রের জোতদার পার্টির নানা ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার আনন্দে কৈচন্দ্র আলোড়িত। অন্যদিকে, মৈচন্দ্রের সন্তানেরা কৈচন্দ্রের পার্টির বৈনাশিক স্বভাবকে চিহ্নিত করলে কৈচন্দ্র তাকে নানা প্রকল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তার রাজনীতিতে সুবিধাবাদের প্রকাশ অসীম। অমিয়ভূষণ মৈচন্দ্র আর কৈচন্দ্রর টুকরো টুকরো আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতির রূপান্তরিত স্বভাবস্বরকে ধরতে চেয়েছেন:

... কৈচন্দ্র হেসে বলল, 'গ্রামৎ বসি থাকিস, জানবু না কিছু। কাঁয় করছে তোর ওই জমিধরা আইন? তোরই নুন-পাট্টি।'

...কৈচন্দ্র বলল, 'তুই ভাবিস, আমি ঘরৎ খায়া বনৎ ভৈষ চরাই? তো, পইলা , বন বা কোটে আর? ভৈষ বা কোটে? দুসরা, উমরা ত্তিস শাল প্রধান থাকছে, পাইছে কী? করছে কী? বিডিও সাহেব, মোর গ্রামৎ কিছু গম দিলে ভাল্, বিডিও সাহেব মোর গ্রামৎ কিছু মাটি কাটা কাম হলে ভাল্। এই না করছে ত্তিস শাল? বিডিও দেখি চেয়ার ছাড়ি উঠি দাঁড়াছে। হেডক্লাক দেখি হাত মোচড়ামুচড়ি কচ্ছে।...জমানা পালটি গেইছে রে,...মোর পাট্টি বনৎ ভৈষ চরায় না। অ্যালা মোক সভাপতি সাহেব কয় কি না কয়, শুনি আয়। অ্যালা কাঁও-এ কারো অধীন নাই রে। বিডিওক দেখি চ্যার ছাড়ং মুই?

মৈচন্দ্রর মেজ ছেলে হেসে বলল, 'আচ্ছা কাকা, তুই না হয় রাজবংশী থাকি সাহেব হয়া গেইছিস, কিন্তুক তাত দশজনার কী হইছে?

...দাদা, তোক কয়া দিই, আগৎ যে ইলেকশনৎ দাঁড়াছিস, অ্যালা আর দাঁড়াবু না। তোর অমলতবু হারি যাইবে।...তোর গ্রামৎ অ্যালা উমরায় না মেজোর্‌টি।

'উমরায় ক্যান কবু? খুলি ক।'

'হোই না রংপুরিয়া ইফুজিগুলা।'

'কায় বসাইছে ওগুলাক? তুই-তো।' মৈচন্দ্র বলল।

'হামি? হামি কী করছি? র‍্যাশন কাড করি দিছং? তার আগৎ কাঁয় আনছে? কনট্রাক্টও আনছে কিনা মাটি কাটিবার? তো এটেকার মানষি তের টাকা নেয়, উমরা নেয় দশ টাকা। তো লোভ লাগি গেইছে, যায় নাই। পাছৎ না খায়া থাকে, র‍্যাশন কাড করা লাগে কি নাই লাগে?'

ফিরি যায় না ক্যান? মৈচন্দ্রের সেজ ভাই বলল।

ক্যানে ফিরি যাইবে? আমার পাট্টির এন্ট্রে তো কয়া দিছে, উমরা আমার আত্মীয়।...আগৎ তো সগায় ইন্ডিয়ার ছিটিজেন, পাছৎ তো বাংলাদেশী।

কৃষ্ণচন্দ্র ...হেসে বলল, 'আচ্ছা, কাকা, তো, এরশাদ রংপুরিয়া হয় কি না হয়?'

'হয় তো।'

উমরা ইন্ডিয়া স্বাধীন হওয়ার আগে থাকি ইন্ডিয়ার ছিটিজেন,...

কৈচন্দ্র ...বলল, 'হয় তো'।

'ভাবি দেখ, কাকা। এরশাদ তো আত্মীয় হইল। উমরায় যদি বিশ হাজার আত্মীয় ধরি আসি যায়, র‍্যাশন কার্ড করি দিবু তো?' কৈচন্দ্র তেড়ে উঠল।

... ...

'আচ্ছা, কাকা, তোমার সড়কৎ লাভ কি হইল্?'

'বাস যাইবে, বাস।'...

'তোমার বাসৎ প্যাসেঞ্জার বা কাঁয় হয়! আচ্ছা হউক তা। সড়কের মাটি কাটি তো গ্রামৎ টাকা আসছে, ভোট হয়া গেইছে। ভাল্ই। কিন্তু জল বাধি গেইছে। আগৎ এ গ্রামৎ জল জমছে?

'জল জমে তো কী হয়? ফ্লাড হয়া যাইবে? গম দিম্, টাকা দিম্।

'আর ওই ব্লকর ওই সড়কটা হইলে তো দু-সড়কর মাঝের জমি বিল হয়া যাইবে।'

যাইবে ।...শোন, শোন। তেমন হয়া যায় খারাপ কী হইবে? নিবিড় মাছচাষ প্রকল্প করি দিম্। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১০৪-১০৭)

জোতদার পার্টি আর তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারি দলের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আর সরকারি দলের সুবিধাবাদী চরিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে সড়কে জনগণের কোন লাভ নেই, যে সড়কের জন্য মাটি কেটে গ্রামে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, যে সড়কের জন্য জমি বিলীন হয়ে বিলে পরিণত হয়েছে, কৈচন্দ্রের সরকারি দল সেসব বৈনাশিক অবস্থাকে ভোটের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের সাথে অরণ্য কেটে চোরাই কাঠের ব্যবসা করা কিংবা বস্তাবন্দি ইরি ধানকে ভোগধান বলে চালানোর মধ্য দিয়ে কৈচন্দ্রের সুবিধাবাদী সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভাইপো কৃষ্ণচন্দ্রের চেতনায় মুদ্রিত কৈচন্দ্র সম্পর্কিত ভাবনারাশির প্রকাশ তাই এভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠে, 'কাকা তোমরা ভ্যাজালদার হয়া গেইছেন'

(অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১১৬)। এভাবেই *সোঁদাল* উপন্যাসে কৈচন্দ্র জাফরুল্লার মতই সীমাহীন লোভে অরণ্য গ্রাস করে যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। এমনকি রাভা জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়টিও তার ফিকে হয়ে যায় সাহেব হয়ে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষার চাপে।

উপন্যাসে মোন্নাত আর তিন্নি যদি আরণ্যক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, তবে খোকনেন্দ্র ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। অরণ্যের প্রাণখেকো এই ব্যক্তি সহসাই মোন্নাতের চেতনায় আলোড়ন তোলে। তিন্নির ধর্ষকদের আবছা অবয়ব মোন্নাতের চেতনায় মুদ্রিত ছিল। অরণ্যখেকো খোকনেন্দ্র আর কৈচন্দ্রকে দেখে তার মনে হয় এদের সে চেনে। ধীরে ধীরে মোন্নাতের ধনতান্ত্রিক সমাজকর্তৃক প্রদত্ত ইটালু সত্তা তার রাভা শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। মোন্নাতের প্রগাঢ় অনুভব ভাষা পায় এভাবে :

> ...কেউ যেন পালাচ্ছে। ইটালু কি? তার এরকম অনুভব হলো, তার আগে আগে কেউ হাঁটছে। সে হাঁটতে শুরু করল। সে এরকম অনুভব করল, দেখা যাক তো সত্যি ইটালু পারে নাকি শহরে ঢুকে যেতে। অদূরে তো শহরের কেন্দ্রস্থল। আদালত, সরকারি অফিস...খাকিকোট পুলিশ...গাড়ি আর ভিড় আর বোধহয় সবচাইতে বড় চায়ের দোকান। দেখো, ইটালু চায়ের দোকানটার দিকে যাচ্ছে। মোন্নাত এ পকেট ও পকেট থেকে খুচরো পয়সা, ছোট ছোট নোটে কয়েক টাকা বার করে ইটালুর হাতে দিয়ে ঠিক করল, ইটালুর গায়ে গায়ে লেগে থেকে দেখতে হবে, ইটালু ওই শহরের মানুষদের ভিড়ে ঢুকে যেতে পারে কিনা। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১১৮)

মোন্নাতের গায়ে ও চেতনায় সাঁটা ইটালু (যে ইটের কাজ করে, যন্ত্রসভ্যতার প্রতীকসত্তা) তার মূল মোন্নাত সত্তা থেকে বেরিয়ে যাবার পর সে সবরকম দ্বিধা মুছে ফেলে শেকড়বিচ্ছিন্ন-অস্তিত্বহীন বারবণিতা (একদা অরণ্য-নারী) তিন্নিকে নিয়ে অরণ্যের পথে পা বাড়ায়। সুপ্রিয়র মৃত্যু, আন্দোলনগত ব্যর্থতাবোধ, হতাশা, যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসন, পুঁজিবাদের বিস্তার, রাভা জাতগোষ্ঠীর অস্তিত্বসংকট আর বুনো আরণ্যক মানুষের সংকরায়ণ তার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। আরোপিত পাগল সত্তা তার অস্তিত্ববিকল করে তুলছিল ক্রমশ। চেতনায় জিজ্ঞাসারা হানা দেয় বার বার:

> আরে, সে কি সত্যি পাগল? সে কি পাগলের ভান করছে না? এই শহরটা কি তা হলে কিছু না? দূর, সে পাগল হবে কেন! সে একটা পথের ধারের গাছকে জড়িয়ে ধরল। হে গাছ, হে আকাশ, হে পৃথিবী, আমাকে পাগল হতে দিও না। সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। যা হবে, তা তো এই শহরেই হবে। তার আগে তাকে সব প্রবেশ পথ, সব প্রস্থানপথ চিনে রাখতে হবে না কি? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২০-১২১)

মোন্নাত আর তিন্নি দুজনেই এই নেতিবাচক জীবন ছেড়ে অরণ্যজীবনের পথে পা বাড়ায় আবার। *মহিষকুড়ার উপকথা*-র আসফাকের পিরহানের মতই পরনের গোলাপি শাড়ি ছেড়ে হলুদ সোঁদাল রঙের শাড়ি পরে তিন্নি শহুরে বেশ্যা জীবনের ইতি টেনে তার আরণ্যক সত্তা ফিরে পায়। একসময় কাটারিও ফিরে আসে তার কোমরে। কারণ, 'বনের বেটি ছাওয়ার কোমরৎ কাটারী নাই থাকে তো নাঙ্গা মনে হয়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২৭)। তার শরীরে সবজে শ্যামল বনের মত লাবণ্য ফিরেছিল। তিনমাস বনের পথ চলতে গিয়ে তারা যাযাবর জীবনে সংসার পেতেছিল। আর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই উচ্চারণে তিন্নির কণ্ঠ আবেগে কেঁপেছিল,

'একটা রাতি থাকিবার দে। জীবনের সোয়াদ মিটায়ে নিম্' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১২৭)। কিন্তু তিন্নির অভিমানাহত উচ্চারণও মোন্নাতকে ফেরায় না। কিন্তু ভয় ধরানোই যাদের উদ্দেশ্য, যাদের কাছে ভোট জেতার হাতিয়ার টেলিস্কোপিক রাইফেল, স্টেনগান কিংবা টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য অবলীলায় যারা মানুষ মারে, খোকনেন্দ্র দাসের মত সেইসব বিবেকহীন বর্বরদের কাছে জীবনের স্বাদ মূল্যহীন। আর তাই খোকনেন্দ্র আর তার সঙ্গীর কাছে পাগল ইটালু কিংবা মোন্নাতের দাম টার্গেট প্র্যাকটিসের নিশানা পর্যন্তই। খোকনেন্দ্র দাস আর কৈচন্দ্রদের মত অনৈতিক ব্যক্তিস্বার্থপ্রধান রাজনীতির কাছে মোন্নাতের মত স্বাধীনতাকামী মানুষের আত্মাহূতির মধ্য দিয়ে মোন্নাত আর তিন্নির সংকটাপন্ন সত্তাকে প্রতীকায়িত করেন । এ প্রসঙ্গে সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> 'সোঁদাল' নভেলেটটিতে লেখক যে গল্পের ভেতর নিয়ে যান তার মূলকথা ধনতন্ত্রের চক্রান্তে আদিম সরলতা তার প্রেমপিপাসা নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। মোন্নাত অসুর উপজাতি কন্যা তিন্নির কাছে অরণ্যে আশ্রয় পেলেও তা চিরস্থায়ী নয়। পিপাসা থেকে যায় জীবনের জন্য। (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ১১০)

মোন্নাতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এভাবেই লেখক যন্ত্রসভ্যতা-পুঁজিবাদের উত্থান আর অরণ্যপ্রাণ কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের পতন চিহ্নিত করেন। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রতীকও এটা। *সোঁদাল* উপন্যাসে এভাবেই লেখক অরণ্যহীন নগরসভ্যতার নেতিবাচক কথকতা রূপায়িত করেন। সময়ের অভিঘাত ও সভ্যতার ক্রমরূপান্তর ব্যক্তির হৃদয়ে রচনা করে অস্তিত্বসংকট; অরণ্যই একমাত্র আশ্রয়, যেখানে মোন্নাত তিন্নির মত মানবাত্মা জীবনসংকট উত্তরণে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার পরিসর পায়।

উপর্যুক্ত চারটি উপন্যাস বিশ্লেষণ করে বলা যায়, লেখক এখানে আদিপ্রাণ আরণ্যক মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব-সংকট প্রকাশ করতে গিয়ে যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপের নানা মাত্রা স্পষ্ট করে তোলেন। যন্ত্রসভ্যতা আদিপ্রাণ মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস ও যাপিত জীবনের শান্তি বিনষ্ট করে তাদের সত্তায় লোভ-সংশয়-হতাশার বীজ রোপণ করে। আদিপ্রাণ মানুষের জীবনে জড়িয়ে-থাকা অরণ্য বিনষ্ট হয় যন্ত্রসভ্যতার লোভের লাঙলে । ফলে তারা শেকড়বিচ্ছিন্নতার স্বাদ পায়। অস্তিত্ব-সংকট আরোও গাঢ় হয় তখন। সময়ের প্রবল অভিঘাতে রূপান্তরিত সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে কেউ কেউ সমূলে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, কেউ-বা সেই প্রবল আঘাতের ঘাত-প্রতিঘাত উৎরে গিয়ে অরণ্য আর স্বসংস্কৃতি আঁকড়ে আদিপ্রাণ ধরে যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিকতার বিরুদ্ধে তাদের মৌন লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটায়। অরণ্যই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র আশ্রয়। অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে বৈরি সময় আর সভ্যতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো প্রবল অস্তিত্ববান এইসব আদিপ্রাণ মানুষের জীবনকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে মাতালু আর কাঁকরুর নিরন্তর লড়াই, অরণ্যের উত্তরাধিকার ধারণে চন্দানির অরণ্যে যাপিত জীবন, লেদু মিঞার আত্মোৎসর্গ, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নে মোন্নাতের অরণ্যে আশ্রয় অন্বেষণ কিংবা অরণ্যহীনতায় আব্রুহীন ধর্ষিত তিন্নির শহর-অরণ্য-রাজনীতি আর পুঁজিবাদী-অর্থনীতির বিনষ্ট মুখাবয়বের সঙ্গে নীরব দ্বন্দ্ব কিংবা নির্বীর্য আসফাকের সত্তায় প্রগাঢ় বীর্যবান মোষের আরণ্যকস্বর–অমিয়ভূষণের এইসব উপন্যাসকে প্রাণ দিয়েছে। অরণ্য আর কৃষিসভ্যতার বিরুদ্ধে আত্মসর্বস্ব যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার, আরণ্যক আদিপ্রাণের বিরুদ্ধে উঠতি পুঁজিপতিদের আগ্রাসন, রাজনীতির কলুষিত মুখাবয়ব

কিংবা রূপান্তরিত অর্থনীতির আগ্রাসনে মূল্যবোধ-বিশ্বাস-যাপিত জীবনের পরিবর্তন–এসবকিছুর মিথস্ক্রিয়ায় অমিয়ভূষণ মূলত সময়কেই ধারণ করেছেন। সেই ক্রমরূপান্তরিত সময়ের অভিঘাতে আদিপ্রাণ মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে এইসব উপন্যাসে।

সহায়কপঞ্জি

অনিন্দ্য সৌরভ (২০০১)। "দুখিয়ার কুঠি: ছিন্নমস্তা সভ্যতা ও বিলীয়মান কৌম-সমাজ", বৈতালিক, তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৫ ই মাঘ, কলকাতা। পৃ. ৮৬-৯০

অনিন্দ্য সৌরভ (২০০৩)। "মহিষকুড়ার ইতিবৃত্ত", 'জলার্ক', পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল, কলকাতা। পৃ. ২৪-২৯

অর্ণব সেন (২০১৪)। *শৈলী ভাবনায় কথাসাহিত্যের কয়েকজন*, দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০২)। 'নিজের কথা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ১, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৫)। 'দুখিয়ার কুঠি', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৩, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৮)। 'মহিষকুড়ার উপকথা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৬, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০১০)। 'হলং মানসাই উপকথা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৮, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০১০)। 'সোঁদাল', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৮, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অলোক রায় (২০০৯)। *বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

উর্বী মুখোপাধ্যায় (২০১৬)। *অমিয়ভূষণের উপন্যাস প্রসঙ্গে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ঊষাকুমার দাস (২০০৮)। "রচনাপ্রসঙ্গ", (ঊষাকুমার দাসের ১৯.৬.৬৯ তারিখের পত্র), উদ্ধৃত: *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৬, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ৫৪৮

চারু মজুমদার (১৯৬৯)। 'দেশব্রতী' পত্রিকা, ২১ আগস্ট ১৯৬৯, উদ্ধৃত: *মননে সৃজনে নকশালবাড়ী*, প্রদীপ বসু সম্পাদিত, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ.২৪০

ডোরা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮১)। "মহিষকুড়ার উপকথা", 'লা পয়েজি', পঞ্চদশবর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১২০-১৩০

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৫)। "উপন্যাসের প্রতিবেদন: বিশেষ পাঠ 'দুখিয়ার কুঠি", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৮৯-১০৯

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১০)। *উপন্যাসের বিনির্মাণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

দেবাশিস মল্লিক (২০০৪)। "মহিষকুড়ার উপকথা: নিম্নবর্গের সংস্কৃতি সন্ধান", 'ঐক্য' ক্রোড়পত্র অমিয়ভূষণ, ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ. ৭১-৭৭

ধীমান দাশগুপ্ত (১৯৯৪)। "ঐতিহ্যের আধুনিক আত্মনির্ণয়: মহিষকুড়ার উপকথা", 'উত্তরাধিকার' চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১১-১৫

নির্মল দাশ (২০০১)। *উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ*, সাহিত্যবিহার, কলকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১০)। "ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ. ১-২১

বিজিতকুমার দত্ত (২০০১)। "মহিষকুড়ার উপকথা–ভিন্নপাঠ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১৫৫-১৬৭

বিপ্লব মাজী (২০১২)। "বাংলা উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন", *বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর*, বিপ্লব মাজী সম্পাদিত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ. ৩৯৭-৪১৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০৫)। *আরণ্যক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মহাশ্বেতা দেবী (২০০৩)। "চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* নবম খণ্ড, অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মহাশ্বেতা দেবী (২০০৩)। "অরণ্যের অধিকার", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* অষ্টম খণ্ড, অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী এবং জোবাইদা নাসরীন (২০০১)। *নিজভূমে পরবাসী* ১, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ উৎস প্রকাশনী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৯)। "রক্তকরবী", *রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টম খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবিন পাল (২০১১)। *উপন্যাস: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

রমাপ্রসাদ নাগ (২০০২)। *স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

রমাপ্রসাদ নাগ (২০১৪)। *অনন্য অমিয়ভূষণ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

শুভময় মণ্ডল (২০০১)। "নির্বাস: বিন্যাসের বিপর্যয়ের সৌকর্য", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১২৮-১৪৬

শিবনারায়ণ রায় (১৯৯৪)। "এই অরণ্য, এই নদী, এই দেশ", 'উত্তরাধিকার' চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর (পুনর্মুদ্রণ), অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা।পৃ. ৩০-৩২

শুভঙ্কর ঘোষ (২০০১)। "দুখিয়ার কুঠি: অনন্য অমিয়ভূষণের ক্যাজুয়াল ফসল", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১০৫-১০৮

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭১)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

স্বপন সেন (২০০১)। "অমিয়ভূষণ: স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত লেখক", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৫৯-৬২

স্বরাজ গুছাইত (১৯৯৭)। *বিনির্মাণ ও সৃষ্টি: আধুনিক উপন্যাস*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।

সুকান্ত সেন, অভিজিৎ রায় ও সিলভানুস লামিন (২০০৭)। "পটভূমি", *সমতলের আদিবাসী অধিকার ও অধিকারহীনতা*, বারসিক, ঢাকা। পৃ. ৯-২৫

সুবোধ ঘোষ (১৩৫৫)। *ভারতের আদিবাসী*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, কলকাতা।

সুবোধ দেবসেন (২০১০)। *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, বর্ণ গ্রন্থন, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী (২০০১)। "অমিয়ভূষণ মজুমদার ও আদিবাসী চেতনা", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ.২৬৩-২৮৮

হাসান ফেরদৌস (২০১৪)। "আদিবাসী, আমাদের প্রথম মানব", *আদিবাসী আছে?...আছে!*, সায়েমা খাতুন ও মাহমুদুল সুমন (ভূমিকা ও সম্পাদনা), সংবেদ, ঢাকা। পৃ. ৩৮-৪১

সাক্ষাৎকার

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯৯৪)। "আমাদের দেশে যদি সমালোচক থাকত তবে লোকে বুঝত কোনটা উপন্যাস, কোনটা উপন্যাস নয়...", অনিন্দ্য সৌরভ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, 'উত্তরাধিকার', অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ. ১-৩২

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৬)। "–অধিদৈবতের প্রস্থান : প্রয়াত অমিয়ভূষণের শেষ দীর্ঘতম জবানবন্দী–", সৌরভ ঘটক, জয়ন্ত চক্রবর্তী, শুভ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার (মুদ্রণ: উতঙ্ক কুমার দে, তন্ময় নাগ), সহস্রাব্দ, পঞ্চম বর্ষ জানুয়ারি-জুন, কলকাতা। পৃ. ৫-২৭

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৪০৮)। পৃথ্বীশ সাহা রচিত "স্বগত অমিয়ভূষণ মজুমদার" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত নকশাল সম্পর্কে অমিয়ভূষণ মজুমদারের বক্তব্য। শারদীয় শিলীন্ধ্র, ৩৫ বছর পূর্তি সংখ্যা ৩-৪, কলকাতা। পৃ. ৩৭১-৩৮১

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক নরনারীর সম্পর্ক: মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ অন্বেষণ

একালের উপন্যাসশিল্পে আধুনিক নরনারীর মনোদৈহিক জটিলতা লেখকের হাতে নানা মাত্রিক পরিচর্যা পেয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে আধুনিক জীবনের এই জটিলতার গ্রন্থি লেখক বুনে তুলেছেন গভীর শিল্প চেতনায়। জটিলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্দীপক শক্তি হিসেবে তিনি সক্রিয় করে তোলেন সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং নরনারীর প্রেম ও যৌন-মনস্তত্ত্ব। নারীপুরুষের আচরণগত বিচিত্র জটিলতার মধ্য দিয়ে সময়ের অভিঘাতটিই অমিয়ভূষণ অনুভব করতে চান। বৈরি সময়ের গর্ভে প্রতিস্থাপিত তাঁর চরিত্রগুলি উপলব্ধি করেছে অস্তিত্বের টানাপড়েন, যন্ত্রণা আর বিবিক্ত সত্তার আলোড়ন। *নির্বাস* (১৯৫৯), *বিলাস বিনয় বন্দনা* (১৯৮১), *বিবিক্তা* (১৯৮৯) ও *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী* (১৯৯৭) উপন্যাসের চরিত্রগুলো সময়ের করালগ্রাসে কখনো ক্ষতাক্ত হয়েছে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায়, আবার কখনো-বা বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করেই প্রগাঢ়ভাবে অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে। টানাপড়েনের যন্ত্রণায় বিদ্ধ অমিয়ভূষণের উপর্যুক্ত উপন্যাসের নরনারীর আন্তর্জাগতিক জটিলতার স্বরূপ উন্মোচনই বর্তমান অধ্যায়ের মৌল অভিপ্রায়।

এক সাক্ষাৎকারে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে নিজের ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন অমিয়ভূষণ। তাঁর বক্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যাবে নারী ও পুরুষ চরিত্র নির্মাণে তাঁর মূল প্রবণতা:

> ...পুরুষ এবং স্ত্রী মিলে একটা জাতি, মানুষজাতি, যার...সুন্দর অংশটা নারী। শুনতে পাই y ক্রমোসোমের এক ক্ষীণাংশ আদিজনক অ্যাডামের, ডি এন এ-র সবটাই ইভের। আমি তো দেখলাম জননী, জায়া, দুহিতার স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধার সম্পদ হয়ে জীবন কাটালাম...আমার তো মনে হয় নারীরা যদি তাঁদের ও তাঁদের সন্তানের প্রয়োজনে আমাদের না লাগান, আমরা...ভয়ে (মৃত্যুভয়ে) সন্ন্যাসী হয়ে যাব।...যদি বলি নারীই জীবন, পুরুষ তার means to an end?... (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৫: ৩৯)

অমিয়ভূষণের উপন্যাসের নারী চরিত্র তাই প্রবলভাবে ব্যক্তিত্বময়ী। তুলনায় পুরুষেরা অনেকটাই ম্রিয়মান। সমালোচক সমীর চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছেন, অমিয়ভূষণের কাছে নারী:

> গর্ভধারিণী জননী, আনন্দের আধার, প্রতিপালিকা, আশ্রয়দাত্রী, করুণাময়ী,...এই নারী তন্ত্রের নারী, সৃষ্টিধারিকা, প্রাণবীজাধারা, পালিকা ও চালিকা। অন্যদিকে পুরুষ–স্বার্থপর, ভীরু, অত্যাচারী, পরাধীন, শোষক,...। অবস্থার সুযোগে সে নারীকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।...নারীই নিয়ামক, নির্মাতা, এবং নিয়তিও।...অমিয়ভূষণের প্রত্যেকটি নারী চরিত্র একেকটি পজিটিভ ফোর্স। নিজে নিজেই সক্রিয়।...সে এক স্বাধীন পরমা সত্তা। (সমীর, ১৯৯৫: ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬)

তাঁর উপন্যাসে নারী প্রধানত পুরুষের আশ্রয় এবং শক্তি। ফলে নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোসংকট উপন্যাসে যতটা প্রকট, পুরুষের ক্ষেত্রে সেটি ততটা প্রধান হয়ে ওঠেনি। আধুনিক নারীর জীবনসংকট তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও সেখানে নারীর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পুরুষ। আধুনিক পুরুষ ও নারীর বিচ্ছিন্নতাবোধ, তাঁদের আত্মসম্মান, সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কৌশলে আপাত

পরাজিত ব্যক্তিসত্তার ক্রন্দন এবং শেষপর্যন্ত এসবের বিরুদ্ধে তাদের মাথা উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

নারীপুরুষের প্রেম এবং যৌন মনস্তত্ত্ব এই উপন্যাসগুলোতে গভীরভাবে রূপায়িত। পাঠক উপলব্ধি করবেন, সংস্কারমুক্ত আদিম যৌন সম্পর্কের পরিস্ফুটনে অমিয়ভূষণের এই উপন্যাসগুলো অনন্য। লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের যাপিত প্রেম ও যৌনতায় এই আদিম সংস্কারহীনতার প্রকাশ ঘটান। যদিও তাঁর উপন্যাসে প্রেম আর যৌনতা একেবারেই পৃথক। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ভাত ও মদ যেমন পৃথক, তেমনি প্রেম ও কেচ্ছাও ভিন্ন। প্রেম যদি আলো হয়, তবে কাম অঙ্গার-পোড়া চারকোলের ছাই।...সমগ্র অমিয়ভূষণেই যৌনচেতনা কখনো প্রেমের পরিবর্ত হয়ে ওঠেনি।...যতক্ষণ পর্যন্ত নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেমের আলো প্রজ্জ্বলিত থাকছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনিও উদারহস্ত; পাপপুণ্যের তথাকথিত অনেক ধারণাকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন কলমের এক আঁচড়ে। (মোসাদ্দেক, ১৪২১: ২১)

কাজেই নরনারীর সম্পর্কের ভেতর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেম রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত অবাধ যৌন সম্পর্কের মধ্যে তিনি কোন পাপ দেখতে পাননি। । সোফোক্লেসের *ইডিপাস* নাটকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে অনুভূত হবে যে, এ নাটক সভ্যতা থেকে বর্বরতার দিকে নয়–বরং যাত্রা করেছে সভ্যতার মূলের দিকে এবং 'ওইদিপৌস সত্যকে জানতে চেয়েছেন, জেনেছেন নিজেকে। আর চরম আত্মাবিষ্কারের মুহূর্তে যা তাঁর অটুট আছে, তা তাঁর সভ্যতা, তাঁর মনুষ্যত্ব...পাপবোধই তাঁর মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় উপকরণ' (শিশিরকুমার, ১৯৯২: ১১০-১১১)। অমিয়ভূষণের নরনারীর যৌন মনস্তত্ত্বেও ঘোষিত হয়েছে সভ্যতার মূলের দিকে যাত্রার বাণী। সংস্কারহীন দ্বেষচেতনার উর্ধ্বে উঠে প্রেমময় যৌনতার অবাধ রূপায়ণ অনুভূত হয় তাঁর উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন:

> তাঁর কথাসাহিত্যে যৌনতা একটি প্রবল জীবনীশক্তি। যা মানবমনন অলগ্ন নয় কিন্তু যা মানব-সমাজের নীতি ও নিষেধকে গ্রাহ্য করে না একেবারেই। 'ইনসেস্ট' বা অগম্য-গমন সম্পর্কিত নিষেধ মানব-সমাজের নির্মিত বিধান।... প্রকৃতির যে লাইফ ফোর্স–তার প্রবহমানতা জৈবিক যৌনতার শক্তির উপরেই নির্ভরশীল, সেখানে বিপরীত লিঙ্গমাত্রই মিলিত হয় এবং অব্যাহত রাখে প্রাণধারা। এই অরোধ্য নৈসর্গিক শক্তিটিকেই তাঁর উপন্যাসের মানব-চরিত্রে মাঝে মাঝে সন্নিবিষ্ট করেন অমিয়ভূষণ। কখনো ভাইবোন, কখনো শ্বশ্রূ-জামাতা, কখনো বিমাতা-সপত্নীপুত্র এবং প্রায়শই পূর্ণ যৌবনবতীর সঙ্গে সদ্য তরুণ বা কিশোরের যৌন-সম্পর্কের প্রবলতা উদঘাটিত করে দেন তিনি উপন্যাসে। (সুমিতা, ১৯৯৫: ১৪৯-১৫০)

অমিয়ভূষণের উপন্যাসের নরনারী যে যৌনজীবন যাপন করেছে সেটি সাধারণের কাছে সংস্কারবর্জিত এবং তথাকথিত নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করলেও অমিয়ভূষণ একে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেননি।

যৌনতার এই অবাধচারিতা ছাড়াও অমিয়ভূষণের উপন্যাসে রয়েছে আধুনিক মানুষের নিরন্তর নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা। প্রগাঢ়ভাবে রূপায়িত হয়েছে উদ্বাস্তু ব্যক্তিসত্তার মনোদৈহিক জটিলতা। তবে, অস্তিত্বসংকটাপন্ন মানুষের কাতর আকুতির পাশাপাশি অস্তিত্ববান মানুষের বীর্যবান সত্তার কথকতাও তাঁর উপন্যাসে প্রকাশিত। উপন্যাস বিধৃত উপর্যুক্ত প্রবণতাসমূহের অন্বেষণ করা যেতে পারে বর্তমান অধ্যায়ে।

নির্বাস

আধুনিক নরনারীর মনোদৈহিক জটিলতার বীজ অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছে *নির্বাস* (১৯৫৯) উপন্যাসে। এ উপন্যাস সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেন:

> এটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। যদি রাজনীতির কোনো ইশারা এসে গিয়ে থাকে, তবে তার প্রতিপাদ্য রাজনীতি উদ্বাস্তুকে তার বাস্তু ফিরিয়ে দিতে পারে না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫ : ৩৯৮)

যদিও লেখক দাবি করছেন যে, এই উপন্যাসে রাজনীতি নেই, কিন্তু পাঠক উপলব্ধি করবেন, চমৎকার কৌশলে লেখক রাজনীতির একটি চোরাস্রোত পরোক্ষভাবে উপন্যাসে প্রবাহিত করে দিয়েছেন এবং সেই স্রোতে অবগাহনরত একটি মেয়ের মনোদৈহিক জটিলতাকে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। উপন্যাসে সরাসরি উঠে এসেছে বৈরি কালের বাস্তুহীন বিধ্বস্ত এক মানুষের মুখ। বিমি এক উদ্বাস্তু, যার বেদনা ও অন্তর্ঘাত উপন্যাসে তার সংকটের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বিমলা কিংবা তার উদ্বাস্তু সত্তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে বলতে হয়, উদ্বাস্তু তারাই, যারা স্বভূমিচ্যুত, যারা ছিন্নমূল, এবং যারা জানে না ঠিক কোথায় গিয়ে তারা থামবে। কোথায় আবার শেকড় চারিয়ে বসবে। যদিও শেকড় চারিয়ে বসলেও স্থানীয় মানুষের চোখে তারা শুধুই রিফিউজি। আর সে ভূমিও তাদের একান্ত নিজস্ব হয়ে ওঠে না কখনো। সমালোচকের ভাষায়:

> ...উদ্বাস্তু সমস্যা শুধু একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই নয়, তার একটা বিরাট মানবিক দিকও আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ বহুবার স্বভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে নতুন দেশকে তার আবাসভূমি করে তুলেছে। অনেক কিছু হারিয়ে গেছে চিরতরে–তার জন্য দীর্ঘশ্বাস, আবার নতুন পটভূমিতে গড়েও উঠেছে জনপদ। জীবনের টানাপোড়েন, ভাঙাগড়ার খেলা এসবকে, উদ্বাস্তু জীবনকে নিয়ে লিখেছেন অনেক কথাশিল্পী। অমিয়ভূষণও তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পে এ বিষয়কে বেছে নিয়েছেন। ছয়ের দশকের 'নির্বাস' ও 'উদ্বাস্তু'...'উরুণ্ডী'–তে আমরা প্রত্যক্ষ করি বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবন। দুঃখ-বেদনার স্তরে স্তরে মিশে থাকে নতুন করে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা–নতুন পরিবেশের স্পর্শে জেগে ওঠে পুরোনো মাটি।...চলমান মানুষ থেমে যায়–যেখানে উত্তুরে পাহাড়ের ছায়া নিবিড় ও ভারী হয়ে আছে, আর বন্ধুর জমির অবাধ বিস্তৃতি নবাগতদের গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষমাণ, সেখানেই থেমে যায় মানুষের মিছিল। (শুভময়, ২০০৪: ৫৯)

দেশভাগপূর্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, ১৯৪৭ এর দেশভাগ এবং রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তির লাঞ্ছিত-নিপীড়িত জীবনসংকটের জটিলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে। সমালোচকের ভাষায়, বিমি:

> গোটা উপন্যাসটার সঙ্গে গোটা ভাঙন, অস্থিরতা, ক্ষয়কে নিজের মধ্যে, শুধু তাই নয় 'হলুদমোহন ক্যাম্পটাই সে ব'য়ে বেড়াচ্ছে মনে মনে'।...এবং হলুদমোহন ক্যাম্পেই শুরু বা শেষ নয়। ১৯৪২-উত্তর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাঙনের রাজনীতিটাকেই, রাজনৈতিক ভাঙনজনিত কারণে মানবিকতার সকল অবমাননা ও লাঞ্ছনাকেই বিমি বহন করেছে সকল অস্তিত্বের মধ্যে।...একটি উপন্যাস, যার আয়তন কৃশকায়ই বটে, তার একটি নারী চরিত্র সামাজিক তোলপাড়ের এতখানি বিস্তারকে ধারণ করতে পেরেছে।...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর

> দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ একটি অংশের অস্থির ভূগোলটাকেই তো বহন করেছে বিমলা। (শুভময়, ২০০১: ১৩১-১৩২)

সংকটাপন্ন এক সময়ের আদল উপন্যাসে নির্লিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। সময়ের অভিঘাতে বিমি-বিমলপ্রভা বা বিমলার একের পর এক আশ্রয়চ্যুতির মধ্য দিয়ে তার বাস্তুহারাজীবন-মনস্তত্ত্ব, যন্ত্রণা, মনোজাগতিক টানাপড়েন ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। তার মনে বার বার প্রশ্ন জেগেছে, 'কোথায় যাবে? বাস্তুহারারা কোথায় যায়?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫ :১৮৬)। উপলব্ধি করা যাবে, ক্ষতাক্ত কাল মানবের জীবনে যে অন্তর্ঘাত এবং বেদনার প্রকাশ ঘটায়, সেটি একসময় জীবনকে করে তোলে স্থিতিহীন ও বিবরলালিত। ব্যক্তির সেই স্থিতিহীনতা তার ভেতর অস্তিত্বসংকট জন্মায়। সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> বার্মা থেকে ব্রজযোগিনীর হলুদমোহন ক্যাম্প এবং দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু হবার ট্রমা আসলে অনিকেত সমষ্টিজীবনের ব্যক্তিক প্রকাশ। বিমলপ্রভা কীভাবে আর খুঁজে পাবে জীবন...নির্বাস জীবন আসলে ব্যষ্টির সেই ট্রমাচিহ্নিত এপিকের উপাদান, যা দেশভাগের বিরুদ্ধে মানবিক প্রত্যাঘাত।...ধর্ষিতা-অনিকেত আত্মচৈতন্যের মধ্যে থেকে সৌদামিনী-বিমলপ্রভা তাহলে কি শরীরে বয়ে চলেছে ট্রমার ক্ষত আর মনে লালন করছে ঘরে ফেরার ইচ্ছে। (মননকুমার, ২০১৪ :৭২-৭৩)

স্কুলমাস্টার ভুবনবাবুর স্ত্রী হিসেবে পরিচিত বিমির জীবনরেখা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ষোল বছর বয়সে বাস্তুহারা বিমি পরবর্তী জীবনেও মাথা গোঁজার স্থায়ী কোন ঠাঁই খুঁজে পায়নি। তার জীবন বার বার এ হাত থেকে ও হাতে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪২-এ রেঙ্গুনে মিত্রপক্ষের আক্রমণের পর বজ্রযোগিনী যাত্রার মধ্য দিয়েই বিমির নির্বাস জীবনের সূত্রপাত ঘটে, যে জীবনে বার বার সে পরাজিত হয়েছে–আবার পরাজিত অস্তিত্ব নিয়ে নতুন করে বাঁচার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সমালোচক বীতশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> ...ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে রেঙ্গুনে পাড়ি দেওয়া বিমলা, রেঙ্গুন ছেড়ে দলের সঙ্গে দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে আবার বাধ্যতায় বজ্রযোগিনীর পথ-ধরা কিশোরী বিমলা, দলছুট ও ধর্ষিতা বিমলা, উত্তরের চা-বাগানে প্রেমের ও দাম্পত্যের স্বপ্ন প্রায়-সফল করতে চাওয়া তরুণী বিমলা, ক্যাম্পের যুবতী বিমলা এবং নিজস্ব বাড়িতে ভুবনবাবুর সঙ্গে সহবাসিনী–ষোলো বছর থেকে তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর পর্যন্ত বিমলা নিজে তো সেই নদীর চর এবং চরের মত, কর্ষিত হবার অপেক্ষায়...সে যুবতী, প্রৌঢ় ও পরিণত। (বীতশোক, ২০০৬: ৭৯)

বার বার বিমলার এই বাস্তুচ্যুতি তাঁর মনোজাগতিক জটিলতার মূল উৎসবীজ। ১৯৪৭-এর পর রাজনৈতিক কারণে বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দেশত্যাগী সংখ্যালঘু সেই মানুষগুলো চিহ্নিত 'রিফুজি' হিসেবে। এদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ণনা এরকম: 'Refugees means a person who was migrated into West Bengal for reasons of safety in apprehension of disturbances endangering person or property in his usual place of residence in Eastern Pakistan.' [১৯৫৪ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি: notification no 3370 Rehabilitation. দ্রষ্টব্য:] । বিমি এ ধরনেরই এক রিফুজি–তবে ১৯৪৭-এর রিফুজি নয়। সে উদ্বাস্তু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪২-এ। সময়কাঠামো নির্মাণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অভিঘাতগুলো। রেঙ্গুন আক্রান্ত হওয়ার আগেই বিমিকে তার বাবা বড়বোন ও বোনের স্বামীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়। পথে

বৃটিশ সৈনিকের কাছে ধর্ষিত বিমি দলছুট হয়ে পথ হাঁটে মরণচাঁদ, সোদামুনির মত পূঁতিগন্ধময় মানব মিছিলে। ১৯৫৬-র পর মাথার ওপর ছাদ মিলেছিল–১৯৫৯-এ এসে সেটি আরও স্থায়ী হয়ে উঠলেও স্বস্তি মেলেনি আর। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত সময়পটে প্রতিস্থাপিত বিমি এবং বিমিসদৃশ উদ্বাস্তু মানবের সংকটাপন্ন জীবনকথার আদলে উপন্যাসে কালান্তরের অভিঘাতটিই অনুরণিত।

উপন্যাসে বিমির মনোজটিলতা তার দুঃসহ অতীতচারিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। নিজের ভেতর পুঞ্জীভূত বেদনাকে বিমি দাবিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু সে তা চায়নি। মনের অনেক গভীর তল থেকে উঠে আসা স্মৃতি জেগে উঠতেই সে যেন অন্য সবকিছু বিস্মৃত হয়ে এই জেগে ওঠার ব্যাপারটাতেই কৌতুক বোধ করে। ভাবে, দুঃসহ অতীতকে ঠেকিয়ে না রেখে বরং তারা উঠে আসুক। 'ভাষা পাক। বোবার যন্ত্রণাই তো আরো বেশি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫ : ১৮৪)। বিমি তাই বার বার ডুবে যায় স্মৃতির গহনে। কালের অভিঘাত ব্যক্তির অবিশ্রান্ত চেতনাজগতে হানা দেয়। কাজেই স্মৃতিকাতরতা এবং চেতনার প্রবহমানতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিমির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যুদ্ধ, দেশভাগ, উদ্বাস্তুজীবন, ধর্ষণ–একটার পর একটা স্মৃতি বিমির ভেতর ভাসান দেয়। তার চিন্তা বার বার মোড় ফেরে বলেই হয়ত বিচিত্রমাত্রিক কাল এবং কালের ক্ষত উঠে আসে উপন্যাসে। বিমি ভাবে:

> রাজনীতি কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত এসে পড়ে। কারণ নিশ্চয়ই আছে।...যুদ্ধটা এমনি ব্যাপার। আর দেশবিভাগ। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের চাইতেও নির্মম এই ব্যাপারে মন যেন কারণ খুঁজবার জন্য দিশেহারা হয়ে মাথা কুটতে থাকে।...কত রূপ রাজনীতির। ফাদার ফিলিপটের চেহারাটা আবার চোখের সামনেই যেন দেখতে পেল সে।...এই ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে মরণচাঁদ আর তার বউ সোদামুনি।...বিমির চিন্তা মোড় নিল এখানে।...বেঞ্জামিন সে রাত্রিতেও শয্যার পাশে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করেছিল। যে শয্যা, অন্তত বেঞ্জামিনের হিসাবে, কিছুক্ষণ বাদেই অবিবাহিত নরনারীর সঙ্গমশয়নে পরিণত হবে।...ধর্ম আর রাজনীতি। কোথায় ধর্মের শেষ আর রাজনীতির শুরু? ধর্ম আর রাজনীতি যেন হাত ধরে চলছে। এই হলুদমোহন ক্যাম্প ধর্মের তৈরি।...মরণচাঁদ ধর্মের জন্য দেশত্যাগ করেছে।...হসপিট্যাল থেকে ফাদার ফিলিপটের বাংলোয় আশ্রয় পাওয়ার একমাসের মধ্যেই সংবাদ এল একটা। যশোর জেলায় ফাদারের যে ছোট গির্জা আছে সেখানকার কর্মচারী অসুস্থ।...(অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৩০-১৩১)

যুদ্ধ থেকে শুরু করে বেঞ্জামিন কিংবা হলুদমোহন ক্যাম্প–সবটাই বিমির চেতনা ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমানুসারে নয়। চেতনার প্রবহমানতায় এটাই স্বাভাবিক। অখণ্ড প্রবহমান সময় পরম্পরা ভেঙে টুকরো টুকরো সময়ের চালচিত্র বিমির চেতনায় ভিড় করে। এভাবেই উপন্যাসে লেখক মনস্তাত্ত্বিক সময়কাঠামো নির্মাণ করেন।

সময়ের অভিঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে বার বার অস্তিত্বসংকটে পতিত বিমি উত্তরণের সংগ্রামে কখনো পিছপা হয়নি। সময়ের চড়াই উৎরাই বিমিকে ভেঙেছে, গড়েছে। শুরুটা হয়েছিল একেবারে শুরু থেকেই। লেখক স্পষ্টতই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালপরিসর এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধের অভিঘাতটি ধারণ করতে সচেষ্ট। ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সময়কাল স্পষ্ট করেই উপন্যাসে উল্লেখিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে রেঙ্গুন থেকে বাংলাদেশে পাড়ি জমানোর মধ্য দিয়ে বিমির সংকটের সূত্রপাত। বাকি সময় বিমির বয়সের অতিক্রম্য সময়ের মধ্য দিয়ে হিসেব করে নিতে হয় পাঠককেই। উপন্যাসের শুরুতেই বিমি সে ধারণা পাঠকের ভেতর রোপণ করে:

> সে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। যুদ্ধ, এই শব্দটাকে অবলম্বন করে তার মন এদিক-ওদিক খানিকটা হাতড়ে চ'লে তারপর এই ধারণাটাই পৌঁছুল : আবার যুদ্ধ বাধবে নাকি? কিন্তু এটা তার মনের ঈপ্সিত বিষয় নয়। হাই উঠল তার। তারপর সে চিন্তা করল–হ্যাঁ যুদ্ধ কাকে বলে তা সে জানে। জানাটা খুব ঘনিষ্ঠই বলতে হবে। কিন্তু অনেক অতীতের ব্যাপার। তখনকার বেদনা কালের অনেক বাধা পার হতে হতে ক্লান্ত নিরুত্তাপ।
>
> সতেরো বছর হলো কম করেও। তখন ষোলো ছিল তার, এখন সে উত্তরতিরিশ।...রেঙ্গুন থেকে বজ্রযোগিনী। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১০৬-১০৭)

ভুবনের সহধর্মিনীরূপে উপন্যাসের শুরুতে বিমির আত্মপ্রকাশ ঘটলেও স্তরে স্তরে উপন্যাসের গভীরে গেলে কালের ক্রমন্যাস উন্মোচিত হয়। মূলত যুদ্ধই এ উপন্যাসে ব্যক্তির সঙ্কটের মূল কারণ। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ লিখেছেন:

> ...বিমলা যাকে একদিন রাজনীতির খেলার শিকার হয়ে বাবাকে ছেড়ে একমাত্র দিদি আর তার স্বামী ভুবনবাবুর সাথে রেঙ্গুন থেকে বজ্রযোগিনীর পথে রওনা হতে হয়েহিল। মূলহীন মানুষের স্বভূমি ছেড়ে বহির্গমন। মূলহীন বিমি বার বার উৎখাত হয়েছে নিজের স্বরচিত জায়গা ছেড়ে। (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ৪৭)

এই ছেড়ে যাওয়া তার মনের ভেতর ট্রমার জন্ম দিয়েছে। সে তার মানসিক দৃঢ়তা হারিয়েছে।

সাময়িক হলেও তার বাস্তুহারা নাম ঘুচেছিল হলুদমোহন ক্যাম্পে। ক্যাম্পভুক্ত ছেঁড়াখোঁড়া পুতুলসদৃশ রিফুজি মানুষগুলো দেশত্যাগের বেদনা নিয়েও দণ্ডকারণ্যে স্থায়ী হবার স্বপ্ন দেখে সে। লেখক এ উপন্যাসের উদ্বাস্তু মানুষের স্বদেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পূর্ববঙ্গকেই। তাদের কাছে দণ্ডকারণ্য তাই দেশ নয়–হয়ে ওঠে অপরিচিত পৃথিবীর কোনো এক অংশ। (দ্রষ্টব্য: 'দণ্ডকারণ্য নিশ্চই পৃথিবী, দেশ তো নয়, কেননা, পদ্মা যে দেশে প্রবাহিতা, সেটাই দেশ' [অমিয়ভূষণ, ২০০৫ : ১৩৬]) হলুদমোহন ক্যাম্পের পচনশীল জীবন থেকে মুক্তির চাবি যেন দণ্ডকারণ্য। সেখানে যাবার আগেই বাস্তুহারা জীবন থেকে ভুবনবাবুর সঙ্গে মিলিত জীবনের মধ্য দিয়ে তার মুক্তি ঘটে। বার বার বিচ্ছিন্নতার আগুন বিমিকে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ করেছে। এ জন্যেই তার উদ্বাস্তু জীবনের স্থায়ী চিহ্ন হিসেবে রয়ে যায় বুকের রোগ। তার মনে হয়েছে 'বুকে যে কঙ্কাল আছে থাক। সে আলমারির দরজা খুলতে নেই' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৩৩)।

এর আগে বিমির জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা তাকে বার বার ট্রমার ভেতর নিয়ে গেছে। অমিয়ভূষণ মনে করেন, 'শরীর ও মনে ধর্ষিত হওয়ার প্রতিকারহীন যন্ত্রণাও ট্রমা সৃষ্টি করে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৮৬)। বিমিকেও এই ধরনের ট্রমার ভেতর দিন যাপন করতে হয়েছে। দিদি-জামাইবাবুর সাথে বজ্রযোগিনী যাবার পথে ট্রেনে ডাকাতরূপী ব্রিটিশ সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হবার বেদনা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের অন্তর্ঘাত তার অস্তিত্বে সংকট জাগায়। বিশপ ফিলিপটের হাসপাতালে চেতানা ফিরে পাবার পর বিশপের পরিচারিকাদের ভেতর স্থান পাওয়া বিমির ওপর চোখ পড়েছিল পঞ্চাশ স্পর্শ-করা পাদ্রি বেঞ্জামিনের। তাঁর হাত ধরেই যশোরের ছোট হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে গিয়েছিল সে। মনের ভেতর লুক্কায়িত ছিল কলকাতা পৌঁছাবার আকাঙ্ক্ষা; 'বন্ধু, পেনফ্রেন্ড। তাই যেন অনেক বাধার পরেও কলকাতার উচ্চতার কথা মনে ছিল

তার।...কলকাতা সভ্য দেশ, সরকার একসময়ের সহপাঠী, ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত পেনফ্রেন্ড' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৩৩)। অন্যদিকে, বেঞ্জামিনের মনে ছিল নারীর শরীর ভোগের অবদমিত লালসা। পথে বিমির হাতের উপরে কাঁপা কাঁপা হাত রাখায় ক্রমশ ধর্মের মুখোশ ছিঁড়ে পুরুষ বেঞ্জামিন প্রকাশ পায়, বেরিয়ে আসে তার যৌনকামনা আর নারীলোলুপ সত্তা। লেখক প্রশ্ন করেন, 'ব্যাচেলর বেঞ্জামিনের বয়স বোধহয় পঞ্চাশ স্পর্শ করেছে। এতদিনকার ধৈর্যের বাঁধ তাঁর ভাঙল কেন? ভ্রষ্টা মেয়েরা কি পুরুষ-মনে কামনা জাগিয়ে তোলে? আর সে কি ভ্রষ্টা মনে করেছিল বিমলাকে?' (অমিয়ভূষণ,২০০৫: ১৩২) প্রথমবার ধর্ষিত বিমলা নিজেকে ভ্রষ্টাই মনে করেছিল। বেঞ্জামিনের এই মনোভঙ্গিই মনোজটিলতাসৃজক। পরবর্তীকালে বেঞ্জামিনের লোলুপতা তার ভেতর ভ্রষ্টা-অনুভবের সমস্ত নিয়ামক শক্তির যোগান দেয়। শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে বিমিকে যাচঞার ভেতর বেঞ্জামিনের পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব উপন্যাসে অসাধারণ প্রতীকী পরিচর্যা পায়:

> পাশাপাশি ঘরেই বন্দোবস্ত হয়েছিল যশোরের বাংলোয়।...দু' ঘরের মধ্যকার দরজাটির একটি পাল্লা খোলা অন্যটি ভেজিয়ে রাখা।...টেবিলের উপরে একটি দগদগে টেবিল ল্যাম্প। বিমলার ছায়া গিয়ে পড়ল পাশের ঘরে।...সে দেখতে পেল, বেঞ্জামিন মেঝেতে জানু পেতে বসে প্রার্থনা করছে খাটের পাশে। বিমির ছায়াটা বিছানার উপর দিয়ে গড়িয়ে বেঞ্জামিনের গায়ে গিয়ে পড়েছিল। কী প্রার্থনা করেছিল সে? দুটো প্রার্থনার মধ্যে সঙ্কুচিত করে রাখা একটুকরো পাপ! (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৩২)

বেঞ্জামিনের শরীরী আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা অনুরণিত হবে এই বাক্যগুলোতে, সেই সাথে বিমির মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন। 'মনে হয়েছিল তার বার বার, সে আর মানুষ নেই ভৈরবের ঘটনার পর। সেই কুকুরদের কামড়ে সে এখন কুকুর। একটি নারীর প্রেত, প্রতিহিংসা নেবার মনোভাবই যার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে পারে।...কী হবে আর কলকাতায় গিয়ে। বলা যাবে কোনো বন্ধুকে? সারা জীবন তার কৃপাদৃষ্টির ছোবল খেয়ে বেড়াতে হবে না?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৪৫)।

লেখক প্রেমহীন এই কাম সম্পর্কের ইতি টানলেন দ্রুত। বিমি পালাল। তবে তার চেতনায় গাঢ় ছায়া বিস্তার করে থাকল ভ্রষ্টা নারীর অশুচিতা। এই মনোজটিলতাই তাকে বার বার অতীতচারী করে। তার সময় কাটে ঘোরের ভেতর। ভুবনের বাড়ির দুপুরগুলো তাই বার বার হয়ে ওঠে অতীতময়। কারণ বিমির কাছে, অতীত যতই ঘৃণ্য হোক–সেটিই তার আত্মপরিচয়। মান্দার গাছের মত মানুষ গত বছরের ফুলকে ভুলতে পারে না। পলায়নপর বিমির পূতিগন্ধময় জনস্রোতে গা ভাসানোর ইতিবৃত্তও তাই ধারাবাহিকভাবে মনে পড়ে তার। কপোতাক্ষ পেরিয়ে বনগাঁ এসে দেখা পাওয়া মরণচাঁদ, সোদামুনি, বিন্দা, শ্রীকান্তের দলের সঙ্গে সে পদ্মা পেরিয়ে কলকাতার পথে পা বাড়ায়। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কলকাতার বদলে একবছরের পথ হেঁটে এসেছিল হলুদমোহন ক্যাম্পে। সৌম্যের সঙ্গে তার দেখা হলো এখানেই। হলুদমোহন ক্যাম্পের অজয়, সুরথ, লতা, মোহিত আর সৌম্যর ভেতর অনেক বেশি সহৃদয় লেগেছিল তার সৌম্যকে।

উপন্যাসের নতুন বাঁক বদল ঘটে সৌম্যকে কেন্দ্র করে যার হাত ধরে হলুদমোহন ছেড়ে সোয়েথয়েট চা বাগানের লেডিওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টরের চাকরিতে যোগদান করে বিমি। সোয়েথয়েট চা বাগানে সে তাঁর মনোগহনের অশুচিতা ঝেড়ে ফেলে ঘঁষে-মেজে নিজেকে অন্য এক মানুষ করতে চেয়েছিল। পুরোনো বিমি

থেকে আধুনিক 'সোফিস্টিকেটেড' নারী হয়ে ওঠার তাড়নায় বাথটাবের কবোষ্ণ জলে স্নানরত বিমি নিজের ভেতরে অবগাহন করে: 'গাহন, গাহন, গাহন জলকে দেখা। জলকে অনুভব করা। নিজেকে দেখা। নিজেকে অনুভব করা। প্রতীকী স্নান' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৬৮)। এই প্রথম বিমি তার স্রষ্টা সত্তার ঊর্ধ্বে উঠে একান্তই নিজের ব্যক্তিঅস্তিত্বকে অনুভব করে। কিন্তু এখানেও তাকে রাজনীতি আর নারীলোলুপ শক্তিমানের শিকার হতে হয়। শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান ইউনিয়ন ভেঙে পালটা ইউনিয়ন গড়ার জন্যে তাকে ব্যবহার করে সৌম্য। ততদিনে সৌম্যের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। এই অন্তরঙ্গতা দৈহিক সম্পর্কে গড়ায়। সোয়েথয়েট বাংলোর অদ্ভুত শান্ত-গোছানো কামরার স্থিতি মোহ তাকে মোহিত করেছিল। এখানকার সাজানো গোছানো ঘরে মুখোমুখি বসে সৌম্য তাকে নতুন স্থিত জীবনের স্বপ্নে বিভোর করে। বিমির পূর্ণ নারীত্বের স্বাদ অবগাহনের এইসব দিনে দারুণ তারুণ্য নিয়ে আগত সৌম্য ভেবেছিল, বিমির উদ্বাস্তু মন এখানে পুনর্বাসন পেল। হয়ত ঠিকই ভেবেছিল সৌম্য। স্থিতিই চেয়েছিল বিমি:

> আলো জ্বালার আগেই বিদায় নিল সৌম্য।...অন্ধকার হয়ে আসা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বিমি, দু'হাতে দু'হাত জড়ানো...বাঁদিকের ঘাসগুলো নড়ছে। অস্পষ্ট খ্যাঁকখ্যাঁক করল কেউ।...আলোটা জ্বালল সে। নিঃসঙ্গ বাড়ির নীরব পরিবেশ। তৃপ্তি, তৃপ্তি। কী একটা জন্তু ভয় পেল। অন্য কোনো জন্তু শিকার ধরেছে। চাপা গরগর শব্দ। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা যেন এই অরণ্যেরই কোন মার্জারী। অনেক আকাঙ্ক্ষার ক্লান্তির অনেক পথ চলার মার্জার দূরাগত। নিঃসঙ্গ মার্জারী মৃদু মৃদু গর্জন করে অগ্রসর হচ্ছে বনপথে। কিছু ক্লান্ত অভিজ্ঞতার পরিতৃপ্তির আলস্যে লাঙ্গুল দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করছে, নিঃসঙ্গ, অন্ধকার। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ অরণ্যের সে ঈশ্বরী। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৭০-১৭১)

এই গর্বিত নিঃসঙ্গ মার্জারী বিমি নিজে, আর সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় শিকারী জন্তুর প্রতীকে সৌম্য তাঁর লোলুপতা নিয়ে অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে। পুরোনো ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে সৌম্য শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়। সন্তানসম্ভবা বিমি হারায় চাকরি–হারায় একান্ত স্বাধীনতা আর নিরাপত্তা। অমিয়ভূষণের উপন্যাসে 'পুরুষটি যতবেলা ইভের অ্যাডাম, ততবেলা সম্পর্কের সুতো ছাড়তে তিনি যাকে বলে অমায়িক...।...তবে পুরুষ সংগীটি যদি ইভের অ্যাডাম হওয়ার পরিবর্তে ইভটিজার হয়ে ওঠে, তাহলেই তিনি কৃপাণহস্ত। তখন তুমি যে-ই হওনা কেন, এমনকি তুমি যদি বিপ্লবের নাম করেও তিব্বতী রমণীকে ধর্ষণ করো, তাহলে তোমাকে ধর্ষক নামেই ডাকা হবে' (মোসাদ্দেক, ১৪২১: ২১)। অমিয়ভূষণের যৌন-মনস্তত্ত্বে প্রেমকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রগাঢ়ভাবে। *নির্বাস* উপন্যাসে বিমির উদ্বাস্তু জীবনে স্থিতির স্বপ্ন বুনে অরক্ষিত অবস্থায় তাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া সৌম্য তাই এক ধর্ষকের প্রতীক। সোয়েথয়েট চা বাগানে পরিপূর্ণ জীবনের যে স্বাদ ও স্থিতি সে পেয়েছিল–এবার তা উধাও হওয়ার মুখে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক শুভময় মণ্ডল লিখেছেন:

> ...পাল্টা ইউনিয়ন গড়ার তোলপাড়ে বিমির চাকুরিচ্যুতি সমাচ্ছন্ন। এমত অবস্থায় চা বাগানের বড়বাবুর লোভের কাছে বিমির শরীর সমর্পণ। হয়ত সমর্পণই। যথেষ্ট স্পষ্ট করেননি অমিয়ভূষণ। প্রায়শই তা করেন না। বিমলার সন্তান ধারণ ও প্রসব। এ সন্তানের পিতৃত্বের দায় কার? অবশ্য শব্দটা যদি 'পিতৃত্ব' হয়। আবার অস্পষ্ট রাখার অভ্যাস উপভোগ করেছেন অমিয়ভূষণ। (শুভময়, ২০০১: ১৩৩)

সমালোচক শুভময় মণ্ডলের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, চা বাগানের বড়বাবুর লোভের কাছে বিমির শরীর সমর্পণের বিষয়টি অমিয়ভূষণ খুব অস্পষ্ট রাখেননি। প্রতীকী পরিচর্যায় একে তিনি স্পষ্ট কণ্ডে তোলেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বিমলা বড়বাবুর প্রস্তাবে নীরবে সায় দিয়েছে। ততদিনে সে আর একলাও নয়। তার শরীরের ভেতর বেড়ে উঠছে অন্য এক শরীর। তাই বড়বাবুর মিলন প্রস্তাব শুনে:

> দুঃখিত হতে হতে বরং উদাস হলো বিমি।
>
> বলবে কি?–সৌম্য বসন্তে ফোটা নতুন জীবনের চম্পককলি আর আধপাকা কোঁকড়ানো চুলে আধেক কপালঢাকা বড়বাবু অভিজ্ঞতায় দক্ষ নিদাঘ কাল, যা মউলের গন্ধ মধুকে রসালে পরিণত করে; নীল মাছি আসে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৯৬)

বড়বাবুর দক্ষ অভিজ্ঞতাই প্রয়োজন ছিল বিমির–সে তা গ্রহণও করেছে। অন্যদিকে বিমির সন্তানের পিতৃত্বও অস্পষ্ট রাখেননি লেখক–স্পষ্টত সৌম্যই তার পিতা। দুই ক্ষেত্রেই লেখক প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। যখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিমি যখন সৌম্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তখন বিমির মনে হচ্ছিল:

> এটা একেবারেই মিথ্যা কথা, শুধু কবি-কল্পনা যে জন্মের আগে ভ্রূণ, তা সে যতই পরিপুষ্ট হোক, কখনো তার ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। কল্পনা, কল্পনা। সেটা কান্না ছাড়া কিছুই নয় যা বিমলা অনুভব করেছিল। তার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। এ কখনো হতে পারে অন্তঃস্থ ভ্রূণ হাত তুলে তার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, সেই অস্বাভাবিক অভিযোগের সময়ে? আসামীর কাঠগড়ায় সৌম্য, আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় সে?...আর সেনাপতি সৌম্য, আমি কি তোমার খরচ করা যায় এমন সৈনিক ছিলাম? (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৯৭)

শরীরের ভেতরের এই ভ্রূণের পিতৃত্ব সৌম্যের বলেই বিমি উপর্যুক্ত মনোভাব বোধ করেছে। বিমলার প্রয়োজন ছিল জীবনের চরম অনিশ্চিতি এড়ানো–সে জন্যেই সে বেছে নিয়েছে বড়বাবুর আশ্রয়। অবশ্য বড়বাবুর *পান আর মশলা মুখে পচে* উঠতে তেমন সময় লাগেনি। *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসেও আসফাকের ঔরসজাত সন্তান অভিজ্ঞ নপংসুক জোতদার জাফরুল্লার পরিচয়েই পরিচিতি পেয়েছে। জাফরুল্লার স্থিতিশীলতাকেই বেছে নিয়েছিল আসফাকের ঔরসজাত সন্তানের মা কমরুন। নির্বাসেও প্রায় একই ঘটনার অনুরণন উপলব্ধ হয়। বার বার বাস্তুচ্যুত বিমি একটু স্থিতি চেয়েছিল বলেই হয়ত তার এই আত্মসমর্পণ। সোয়েথয়েট বাংলোর অদ্ভুত শান্ত-গোছানো কামরার স্থিতি তার জীবনধারণ ও সন্তান প্রসবের জন্য অনিবার্য ছিল। ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার জীবন অশেষ মূল্যবান। কিন্তু এই জীবন ও অস্তিত্বের বিনিময়ে নির্বিকার কাল ব্যক্তির অন্তর্ভূমি থেকে শুষে নেয় তার শুভ জীবনরস। মদোগন্ধময় পান আর মশলার পচে-ওঠা গন্ধও তখন ব্যক্তিকে সইতে হয়। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির মনোজীবন হয়ে ওঠে রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাময়–শুরু হয় ব্যক্তির মনোবিকলন ও বিপর্যয়। বিমির ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। ষোলতে ধর্ষিত এই নারী কর্ষিত হবার আকাঙ্ক্ষায় দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িয়ে সৌম্যর সন্তানের মা হতে চেয়েছিল, কিংবা স্থিতির আকাঙ্ক্ষায় বড়বাবুর প্রস্তাবে দ্বিধান্বিত বিমি শেষপর্যন্ত সমর্পণ করেছিল নিজেকে তার কাছে। কিন্তু ফিরতে

হলো তাকে। বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় সোয়েথয়েট চা বাগান থেকে অন্তঃসত্তা বিমির ফিরে আসা এবং সদ্যোজাত সন্তান ফেলে আবার হলুদমোহনের পথে পা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে পুনরায় এক জীবনবাদী বিমিকে দেখা যায়:

> শুধু বাঁচা নয়। প্রাণ বিকিরণ করার মত তারুণ্য ফিরে পাওয়া যেন মনের। যেন বলা যাবে এত বেদনা, এত কষ্ট। সার্থকতার এই পথে এসে দাঁড়িয়ে সবই তপস্যার মত মূল্যবান হয়ে উঠবে।...এই পৃথিবী যেন আবার নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে। এতদিন শুধু কিছু সময় নষ্ট হয়েছে বই তো নয়। তাকেই-বা ব্যর্থ বলা হবে কেন? অভিজ্ঞতারই বা কী কম মূল্য? (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৭৪)

অমিয়ভূষণের উপন্যাসে সন্তান বাস্তুর নামান্তর–বেঁচে থাকার অবলম্বন। *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসেও আসফাকের কাছ থেকে তার সন্তান কেড়ে নেবার মধ্য দিয়ে লেখক তাকে বাস্তুহীন মানুষে পরিণত করেন। এ উপন্যাসে বিমিও আসফাকের মত সন্তানহারা এক উদ্বাস্তু প্রাণ। বিমির নীল চোখের সঙ্গে সাযুজ্য রচনা করে লেখক বার বার ইঙ্গিতে তাঁর ছেলেকে চিহ্নিত করতে চান। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বিমির চোখ ছিল ফিরোজা নীল সোনালি। ফিরোজা নীল চোখের এক সন্তান অভিমন্যু বেড়ে উঠেছে সোদামুনির স্বামী মরণচাঁদের মাসির কাছে। মাসি নিজের ছেলে বলেই পরিচয় দিত–বলত কুড়িয়ে পেয়েছে। কিন্তু সোদামুনি কখনো সেটা বিশ্বাস করেনি: 'সোদামুনি বলেছিল, অমন শক্ত আঁশ আঁশ যার চামড়া, অমন নরম ছেলে তাঁর শক্ত বুকে জন্মায় না...' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৭৭)। নারী শিল্প সমিতির অফিসে যাবার সময় মাদার গাছে চমৎকার ফুল দেখে অবাক হয়ে বিমি ভাবে শক্ত আঁশ আঁশ চামড়ার মাতৃজঠরেরও নরম ছেলে জন্মাতে পারে। মাতৃসত্তার সঙ্গে মাদার গাছের মাতৃজঠর একাকার হয়ে ওঠে লেখকের প্রতীকী পরিচর্যায়:

> গাঁট গাঁট বাঁকা-তেড়া, মরা গুঁড়ির গা থেকে সরু সরু কয়েকটা ডাল বেরিয়েছে।...আশ্চর্য, ফুল! লাল থোকা থোকা ফুল।...এ ফুল প্রসবের প্রাণ কোথায় পেল?...মাদার বোধহয় গাছটা। সোদামুনি বলেছিল, অমন শক্ত আঁশ আঁশ যার চামড়া, অমন নরম ছেলে তাঁর শক্ত বুকে জন্মায় না।..কোকিলের ডাক নেই, শিহরিত হয়ে ওঠার মত পল্লব নেই, তবু সে ফুল ফুটল কী রক্তিম তারুণ্য তার! (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৭৭)

সৌম্যের দারুণ তারুণ্যের কাছে বার বার আশ্রয়চ্যুত উদ্বাস্তু বিমি ধরা দিয়েছে এবং তার রুক্ষ শুষ্ক নির্বাসিত সত্তায় মাদারের ফুলের মতই এক সন্তানের জন্ম দিয়েছে। যদিও সে সন্তান ছেড়ে চলে আসার মধ্য দিয়ে শেকড়হীন অস্তিত্বের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে এই নারী। স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও শেষপর্যন্ত বিমির ফিরোজা-নীল-সোনালি চোখের সঙ্গে মরণচাঁদের মাসির পালিত ছেলের ফিরোজা-নীল-সোনালি চোখের দূরান্বয়ী প্রতীকী সাদৃশ্য রচনা করে লেখক বিমির ছেলে হিসেবেই অভিমন্যুর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিমি যখন হাসপাতালে সাত দিন বয়সের ছেলে রেখে চলে আসে–লেখকের তখনকার বর্ণনা:

> সাদা ধবধবে বিছানায় বাদামি নরম কম্বল। লোহার ছোট খাট। যেন ছবি। ঘুমন্ত শিশুটি দুহাত তুলে রেখেছে মুখের সামনে। কোনো কাল্পনিক বিপদ থেকে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নাকি ওটা।...বারান্দা থেকে লনে নামল বিমি...পথ ধরে চলতে গিয়ে ফেরারি আসামির মতই সে সতর্ক হলো।...হাঁটতে লাগল সে। কোথায় যাবে? বাস্তহারা কোথায় যায়? (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৮৬)

ছেঁড়াখোঁড়া পুতুল সদৃশ মরণচাঁদ, সোদামুনি, লতা, শ্রীকান্তের সঙ্গে পথ হাঁটা বিমির ভাবনায় ধরা পড়ে সন্তানসম বাস্তুভাবনার বিষয়টি:

> অনেক হেঁটেছে তারা।...অবশেষে এই হলুদমোহন।...সন্তান একধরনের স্থিতির প্রমাণ বইকি।...নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বর্ষার জল চলতে দেখেছে বিমলা।...ডোবার শ্যাওলা স্রোতে বাঁচে না, মাটির দিকে ঝোঁকে। বর্ষার ডোবা আর নদীর খাত একাকার হয়ে গেলে তারা ভেসে পড়ে।...শৈবালগুলি পায়ের দিকে এসে যেন মাটি কামড়ে ধরতে চায়, দু এক মুহূর্ত পারেও তা, তারপরই আবার স্রোতের টানে ভেসে যায়। লতা ভেসে গেল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৪৮)

সন্তানহীন লতা শ্যাওলার মতই উদ্বাস্তু, জনস্রোতে ভেসে যাওয়া শৈবাল। বিমি নিজেও তাই। সুরথ আর তার স্ত্রী স্বেচ্ছায় সন্তান দত্তক দিয়ে নাম লিখিয়েছিল বিমিদের বাস্তুহীন দলে। বিমি, লতা কিংবা সুরথের স্ত্রী এভাবেই সংকটে পতিত।

বিমির জীবনের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে সোয়েথয়েট চা বাগান থেকে হলুদমোহন ক্যাম্পে ফেরার মধ্য দিয়ে। এখান থেকেই ভৈরবে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভগ্নিপতি ভুবনবাবুর সাথে চিঠি লিখে যোগ ঘটে তার। ঔপন্যাসিক ফিরে যাচ্ছেন উপন্যাসের শুরুতে–যেখানে বিমি আর ভুবন স্বামী-স্ত্রীরূপে পরিচিত হলেও আসলে তারা স্বামী-স্ত্রী নয়–ভাল পার্টনার মাত্র। অদ্ভুতভাবে পৃথক শয্যায় ঘুমোনো স্বাধীন এই নরনারীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি পারস্পরিক মমতা। লেখক বার বার বিমির ভাবনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেন তাঁদের সম্পর্ক। তার মনে হয়, 'সে তো ভুবনবাবুর নবোঢ়া নয় যে সন্ধ্যায় বিশ্রামের ক্ষণ উপভোগ করার জন্যই ভুবনবাবুকে বাইরে না যেতে অনুরোধ করে থাকবে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১১৩)। তবু সৌম্যের কাছে এবং সোয়েথয়েট চা বাগানের বড়বাবুর কাছে নিগৃহীত হয়ে ফেরার পর বিমি পরনের নোংরা পুরনো কাপড়ের মতই তার ঘৃণ্য অতীতকে ছেড়ে ফেলে প্রবেশ করে ভুবনের জীবনে:

> স্কুলের একটা ঘর কেউ দখল করেনি। ঘরটা দেখলে তালা দেওয়া বলে ভুল হয়। আর সেই ঘরে ভুবনবাবুর বিছানা পেতে দিয়েছিল। যত্ন করে বিছানা পাতার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেটা অনেকদিনের পরিচিত শোবার ঘর। প্রথম রাত্রিতেই সে-ঘরে এল বিমলা...ঘরে ঢুকে বলল 'ভুবনবাবু তোমার একখানা ধুতি দাও।' বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজের ছেঁড়া ব্লাউজ ও ময়লা শাড়িটা ফেলে দিয়ে ভুবনবাবুর ধুতি গায়ে জড়িয়ে সে যখন ঘরের অন্ধকারে ফিরে গেল তখন তার হাত পা কাঁপছে।... ক্লাস এইটের ঘরের উদ্বাস্তুদের চোখের সামনে সে রাত্রিতেই মিথ্যা এই ঘোষণা করেছিল 'সে ভুবনবাবুর স্ত্রী।...ভুবনবাবুর বিছানা এক আঙ্গুলে ছুঁয়ে মেঝেতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১১৯-১২০)

বিমলার কাছে ভুবন যে আশ্রয়ের প্রতীক, শেষ বাক্যটিতে চমৎকারভাবে সেটি প্রতীকায়িত। হলুদমোহনের পরবর্তী দিনগুলোতে ভুবনের সঙ্গে বলয়িত তার পার্টনারশিপের সংসারে মাঝে মাঝেই দাম্পত্যজীবনের ছায়া উঁকি দিয়েছে। বিমির জন্য ভুবনের জোড়াবালা কেনা কিংবা ভুবনের জন্য বিমির রুটিনমাফিক সাংসারিক যত্নের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটে। তবু সাংসারিক এই স্থায়িত্ব বিমিকে স্বস্তি দেয় না। ভুবনবাবু বালাজোড়া পরিয়ে দেবার পর তার মনে হয়: 'স্থিতি! এই নাকি স্থিতি?...রবিবারি প্রবন্ধেও যেন পড়েছে–বলয়ই হচ্ছে স্ত্রীলোকের শৃঙ্খল। যা গৃহ আর স্ত্রী একত্র রাখে। স্থিতির জন্য তার প্রতীক হিসাবে আজ তা পৌঁছে গেল তার

হাতে? পরিক্রমার শেষ। সেই পুরনো কথা–আর এত সস্তা প্রতীকে!' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫ : ১৪৯)। সন্তানহীন এই জীবন একেবারেই স্থায়ী নয় বিমির কাছে। তাই বালাজোড়া সে খুলে রাখে সন্তর্পণে। যদিও ভুবনের চোখে ধরা পড়লে বিমি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করে:

> আনোনা ভুবনবাবু, আবার পরিয়ে দিলেই বা। জানো ভুবনবাবু, একজন স্কুলমাস্টারের বিমিকে ধর্মপত্নীই ভাবা উচিৎ লোকের। নষ্টচরিত্রের স্কুলমাস্টারের চাকরি থাকে না।...(অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৯৮)

শেষপর্যন্ত ভুবনকে আঁকড়ে ধরে একটা স্থিতি প্রত্যাশা করেছে বিমি। কিন্তু তাতেই কি তার মুক্তি? প্রশ্ন থেকেই যায়! এ উপন্যাসে বিমি যেন একখণ্ড ভূমি, যার কর্ষিত হবার কথা থাকলেও ষোল বছর বয়স থেকেই অকর্ষিত এই নারী বার বার নিগ্রহের শিকার। অকর্ষণের বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। উপন্যাসে সেই বেদনার প্রকাশ গাঢ়তর:

> ...বুকের কাপড়টা সরে গিয়েছিল। অনাবৃত করল সে। সুঠাম স্নেহভারানত বুক দুটি; কিছুটা উদ্ধত, কিছুটা যেন রোদনমুখী। বুক, কুক্ষি, জঙ্ঘা। অশ্রু যেন বাইরে আসার পথ পাচ্ছে না।...হিংস্রতার মত আদিমতার মত একটা উত্তাপ যেন অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কী যেন নেই। অন্ধ সে, জড় সে, তার দেহ নেই, মুখাকৃতি বোঝা যায় না,..। যেন ভ্রষ্ট ভ্রূণ। কি যেন একটা অনুশোচনা। (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৯১)

সন্তান জন্ম দিয়েও মাতৃত্বের স্বাদ না পাবার যন্ত্রণা কিংবা সদ্যোজাত সন্তানকে ফেলে চলে আসার অনুশোচনা বিমিকে এভাবেই বার বার কাতর করে।

'বাহ্যিক বস্তুহীনতা নিরালা মনের কোণে বাস্তুহীনতার জন্ম দেয়। তাই উদ্বাস্তু মানুষ কেবল নিজের বসতবাটি ঘর গেরস্থালী হারায় না, হারায় মানসিক দৃঢ়তা-চিত্তবৃত্তির সমস্ত সদগুণ' (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ৩৮)। সন্দেহ নেই বিমি মহাযুদ্ধের অভিঘাত এবং সেই অভিঘাত-সৃষ্ট সমাজ ও ব্যক্তিক আক্রমণে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সময়ের প্রবল অভিঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্তর্মুখী বিমি বাইরে নিশ্চুপ থাকলেও যেকোনো সংগ্রামের মুখোমুখি হতে ভয় পায়নি। জীবনের হাল ছাড়েনি সে। সৌম্য আর বিমির সন্তানকে শেষপর্যন্ত সে হলুদমোহন ক্যাম্পের ছন্নছাড়া ছেঁড়াখোঁড়া মানুষগুলোর সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে যাবার বাসে তুলে দেয়। এই সন্তানের মধ্য দিয়েই সে পেতে চেয়েছে নতুন জীবনের স্বাদ। দণ্ডকারণ্যে যাবার দিন শ্রীকান্ত আর বিন্দার সন্তান প্রসঙ্গে তার মনোভাবনার মধ্যেও এর অনুরণন টের পাওয়া যায়:

> বিন্দা তার একমাসের শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে আছে, আর শ্রীকান্ত তার বাহু স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে।...বিন্দা নতুন হতে চলেছে? কোলে কি তার নতুন জীবনের ন্যাস ?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৫: ১৯৩)

সমালোচক বীতশোক ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন:

> অনেককাল নিজস্ব চালচুলা ছিল না বিমলার। উদ্বাস্তু সে, কিন্তু মাথার ওপরকার আচ্ছাদন ও চার দেওয়ালের নিরাপত্তাকে সে বাস্তু ভাবতে পারেনি। যে স্বাধীনতা বনেজঙ্গলেও পাওয়ার উপায় নেই তাকে চার দেয়ালের স্বাতন্ত্র্যে আস্বাদনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রলুব্ধ করেছে, আবিষ্ট করেছে। ত্রিকোণ ক্যাম্প থেকে চতুষ্কোণ গৃহহীনতায় যে পৌঁছেছে তার ভাবনা এমন ধারায় গেলে অন্যায় হয় না। দুজনের পার্টনারশিপে সংসার

চালানো থেকে এমন স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হওয়া তবু বিমলার কাছে তা স্থিতির চরম প্রমাণ ছিলনা। ''সন্তান একধরনের স্থিতিরই প্রমাণ বৈকি"। (বীতশোক, ২০০৬: ৮২)

নির্বাস উপন্যাসে বিমি সন্তানের মধ্য দিয়ে নিজের উদ্বাস্তু জীবনে বাস্তুজীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছে–দেখেছে নতুন হয়ে ওঠার স্বপ্ন। এভাবেই সে অস্তিত্বসংকট কাটিয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে। শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি দণ্ডকারণ্যে সন্তান প্রেরণের মধ্য দিয়ে নিজের শেকড়হীন জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত।

বিলাস বিনয় বন্দনা

অমিয়ভূষণের আরেকটি গুরুত্বর্পূণ উপন্যাস *বিলাস বিনয় বন্দনা* (১৩৮৯)। এ উপন্যাসে আধুনিক নরনারীর মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে চরিত্রগুলোর অস্তিত্বসংকটগত পলায়নপর মনোবৃত্তিকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের *নৌকাডুবি* (১৯০৬) উপন্যাসের এক আধুনিক মাত্রা এখানে উপস্থিত। যে নাটকীয় নৌকাডুবির মধ্য দিয়ে নববধূ কমলা রমেশকে স্বামী ভেবে সংসার যাপন করে, উপন্যাসশেষে লেখক নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সেই ভুল সংশোধনপূর্বক কমলাকে স্বামী নলীনাক্ষের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে *নৌকাডুবি* উপন্যাসের সম্পর্ক জটিলতার মীমাংসা ঘটান। কিন্তু *বিলাস বিনয় বন্দনা* অন্যরকমের গূঢ় সম্পর্ক জটিলতা ভারাতুর এক উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> এখানে বন্দনাকে কেন্দ্র ক'রে বিলাস-বিনয় দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত দুজনের বিনাশের দিকেই নিয়ে যায়। যার যার বউও এখানে নেই: একা বন্দনাই। আসলে উপন্যাসটি নৌকাডুবির সংশোধন। নৌকাডুবির গল্পে অন্তর্নিহিত যে আইডেনটিটির সংকট ও সমস্যা, যা রবীন্দ্রনাথ গল্পের ঝোঁকে মুখ্য করে তোলেননি, সেটাই অমিয়ভূষণ সামনে আনেন। (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৪: ১৮-১৯)

উপন্যাসে বিলাসের সঙ্গে বিনয়ের কথার মধ্য দিয়েও বিষয়টি প্রকাশিত: 'তুমি কি এখনও নৌকাডুবির গল্পের যুগে আছো? যার যার বউ তার তার কাছে ফিরলেই মিটে যাবে'? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬১)। কাজেই উপন্যাসে ত্রিমুখী সম্পর্কের জটিলতার বিষয়টি আঁচ করা যাবে।

সম্পর্ক-জটিলতার দিক থেকে এ উপন্যাস *নৌকাডুবি* থেকে পুরোপুরি আলাদা। বিলাসের স্ত্রী হলেও বন্দনার এককালের প্রেমিক বিনয়–যার প্রতি এই নারীর মুগ্ধতা উপন্যাসে শেষপর্যন্ত অনুরণিত। বিনয়ের সঙ্গে সংঘটিত তার কৈশোরক শরীরী সম্পর্কের শিহরণ সে অনুভব করেছে আমৃত্যু। বিলাস ও বিনয়ের শারীরিক সাযুজ্যের কারণে বিলাসকে বিনয় ভেবে ভালবেসেছে প্রায়-অন্ধ বন্দনা। বিনয়ও এই গ্রন্থিবদ্ধ (fixation) পুনরাবৃত্তির জাগরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বরং বার বার তার ভাবনায় ফিরে আসে এই ভাবনা:

> ...এক মৃদু শীতের রাত সে আর বন্দনা একই বিছানায় কাটিয়েছিল...একটা টাটকা সোনালি মধুর স্বাদ যেন। কত বয়স ছিল তখন বন্দনার, নয়-দশ? তার নিজের বয়স চৌদ্দর বেশি নয়।...ভোর রাতে ঘুম ভেঙেছিল বিনয়ের। সে অনুভব করল, বন্দনা তার বুকের উপরে, তার মুখের দুপাশে কনুই রেখে নিজের মুখকে বিনয়ের মুখের কিছু উপরে রেখেছে,...বন্দনা গান করছিল, খেলার সাথী, গেল যে খেলার বেলা। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৯৮)

যদিও পরবর্তীকালে, বিনয় এবং বন্দনা–দুজনের পিতার আত্মা ও শরীরগত দর্শনচিন্তাসংবলিত দ্বন্দ্ব এবং প্রবল মতানৈক্যের কারণে পরস্পর জীবনের পথ আলাদা করে নেয়। বিনয়ের জীবনে বন্দনার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ওঠে আয়ুষ্মতিয়া। বহুকাল পর বন্দনার পিতার শারীরিক অক্ষমতা ও অর্থকষ্ট বন্দনাকে বিনয়ের কাছে সহায়তার জন্যে চিঠি লিখতে বাধ্য করে। বিনয় পরিচয় গোপন করে তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি বিলাসকে বিনয় সাজিয়ে প্রায়-অন্ধ বন্দনার কাছে পাঠায়। কিন্তু যে মুগ্ধতায় বিনয় আর বন্দনার ফিক্সেসন ঘটেছিল, সেই মুগ্ধতাই কাল হলো। বিনয়ের ছদ্মপরিচয়ে বিলাস (Self imposition: imposed by oneself on oneself) বন্দনার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলো। এখান থেকেই শুরু হলো চরিত্রগুলোর মধ্যকার ত্রিমুখী সম্পর্ক-জটিলতা।

মনোজাগতিক দোলাচল ও টানাপড়েন এ উপন্যাসের মূল অবলম্বন। কাজেই সময় বিন্যাসে লেখক এখানে মনস্তাত্ত্বিক সময় ব্যবহারে কুশলী শিল্পী। বিনয়ের চেতনস্তরে নিয়ত বহমান ঘটনা এবং স্মৃতিকাতরতা উপন্যাসে বিনয় বন্দনার কৈশোরক আবেগী জীবনকালের কথকতা রচনা করেছে। স্মৃতিময়তা উপন্যাসটির কাল-নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বন্দনার চেতনায় ফিরে ফিরে আসে বিনয়কে ঘিরে নানা স্মৃতি। এক শীতের ভোরে চম্পককে দেখতে যাবার সময় বর্তমান ডিঙিয়ে বন্দনা অতীত থেকে আরো দূর অতীতে স্মৃতি হাতড়ে ফেরে:

> দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শীতে বন্দনার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আর তখন বিনয় তার সঙ্গিনী বন্দনাকে গ্রেটকোট খুলে তার মধ্যে টেনে নিয়েছিল, যেন মস্ত একটা শক্তিমান পাখি তার ডানার পালকে ঢেকে নিল ওকে। আর বন্দনা যেন সেই রাত্রিটার অনুভূতিতে ফিরে গিয়েছিল–যে রাত্রির শেষে, বন্দনা খেলার সাথীকে খেলার বেলা শেষ হয়ে যাওয়ার গানটা শুনিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছিল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬৪)

মনস্তাত্ত্বিক সময়কাঠামো এভাবেই উপন্যাসে মূল অবলম্বন হয়ে ওঠে। বহিরাঙ্গিক সময়ব্যবহারে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সনের উল্লেখ না থাকলেও এটি যে বিংশ শতকের আধুনিক কালপট, নানা ইঙ্গিতে লেখক সে বিষয়টি স্পষ্ট রাখতে চান। 'আধুনিক' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১২৬) নারী, 'আধুনিক সমাজ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১২৬) শব্দগুলো উপন্যাসের আধুনিক কালটিই চিহ্নিত করে। লেখক প্রায় চৌদ্দ-পনের বছরের এক কালপট রচনা করেন, যেখানে বিনয়-বন্দনার কলকাতা ক্যামাক স্ট্রিটের জীবন, গিরিডির জীবন, দেরাদুনের পাহাড়ী জীবন এবং এপিলোগে বর্ণিত বছর পাঁচেক পরের এক বিচারকের এজলাসের কাহিনি মুদ্রিত। আধুনিককালে বিনয়-বিলাস-বন্দনার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে সমকালের অভিঘাত সন্তর্পণে উপন্যাসে উপলব্ধি করা যাবে।

বিলাসের সংকটের সূত্রপাত ঘটল তখন, যখন সে অনুভব করল বন্দনার মনোজীবনে বিলাসের কোন অস্তিত্ব নেই। বন্দনার কাছে বিলাস বিনয় মাত্র; বন্দনার হৃদয়ে বিনয়ের প্রবল প্রকাশ বিলাসের ভেতর এক আইডেনটিটি ক্রাইসিস বা সংকটের জন্ম দেয়। এই সংকটই বিলাসকে করে তোলে পলায়নপর। এভাবেই তার অস্তিত্বসংকটের উদ্ভব ঘটল। এক অচেনা ড্রাইভারের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু হিসেবে ব্যবহার করে উপন্যাসের শুরুতেই জীবিত বিলাসের স্থলে মৃত বিলাস চরিত্র প্রতিস্থাপিত হয়ে গেল। সত্য জাগ্রত থাকে শুধু

সর্বজ্ঞ লেখকের অভিজ্ঞানে। উপন্যাসশেষে ফিরে আসা বিলাসের অস্তিত্বসংকটজাত বিষাদগাঢ় উচ্চারণ বিলাস ও বিনয়ের কথোপকথনে বেরিয়ে আসে:

> বিলাসের প্রতি বিনয়ের জিজ্ঞাসা:
>
> ... বন্দনাকে রেখে? বলো, পালিয়েছিলে কেন? সে অন্ধ বলেই নয় কি? আর এখন বুঝি সেই টানা চোখ দুটোতেই দৃষ্টি ফিরেছে বলে কি লোভ হয়েছে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬০)
>
> বিনয়ের প্রতি বিলাসের:
>
> জানো বিনয়, কী লজ্জায় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি! জানো আমি দেখলাম, বন্দনা আমাকে ভালবেসেছে আমাকে বিনয় জেনেই। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৭০)

অমিয়ভূষণ বিশ্বাস করেন, অস্তিত্বসংকটজাত পলায়নপর মনোবৃত্তি মানুষের জন্মগত। বিনয়ের কণ্ঠে অমিয়ভূষণের সেই বিশ্বাসের সুরই ধ্বনিত। বিলাস তাই অস্তিত্বসংকটে ভুগে বন্দনার জীবন থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে, বিনয়ের অস্তিত্বসংকট ভিন্নরকম। আয়ুষ্মতী কিংবা বন্দনার পুরো অস্তিত্বে নিজেকে অনুভব করলেও বংশগতভাবে স্বল্পায়ু বিনয় মৃত্যুভয়ে প্রবলভাবে ভীত। বিশ্ববেদান্ত সঙ্ঘের ঘেরাটোপে অনেককাল ক্লান্তিকর জীবন কাটানো বিনয় অকালমৃত্যুর ভয়ে ভীত বলেই নিজের মৃত্যুকে এড়াতে বন্দনা ও বিলাসের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে পরিচিত করে নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষায় বেঁচে উঠতে চায়। এটাই বিনয়ের অস্তিত্বগত মনোসংকট। বিনয়ের এই মনোবৃত্তির দিকে আঙুল তুললে বিলাসকে বিনয়ের জবাব:

> ...একে এসকেপিস্ট বৃত্তি বলে, পলায়নপর বৃত্তি...এসকেপ করাটাই মানুষের আদিমতম সুখ। আমরা কেউই জন্মাতে চাইনি। ভুলে যখন জন্মেছি, তখন জীবনের এক-তৃতীয়াংশ জীবন থেকে ঘুমের জগতে পালাই। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৪৬)

অমিয়ভূষণ মজুমদার মানুষের এই পলায়নপরতা নানাভাবে তাঁর রচনায় চিহ্নিত করেন। তাঁর এই বক্তব্য মনে করিয়ে দেয় ফ্রয়েডকে:

> The state of sleep represents a turning away from the real external world,…(Freud, 1933: 26-27)

অনেক ক্ষেত্রেই অমিয়ভূষণের কথা ফ্রয়েডের বক্তব্যের কাছাকাছি। ফ্রয়েডকে আত্মস্থ করে অমিয়ভূষণ নিজের মত করে মানবঅস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অস্তিত্বসংকট থেকেই পলায়নপরতার জন্ম হয়। অমিয়ভূষণের উপন্যাসের চরিত্রগুলো প্রায়ই অস্তিত্বসংকটে ভুগে হয়ে ওঠে পলায়নপর। তিনি নিজেও এই পথের পথিক। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন:

> জীবন আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এবং আমার জাগতে ভালো লাগছে না।...আমি ঐ পার্টিকুলার ধরনের এস্‌কেপ চাচ্ছি। মায়ের জঠরে যে-এসকেপ করেছিলাম জীবনকে ছোঁয়ার, জীবনকে আদিরূপে দেখবার, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করি। (অমিয়ভূষণ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ নেই)

মাতৃজঠরের প্রতি তাঁর এই আবেগ পাঠককে ফ্রয়েডের সঙ্গে সঙ্গে Jacque Lacan (১৯০১-১৯৮১) এর 'personal Development' তত্ত্বের 'Symbiosis with mother' বক্তব্যের কথাও মনে করিয়ে দেয়। যদিও লাকাঁ আর অমিয়ভূষণের বক্তব্যের বিষয়বস্তু পুরোপুরি বিপরীত। মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে আসার পর মানবশিশুর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করাই ছিল লাকাঁর মূল অভিপ্রায়। অন্যদিকে, অমিয়ভভূষণ ফ্রয়েডের মত মাতৃজঠরকে দেখেছেন এক নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে। 'লিখনে কী ঘটে' এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> আমরা যে ঘুমাই, সেটা জীবন থেকে পালানো। যোগীরা জীবন থেকে পলায়নপর। ভোগীরাও তাই।... এমনকি দারুণ রকমে সমাজ-সংবেদনশীল যে বুদ্ধিজীবী তাঁরাও...। ইদ্-এর কাছ থেকে, নিজের উইলের কাছ থেকেও, না পালিয়ে উপায় নেই।... ঘুমকে নিশ্চিত করার জন্যই স্বপ্ন। এই স্বপ্ন দেখার ফলে আমরা এমন এক কবোষ্ণ নিষ্ক্রিয় অন্ধকারে ফিরে যেতে পারি যা যেন মাতৃজঠরের। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৭৯)।

কবি রিলকের *ডুয়িনো এলিজি* কাব্যগ্রন্থের (দশম এলিজি) টীকা অংশে বুদ্ধদেব বসু 'মাতৃগণ' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, ফ্রয়েড এবং অমিয়ভূষণের বক্তব্যের অনুরণন মেলে সেখানেও:

> মাতৃগর্ভে আমরা থাকি অবিরল তৃপ্ত ও অনাক্রমণীয়; কিন্তু সেই আশ্রয় থেকে বেরিয়ে, এক প্রতিকূল জগতে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে, আমরা সাবালক বয়সে অনবরত অচেতনভাবে মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চাই। (বুদ্ধদেব, ১৯৭০: ২০৮)

বিলাস বিনয় বন্দনার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় লেখক এভাবেই মানুষের নির্জ্ঞান চেতনার মৌল অভিপ্রায় অস্তিত্বসংকটজাত পলায়নপরতাকে উপজীব্য বিষয় করেন। শুধু তাই নয়, একে তিনি প্রকাশ করেন মিথ-প্রতীকের আদলে। উপন্যাসে বিনয় বন্দনাকে বলেছে:

> তুমি কি বাইবেলের গল্প জানো? শোনো, আদম তো নির্বাসিত হলো। বুঝলাম, অপরাধ করে শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু তারপর কী হলো?...এর উপরেই ক্রিশ্চানদের পুনরুদ্ধারের থিয়োরি। আমার তো মনে হয়, আদম সেই বাগানের চৌহদ্দি পার হয়ে এসেই প্রথমে যা করেছিল তা এই: সে ভয়ে ভয়ে বাগানটির দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল...খুব বেঁচেছি। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৪৭)

আদম ইভের কর্মকাণ্ড অমিয়ভূষণের কাছে পাপ নয়–বরং তা জীবনের নামান্তর। আদম ইভ এখানে বিনয় ও বন্দনার জীবনরূপক। সে জন্যেই বিনয়-বন্দনার যাপিত জীবন লেখকের চোখে পাপ নয়। 'সাহিত্যিক জীবন মহাশয়' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> আনুমানিক দুহাজার বছর আগে, এশিয়া মাইনর বা তার কাছাকাছি কোথাও এক বাগান থেকে জীবন শুরু হয়েছিল বলে জানানো হয়েছিল।...ইভকে বাগানেই তৈরি করা হয়েছিল আর তা আদমের বুকের হাড় থেকে।...ইভ থেকেই জীবন শুরু বলা যেতো। জীবনের মূলেই পাপ, কম করে বললেও ইনডিসিপ্লিন, আইন-আমান্য। সে ভারি কৌতুকের হবে, যদি ইডেন বাগিচার সেই জোতদার যে অপোজিশন লিডারকে বহিরিস্থিত অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল–সেই জোতদারের হুকুম অমান্য করেই জীবন শুরু, এবং জীবন বলতে যা কিছু বুঝি, তার লক্ষণই আপাতত নীতিবাগিশ মশাইকে মেনে নেয়া। জীবনকে আদম অথবা

> সিসিফাস-তুল্য দণ্ডিত অপরাধী মনে না করে, বরং সেই অন্ধর বাহক মনে করা যাক, যদিও তেমন অপরাধী অথবা ক্রীতদাসী কোনটা হওয়া ভালো এ নিয়ে কম দ্বিধা ছিল না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৫০৪-৫০৫)

জীবন মানেই পাপের নামান্তর, জীবন মানেই ইনডিসিপ্লিন। আদমকে অন্তর্সত্তায় ধারণ করেছে বিনয়। বিলাসকে নিজের ছদ্মপরিচয়ে বন্দনার কাছে পাঠিয়ে বন্দনা-বিলাসের পারস্পরিক আকর্ষণের ইন্ধনও যোগায় সে:

> এ যেন কোনো গল্পের মত, কোনো পুরাণের গল্পই, ধাঁধাঁর ভাষায় যেন কোনো নিষেধ আছে, ঠিক বিশ্বাস হয় না যে সেই সামান্য নিষেধ অবহেলা করলে তেমন বড় শাস্তি হতে পারে, যেন কোথাও লেখা আছে ফুল তুলোনা, কিন্তু এমন সে লেখার ভঙ্গি যে অজ্ঞাত এক অপরাধের তুলনায় হাজার গুণ বড় শাস্তির ভয়ও দেখায়, খেপিয়েও তোলে; যেন কেউ বলেছে আপেল ছোঁবেনা, তোমার মনে হয়, কী ভয়ানক ব্যাপার লুকিয়ে ছিল ওই সামান্য নিষেধে? বিনয়ের মনে হলো, তাকে কি পাপ বলবে যে সে তেমন করে বিলাসকে বিনয় সাজতে বলেছিল? যেন কোথাও এক মহান নিষেধ ছিল, একজন মানুষ অন্য মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবে না, এই আমার আদেশ, এই আমার উপদেশ। সে নিষেধ না শুনলে তুমি নিষেধকারীর হাতে গিয়ে পড়ো, যার শাস্তি পাহাড়ের মত, সমুদ্রের মত, হারিকেন ঝড়ের মত, কারণ ছোট কিছু সে তৈরি করতে ভুলে গিয়েছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১২৯)

যে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিনয় বিলাসকে বিনয়ে অর্থাৎ একজন মানুষকে অন্য মানুষে পরিণত করে, তার শাস্তি ছিল প্রবল, প্রগাঢ়। এই শাস্তির ভয়াবহতায় শেষ পর্যন্ত বন্দী হলো দুজন–বিনয় ও বন্দনা। যেন বা আদম ইভের মতই তারা বন্দি, স্বর্গচ্যুত। যে সম্পর্কের দ্বন্দ্বে তারা জড়িয়ে গেছে, তা থেকে তাদের মুক্তি নেই। বিনয়ের দিক থেকে প্রথমত বিলাসকে বিনয়ের ছদ্মপরিচয়ে পাঠানোর পাপবোধ, পাপবোধজাত দায় সেইসঙ্গে বন্দনার প্রতি তার কৈশোরক মুগ্ধতা, মৃত্যু এড়াতে বেদান্ত সংঘ ত্যাগের এক মুক্তিদ্বার হিসেবে বন্দনাকে গ্রহণ বিনয়কে একদিকে যেমন জটিলতা থেকে মুক্তি দেয় না, তেমনি বন্দনার দিক থেকে বিনয়ের প্রতি প্রবল মুগ্ধতা মুক্তির পরিবর্তে শৃঙ্খলেই জড়ায় বন্দনাকে। বিনয়ের আত্মযন্ত্রণা এবং পাপবোধ বার বার উচ্চারিত হয় উপন্যাসে। 'আমার একটা চোখের কর্ণিয়া ওকে দিন। আমার ভুল, আমার পাপ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৩৪)। এই পাপবোধ তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া করতে গিয়ে বন্দনার প্রতি প্রবল মমতা অনুভব করে ভাবে সে, 'ওই যে যাকে সুপার ইগো বলে, মানুষের সেই অংশত চেতন অংশ যা পৈতৃক বিবেক ও সমাজ-বিধি প্রতিফলিত করে চরিত্র গড়ে তোলে,...তাকে কাজ করতে দেবে না।...বরং সে বুদ্ধির সাহায্যে চলবে। অর্থাৎ সুপারইগো শব্দটা লাগসই হোক, না হোক, সে তার কথা এবং কাজে মনের তলা থেকে কিছু উঠে আসতে দেবে না' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১২৯-১৩০)। বন্দনার প্রতি অন্যায়ের পাপ-স্খলনে তার প্রথম রূপান্তরিত সত্তার ভাবনা এটি।

উপন্যাসে লেখক আদমের পাপের সঙ্গে বিনয়ের পাপকে সমীকৃত করে তোলেন। সেই সঙ্গে সমাজও একটি জায়গা হয়ে দাঁড়ায় বিনয়ের কাছে; বিনয় যে বিলাস নয়, সমাজ জানে না সেটা । যে কারণে সব ছেড়ে বন্দনাকে নিয়ে তার পিতার বাড়িতে উপস্থিত হবার পর বিনয়ের মনে হয়, '...কেয়ারটেকার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে? সে কি দাদাবাবুর আগেকার ছবির সঙ্গে বর্তমানের চেহারা মেলাচ্ছে?...বিনয়কে এখনই কি

প্রতারক বলে চিনবে না?...তাদের দিদিমণি? শ্রদ্ধা বলতে কিছু কি অবশিষ্ট থাকবে এই নকল স্বামীর সঙ্গে একত্র থাকার পর'? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৩৬)

এইসব টানাপড়েনের ভিড়ে বিনয় বিলাস ও বন্দনার বিয়ের ছবি খুঁজে পেলেও বিলাসের মিথ্যা মৃত্যুঘটনা তাকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। একই সঙ্গে সদ্যদৃষ্টি ফিরে পাওয়া বন্দনা আবেগে আপ্লুত বিনয়কে বিহ্বল করে তোলে:

> ...বন্দনা বিনয়ের দিকে ফিরে দাঁড়াল। দুহাত তুলে বিনয়ের দুই গালে রাখল।...দুই হাতে বিনয়ের দুই গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদুস্বরে বন্দনা বলে যেতে লাগল: তুমি এত সুন্দর, এত সুন্দর, কবে থেকে, বিনয়, তুমি আমার মনে স্বপ্ন হয়ে ছিলে। তোমাকে পেলুম, সুন্দর লাগতো। যদি কখনো স্বপ্নের সঙ্গে না মিলেছে, বুঝেছি সে আমার চোখের দোষ। আর এখন, এখন তুমি কত সুন্দর। স্বপ্নকে ছাড়িয়ে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৩৯)

বন্দনার জীবনে বিলাসের স্মৃতি যে পুরোটাই বিনয়ের ছদ্মাবরণে ধোঁয়াশাপূর্ণ, সেটি উপর্যুক্ত উক্তির শেষ বাক্যগুলোতে বোঝা যায়। একারণেই বিনয়কে ঘিরে বন্দনার ব্যাকুল স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা। তবে সত্য বেরিয়ে এল বিনয়ের কণ্ঠে, শোনা গেল তার আত্মস্বীকৃতি:

> আমাকে বিশ্বাস করো, বন্দনা। অসৎ অভিপ্রায় আমার ছিল না। খেলার মত হালকা কিছু করতে গিয়ে আমি বরফের অ্যাভালাঞ্চে হাত দিয়েছিলাম, বজ্রের মত তা আমার উপরে নেমেছে। আমি, আমি মানুষকে অবহেলা করতে গিয়ে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৪১)

বিনয়ের কাছে একজন মানুষের অন্য মানুষে পরিণত হওয়ার কৌশল যেন ফসটাসের শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রির মতই গূঢ় অপরাধ। বন্দনার সামনে যে কদর্য বাস্তবতা এসে দাঁড়াল, সেটি বিলাসের মানবাত্মাকে বিলাসের অবহেলা করার ফল। সেইসূত্রে শিবকালী ও বিনয়ের পিতার সেই শরীর ও আত্মার পুরনো দ্বন্দ্বই সামনে এসে দাঁড়াল। বন্দনার পিতার কাছে শরীরই মুখ্য; কিন্তু বন্দনার কণ্ঠোচ্চারিত সত্য আত্মাকেই বেছে নেয়:

> আমি তো বিনয়বাবু, তোমাকেই, তোমাকেই ভালবেসেছি, তুমি ভেবেই বিয়ে করেছি, তুমি ভেবেই ঘুমিয়েছি, আমার সেই ভালবাসা সব মিথ্যে? শুধু মাংস, স্নায়ু এসবই সত্যি? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৪১)

দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বে এবার যেন আত্মারই জয় হলো। শরীর ও আত্মার এই দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে টমাস মানের (১৮৭৫-১৯৫৫) *The Transposed Heads* (১৯৪১) নভেলার প্রসঙ্গ মনে পড়ে। দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব বিষয়ক ভারতীয় কিংবদন্তির ভেতর টমাস মান নিজের দর্শন প্রোথিত করে এই নভেলার মূল আইডিয়া গ্রহণ করেন। তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেন দেহ আর আত্মার ভেতর বিস্তর ব্যবধান হলেও একটি আরেকটির সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। মূল বিষয় হলো, মানুষের চালিকা শক্তি আসলে আত্মা না শরীর, সেটির অনুসন্ধান করা। বর্তমান উপন্যাসে বিনয় আত্মার এবং বিলাস দেহের প্রতীক! কারণ আত্মা নয়, নিজের দেহকে (impose) আরোপ করেই বিনয় বিলাসকে বন্দনার দিকে যেতে প্ররোচিত করে। উপন্যাসশেষে টমাস

মানের মতই অমিয়ভূষণ কার মৃত্যু হলো সে বিষয়টি অমীমাংসিত রাখেন এবং দেহ ও আত্মার প্রতীক বিনয় ও বিলাসের এক একাকার অস্তিত্বের জন্ম দেন। শুধু টমাস মান নয়, দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) দর্শনতত্ত্বে দেহ-মন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। তাঁর 'পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া' মতবাদে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, 'মনের স্বরূপ হচ্ছে চিন্তন এবং চিন্তনের মধ্য দিয়েই আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হই।...সংবেদনের সাথে মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত থাকলেও সচেতনতা অথবা সংবেদন সম্পর্কিত জ্ঞানকে দেকার্ত মনের বলে দাবি করেন, এভাবেই দেহ-মনের বলেও তিনি ব্যাখ্যা করেন' (রাশিদা আখতার, ২০১৫: ৩৫-৩৬)। সমালোচক *The Passion of the Soul* গ্রন্থে উপস্থাপিত দেহ ও মন সম্পর্কিত দেকার্তের বক্তব্য প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> আবেগ (passion) হলো মনের দিক কিন্তু এর প্রকাশ হলো দেহের দিক। দেহ-মন সম্পর্কে তিনি বলেন যে দেহের মাঝে মন গতির সঞ্চালন করে।...দেহ-মনের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে তিনি একে অপরের কারণ বলেও ব্যাখ্যা করেন। (রাশিদা আখতার, ২০১৫: ৩৫-৩৬)

অমিয়ভূষণ দেকার্ত পড়েছিলেন কিনা তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও তিনি বিনয় ও বিলাসকে দেহ ও আত্মার প্রতীক হিসেবে দ্বৈতবাদী এই তত্ত্বের আধারে নিয়ে এসেছেন। উপন্যাসে আত্মাময় বা মনোবাদী বিনয়ের আবেগের প্রকাশ ঘটে দেহবাদী বিলাসে। তবে উপন্যাসশেষে দেকার্তের এই দ্বৈতবাদী দেহ ও আত্মার তত্ত্বকে অমিয়ভূষণ একত্ববাদে পরিণত করেন। তাঁর কাছে বিলাস-বিনয় হয়ে ওঠে একই সত্তার নামান্তর।

উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে (লেখক কথিত তৃতীয় বা শেষ অধ্যায়) মৃত্যুভীতি এবং দায়বোধ ছাড়াও বন্দনার প্রতি কৈশোরক মুগ্ধতা বিনয়কে নিয়ে এল দেরাদুনের এক পাহাড়ি গ্রামে নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে। 'এমনভাবেই এক অপরূপ সন্ধ্যায় গল্প শুরু হলো। তাকে কি সত্য বলা হবে কিংবা প্রেম যা থেকে বিলাস বর্জিত?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৪৩) পরস্পরের প্রেমেই পড়ল বিনয় ও বন্দনা। একে অপরের অস্তিত্বসংকট ভুলে পাহাড়ি গ্রামে, আংরেজ টোলায় বিনয় গড়ে তুললো এক বাগান; যেন সেই বাগানে সে আর বন্দনা স্বর্গচ্যুত কোন যুগল। বন্দনার মন বিনয়কেই লালন করেছে আত্মায়, নিজের সন্তানের পিতার স্থানেও সে বিনয়কেই আঁকড়ে ধরে। রাতের অন্ধকারে সে স্পষ্ট অনুভব করে:

> এই মানুষটাকেই আমি চিরকাল ভালবেসেছি। চিন্তাটার কি মধুর স্বাদ! কিন্তু সেটাই ঘুম টুটিয়ে দিল।... সে চেয়ে চেয়ে দেখল, অবশেষে তার চোখ পড়ল মেঝের উপরে। তার ঘরে আলো নেই কিন্তু বিনয়ের ঘর থেকে একটা, চম্পকের ঘর থেকে আর একটা আলো এসে মিশেছে মেঝের উপর। আলোর দুটি বাহু যেন। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৪৫)

বিনয় ও চম্পক এখানে আলোকিত সম্পর্কের ধারক। অন্যদিকে বন্দনা এক ইভ, যে প্ররোচনা জোগায় বিনয়কে। সুতরাং অন্ধকারের বাসিন্দা সে। এই অধ্যায়ে বিনয় বারবারই পলায়নপরতার কথা আউড়ে চলে। আদম ও ইভ কিংবা জেসাস পুরাণ ক্রিয়াশীল তার ভাবনায়। বিনয়ের কাছে বন্দনা আর তার জীবন আদম-ইভসদৃশ। তাই এই বাগান তার কাছে ইডেন বা স্বর্গ নয়, বরং স্বর্গচ্যুত আদম ইভের প্রথম পা-ফেলা পৃথিবীর

মত। যে জীবন বিনয় আর বন্দনা ফেলে এসেছে, সেটি ছিল স্বর্গসম। বিনয় বলে চলে 'একে বলো পৃথিবী, যেখানে স্বর্গ হারালে মানুষ প্রথম পা রাখতে পারে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৫৩)। এ স্বর্গ বিনয়ের 'কর্মেরস্বর্গ', 'বণিকদের বিজ্ঞাপনের তৈরী পৃথিবী' নয়। যদিও সে ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট, তবু এই আদিম পৃথিবীতে বণিকেরা লোভ জাগাতে ব্যর্থ। আদিমতা ও আত্মা–এ দুয়েই তার গাঢ় বিশ্বাস। তাই প্রকৃতি আদিমাতার কাছে তার ফেরা, তাকে আশ্রয় করেই তার বাঁচার আকুতি, তার অস্তিত্বসংকট কাটানোর আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত।

বারবারই পাপবোধ বিনয়কে শাপগ্রস্ত হবার ভীতিবোধে আচ্ছন্ন করে। শুধু আদম-ইভই নয়, বিলাসের ঔরসজাত চম্পক তার কাছে প্রতিস্থাপিত শিশু ঋষি শ্বেতকেতুর স্থলে। অমিয়ভূষণ লেখেন:

> গল্পটা সেই শিশু-ঋষির শাপ।...পুরাণের অত গল্পের মধ্যেও অমন কঠিন শাপ অমন ছোট্ট কচি একটা মুখে আর নেই। সেই শাপের ভয়ই যেন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মনে বিবেক। তখন বোধহয় যে কোনো পুরুষের কামনার ডাকে সাড়া দেয়াই প্রথা ছিল স্ত্রীলোকের। সমাজের নিষেধ ছিল না। সেই শিশু-ঋষির মা হয়ত তেমন কোন ডাকে সাড়া দিয়ে অনুপস্থিত। বেলা বয়ে যায়, স্তনের জন্য আকুল ঋষি শাপ দিয়েছিল। প্রথা বদলে গেল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৫৫)

চম্পকের দিকে তাকিয়ে বিনয় অপরাধবোধে ভোগে। মনে হয় তার 'চম্পক, নিশ্চয়ই, পুরাণের সেই গল্পের শিশু ঋষি নয়, সে হয়ত অভিশাপ দেয়না। তাই বলে তার যন্ত্রণা না হবে কেন?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৫৯)। বন্দনা আর তার জীবনের অনৈতিক সম্পর্কের অন্তর্ঘাত চম্পকের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করবে, সেটি বিনয়কে ভাবায়। এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি নেই জেনেও তবু এই জীবন মোহময় বিনয়ের কাছে। চম্পককে নিজের উত্তরসূরি ভাবার মধ্য দিয়ে তার অকালমৃত্যুভীতি উবে যায়। এমনকি বিলাসের প্রত্যাবর্তনেও তার মনে হয়, 'একি অদ্ভুত ব্যাপার হলো! সে তো ভেবেছিল, বিলাস দেখা দিলেই তার নিষ্কৃতি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬১)। কিন্তু নিষ্কৃতির বদলে সে স্পষ্ট বিলাসকে জানায়, 'তুমি কি কখনো ভেবেছো, বন্দনা যাকে ভালবেসেছে সে বিনয়'? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬১)। অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন:

> প্রকৃতপক্ষে self love এর স্মৃতি নাকি? এক তের বছরের ছেলের এক দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে রাত কাটানোর রোমান্টিক স্মৃতি? তা থেকেই পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন? পড়ার ভয়? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪২)

'পড়ে যাওয়ার ভয়' শব্দত্রয় আদম ইভের স্বর্গচ্যুতির মিথটিই মনে করিয় দেয়। উপন্যাসের প্রায় শেষদিকে কৈশোরক মুগ্ধতার গ্রন্থিবদ্ধ (fixation) পুনরাবৃত্তির জাগরণে বন্দনার দ্বিধা কেটে যায়। বিনয়ের স্বহস্তে নির্মিত বাগানে বেড়াতে বেড়াতে 'প্ল্যাঙ্ক-পাতা ঝর্ণাটার কাছে এসেছিল তারা। বন্দনা ইতস্তত করতে লাগল। যেন একবার সাহস করে এসেছিল বটে কিন্তু দ্বিতীয়বার পারবে না পার হতে, যেন হাত বাড়াল, যেন দুজনের চেষ্টায় তবু পারা যায়। বিনয় একটু অদ্ভুতভাবে হাসল। হঠাৎ দুহাতে বন্দনাকে তুলে নিল, পাটাতনের উপর দিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঝর্ণাটা পার হলো' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬২)। এই প্ল্যাঙ্ক যেন প্রতিস্থাপিত হয় বহুদিন আগের এক প্ল্যাঙ্কে, যা বেয়ে তারা দুজন একদা শরীরী আবেগে এক হয়েছিল। লম্বা সময় ধরে দুজন হাতে হাত রেখে 'তাদের সেই স্বপ্নের মত গড়ে তোলা বাগিচায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।...কোন কোন গাছের, কোন

কোন টেরাসের ইতিহাস আছে, ছোট্ট, এক মিনিটে শেষ হয়, এমন ইতিহাস, কিন্তু তা যেন মনে পড়ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬৩)। আদম ইভের মতই তারা যুগলবন্দি ঘুরে বেড়ায়।

জীবন পাপের নামান্তর নয়; কাজেই বন্দনার সঙ্গে যাপিত এ জীবন একটুকরো আলো সদৃশ। আদম-ইভ অনুষঙ্গী আপেল বা আপেল গাছ পুরাণে পাপের প্রতীক হলেও এ উপন্যাসে বিনয়ের কাছে আপেল গাছ আশা জাগানিয়া গাছের প্রতীক। অরণ্যে তাদের যুগল বিচরণ স্বপ্নের চেয়েও মধুর। আপেল গাছ একদিন বিনয়কে আশার আলো দেখিয়েছিল, নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল বিনয়ের প্রাণে। বিনয় ও বন্দনার অনেককাল আগের আলিঙ্গন মধুর মিলন প্রতীকায়িত হয়ে যায় আপেল গাছের প্রতিরূপকে:

> ...কী সুন্দর! এখন বসন্ত নেই আমাদের আপেলগুলো শাঁসে ভরে উঠেছে। চেরিতে যখন ফল আসে তখন থোকে থোকে ফুলের সুঘ্রাণ থাকে না আর। মনে পড়ে কী সাহস ছিল তোমার! ওদিকে তোমার বাবা মা দোর পিটিয়ে ডাকছেন নিচুতলায়, আর তুমি আমার মুখের পরে ঝুঁকে গান গাইছো। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬৯)

পুরো অংশটিই প্রতীকী। এখন বন্দনা আর বিনয়ের জীবনে প্রথম যৌবনের সেই উদ্বেল সৌগন্ধ্য আর নেই, তবু তাদের এখনকার সম্পর্কের পরিপক্বতা প্রগাঢ়, বিশাল। এ কারণেই বিনয়ের দ্বিধাহীন উচ্চারণ 'আমাদের এই জীবন কি তোমার সেই দশ বছরের বাসরশয্যার মত মধুর নয়? সেটা তেমন ক্ষণস্থায়ী বলেই কি, তার ফল পরে কিছু খাটেনা বলেই কি তা সুন্দর নয়' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬৯)। যদিও এরই ভেতর বিনয়ের মনোজগতের টানাপড়েন, দ্বন্দ্ব এত গাঢ়তর হয়ে ওঠে যে সে এক মনস্তাত্ত্বিক হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। তার মনে হয়, বন্দনার ঘরের আয়নায় ছায়া পড়েছে বিলাসের; তাই মুহূর্তে সে গুলি করে বিনয়ের আন্তর্জাগতিক সৃজন বিলাসকে। বহুভাবেই বিলাসকে সে সরিয়ে দিতে চায়; বন্দনাকে খুন করার কথা ভাবে, নিজেকে নিজে হত্যায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু কোনভাবেই এই জটিলতা থেকে তার মুক্তি মেলে না।

উপন্যাসে আপেল গাছের চারপাশের ফাটলকে লেখক চিহ্নিত করেন বিলাসের আগমনে বিনয়-বন্দনার জীবনে ভাঙনের প্রতীকরূপে। বিনয়ের জীবনাকাঙ্ক্ষায় বিলাসই এক ধ্বস। এ উপন্যাসে 'জটিল চরিত্র-সম্পর্কগুলো মূলত বিনয়কে ঘিরে বা স্পর্শ করে বিন্যস্ত হয়,...এখানে বিনয়কে মুখ্য বিন্দু করে নানা কৌণিক অবস্থানে সাজানো বিবিধ চরিত্র' (বাসব, ২০০১: ১৭৫)। কাজেই উপন্যাসে বিনয়ের অস্তিত্বগত টানাপড়েন মুখ্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে এসে পাঠক অন্য এক পৌরাণিক অনুষঙ্গের সম্মুখীন হন। পুরনো আপেল গাছটিকে বাঁচাতে গিয়ে বিনয় তার চারপাশের ফাটল বোজাতে যাবার পথে যে ভার বহন করেছে সেটি ক্রুশ-কাঁধে যিশুর মিথকেই মনে করিয়ে দেয়। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> এখানে বোধ হয় বেশি খাড়া হয়েছে পথ। বিনয়কে আর একটু চলতে হচ্ছে। তার ফলে এরকম মনে হয়, যেন কাঁধের ভারটাই বাড়ছে। কাঁধের উপরে সেই মই। কারো কারো কি মনে হবে এমন একজনের কথা যিনি একটা ক্রসের ভারে নুয়ে নুয়ে চলেছিলেন। তা বোধ হয় উচিত হয় না। কেননা তিনি তো নিজের ব্যথা বহন করেননি। বহুর, পৃথিবীর সব মানুষের যন্ত্রণা...আর তিনি আপেল বাঁচাতেও যাননি। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬৯)

সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন:

> উদ্ধৃত অংশে এক পুরাণের স্মৃতি ঝলসে ওঠে: আবার বিনয়ের যন্ত্রণার সীমাও স্পষ্ট। অবশ্যই চার-পাঁচ পুরুষের শিল্পপতির বংশের ছেলে বিনয়ের বন্দনাকে বাঁচানোর মধ্যে চলে আসা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা পাওয়া, আয়ুষ্মতিকে ছেড়ে দেওয়া বা আংটির ঘটনায় নিজেকে সরিয়ে আনা একটা প্রতিবাদ, দায়বদ্ধতা। কিন্তু এর মধ্যে বহুর ইতিহাস বাজেনা, আর উদ্ধৃতির শেষ অংশটুকু "তিনি আপেল বাঁচাতেও যাননি।" আদম ইভের স্বর্গোদ্যান ও আপেল ভক্ষণের আদি পাপের আভাস জড়িয়ে থাকে এখানে:... (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৪: ২২)

বোঝা যায় সামূহিক যন্ত্রণা নয়, বরং ব্যক্তিক যন্ত্রণা মোচনের জন্যেই বিনয়ের এই জীবন বেছে নেয়া।

উপন্যাসের শেষ দিকে এসে বিনয় বিলাসের পারস্পরিক কথোপকথন তাদের অন্তর্জাগতিক টানাপড়েনকেই মূর্ত করে তোলে। বন্দনার জীবনপট থেকে বিলাসের পলায়নপরতার কারণ আর বন্দনার প্রতি বিনয়ের প্রগাঢ় মুগ্ধতা এ অংশে রূপায়িত। বন্দনার জীবনে বিলাসের অস্তিত্বহীন অবয়ব কিংবা বিনয়ের দুর্বলতম দিক সম্পর্কিত পারস্পরিক আঘাত বিনয়-বিলাসের আলাপচারিতায় উঠে আসে। মূলত দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বের প্রগাঢ় প্রকাশ ঘটেছে এ অংশে। দেহবাদী বিলাস বিনয়ের আত্মার ধারণাকে ধূলিসাৎ করে বিনয়কে বন্দনার দেহের প্রতি লোভাতুর বলে প্রমাণ করতে চায়। বিনয়ের আকাঙ্ক্ষা নগ্নভাবে উপস্থাপন করে বিলাস:

> বিনয়, তুমি দার্শনিক হতে পারো, হয়ত পাঁচ পুরুষ ধরে শরীর ঠকিয়েছে বলে তার উপরে অবজ্ঞা, কিন্তু, আচ্ছা, আমি যদি বলি, সবটাই তোমার এক বায়োলজিক্যাল কৌশল? এইভাবে তুমি তোমার বংশের হেমোফিলিয়াকে ঠেকাতে চেয়েছো? তোমার মধ্যে মৃত্যু বাসা বেঁধে আছে, তাকে পাশ কাটিয়ে, তোমার ছেলে যেন তা বয়ে না বেড়ায়, তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে টিকে রইল।...তোমার সহজে রক্তপাতের প্রবণতা, আমার যে এপিলেপসি, সন্ন্যাসের দোষ নেই কে বলেছে? অর্থাৎ আমার আর তোমার? দুজনের থিয়োরি সমান ভুল? বলো কখনো নেশা লাগেনি রক্তে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৭০)

বিলাসের এই উক্তিতেও বিনয়ের প্রতি এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তিতে আরোপের অভিযোগ উচ্চকিত। মৃত্যুভয়ে বংশ বিস্তারে অনীহ বিনয় বন্দনার ঔরসজাত পুত্রের মধ্য দিয়ে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ দেখতে চেয়েছে। বিলাস তাচ্ছিল্য করেছে একেই ।

উপন্যাসের শেষে আপেল গাছের গোড়ায় বিলাস ও বিনয় এদের যে কোন একজনের হাহাকারের ইমেজ রচিত হয়েছে। যে কোন একজন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়! তবে সেটি বিলাস না বিনয়–লেখক তা অস্পষ্ট রাখেন। এপিলগে একজন মৃত এবং একজন অন্তর্হিত ব্যক্তিকে তুলে আনেন লেখক। বছর পাঁচেকের ব্যবধান রচনা করে সেই মৃতদেহ বিলাস না বিনয়ের, কিংবা বিনয় কি বিলাসকে খুন করে পালায়, কিংবা এই সন্ন্যাসী কে?–সেটি চিহ্নিত করার জন্য এক বিচারিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। কাঠগড়ায় নিশ্চুপ দাঁড়ানো বন্দনা কাউকে চিনতে পারে না বা চিনতে চায় না। চম্পক তথা যে উত্তরাধিকার বিলাস কিংবা বিনয় রেখে গেছে, সেই উত্তরসূরির চোখেই শেষ পর্যন্ত লেখক বিনয় আর বিলাসকে আঁকতে চান:

> একটা আপেল গাছ বাঁচাতে গিয়ে যে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়, কিংবা যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাঁচাতে গিয়ে তা করে, এদের মধ্যে কে এই সন্ন্যাসী? সে যেন মনে মনে ভিক্ষুর মুক্তি কামনা করে চলেছিল। যেন সে তারই ছেলে যে

আপেল গাছ বাঁচাতে যায়, যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাঁচাতে যায় একই রকম বিপদে, আর এই ভিক্ষু যে এমন বিপদেও শান্ত, তিনে মিলেই যেন এক লোক।

ভিক্ষু ছাড়া পাবে শুনে যেন আনন্দে তার দুচোখ ভরে জল এসে গেল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৭৩)

মূলত এ উপন্যাসে টমাস মানের নভেলার মতই দেহ ও আত্মার প্রতীকে অমিয়ভূষণ দেহবাদী বিলাস আর আত্মাবাদী বিনয়ের অস্তিত্বসংকটকে তুলে ধরেছেন। মিথ-আবহের মধ্য দিয়ে আধুনিক ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, স্বল্পায়ুজাত পলায়নপরতা, মনোদৈহিক গূঢ়-এষণা এখানে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বন্দনাকে ঘিরে দুই পুরুষের আত্মদ্বন্দ্ব আধুনিককালের মানবিক এক সংকট। অমিয়ভূষণ বিলাস বিনয় আর বন্দনার মত আধুনিক ব্যক্তিসত্তার প্রতীকে আবহমানকালের মানবাত্মার গূঢ় অস্তিত্বসংকটের কথাই বলতে চেয়েছেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে নিরন্তর সচেষ্ট মানুষেরই প্রতীক হয়ে ওঠে বিলাস বিনয় বন্দনা।

বিবিক্তা

বিবিক্তা (১৯৮৯) উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্ক জটিলতা আর ব্যক্তিঅস্তিত্বের সংকটস্বরূপ কিছু ভিন্ন। আধুনিক নারীর বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, বিষণ্নতা ও মানবসম্পর্কবোধের জটিলতার প্রকাশ ঘটেছে *বিবিক্তায়*। সমালোচকের ভাষায় এ উপন্যাসটি:

...বর্তমান পৃথিবীতে কয়েকটি নর-নারীর গভীর গভীরতম একাকিত্বের বিষণ্ন ম্লান একটি কাহিনি।...একটি রাজনৈতিক বন্ধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে মূল এবং পার্শ্ব চরিত্রগুলি। ঘটনাচক্রে উঠে এসেছে সমকালীন রাজনীতির নীচতা, ভ্রষ্টতা এবং আদর্শহীনতা, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনাবিলাসী বিপ্লবীর প্রসঙ্গ, একটি মহকুমা শহরের সংকীর্ণ পরিসরে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার দৈনন্দিন প্রয়াস। কিন্তু বিবিক্তা-য় এ সবই 'এহো বাহ্য', আধুনিক মানুষের, মনোজীবী মানুষের, সমাজ সংসার এবং সর্বোপরি নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিবিক্ত, অ্যালিয়েনেটেড হয়ে যাবার অনুভবটি এখানে শিল্পরূপ পেয়েছে। (প্রবাস, ২০০১: ২১০)

এ উপন্যাসের নিঃসঙ্গ বিবিক্তজন হৈমন্তী সেন। অমিয়ভূষণ নিজের ডায়েরিতে ১৯৭৫-এ এই উপন্যাস সম্পর্কে যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসের মূল প্রবণতার প্রকাশ ঘটে। একদিকে হৈমন্তীর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিচেতনা এবং অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, এলিট শ্রেণির সুবিধাবাদী মুখাবয়ব, বৈরী সময়ের গর্ভে অস্তিত্ববান কিংবা অস্তিত্বহীন মানুষের অন্তর্লীন বেদনা এ উপন্যাসে ভাষরূপ পেয়েছে। হৈমন্তীর নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, সৃজনীসত্তা আর জটিল সম্পর্কচেতনাকে সামনে রেখে অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন:

আদিম রমণীকে আমরা চিনি না। এখন যাকে দেখতে পাচ্ছি তার আদিম সত্তা এইখানে যে, সে সবকিছু সৃষ্টি করতে চায়। বুদ্ধি, মন দিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত Total existence, বুদ্ধি মন শরীর দিয়ে সব দিয়ে সৃষ্টি করতে চায়। নতুন পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মবোধ করে, পৃথিবীও বদলাবে, সে ও বদলাবে, পরে আবিষ্কার করবে সে ও পৃথিবী এক। কিন্তু আপাতত ব্যর্থতাই, কারণ দল ছাড়া আদিমতায় পূর্ণ এই রমণী একা সৃষ্টি করতে পারে না। তার সৃষ্টির পার্টনার আদিকাল থেকে পুরুষ পুরনো মৃত্যুর বীজে ভরা–হিংসা, বিদ্বেষ, লোভে আকণ্ঠপূর্ণ, সে নতুন দল গড়তে চায় কিন্তু সে দলেও হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ বর্জিত হবে না,

> কাজেই সেই পুরুষ স্রষ্টা হিসেবে নপুংসক। কিন্তু এই আদিম রমণী আদিমতার বীজ বহনকারিণী, দলছাড়া একজন; একেবারে আদিম নয়। সে সমাজে বাস করে। আদিম অবস্থায় ক্ষুধা ছিল, অন্ন খুঁজে বেড়াতে হতো। এখন সেই অন্নের অভাব না থাকায় অভাববোধটা যেন পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। এবং তা এখন সৃষ্টির ক্ষুধায় পরিণত (pure specimen) হয়েছে; অর্থাৎ আমার গবেষণার জন্য তার অন্নের ক্ষুধা আর সৃষ্টির ক্ষুধাকে পৃথক করা হয়েছে।
>
> এই আদিম রমণীর অন্য আরেকটি দিক, সে একবাক্স ভর্তি পুতুল পেলে সুখী হতো যেন, অনেক সন্তান।
>
> অন্য আরেকটি দিক মৃত্যুভয়। ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়। এখনই কিছু করতে হবে, দেরী করার সময় নেই। যেন এই ঋতু ফুরিয়ে গেলে আর ফুল ফুটতে না পারে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৪)

অমিয়ভূষণের উপর্যুক্ত বক্তব্যে নারীকে নতুন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে সেই নারী শুধু সন্তান পেলেই খুশি হয় না, বরং এই পৃথিবীতে তার দৃঢ় অস্তিত্বের চিহ্ন আঁকতে চায়।

বিবিক্তা উপন্যাসের কেন্দ্রীভূত আকর্ষণ হলো ছোট্ট একটি মহকুমা শহরের এসডিএমও-র স্ত্রী হৈমন্তী সেন। পেশায় এ্যাডভোকেট হৈমন্তী সেন আধুনিকতার প্রান্ত ছুঁয়ে হয়ে উঠেছেন আধুনিকতম। উপন্যাসের শুরুতেই তার জীবনধারায় দ্রোহের নিশান পুতে দেন অমিয়ভূষণ। লেখকের বর্ণনা:

> ওর সম্বন্ধে শহরের লোক অনেক কিছু জানে। যেমন সে বৈদ্যের মেয়ে, বিয়ে করেছে কায়েতের ছেলেকে। সে এম এ, এল এল বি অ্যাডভোকেট। কোর্টে প্র্যাকটিস করে। তখন সাদা স্ল্যাকসের সঙ্গে কালো কোট এবং চওড়া ফুলদার টাই পরে। মাঝে মাঝে দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়তে দু-তিন কলমের গল্প লেখে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৭৮)

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সের এই নারীর সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দৃঢ়তা আর সৃজনশীলতায় অভিনবত্ব। এর মধ্যেই নিহিত চরিত্রের সম্পর্ক-জটিলতার বীজসূত্র। একা একা সৃষ্টি করা যায় শুধু সাহিত্য–আর কিছু নয়। হৈমন্তীও পুরুষের সহায়তাহীন এক সৃষ্টি প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, হোঁচট খায়। তাই মনোনিবেশের জায়গাটা তার লক্ষ্য খুঁজে পায় সাহিত্যে। কন্যা সন্তান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মনের গোপন কোণে পুত্রসন্তান না পাওয়ার বেদনায় সন্তর্পণে সে ম্লান হয়। অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন:

> ...সে ভাবে ছেলে হলে ভালো হতো এবং মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব নাকি? স্ত্রীলোকরূপে পুরুষের সামনে যে হীনমন্যতা, ছেলে হলে তা ঢাকা পড়ত এই জন্য যে সে হতো তার অন্যরূপ?...আর প্রথম উপন্যাসটিও তার মনের মত হয়নি। পুরুষের সাহায্য ছাড়া প্রকাশিত হয়নি। উপরন্তু তেমন শক্তিশালী কিছু নয়। কিন্তু তাই ব'লে গোপন করে না, তার উপরে স্নেহও আছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৭৮)

হৈমন্তীর এই চিন্তার সাথে অমিয়ভূষণ ফ্রয়েডকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। সমালোচক হুমায়ুন আজাদ তাঁর নারী গ্রন্থে ফ্রয়েডের সেই মতটি তুলে ধরেছেন এভাবে:

> নারীর শিশ্নকামনা কখনো কাটে না, কেননা, 'শিশ্নকামনাই হচ্ছে একান্ত নারীর কামনা।' নারী শিশু চায়।...এই শিশু ছাড়া শিশ্নের কাছাকাছি আর কিছু পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।...নারীর প্রেমাস্পদ হয়ে

> ওঠে শিশু।...শিশুর মধ্যে পায় সে তার হারানো শিশ্নকে।...তার সুখ হয় সত্যিই অসামান্য যেদিন চরিতার্থ হয় শিশু লাভের বাসনা; এ-সুখ আরো বিশেষ হয়ে ওঠে যদি শিশুটি হয় ছেলে, যে তার জন্যে নিয়ে আসে বহু কামনার শিশ্নটি। (হুমায়ুন, ২০০১: ১৫৮)

কন্যা সন্তানের মধ্য দিয়ে হৈমন্তীর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। সেই সঙ্গে হয়ত পুরুষের সাহায্য ছাড়া কিছু সৃষ্টি করতে না পারার বেদনাবোধ এই নারীকে পীড়িত করে। বুদ্ধি ও মন দিয়ে হৈম খুব উঁচু মানের কোন উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত এর সাথে শরীর অর্থাৎ সর্বতোসত্তা (total existence) যুক্ত করে পৃথিবীতে আনে কন্যাকে। তবু এই সৃষ্টিতে আনন্দ নেই। ফ্রয়েডের সেই শিশ্নকামনাই উচ্চকিত হয়ে ওঠে। হৈমর মনোজাগতিক জটিলতার এও এক সূত্র।

শুধু সন্তান কামনাতেই নয়, হৈমর উপন্যাস রচনাসূত্রে অমিয়ভূষণ তার স্বস্তি খুঁজে ফেরা পুরনো জীবনে ফিরে গেছে–যে জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে মোতিদি। সম্পর্ক জটিলতার আরেকটি প্রান্ত উন্মোচিত হয় উপন্যাসে। হৈমর ভাবনাজগতের অনুরণন:

> সে যেন স্থির করে ফেলেছিল, কৃত্রিম শব্দটাই মোতিদির তৈরি। কিন্তু আসলে তা তো নয়। হৈমন্তী বেশ ভালভাবেই জানে, কৃ ধাতুতে প্রত্যয় ক্তি করে সেই কবে কোন যুগে, খৃষ্ট জন্মেরও আগে, কোন পণ্ডিত তৈরী করেছিল, তার বিধানেই শেষের ম-টা আসে, কিন্তু মোতিদি যেন বলেছিল: নরনারীর অসমপ্রেমও কৃত্রিম। দুটো শরীর দগ্ধ হয়, তার ফলে উত্তাপ আর অঙ্গার ছাড়া যদি ক্ষণিক আলো জ্বলে তবে তাইতো প্রেম আর তা নিয়েই কাব্য।...কাল রাতে মোতিদির চিঠি এসেছে। নিজে হাতে করে এনেছে সে। কিন্তু আর এক রাত হতে চললো, এখনও খোলা হয়নি। একি অদ্ভুত ভুলে যাওয়া! গভীর অনিচ্ছাতেই কি এমন ভুল হয়েছে?...দেখাই যাচ্ছে, সে মোতিদিকে অবহেলা করছে।...সে যে এমএ এবং ল পাশ করেছে, ছবি আঁকতে জানে, উপন্যাস লিখতে সাহস করেছে–এসবই মতিদির অনুপ্রেরণায়, উৎসাহে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২০৩-২০৪)

হৈমন্তীর জীবনে এক নারীর প্রগাঢ় অনুপ্রেরণার নাম মোতিদি। মোতিদির কাছে নরনারীর প্রেম অসম। তাহলে কি নারীতে নারীতে প্রেম তার কাছে সমপ্রেম? সমকামিতার এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়ে যায় এখানে। এবং এই সমপ্রেম আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফলা, ব্যর্থ। কেননা সে প্রেম কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা; সৃষ্টি করার তৃষ্ণা হৈমন্তী তাই মেটায় সাহিত্য রচনায়, চিত্রকর্মে। সাহিত্যকর্ম বিবিক্ত এই নারীর পলায়নপরতার আশ্রয়। অমিয়ভূষণ তাঁর 'লিখনে কী ঘটে' প্রবন্ধে কিংবা *বিলাস বিনয় বন্দনা* এবং *বিবিক্তা* উপন্যাসেও ব্যক্তির এই পলায়নপরতার কথা উচ্চারণ করেন:

> ভায়োলেন্ট, কদর্য, পুরুষশাসিত এই পৃথিবী থেকে মানুষের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সমকাম একটা সাময়িক আশ্রয় হতে পারে, কেননা তা কোনো সময় ভায়োলেন্ট নয়, কখনো অধিকার ফলায় না, তা যেন ইনটেলেকটের সাধর্ম্য থেকে জন্মায়; তার সৃষ্টি, কদর্যতার নতুন বাহন মানুষ–শিশু না হয়ে কাব্য, চিত্রসঙ্গীতের মত অবিনশ্বর সম্পদ। হতে পাওে, এ আশ্রয় চিরস্থায়ী নয়, কেউ হয়তো পালায় দিশেহারা হয়ে, কিন্তু তার কারণ যেন এই যে কোনো স্বর্গই চিরস্থায়ী হবে না এই মানুষের ভাগ্য। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২০৬-২০৭)

হৈমন্তী আর মোতিদিও সাময়িক আশ্রয় হিসেবে সমকামকে ভাগ্য হিসেবে বেছে নেয়। হৈম আর মোতির এই প্রেমের খুব সূক্ষ্ম ছায়াপাত ঘটিয়েছেন লেখক উপন্যাসে। মোতিদির ফ্রেমবন্দি নগ্নপ্রায় ছবিই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্তর্পণে প্রকাশ করে:

> ...ছবিটা মেঝেতে দেওয়ালের দিকে মুখ করে রাখা।...ফ্রেমে, ক্যানভাসে কেমন ধুলো দেখছ না! দেয়ালে না টাঙিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে রাখার কারণ তো এই যে এঘরে মক্কেলরা আসে যাদের সামনে নুড ছবিটা মেলে ধরা যায় না।...এটা ঠিক নুড নয়, শায়িতা এক মহিলার ছবি যার পরনে মসলিন।...ছবিটা গোইয়ার বিখ্যাত ছবি নিরাবরণা মাজার অনুকরণে আঁকা।...ছবিটার মডেল মোতিদি। প্রায় এক মাস ধরে ছবিটাকে এঁকেছিল হৈমন্তী এম এ পরীক্ষার পরে। সেই লম্বা টানা দুপুর এবং বিকেল ধরে ছবি আঁকা চলতো।...মোতিদির গড়নের সৌন্দর্য ফুটে আছে বৈকি। হৈমন্তী অস্বীকার করবে কি করে মোতিদির সেই সোনালি রঙের শরীর সে উপাসনার দৃষ্টিতে দেখেছিল। আর তখন মোতিদির চোখ দুটি ভরা তৃপ্তির মাধুর্য। ছবিটাই প্রমাণ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২০৪-২০৫)

অন্য আরেকটি ছবিতেও প্রায় নুড্ মোতিদির শারীরিক সৌন্দর্যে হৈমর বিভোর মুগ্ধতা উপলব্ধি করা যায়:

> ...সে হাসি ভুবনমোহিনী। কাঁচুলিভ্রষ্ট, ঈষৎ ম্রিয়মান সেই বুক ভুবনমোহিনী। কলকাতার একজিবিশনে দেখানো হয়নি, কারণ মোতিদির ছাত্রীদের কিংবা সহকর্মিনীদের কারো চোখে তা পড়ার সম্ভাবনা ছিল,...মোতিদির গায়ের রং এ ছবিটায় ক্রোম ইওলো, চুল প্রুশিয়ান ব্লু। মোতিদি...ছবি শেষ হলে বলেছিল: তোমার ওয়াটার বেশী উজ্জ্বল আর স্বচ্ছ ওয়েলের চাইতে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২০৫)

চিত্রকর্মের এই নারীর প্রতি মুগ্ধতা সহজ স্বাভাবিক নয়। এই সম্পর্ক আরও বেশি উন্মুক্ত হৈমন্তীর লেখা উপন্যাসে। সেখানে রূপ পেয়েছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই নারী; এদের একজন ছাত্রী, অন্যজন অধ্যাপিকা–তাদের নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, পারস্পরিক মুগ্ধতা কিংবা বিবিক্ত হবার যন্ত্রণাকাতর কথকতা। উপন্যাসে পোস্টমাস্টার হৈমন্তীর উপন্যাস সম্পর্কে যে মনোভঙ্গি ব্যক্ত করেন, সেখানে ক্ষয়িষ্ণু কালের অভিঘাতে বিবিক্ত নরনারীর সংকট উচ্চকিত। তিনি উপলব্ধি করেন:

> একটা উপন্যাস লেখার ইসথেটিক উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে দুটি চরিত্র। দুইটি নারী চরিত্র, একজন ছাব্বিশ সাতাশ বছরের অধ্যাপিকা, অন্যজন তার বাইশ তেইশ বছরের ছাত্রী। উপন্যাসে তারাই কেন্দ্রীয় চরিত্র।...দুজনেই জনসমাজ থেকে বিবিক্ত, অ্যালিয়েনেটেড।...পারিবারিক জীবনের বন্ধন শিথিল, ভালবাসার বদলে রুগ্ন আসক্তি এবং ইনসেস্টের আভাস। সামাজিক জীবনে ক্ষুধা, অপুষ্টি, মিথ্যাচার, তুচ্ছতা, নীচতা, এক নিদারুণ কাপুরুষতা–যেমন একটি যুবককে চোর এই অপবাদ দিয়ে দিনে দুপুরে কলকাতার রাজপথে তিন ঘন্টা ধরে পঞ্চাশজন মিলে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা। পথচারীরা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ভীত, উদাসীন, অথবা নিজের দৈনন্দিন স্বার্থের চিন্তায় মগ্ন।...যেমন, বেকার মেয়েকে চাকরি দেয়ার আশ্বাস দিয়ে কোন চামচা তাকে এমএল এর ঘরে রাত কাটাতে বাধ্য করছে।...এমন সব ঘটনা গেঁথে গেঁথে এমন এক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে উপন্যাসে যে সেই ভায়োলেন্ট, নীতিবর্জিত, কদাচারী পরিবেশের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তখন মানুষ নিঃসঙ্গ, অসম্পৃক্ত, বিবিক্ত হয়। সেই তরুণী অধ্যাপিকাকে এই অসম্পৃক্ততা প্রায় স্কিৎসোফ্রেনিক করে তুলেছে। ছাত্রীটিরও যেন ক্লস্ট্রোফবিয়া হতে চলেছে। এদের চারিপাশে কিন্তু ক্রমশ দূরে দূরে সরে যে পুরুষ চরিত্র, যে পুরুষ-

> গোষ্ঠীগুলো, যে পুরুষ জনতা দেখা দিচ্ছে তারা পরিবেশের সিম্বল ও বাহন। একদিন সেই ছাত্রী এক অস্তিত্বহীন বোমা বিস্ফোরণকারী শোভাযাত্রার অমূলক ভয়ে অধ্যাপিকার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সেখানে তারা ক্রমশ পরস্পরকে ভালবেসে ফেলল। সমকামী ভালবাসা। দুই সুন্দর তরুণ নারীদেহ যেন দুটি আলোর মত, দুটি নদীর সঙ্গমের মত মিলিত হতে থাকে। এই সমকামী প্রেম যেন বিবিক্ততার ওষুধ হতে পারে। প্রেম ও উপন্যাস রচনা চলতে থাকে। সেই উপন্যাসের বিষয়ও প্রেমেরই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভরা ইতিহাস। রক্তাক্ত হিংস্র পুরুষ প্রভাবিত পৃথিবী থেকে দূরে দুটি মেয়ের বেঁচে থাকার সুখ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া; উদ্দেশ্য, একটি উপন্যাস লেখার নান্দনিক আনন্দ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২০৫-২০৬)

অমিয়ভূষণ বলতে চান, সমকালের ক্ষয়িষ্ণু ভালোবাসাহীন অনৈতিক মানুষের তুচ্ছতাবোধ মিথ্যাচার নীচতা ও কাপুরুষতায় ক্লান্ত দুই ভিন্ন পটের নারী সমকামিতাকে আশ্রয় ভেবেছে। অনৈতিক জীবনাভিজ্ঞতা আর সমকালীন বৈরি পারিপার্শ্বিকতার গাঢ় অভিঘাত হৈমন্তীকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে। ফলে, কৃত্রিম পুরুষশাসিত সমাজের অসুস্থতা ও অপুষ্টি মোতি আর হৈমকে সমকামী সম্পর্কে যুক্ত করে। ভায়োলেন্ট এই পৃথিবীতে সমকামিতা হয়ে ওঠে স্বস্তির প্রতীক। তবু এরই মধ্য দিয়ে সমকামী সম্পর্কের অভ্যস্ততায় আসে অবসাদ ও অতৃপ্তি। শেষপর্যন্ত অতৃপ্তিজাত পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতায় আভাসিত হয় মোতিদি আর হৈমন্তী সেনের জীবন সংকট। তাই হৈমর মোতিদিকে ভোলার চেষ্টা, তাকে উপেক্ষা করা! অমিয়ভূষণের উপলব্ধি: '...কোনো স্বর্গই চিরস্থায়ী হবে না–এই মানুষের ভাগ্য' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২০৭)। কেননা, এসডিএমও-র স্ত্রী হয়েও আফসোস কাটে না হৈমর। সে সম্পর্কও সাদা সেলোফেনে মোড়া কমলালেবুর মত কৃত্রিম। মাঝে মাঝেই তাই হৈমর উপলব্ধি, '...মোতিদির ফ্ল্যাটের মত ততটা আশ্রয় পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা আর' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২১৩)। মূলত, মধ্যবিত্ত এইসব মানুষের যাপিত জীবন কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা। এমনকি মোতিদিকে হৈমর লেখা চিঠিতেও এই কৃত্রিমতা বিষয়ক ভাবনার প্রকাশ লক্ষণীয়:

> মেয়েরা কি ইসথেটিক অনুভূতির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে সত্যি সত্যি? বোধহয় আমাদের সেই ফ্ল্যাটের বাইরে সে অনুভূতি পাওয়া যায়না।...সে অনুভূতি যদি আদৌ আসে, ভেবে দেখা দরকার, তা অন্য কারো অনুকরণ করে কিনা।...আমেরিকা থেকে সেলোফেনে সান্ কিস্ড অরেঞ্জ আসে। পৃথিবীকে যদি ওই কমলার সঙ্গে তুলনা করা যায়? কেউ কেউ ভাবে সেলোফেনের ঔজ্জ্বল্য এই সভ্যতা সরিয়ে ফেলে স্বাদু সেই কমলাকে পাওয়া যায়। কিন্তু সব সময়েই এই ভয় থাকে সেলোফেনের মোড়ক সরালে যা চেহারা বেরোবে তাও হয়ত কৃত্রিম। আর তখন কি আবার বিবিক্ত মানুষের মিছিল চলবে? তোমার আমার কল্পনার সেই কাচ ঘরের বাইরে এই পৃথিবী অদ্ভুত। অদ্ভুত! কি করি মোতিদি? (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২১৩-২১৪)

সেলোফেন এখানে কৃত্রিম সভ্যতার প্রতীক। যদিও সভ্যতারূপ কৃত্রিম সেলোফেন সরালেও আদি ও অকৃত্রিম পৃথিবী মেলে না। একের পর এক কৃত্রিমতার সম্মুখীন হতে হতে মানুষ একসময় বিবিক্ত হবার খাতাতেই নাম লেখায়। হৈমন্তীকে বার বারই হোঁচট খেতে হয়েছে, ফিরতে হয়েছে তাকে বিবিক্তার পরিচয়ে। আসলে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অনিকেত মানুষ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের ভেতর নিজে শূন্যতা অনুভব করে। বিশ্বসাহিত্যেও এর প্রকাশ ঘটেছে। *বিবিক্তা*ও এমন এক উপন্যাস যেখানে বর্তমান সভ্যতার কৃত্রিমতার ক্লান্তি অনিকেত করে তোলে এক নারীকে।

শুধু মোতিদি আর হৈমন্তীর পারস্পরিক সম্পর্কই কৃত্রিম নয়, হৈম আর তার স্বামী এসডিএমও-র সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই একই কৃত্রিমতা। শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হৈমর স্বামীকে কামোত্তেজক অ্যাম্পুল ব্যবহার করতে হয়। অন্যদিকে, একদা ইউনিভার্সিটিপড়ুয়া কৌশিক কিংবা কৃশানু–যারা সভ্যতাবিরোধী কিংবা কৃত্রিম-অনুকরণবাদের বিরোধিতা করেছিল, তাদেরই একজন কৃশানুর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে হৈমন্তীকে স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রচনায় কৃত্রিম ছলনার শরণ নিতে হয়। *বিবিক্তা* উপন্যাসে যে-কটি পারস্পরিক সম্পর্ক রচিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের যাপিত জীবনে কৃত্রিমতার অনুরণন টের পাওয়া যায়। বিশেষ করে কৃত্রিম জীবন যাপনে হৈমর মনোযন্ত্রণা আর জীবনজটিলতার প্রতীকী প্রকাশ এই উপন্যাসে বার বার ঘটেছে:

> সন্ধ্যা নেমে আসছে, অথচ ঘরে আলো জ্বালা হয়নি, সেই সুযোগে,...অন্ধকার যেন ধোঁয়ার মত পাকাচ্ছে ঘরগুলোর কোণে কোণে, হঠাৎ হৈমন্তী বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল। দু হাতের তেলোয় মুখ লুকাল। এতদিনের এত মিথ্যাচার এক এক করে মনে পড়ল তার। অনুকে নিয়ে, ওষুধের দোকানদারদের নিয়ে, এমনকি নিজের হাসিকে নিয়ে যত মিথ্যাচার সে করেছে। আর বারবার জঘন্য কুৎসিতভাবে শেষ মিথ্যাচারটাকে মনে পড়ছে! কাউকে কি বলা যায়? নিজের হাতের তেলোতে মুখ ঢেকেও যা উচ্চারণ করা যায় না, তাই সে করেছে–নিজের স্বামীর কাছে সে কাল, নিজের শরীরটাকে বেশ্যার মত কাজে লাগিয়েছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২২৯)

সমালোচক ইমতিয়ার শামীম মন্তব্য করেন:

> অমিয়ভূষণের হৈমন্তী সরলতার নিরুপায়তা অতিক্রম করতে গিয়ে ক্রমাবধী জটিল যৌগিকত্বে সজ্জিত হতে হতে হাল না ছেড়েও বিবিক্ত হয়ে পড়ে।...অমিয়ভূষণ এভাবেই নির্মাণ করেন এক একাকী নারী, যার একাকিত্ব তুচ্ছ সাংসারিক, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জটিলতার মধ্যে দিয়ে উদ্ভূত হয় না–উদ্ভূত হয় সচেতন ও স্বাধীন নারীর অন্তর্গত রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে। অমিয়ভূষণ নারীকে মুক্ত করেন ব্যবহৃত যৌনতা ও কামজ দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক আবরণযুক্ত খেলো হাস্যকর নারীবাদী কেচ্ছা থেকে। আমরা এ কথাও জানতে পারি, স্বাধীন মানুষের সমস্ত শর্ত অর্জনের পরও কোনও নারী নিজের অজান্তেই জীববিদ্যার অমোঘ নিয়মে শরীরকে কাজে লাগাতে পারে–পরবর্তী সময়ে যা উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে তার বিবিক্ততা আরও বাড়ে। (ইমতিয়ার, ২০১২: ৮৫-৮৬)

সমকালীন কৃত্রিম এই সভ্যতার আধারে রচিত মানবিক সম্পর্কও অন্তঃসারশূন্য। জীবন প্রায় সর্বত্রই স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবলম্বন করে কৌশল। অমিয়ভূষণ রচিত হৈমর অনিকেত নিরাশ্রয়ী ব্যাকুলতা উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে তার উচ্চারিত প্রশ্নে: 'এই মিথ্যাচার যা মানুষকে বিবিক্ত করে, এই কপট সভ্যতা যা মানুষকে নিরাশ্রয় উদ্বাস্তু করে, এ থেকে পরিত্রাণের আর কিছু পথ আছে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২২৯)। সমকামিতার মত অধিকারবোধহীন সম্পর্কেও তাই একসময় অভ্যস্ততার বিরক্তি জন্মে; মোতিদি তাই বন্দি থাকে ক্যানভাসেই। এ জীবন থেকে মুক্তি মিললেও সম্পর্কের কৃত্রিমতা থেকে স্বস্তি মেলে না হৈমন্তীর। মুক্তির পথ খোঁজে সে।

বিবিক্তা-র কৃশানু চরিত্র নকশাল আন্দোলনের এবং কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়ে উপন্যাসে সমকালকে অস্তিত্ববান করে তোলে। পুরো উপন্যাস জুড়ে একটি ক্ষতাক্ত কালের কথকতা উঠে আসে। তবে বহিরাঙ্গিক সময়কাঠামো নির্মাণে লেখক সুনির্দিষ্ট সময়কালের উল্লেখ না করে কয়েকটি অনুষঙ্গ

ব্যবহার করেন। নকশাল আন্দোলনের আভাস, আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক আদল এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ উপন্যাসের সময়কাঠামোর নির্মাতা। শুরুতেই বন্ধকে কেন্দ্র করে যে মৃত্যুর মিছিল শহরজুড়ে আলোড়নের জন্ম দেয়, সেটি নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক। লেখক স্পষ্টভাবে নকশাল আন্দোলনের কথা না বললেও জোতদার এক্সট্রিমিস্ট এর দ্বন্দ্ব এবং কৃশানু কৌশিকদের স্বপ্নচরিতার্থের আন্দোলন থেকে বিষয়টি অনুমান করা যাবে। তবে অমিয়ভূষণ নকশালদের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপরেখা আঁকতে চাননি। এ উপন্যাসে সঙ্গীসহ পোস্টমাস্টার চরিত্র আসলে লেখকের নিজেরই প্রতিচ্ছবি। *বিবিক্তার* কাহিনিকে সংক্ষেপ এবং এর থিমে মনোযোগ দেবার জন্যই লেখককে কোরাসের একজন হিসেবে কাহিনিতে ঢুকতে হয়। উপন্যাস রচনাকালের নোটে লেখকের কাহিনিতে ঢুকে-পড়া বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

> কোরাস হিসেবে ঢুকে পড়াটা গল্পটাকে সংক্ষেপ করার জন্য। না হলে আমার মনে হয়েছিল গাঢ় ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যাবে। ডাইলিউট করে নকশাল ছেলেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস হয়ে যাবে। কিন্তু তা তো আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে–দে আসপায়ার্ড ফর সামথিং গ্রেট। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ৫৪৬)

নকশাল আন্দোলনের কালপর্ব মোটামুটিভাবে ১৯৬৭ থেকে শুরু করে ১৯৮৩ সন পর্যন্ত। 'নকশাল আন্দোলনের ছাত্র ও যুবকেরা চেয়েছিলেন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কৃষক জীবনের শরিক হতে।...এঁদের প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত করে সমগ্র ভারতে কৃষি বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটানো' (বিপ্লব, ২০০৮: ৩৯৭-৩৯৯)। সামন্ত প্রথা থেকে কৃষকদের মুক্তির স্বপ্ন দেখা নকশাল আন্দোলনের বিপ্লবীদেরই একজন কৃশানু কিংবা কৌশিক। হৈমন্তী বিশ্বাস করে এরাই কৃত্রিম সভ্যতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে পারে। এসডিও কিংবা হৈমন্তী বিশ্বাস করত কৌশিক বা কৃশানুরা 'এই সভ্যতার চাইতে নতুন একরকম সভ্যতার কথা বলত। যেন সেলোফেনের মোড়ক সরিয়ে তারা কমলালেবুটাকে ছুঁতে পারবে।...' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৯২)। হৈমন্তী তাই মোতিদি কিংবা স্বামীর সঙ্গে যাপিত জীবনের খোঁয়ারি কাটিয়ে উঠতে এইসব বিপ্লবীদের ভেতর মুক্তিকে অবলোকন করতে চেয়েছে। হাসপাতাল থেকে পালানো কৃশানু কিংবা কৌশিককে স্বামীর চোখ এড়িয়ে আশ্রয় দেবার মধ্য দিয়ে নতুন করে আরেকবার মুক্তিকে আলিঙ্গন করতে চায় সে। কিন্তু যেহেতু 'কোন স্বর্গ-ই চিরস্থায়ী হবে না–এই মানুষের ভাগ্য,' সে কারণেই এই বিপ্লবের মধ্যকার অন্তর্কলহ, ভাঙন আর ব্যর্থতাবোধ হৈমন্তীর সামনে এসে দাঁড়ায়। কৌশিক বা কৃশানুর ডায়েরিতে পাওয়া যায় নকশাল আন্দোলন এবং পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ। বিপ্লবীদের বিবিক্ত ও ভারসাম্যহীন অন্তর্কলহ হৈমন্তীর শেষ মানসিক আশ্রয়টুকু যেন কেড়ে নেয়। পালানোর সময় মৃত কৃশানুর শরীরে হৈমন্তীর পোশাক নতুন এক স্ক্যান্ডালের জন্ম দেয়। পুরনো বন্ধু কি এই নারীর প্রেমিক?–এই জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে লেখক এক আচ্ছাদিত গল্পের পট উন্মোচন করেন। কৌশিক কিংবা কৃশানুর সাথে হৈমর পূর্ব প্রেমের আভাস উপন্যাসে সঙ্কেতিত হয়ে যায়। আর খুব সূক্ষ্ম প্রতীকের মধ্য দিয়ে এসডিও ভূপাল বসুর সাথে হৈমন্তীর ক্ষণিক মানসপ্রণয় চিহ্নিত করেন লেখক। নিঃসঙ্গ একাকী বিবিক্ত হৈমন্তী একালের জীবনযন্ত্রণা থেকে ক্ষণিক মুক্তির জন্যেই এই মানসপ্রণয়ের দিকে এগিয়ে যায়। তবে তাও ক্ষণিক অবকাশ মাত্র। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে উপন্যাসের বহিরাঙ্গিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সময়ের অন্তর্বুনন লক্ষ করা যাবে। উপন্যাসটিতে নরনারীর মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ উন্মোচনে লেখক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক সময়ধারণা ব্যবহার করেছেন। পোস্টমাস্টারের চেতনাজগতে আলোড়িত নানা

ভাবনা বিচিত্রমাত্রিক ঘটনাবলির পাশাপাশি বিচিত্র সময়ের ধারক। বৈরি সময়-সভ্যতার নেতিবাচক ছবি সেই ভাবনারাশিতে ছায়াপাত ঘটায়। এছাড়াও এসডিও ভূপাল বসু কিংবা হৈমন্তীর চেতনাগত প্রবহমানতাও এক মনস্তাত্ত্বিক সময়কাঠামোই নির্মাণ করে। ভূপাল বসুর অতীতচারিতায় হৈমন্তীর ইউনিভার্সিটি জীবন উঠে আসে উপন্যাসে। চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস না হলেও অতীতচারিতা এ উপন্যাসের এক অন্যতম দিক।

উপন্যাসের একেবারে শেষে লেখক হৈমন্তীর সঙ্গে ভার্জিনিয়া উলফের বিবিক্ত সত্তার সাযুজ্য টানেনে। ভার্জিনিয়ার সমকামী সম্পর্ক, সাহিত্য সৃজনের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ অনুসন্ধান এবং আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে তার বিলীয়মান সত্তার আর্তিতে হৈমন্তীর অবয়ব পরিস্ফুট। জলের ধারে হৈমন্তীকে দেখে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র অমিয়ভূষণের প্রতিসত্তা পোস্টমাস্টারের ভাবনায় এই সাযুজ্য আরও স্পষ্ট হয়:

> ভার্জিনিয়া উলফের ইতিহাসটা মনে পড়ল পোস্টমাস্টারের। জলের ধারে তার লাঠি, আর বোধহয়, জুতো পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল একদিন। যতদূর সম্ভব মনে প'ড়ে তাকে পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলে আত্মহত্যা হ'তে পারে। না, সবটুকু অনুকরণ করা ভাল নয়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২১৭)

ভার্জিনিয়ার উপন্যাসে প্রতিফলিত তার প্রগাঢ় নিঃসঙ্গ ব্যক্তিজীবনের মতই হৈমন্তীর যাপিত জীবনের সম্পর্ক জটিলতার প্রচ্ছন্ন ছায়াপাত ঘটেছে তার রচিত উপন্যাসে। এসডিপিও ভাবে, 'হৈমন্তী উপন্যাস লিখতে পারে। তাতে বিবিক্ততা, তাতে ক্লস্ট্রোফোবিয়া, সিজোফ্রেনিয়ার ছবি এঁকেছে।...নিরর্থক ভণ্ড ভায়োলেন্স যে বিবিক্ততার একটা লক্ষণ হ'তে পারে তা দেখাতে পেরেছে উপন্যাস' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২২৬-২২৭)। বার বার সম্পর্কের ভেতরকার কৃত্রিম-কুৎসিত অভ্যস্ততা এই নারীকে বিবিক্তজন করে তোলে, যা তাকে একসময় আত্মহত্যার দিকে প্ররোচিত করে। আধুনিক কালের অন্তঃসারশূন্য সম্পর্কজটিলতা শেষপর্যন্ত তাকে অস্তিত্বসংকটেই পতিত করে। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেন:

> 'বিবিক্তা' উপন্যাস বুদ্ধিজীবী উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের অসাড়তা, মিথ্যাচারের কথাকাব্য। যে জীবন কাঙ্ক্ষিত নয় তা থেকে চেষ্টা করেও সরে যাওয়া সম্ভব নয়। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা নিয়ে জীবনে ফিরে আসতে হয়।...হৈমন্তী পৃথিবীর কৃত্রিম পঙ্গু সমাজটার কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু হয় না। শূন্যতার পৃথিবী গ্রাস করে ফেলে তাকে, বিপ্লবী কৃশানু মারা গেলে প্রত্যাশারও অপমৃত্যু ঘটে। নিঃসঙ্গ, একাকী হৈমন্তী বিবিক্ত হয়ে যায়। (রমাপ্রসাদ, ২০০১: ৩৮)

এভাবেই সৃজনশীল মানবাত্মার প্রতীক হৈমন্তী পরাজিত হয়। কৃত্রিম-কুৎসিত সভ্যতার করাল গ্রাসের মুখোমুখি প্রেমহীন নিঃসঙ্গ হৈমন্তী এসডিও-র বাংলোয় বসে ব্যাকুল গলায় উচ্চারণ করে: 'কিছুই কি নেই? কিছুই কি নেই?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২১৩)। স্বামী-সংসার-সন্তান ও অনুকূল সামাজিক পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশের "আট বছর আগের একদিন" কবিতার নায়কের জোছনায় ভূত দেখার মতই হৈমন্তী নিমজ্জিত হয় সর্বব্যাপী নিঃসঙ্গতায়। ব্যাকুল কণ্ঠে তার জিজ্ঞাসা এসডিও কে, 'এই মিথ্যাচার যা মানুষকে বিবিক্ত করে, এই কপট সভ্যতা যা মানুষকে নিরাশ্রয় উদ্বাস্তু করে, এ থেকে পরিত্রাণের আর কিছু পথ আছে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২২৯)। কল্পনার কাচঘরের বাইরের বাস্তব পৃথিবী সত্যি অদ্ভুত।

বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী

একইসঙ্গে জীবনের অমৃত ও গরল পান করে শেষপর্যন্ত টিকে থাকার লড়াইয়ে অপরাজেয় অমিয়ভূষণের *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী* (১৯৯৭) উপন্যাসের কিশোরী নায়িকা তরু। যদিও পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে ওঠেনি, তবু পিতার সঙ্গে তরুর মনোদৈহিক সম্পর্কজটিলতা তাকে নিয়ে গেছে জীবনের নতুন অবস্থানে। জীবনের প্রয়োজনে বয়সের তুলনায় তাকে অনেক বেশি মাত্রায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে হয়। অমিয়ভূষণের তরুর কাছে জীবনের সংজ্ঞার্থ ভিন্ন।

উপন্যাসে যে জীবন তরু যাপন করেছে। নৈতিক মানদণ্ডে তাকে কখনই বিচার করা যাবে না। সমালোচক অর্ণব সেন মন্তব্য করেন:

> ...'বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী' উপন্যাসে (শারদীয় যুগান্তর ১৩৯১) আমাদের চেনাশোনা পৃথিবীর বিপরীতে এক বিদ্রোহী নারীকে প্রতিষ্ঠিত করেন লেখক।...সমাজনীতি বহির্ভূত প্রণয়সম্পর্ক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-জগদীশ গুপ্ত ইত্যাদির পরেও আমরা পেয়েছি। তবে ঠিক এই জাতীয় দুঃসাহস চোখে পড়েনি। অগম্য গমনের ঘটনা ইতিহাস-পুরাণ-গ্রীক উপাখ্যান ইত্যাদিতে থাকলেও প্রবল বাস্তব এই পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে। (অর্ণব, ২০০১: ৪৩)

প্রবলভাবে অস্তিত্ববান হারান দাস আর তার কন্যা তরুর মনোদৈহিক জটিল সম্পর্কের মনস্তত্ত্বই উপন্যাসের মূল আকর্ষণ। পিতাকেন্দ্রিক তরুর অজাচারিতা নাকি তথাকথিত নৈতিকতার দণ্ডধারী ব্যক্তির অন্তরালের অপকর্ম পাপ বলে চিহ্নিত হবে–উপন্যাসে অমিয়ভূষণ এ প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। হারান দাস কিংবা তরু দাসের ক্রমপরাজিত, ক্রমনিঃসঙ্গ এবং ক্রমপ্রান্তিক অস্তিত্বের আদল থেকে মূলত কালের অভিঘাতটিই উপলব্ধি করা যাবে। তরুর পিতা হারান দাসের বামপন্থী দল কিংবা ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টিতে, অথবা, বিপরীতে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা চাঁদের কাকার মত স্বার্থান্বেষী, বিদ্বেষময়, কূটবুদ্ধিসংবলিত অনৈতিক মানুষগুলোর নেতিবাচক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া আধুনিক সভ্যতার বৈরি সময়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। উপন্যাসে লেখক সময়কে কোন নির্দিষ্ট কালজ্ঞাপক শব্দে চিহ্নিত করেননি। বরং অনির্দিষ্ট সময়বিন্যাসের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিকাল এগিয়ে গেছে। অনির্দিষ্টব্যঞ্জক কালচিহ্নিত শব্দ ব্যবহারে কোন সনের ব্যবহার না করলেও লেখক ডিসেম্বর, জানুয়ারি, এপ্রিল, মে–মাসগুলোর নাম উপন্যাসে ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তরুর সদ্যকৈশোরক কিংবা ক্রমবিকশিত নারীত্বের ধাপগুলো উপলব্ধি করাবার জন্য লেখক মাস থেকে মাসে সময়কে বিশ্লিষ্ট করে বিন্যস্ত করেন। বহিরাঙ্গিক সময়ের তুলনায় উপন্যাসটিতে মনস্তাত্ত্বিক সময়ের ব্যবহার বেশি। কারণ, উপন্যাসে অন্তর্কথনরত তরুর (ইনটেরিয়র মনোলগ) চেতনাজগত বার বার অতীত-বর্তমানের দোলাচলে তরঙ্গায়িত। তরুর চেতনার গতি ধারণে লেখক তাই কোথাও কোথাও চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার ঘটান:

> ট্রাকটা চলে গেলে, ঘরেরদিকে ফিরতে ফিরতে কে যেন তাকে মনে করিয়ে দিল, এটা কিন্তু বোয়িং নয়। ...সেটা তো সেই ইনফ্যান্ট ক্লাসের। সে বলেছিল, আমার বাবা এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক এসব চালাতে পারে। তা নিয়ে ঝগড়া হাতাহাতি। দিদিমনি সব শুনে বলেছিল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলেছো', তরু। দেয়ালের দিকে মুখ

করে দাঁড়িয়ে থাকো।' কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল তরু; সে জানে সত্য নয়, তা হলেও দেয়ালের দিকে মুখ রেখে এক ঘন্টা দাঁড়ালে, এক ঘন্টা চাপা কান্না কাঁদলে, আর সেই দেয়ালে যদি একটা মাকড়সা ভয় দেখায়,...সে তার ভাইয়ের ছোট্ট একটা হাত নিজের মুখে বুলিয়ে নিল।

কিন্তু বারান্দায় রোদ পড়ল। তার ফলেই টবটাও চকচক করল। টব না জার? সে রকম গড়ন। ফাটল ধরা, কানা ভাঙা, একদিকের হাতলটাই আছে, তরু ঢোক গিলল। তার পিঠের দিকটা মারের ভয়ে কুঁচকে এল। সে বেশ স্পষ্টই শুনতে পেল : বাপ এনে ময়লা ঢালল শহরের, আর উনি ইল্লত কুড়িয়ে ঘরে তুললেন।

ট্রাক থেকে আবর্জনা ঢাললে ডোমপাড়ার ছেলেমেয়েরা তা থেকে কুড়ায়। এখন সে বোঝে, তাদের দেখাদেখি সে রকম করা তার উচিত হয়নি।...

সেদিন মারগুলো বাবাই পিঠ পেতে নিয়েছিল।...

ফাটল ধার, কানা ভাঙা, বে-হাতল, কিন্তু রোদে জলে পড়ে থেকে হলুদ চীনামাটি কেমন উজ্জ্বল। আর গায়ের লাল আর আশমানিতে আঁকা ফুলের তোড়াটা! নাকি অ্যামফোরা-চাঁদ বলেছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ১৭-১৮)

তরুর ভাবনায় অতীত-বর্তমান একাকার এখানে। তরুর বেদনা, নিম্নশ্রেণির একজন হবার যন্ত্রণা আর মায়ের অহমবোধ চেতনার অন্তর্লীন আলোড়নে একের পর এক উঠে আসে উপন্যাসে।

প্রতিকূল সময়ের অন্তর্ঘাতে ক্রমপরাজিত এবং একসময়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ক্ষয়প্রাপ্ত অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে হারান দাসের মত প্রান্তিক মানুষ। যদিও এর বিপরীতে তরু এক অপরাহত সত্তা। সময়ের অভিঘাতস্পৃষ্ট হয়েও সে মুক্ত। কালের করাল নখর যদিও তাকে ক্ষতাক্ত করেছে, সমাজের কাছে হতে হয়েছে ভীষণভাবে অপমানিত, তারপরেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার লড়াইয়ে সে অপরাজিত। আধুনিক বিবিক্ত নেতিবাচক এক সময়পটে প্রতিস্থাপিত তরু, হারান আর চাঁদের মনোজাগতিক টানাপড়েন-নিঃসঙ্গতা আর ক্রমসংকটে পতিত অস্তিত্বের রূপাবয়ব রচিত হয়েছে উপন্যাসে।

ফেনিয়ে-ওঠা পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষমতাধর মানুষগুলোর ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারে উপন্যাসে কোণঠাসা হারান দাসের ক্রমপরাজিত নিঃসঙ্গ সত্তা। ক্রমে প্রান্তিকতম হয়ে ওঠা পিতার জীবন থেকে মায়ের আকস্মিক অন্তর্ধানের শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে গিয়ে কন্যা তরুলতা দাসের মনোদৈহিক রূপান্তর নির্মাণ করেছে এ উপন্যাসের সম্পর্কজটিলতা। উপন্যাসের শুরুতে হারান ও তার সদ্যোজাত সন্তানের অভাব পূরণে তরুর ভূমিকা একপাক্ষিক হলেও, ঘটনার ক্রমঅগ্রসরমানতায় তরুর ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মায়ের সংসারকেন্দ্রিক সমগ্র দায়-দায়িত্বের ভার আরোপিত হয়। তরু হয়ে ওঠে মায়ের প্রতিরূপ। কন্যা জায়া জননী–এই ত্রিরূপের সংমিশ্রণেই পরিণত হয় কিশোরী তরু; মাত্র একবারের স্বেচ্ছা মিলনে পিতার ঔরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ করে হারানের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে ওঠে সে। এক অদ্ভুত অজাচারী সম্পর্কের দায়ভার উপন্যাসটিতে জটিলতার জন্ম দেয়। সমালোচক গৌতম রায় একারণেই এই উপন্যাসকে বলেছেন 'আধুনিক অয়দিপাউসের কাহিনি' (গৌতম, ২০০৩: ৫৭)। পিতা ও কন্যার এই জটিল যৌনসম্পর্ক বিশ্লেষণে অমিয়ভূষণের যৌনভাবনা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী উপন্যাসটি অমিয়ভূষণ সুমিতা চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেন। সুমিতা চক্রবর্তী 'বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী: অনলদহিত জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই উপন্যাস সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেন তার উত্তরে লেখক সুমিতা চক্রবর্তীকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির ভেতরেই এই উপন্যাস সম্পর্কিত লেখকের ভাবনা-বীজ অঙ্কুরিত:

> ...আপনি যার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন, the other sex, তা আমার মনে আদ্যা বা আদ্যাশক্তি, যা মনসার মত বিষময়ী ও বিষহারিণী, কৃষ্ণকায়া, উলঙ্গিনী, স্নেহময়ী, জননী, শক্তির আধার, কামবিনাশিনী।
>
> উপন্যাসে আরও সমস্যা আছে, যা অন্তর্দ্বন্দ্বকে সামনে আনে। মানুষ classless হবার চেষ্টায় ডিক্লাসড্ হারান (হারিয়েই সে হারান) হলে কী হয়? সাহিত্য ও শিল্পের জন্য মানুষ নৈতিকবোধ ত্যাগ করার অধিকার প্রয়োগ করলে কী হয়? যথা গিরিশ ঘোষ ও নটী বিনোদিনীর পাপ। তাকে পাপ না বলা হলে, তরুবালা সে-ও তো নটী বিনোদিনীর সমান বয়সেই প্রথম পাপ করেছিল, কি পাপী? সে বেশি পাপী, অথবা তরুবালা? ঈশ্বর যদি না থাকে তাহলে পাপ থাকে? অপরাধ অবশ্য থাকে। পদস্খলিতা তরু জননীকে স্টারের সম্মান দেয় কি এক অপরাধচক্র? তরুর যে ইনসেসচুয়াল অপরাধ তার তুলনায় মুখরক্ষার জন্য ভ্রূণহত্যা কি নির্দয় অপরাধ? চাঁদের জননীর ইনসেস্ট ও তার পাপ-খালাসের ইচ্ছার বিপরীতে যদি তরুর ইনসেস্ট– অথচ পিতা ও সন্তানকে জীবনাধিক করার প্রবল ইচ্ছাকে রেখে তুলনা করলে কি উপন্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়? (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৫২৯)

উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর ভেতরেই লুকিয়ে আছে এ উপন্যাসের বক্তব্যগত চাবিশব্দ ; সুমিতা চক্রবর্তী যাকে বলেছেন 'the other sex' অমিয়ভূষণের কাছে তা 'আদ্যা' বা 'আদ্যাশক্তি'। তাঁর কাছে যৌনতা হলো force of life বা জীবনেচ্ছা, জীবনের চালিকাশক্তি। যৌনতার এই শক্তি তাঁর কাছে দেবী মনসার মতই 'বিষময়ী' ও 'বিষহারিণী'। সমালোচক অনিন্দ্য সৌরভকর্তৃক গৃহীত এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ মনসা সম্পর্কে বলেন:

> সেন আমলে আমরা যখন যোগী-বৌদ্ধ, টিবেটান বৌদ্ধ হলোাম, মনসার সেই সময় সৃষ্টি। মনসা জিনিসটাকে আমি যা বুঝেছি,...ইংরেজিতে যাকে তোমরা লিবিডো (libido) বলো, মনসা হলো সেই দেবী। কূলকুণ্ডলিনী সর্পমুখী দেবী। তাকে জাগ্রত করে মাথায়, পিটুইটারি গ্লান্ডে নিয়ে যাওয়া যোগের ধর্ম।...মনসামঙ্গল কাব্যে দেখবে...মহাদেব নামছেন...মহাদেবের একবার মনে হলো, আমি পদ্মবনে খেলা করব...আমাদের শরীরে ছ'টা পদ্মবন আছে। উনি পদ্মবনে নামলেন। নামতে-নামতে তিনি একেবারে যেখানে কূলকুণ্ডলিনীর অধিষ্ঠান সেই গুহ্যদেশে নেমে গেলেন। সেখানে মনসার সঙ্গে দেখা, তিনি মনসাকে নিয়ে উঠছেন। সেই সে বিষময়ী, লিবিডো কিন্তু unconscious তো, মনের অংশই যেন মনসা। সেজন্যই তিনি শিবের আত্মজা। তার মানে Libido is part of mind, super ego is part of mind. সেজন্যই আত্মজা।...আমাদের শরীরের ওই যে বিষ, কাম, ক্রোধ, হিংসা–এই সমস্ত যে মূল শক্তি–libido...(অমিয়ভূষণ, ১৯৯৪: ৪)

ফ্রয়েডের মত লিবিডোকেই তিনি জীবনেচ্ছা বা জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হয়ত ফ্রয়েডের বক্তব্যের ধারাবাহিকতায়ই "পদ্মাপুরাণ" প্রবন্ধের শেষে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন:

> মনঃতে স্বার্থে টাপ্ করে যে মনসা–তা তো মনই যেন, অথচ মন নয়। তা কি প্রাক্‌চৈতন্য মন? শিব যদি পরম মানস হয়, যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক, মনসাও কি তার অংশ, সেজন্য শিবাত্মজা? পরবর্তীকালে যাকে লিবিদো বলা হবে, সেওতো মনেরই অংশ। সে তো বিষের আধার, অথচ সে না থাকলে কিছুই কি ঘটে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৫২৬)

যে লিবিডো তাঁর আরাধ্য, সেটি সমাজসৃষ্ট কোন নৈতিক ধারণা দ্বারা আবদ্ধ নয়। সে এক 'অরোধ্য নৈসর্গিক শক্তি'। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন:

> তাঁর কথাসাহিত্যে যৌনতা একটি প্রবল জীবনীশক্তি। যা মানব-মনন অলগ্ন নয়, কিন্তু যা মানব-সমাজের নীতি ও নিষেধকে অগ্রাহ্য করে নির্মিত বিধান।...প্রকৃতির যে লাইফ ফোর্স–তার প্রবহমানতা জৈবিক যৌনতার শক্তির উপরেই নির্ভরশীল, যেখানে লিঙ্গ মাত্রই মিলিত হয় এবং অব্যাহত রাখে প্রাণধারা। এই অরোধ্য নৈসর্গিক শক্তিটিকেই তাঁর উপন্যাসের মানব চরিত্রে মাঝে মাঝে সন্নিবিষ্ট করেন অমিয়ভূষণ।... বোধহয় অমিয়ভূষণ শাস্ত্রীয় সমাজের 'ছোটো ছোটো নিষেধের ডোর'–কে অস্বীকার করে সেই আদিম নৈসর্গিক প্রাণশক্তিকেই আবাহন জানাতে চান তাঁর শিল্পকৃতিতে। তাঁর বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী-তে সেই সতেজ অরুগ্ন, বলিষ্ঠ, নগ্ন জীবনকেই চান ফিরে পেতে। অমিয়ভূষণের এই চাওয়া সর্বোত্তম সার্থকতায় রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসটিতে। (সুমিতা, ১৯৯৫: ১৪৯-১৫০)

আমাদের অচেতন মনে যেভাবে যৌনচেতনা নগ্নভাবে সুপ্ত, অমিয়ভূষণ ঠিক সেভাবেই এ উপন্যাসে যৌনচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেন, '...যৌন বিষয় কখনো সুন্দর, অনেক সময়েই মধুর এবং আপাত নয়, প্রকৃতই, এমনকি তা জীবনের উৎস' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪৩২)। *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী* উপন্যাসে লেখক পিতা ও কন্যার মনোদৈহিক সম্পর্ক ব্যাখ্যায় যৌনতাকে জীবনের স্বাভাবিক উৎস হিসেবে দেখতে চান, যার মধ্য দিয়ে প্রাণের প্রবহমান গতিধারা বজায় থাকবে। তরু ও হারানের মধ্যকার অজাচারিতা লেখকের কাছে পাপ নয়। এ কারণেই পিতার ঔরসজাত 'অনলসম' সন্তানের হন্তারক হতে চায়না তরু। সমকালে বিরাজমান নানা অসঙ্গতির তুলনায় তাদের এই অজাচারী সম্পর্কের পাপবোধ তরুর কাছে গৌণ। পাপ-পুণ্যের হিসেবটা ভিন্ন বলে তরু পিতার ঔরসজাত অনাগত সন্তানের নাম রাখে অনল–অনলের মতই এ সন্তান তরুর কাছে শুদ্ধ, পবিত্র। তরু আর হারানের এই অজাচারী সম্পর্কে রয়েছে 'পিতা ও সন্তানকে প্রাণাধিক' স্নেহের পবিত্রতা। কাম বা পাপ এখানে মুখ্য নয়। অমিয়ভূষণের অভিমত এটাই।

উপন্যাসে পিতা ও কন্যার সম্পর্কজটিলতার পাশাপাশি লেখক জঙ্গম কালের পটে ক্রিয়াশীল নানা রাজনৈতিক কূটকৌশলের চালচিত্রও রচনা করেন। প্রান্তিক হারান দাসের (যাকে অমিয়ভূষণ বলেছেন সে হারিয়ে গেছে বলেই হারান) ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে ব্যক্ত তার কর্ম ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচয়। অমিয়ভূষণ বলতে চান, হারান এ উপন্যাসে 'classless', (not divided into a particular social class) হতে গিয়ে 'declassed' হয়ে গেছে। Marx মনে করেন, প্রাথমিকভাবে ক্ষমতাধর শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা থেকেই একটি রাষ্ট্র সমাজের নিম্নবর্গকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। হারানও সমাজের ক্ষমতাধর শ্রেণির হাতে নিপীড়িত। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত ডোমপাড়ার প্রতিবেশী এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত অধিবাসী পরিচয়ের পাশাপাশি

আমরা তার আরেকটি যে পরিচয় পাই, সেটিও একেবারেই তুচ্ছ। মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলার ট্রাক ড্রাইভার সে। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী মনে করেন:

> মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষেরাই সামাজিক বিধিনিষেধ, প্রথাসিদ্ধ রীতি-নীতি, লোকাচার, লোকলজ্জা ইত্যাদি দ্বারা পীড়িত হয় বেশি। তারপর একটা সময় আসে যখন জীবনের অ-শীলিত, নগ্ন মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে বিধি তুচ্ছ করা প্রাণাবেগের টানে ভেসে যায় তার সব প্রথা বন্ধন। ফল সবসময় সুখের বা শান্তির হয় না। প্রায়ই হয় গভীর ট্র্যাজিক। সেই ট্র্যাজিক মহিমার মধ্যেই মানুষের অপরাজেয় ব্যক্তিসত্তার জয় ঘোষিত হয়। (সুমিতা, ১৯৯৫: ১৪৫)

তরু কিংবা হারান হয়ত আপাত অর্থে পরাজিত, কিন্তু জীবনের অপ্রতিরোধ্য গতিকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে তারা লেখকের কাছে অপরাজিত।

মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা ট্রাক-ড্রাইভার হারানের গায়ে এক প্রান্তিক শ্রেণিজীবনের লেবেল আঁটা। এ কারণেই অভিনয়কুশলা, মোহিনী ও শুচিবায়ুগ্রস্ত স্ত্রী, শ্রেণিগতভাবে যে কিছুটা হলেও হারানের চাইতে উঁচু, তাকে ছেড়ে চলে যায়। উপন্যাসে হারানের অবস্থান লেখক স্পষ্ট করেন এভাবে:

> তরুরা ডোমপাড়ায় থাকে, যদি বা ডোম না। এই ঝিলই এঁকেবেঁকে শালের সারির আড়ালে শহরের ময়লা ঢালার জায়গায় কি নোংরা, কি দুর্গন্ধ হবে! আবর্জনা জ'মে পাহাড়। কারণ তরুর বাবা ময়লা ট্রাকের ড্রাইভার। খাটা পায়খানার ময়লা ফেলা, চাকায় বসানো গোল গোল ট্যাঙ্কগুলোকে জুড়ে জুড়ে রেলগাড়ির মত হলে, তার সামনের ট্রাকটরটা তরুর বাবা চালায়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ১৫)

হারান আর তার স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছেদের পেছনে শ্রেণিব্যবধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সময় ও সমাজ কেমন করে মানুষকে সন্তর্পণে ডিক্লাসড্ করে, অমিয়ভূষণ সেটি এখানে দেখিয়ে দেন সুস্পষ্টভাবে। অ্যানুয়াল পরীক্ষায় প্রথম হবার সুবাদে স্কুল কর্তৃপক্ষ ডিপ্রেসড-ক্লাস ছাত্রীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তরুকে টাকার তোড়া উপহার দিয়ে ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞায় তাকে অন্যদের থেকে আলাদা বৃত্তে আবদ্ধ করে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের এই সূক্ষ্ম চাল ধরা পড়ে চাঁদের চোখে। চাঁদের সপ্রতিভ কণ্ঠ তরুকে বুঝিয়ে দেয় মূল শ্রেণিবৃত্তের কতটা বাইরে তাদের অবস্থান:

> একটা কথা কি তরু, টাকার কথায় মনে পড়ল। পঞ্চাশ টাকা কিছু না। কাকার শয়তানি। তোর বাবা ডিক্লাসড্ শ্রমিক হতে পারেন। কাকা প্রাইজ দিয়ে ঘোষণা করল তোরা অচ্ছুত। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৬১)

এরই বিপরীতে উপন্যাসে হারানের স্ত্রীর পরিপাটি জীবনযাপনের চিত্র হারান আর তার ব্যক্তিক ও শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব রচনায় সহায়ক। মাকে লেখা বাবার চিঠিতে এদের দুজনের অন্তর্জাগতিক সম্পর্ক জটিলতার সুস্পষ্ট প্রকাশ তরুকে বিহ্বল করে:

> তোমাকে আমার পদবী নিয়ে যারা খোঁচায় তারা আত্মীয়, কিন্তু কষ্ট দিচ্ছে।...আর একটু বয়স হলে বুঝতে। আমার তিরিশের তুলনায় তোমার সতেরো খুব নরম। ইতিমধ্যে তুমি প্রেগন্যান্ট কিন্তু। তুমি কলকাতা যাও আমার ইচ্ছা ছিলনা। এই প্রথম বলে রাজি হয়েছি। ঠকানোর কোন প্রশ্ন নেই। আমি দাস লিখি, কলকাতার

কেউ কেউ দাশ লেখে। ঠাকুরদা পণ্ডিত ছিল, বাবাও। কোন এক নরোত্তম কবি থেকে আমরা দাস। পেটের জন্য ঠাকুরদা কবরেজি, বাবা স্কুলের পণ্ডিত।...আমি জীবিকার জন্য ট্রাক চালাই...

'তুমি ছেলেমানুষ, লেখাপড়ায় ভালো, ভালো গান কর; স্কুলে এমনকি ক্লাবের হয়ে থিয়াটার ক'রে পাওয়া তোমার মেডেল সব আমাকে দেখিয়েছিলে।...তোমাকে দেখে মোহিত হয়েছিলাম, সে জন্য পণের কথা তুলতে দিইনি। দিতে পারলে তোমরাও এক ড্রাইভারকে অত অল্প বয়সের এক মেয়েকে দিতে না। বুঝেছিলাম আমার চেহারা গড়ন তোমার ভালো লেগেছে।'

'বেশ কথা, আজই সাদা ধবধবে মোটা পৈতা কিনে পরব। মনে হবে আমার কালো গায়ে তোমার হাত। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ২৪-২৫)

চিঠিতে একইসঙ্গে হারান দাসের কমপ্লেক্স আর স্ত্রীর সঙ্গে তার শ্রেণিগত ব্যবধান প্রকাশিত। প্রান্তিক মানুষ হারান মিউনিসিপ্যালটির স্বল্পশিক্ষিত ট্রাক ড্রাইভার; কিন্তু তার স্ত্রী কোনভাবেই নিজের উচ্চ সামাজিক অবস্থান ভুলতে পারেনি। কাজেই অনিবার্য হয়ে ওঠে বিচ্ছেদ। স্ত্রী পরিত্যক্ত হারানের বেদনার রন্ধ্র পথেই অন্য সব জটিলতা এসে ভিড় করে। সমাজ তাকে স্ত্রীর দেবহূতি হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে চোখ মটকে কানাকানি করে। প্রবল মানসিক ক্লান্তি তার ভেতর ধ্বস নামায়। তবু স্ত্রীর প্রতি গোপন প্রেম তার অনিঃশেষ। শহরের অলিতে গলিতে সাঁটানো পোস্টারে লাস্যময়ী দেবহুতিকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় গভীর রাতে বেরিয়ে পড়ে সে। তীব্র বেদনায় দেবহুতির ছবির দিকে তাকিয়ে তার উচ্চারণ, 'কেন এলে? আমি, আমরা এখানে, তবু? এতো দূরে গেছো যে, আমরা আর কোন হিসেবে নেই! অভিনয়ের চাইতে কিছু বড় নয়, নিজের কাছে প্রমাণ করতে? না হয় বলো, তুমিও দুঃখী, এটা চাকরি, না এসে উপায় ছিল না' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৭)। এভাবেই হারান দাস ব্যক্তিক আবেগে, অন্তর্ঘাতে ক্লান্ত হয়। সেইসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কূটকৌশলের বিচিত্র নকশা হারানকে ডিক্লাসড (স্বশ্রেণিচ্যুত) করে তোলে। পতিতালয়ের নারীদেরকেও শ্রমিক হিসেবে মর্যাদা দেবার আন্দোলনে হারানের সক্রিয়তাকে ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে ট্রেড ইউনিয়নের হোমড়াচোমড়া ব্যক্তিরা নিজেদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় একদিকে হারানকে যেমন একঘরে বন্দি করে, তেমনি হারানের নিজের লোক কাঙালিকে পাঠায় হাজতে আর সেইসাথে নির্মল বাবু হয় খুনের লক্ষ্য। এসবই বাইরের ঘটনা। ভেতরের ঘটনা হলো, ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ। হারানের জেলা সেক্রেটারি হবার ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও সমূলে নস্যাৎ করবার যজ্ঞে তার বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ রচিত হয় কেন্দ্রের হাতে। প্রান্তিক মানুষের কেন্দ্রের একজন হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে গলা টিপে হত্যা করে স্বার্থান্ধ মানুষেরা। সম্ভাবনাময় এক ব্যক্তির ক্রমক্ষয়ের ইতিহাস রচিত হতে থাকে সময় ও সভ্যতার হাতে।

তরুর কিশোর প্রেমিক চাঁদ নীরবে এইসব অবলোকন করে কাতর হয় তীব্র যন্ত্রণায়; নিজে যদিও কেন্দ্রের ক্ষমতাধরদের সন্তান, তবু তীব্র আক্ষেপে তরুর প্রতি তার উচ্চারণ :

সত্যি বলছি, মনে হয়, কি এক আছে যা সবকিছু করায়, যার লোভে ঝিলটা বুজে যাচ্ছে, সিউএজ মিশছে, যা তোকে শুয়োর পুষতে বাধ্য করে, তোর বাপকে ময়লা ফেলার ট্রাক-ড্রাইভার করে, তার হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। তুই পুষবি না আর দশজন শুয়োর পুষবে, তোর বাপ ট্রাক চালাবে না, আর দশজন দৌড়ে আসবে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ২৯)

এ উপন্যাসে কিশোর চাঁদ বিবিক্তজন। শারীরিক ত্রুটির কারণে নিজেকে সে 'খোঁড়া হাঁস' বলে চিহ্নিত করে। খুঁড়িয়ে হাঁটার বিষয়টি নিয়ে কৌতুক করলেও কৌতুকের আড়ালেই লুক্কায়িত তার প্রবল মনোযন্ত্রণা। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য আর মায়ের অনৈতিক সম্পর্ক তাকে ব্যথিত করেছে। তাদের অনাচার তাকে ভাবতে বাধ্য করে, 'মা, যে অমন সুন্দরী, অন্যায় করেছে যে দুখানা আস্ত পা দেয়নি? (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ১৫)। পৃথিবীতে মানুষেরা আর কেউ সুখী নয়। লোভ মানুষকে স্বস্তি দেয়না। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা আরো প্রগাঢ়। চাঁদের মনে হয় কেউ ভাল নেই। হারান বিচ্ছিন্ন, তরু একা, আর একা সে নিজে, তার মা কিংবা পিতৃব্য। একা দেবহুতি। আধুনিক মানুষের এই বিবিক্ততার কথকতা চাঁদের বেদনাভারাতুর মনোভাবনায় ধরা পড়ে:

> মনে কর, একটা হাঁস একা ভেসে চলেছে। আকাশের শেষে আলো আছে? নিচে সমুদ্র উথলায়। ডানা ক্লান্ত, ভেঙে আসছে, চলেছে; কেউ নেই, সঙ্গী নেই, চলেছে; ডানার পালক খসে পড়ছে, চলছে চলছে; ডাঁটাসার পাখা ঝাপটায়, হয়ত পার নেই, চাঁদ বলে কিছু নেই; ডাঁটাসার পাখা নড়বড়, সমুদ্র ছুঁতে আসছে, পড়তে পড়তে,... (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৮)।

আধুনিক মানুষ জীবন আর সময়ের অভিঘাতে ক্লান্ত নড়বড়ে ডাঁটাসার খোঁড়া হাঁসসম। আকাশের শেষে আলোর খোঁজেই যেন বা তবুও তাদের নিরন্তর উড়ে চলা। চাঁদও অনুভব করে সেটি। উপন্যাসে চাঁদ নামকরণে অনুরণিত লোকপুরাণের চাঁদের সৌগন্ধ। বৈরি এ কাল এখানে মনসার প্রতিরূপ, যার সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে পরাহত এক সত্তা চাঁদ। লোকপুরাণের চাঁদের মত বলিষ্ঠতা কিংবা চারিত্র্যিক দার্ঢ্য একালের চাঁদের নেই। বরং, খোঁড়া পা নিয়ে অসহায়, ভয়ানক নিঃসঙ্গ চাঁদ তার প্রাণসম ঝিলটি বুঁজে যেতে দেখে। তরুর প্রতি তার গাঢ় আবেগ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত। মা ও পিতৃব্যের অজাচারী যৌনতার বিষয়টি নির্লিপ্ত বেদনায় মেনে নিতে হয় তাকে। মনসারূপ বৈরি কালপটে শেকড়চারানো স্বার্থান্ধ ব্যক্তির দ্বেষের বিপরীতে ক্রমশ চাঁদ কিংবা তরু অথবা হারানেরা হয়ে ওঠে অস্তিত্বসংকটাপন্ন ব্যক্তিসত্তার প্রতিরূপক।

অমিয়ভূষণ মনে করেন, প্রান্তিক মানুষকে আরো বেশি প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেবার কলকাঠি যারা নাড়েন, তারাই একালের আধুনিক বিশ্বমিত্তির। হারানের মত মানবাত্মা এইসব বিশ্বমিত্তিরদের হাতেই বন্দিত্ব বরণ করে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, অস্তিত্বহীন। অমিয়ভূষণ বলতে চান, সভ্যতা এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির চরম উৎকর্ষে। কিন্তু এর মূলে যদি থাকে বিদ্বেষ বা ধ্বংস করার প্রবণতা, এক শক্তির হাতে অন্য শক্তির নিধনপ্রক্রিয়া যদি চলতেই থাকে, তবে সইয়জ, মার্কারির মত অসাধারণ সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাদের সকল শুভ-ব্যবহার ভুলে শুধু একে অন্যের নিধনযজ্ঞ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। চাঁদ, তরু কিংবা হারানের এই সমাজও আজ শুভবুদ্ধি ভুলেছে। এ সমাজ বিশ্বমিত্তিরের পণ্যবাদী সমাজের মতই লোভী ও আগ্রাসী। লেখক বিশ্বমিত্তির সত্তাকে প্রতীকী দ্যোতনা দিয়েছেন উপন্যাসে। সেটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ* গ্রন্থে বিশ্বমিত্তির প্রসঙ্গে জানা যাবে:

> এই সত্তা 'বিশ্বার মিত্র' বা 'বিশ্বের আধার–এর মিত্র; সে আবার 'বিশ্ব সৃজনকারী সত্তাসমূহ' (পণ্য উৎপাদনকারী মানুষজন) হতে পারে।...তিনি আগাগোড়া বৈদিক ব্যবস্থার (আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার) বিরোধিতা করেছেন এবং পণ্যবাদী প্রচেষ্টাসমূহের সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।...নারায়ণ যখন নিজেকে চারভাগে ভাগ করে রাম লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার সত্তায় বিভাজিত করে ভারতসমাজে সক্রিয়

> হন, তাঁদের প্রধান সহযোগী দার্শনিক গুরু রূপে দেখা দিয়েছিলেন এই বিশ্বমিত্র সত্তা। তাঁদের একান্ত চেষ্টায় ও কালের নিয়মে শেষপর্যন্ত ভারতসমাজে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।...প্রতীকী ভাষায় যাকে বৌদ্ধ ব্যবস্থা বা বৌদ্ধযুগ (অশোক থেকে হর্ষবর্ধনের কাল) বলা হয়, পৌরাণিক ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় তাকেই রামরাজত্ব বলা হয়ে থাকে। এই রামরাজত্ব ছিল বিশ্বের প্রথম ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। (তবে কিনা এর মূলে কুবের সাধনা ছিলনা, ছিল লক্ষী সাধনা। কল্যাণীর সাধনা। একালের ধনতন্ত্র কিন্তু...আগাপাছতলা কুবের সাধক। তাতে রামরাজত্বের গন্ধটুকু পর্যন্ত...নেই।...এদেশের সেই রামরাজত্ব কিন্তু বেশিদিন টেকেনা। তাতে ক্লেদ জমে, রামকে শূদ্র নিধন করতে হয়। ক্রমে একদিন এই রামরাজত্ব অতিক্রম করে শঙ্করাচার্যদের নেতৃত্বে হিন্দুযুগের সূত্রপাত হয়ে যায়।)
>
> ...বশিষ্ঠ যেমন বৈদিক ব্যবস্থার মুখ্য আধাররূপে সেই ব্যবস্থাকে চালানোর চেষ্টাতেই ব্যাপৃত, বিশ্বামিত্র তেমনি সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার চেষ্টাই শুধু করেননি, পণ্যবাদী পথে যিনিই হেঁটেছেন তাঁরই সহায়তা করেছেন। তার মানে, ভারতভূমিতে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত যে পরস্পর বিরোধী লড়াই লড়ে এসেছে, তার প্রধান দুই দার্শনিক সত্তার নাম বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ বা বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত রক্তপাতে পরিণত হয়। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র যেমন বশিষ্ঠের হাতে নিহত হন, তেমনি বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় কল্মাষ পাদ রাক্ষসে পরিণত হয়ে বশিষ্ঠের পুত্রদের ভক্ষণ করেন। (কলিম, ১৪১৭: ৩২৮)

এই ব্যাখ্যার আলোকে উপলব্ধি করা যাবে, বিশ্বের সহায়তাকারী সত্তার অপর নাম যদি হয় বিশ্বামিত্র, এবং রাম লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্নের দার্শনিক গুরুরূপে যদি বিশ্বামিত্র আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তবে তাদের সহায়তায় বিশ্বের প্রথম ধনতান্ত্রিক সমাজরূপী রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলেও, এবং সেটি প্রশংসিত হলেও রামকে শূদ্র নিধনে নামতে হয়। অর্থাৎ প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতি অনাচার ও বিদ্বেষের খড়্গ নেমে আসায় শেষপর্যন্ত রামরাজত্বের অবসান ঘটে। শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে হিন্দুযুগের সূত্রপাত ঘটে। অমিয়ভূষণ এই বিষয়কেই এ কালের প্রতীক ধরে বলতে চান, ক্রমঅগ্রসরমান সভ্যতা সমৃদ্ধির চরম সীমানায় পৌঁছালেও এর ভেতর বিদ্বেষ বা ধ্বংসাত্মক মনোভঙ্গি লুক্কায়িত থাকলে মহৎ আবিষ্কার তখন হয়ে উঠবে সার্থকতাহীন। এই সমাজ বিশ্বমিত্তিরের পণ্যবাদী সমাজের মতই লোভি, আগ্রাসী এবং পণ্যবাদী। কাজেই তার করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয় ব্যক্তির অস্তিত্বের ভিত। এই সমাজই গ্রাস করে প্রান্তিক মানুষগুলোর অস্তিত্ব–তাদের সম্পদ। পণ্যবাদী সমাজে এ এক চক্রের মত। হারান দাস যে কাজ করবে না, অন্য আরেক প্রান্তিকজনকে সেই কাজ করতে বাধ্য করবে সমাজ, এবং তাদের অস্তিত্বকে কোণঠাসা করে প্রান্তিকতার আস্বাদ দেবে। সমালোচক মনে করেন:

> ফ্রান্জ কাফকার (১৮৮৩-১৯২৪) *দ্যা ক্যাসল* উপন্যাসের বারনাবাস এর মত একালের প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করেছে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই আমলাতন্ত্রের নির্দিষ্ট কোন রূপ নেই, স্বাতন্ত্র্য নেই, ব্যক্তিত্ব নেই। মূর্তিহীন অদৃশ্য আমলাতন্ত্র নিষ্ঠুর যান্ত্রিক নিষ্পেষণে ব্যক্তিসত্তাকে, হৃদয়াবেগকে, মানবধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধ পরিকর। ফলে সাধারণ মানুষ বিচ্ছিন্ন হয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে, তার মধ্যে জন্ম নেয় এক আউটসাইডার-সত্তা। এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিচৈতন্যে ক্রমে জাগ্রত করে দুর্মর নিঃসঙ্গতা। (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৭: ৩৯)

হারানও নিঃসঙ্গ; সেই নিঃসঙ্গ সত্তার শূন্যতা পূরণে হারানের জীবনে এগিয়ে আসে কন্যা তরু। পিতার সঙ্গে তরুর এই সম্পর্ক পাপ নয় কিছুতেই। অমিয়ভূষণের চোখে এ সম্পর্ক নৈতিকতা-পরিপন্থী নয়। বরং তরুর কাছে হারানকে ছেড়ে চলে যাওয়া মায়ের পরবর্তী সত্তা নটী দেবহূতীর কাজই পাপ বলে মনে হয়। মায়ের এই ছেড়ে চলে যাওয়া তার কাছে তীব্র প্রতিবাদের, ঘৃণার:

> বেশ করেছি। তুমি আমার অমন বাবাকে তিলে-তিলে মেরে ফেলনি? ভেবেছ, বাবা অনেকদিন থেকেই বোঝেনি? তা বুঝি খুন করা নয়? বেশ করেছি। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৮)

মূলত মায়ের অনুপস্থিতি ছোট্ট তরুকে বেদনার্ত করে। মনের ভেতর প্রগাঢ় যন্ত্রণায় মায়ের প্রতি তার অভিমানাহত উচ্চারণ, 'আমি কী তোমাদের ছোট্ট একটি মেয়ে নই? আমি কি করে সব তোমার মত রাখি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ২০)। মায়ের অভাববোধের তীব্রতাই প্রথম তাকে রূপান্তরের আস্বাদ দেয়। ছোট ভাইকে বলে, 'ভাই আমাদের মা নেই।...আমার যাই হোক, কাউকে জানতে দেবো নাকি, তোর মা নেই? তোকেও না' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৩১)। পিতার নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলোতে তার মনোজাগতিক রূপান্তর তাকে মায়ের স্থলাভিষিক্ত করে। ভাবে সে, 'কোনো কোনো দিন মা যেন কি একভাবে কথা বললে বাবা সুখী হয়ে উঠতো' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৩)। সুতরাং মায়ের কণ্ঠ ধারণ করতে চায় সে। নিজেকে মায়ের প্রতিরূপ ভেবে অবচেতনে একধরনের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে তরু ছোট ভাইয়ের দুধ মা হরমতিয়ার সঙ্গে। হরমতিয়াকে পিতার যৌনসঙ্গী কল্পনা করে নিজের অজান্তেই সে ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে। স্বপ্নে প্রস্ফুট হয় তার সেই ঈর্ষা, 'যেন সে স্বপ্ন দেখছিল হরমতিয়া এক প্রকাণ্ড মাদী শুয়োর হয়ে যাচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৩৬)। এসবই তার মনোদৈহিক জটিলতার বহিঃপ্রকাশ।

তরুর অন্তর্মানসে মায়ের জন্য সযত্নে লুক্কায়িত আকুতি কান্না হয়ে ঝরে পড়ে। মা তাকে লুকিয়ে দেখতে এলে অভিমানাহত সত্তায় মায়ের প্রতি বাক্যবাণ ছুঁড়ে নিজেই তাতে জর্জরিত হয়। তার মনে পড়ে, 'কে যেন বলেছে, তার মায়ের সম্বন্ধে খুব নোংরা কথা–এখানে, তাও কোনো লম্পটের সঙ্গে। কেন করলে? মরোনি? কেন তা করলে?...মা, কেন এ ঘেন্নার কাজ?...এতদিনে মা হারিয়ে গেল? তাড়াতাড়ি কালো ম্যাকসিটাকে পরতে গিয়ে সেটাকে বুকে জড়িয়ে মা, মা বলে সে কেঁদে উঠল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৬)। হারানের মত সেও লুকিয়ে মাকে দেখে। সে দেখায় দেবহূতীর পঙ্কিল জীবন চমৎকার প্রতীকে উঠে আসে উপন্যাসে:

> সবচাইতে কাছে সার্কুলার রোডের কোণের বাড়িটার ভিতে সন্ধ্যার কিছু আগে সে ছবিটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুদিন আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তাতেই কাদার ছিটে লেগেছে। অল্পে রক্ষা পেয়েছে। তরু প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে ছবির মুখ থেকে ধুলো কাদা মুছে দেয় আর কি কাঁদতে কাঁদতে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৭)

তবু টানাপড়েন চলতেই থাকে। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি চলতেই থাকে। অভিমান পাহাড় হয়ে ওঠে। মায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণায় তার উচ্চারণ, 'তোমাকে একেবারে ভুলে যাবো, একেবারে একেবারে মুছে দেবো। নিজের স্বামী পুত্রকে হত্যা করার চাইতে মাতৃহত্যা কি বেশি পাপ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৪৯)। বার বার মায়ের শূন্যস্থানটুকু পূরণ করে পিতার জীবনে তরুর অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তরুকে অবচেতনে অপরাধী

করে তোলে। তার মনে হয় মাকে হত্যা করেছে সে সযতনে। সে যেন চাঁদ কথিত সেই একা উড়ে যাওয়া হাঁস, যা কান্নার মত ডানা ঝাপটায়। তবু সমাজের চোখে বেশ্যা আর চোরের সন্তান হিসেবে পরিচিত হলেও হার মানে না সে। প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতম করে তোলার এই মহাযজ্ঞে সমাজের নিপীড়নের শিকার হতে হতেই সে ভাবে, 'কবিতার ক্লান্ত ডানা পাখীকে কি উড়তে হয় না'? (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৫৯)। নটী বিনোদিনীর মতই দেবহুতীও হয়ত নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে কোন এক মাড়োয়ারীর কাছে। কিন্তু বিনোদিনীর যে কাজ অমিয়ভূষণের চোখে পাপ নয়, সেই একই কাজ দেবহূতীর জন্য পাপের সামিল। তরুর কণ্ঠে উচ্চারিত অমিয়ভূষণের পাপপুণ্য সংবলিত বক্তব্য পাঠকের ধারণাকে আমূল বদলে দেয়:

> অন্যায়? অপরাধ? অন্যায় অপরাধ বলে কিছু আছে? মানুষ কাকে কি বলবে তা সুবিধামত পছন্দ করে নেয়। কাঙালিকে জেল হাজতে দিয়েছিল, নির্মলকে খুন করতে গিয়েছিল। তোমাকে তাড়িয়েছে, চোর বলে রটিয়েছে, এখন গেনু ডাক্তার তো প্রকারান্তরে তোমাকে পাগলই বলেছে। এসব অন্যায় না, না অপরাধ?...
>
> পাপ? সরিয়ে দিতে হবে? খুন করবে?... ...
>
> অদ্ভুতভাবে হাসল সে, বলল 'আমরা কি কোনদিনই ভগবান মানি যে, আমাদের পাপ হবে? দেবহূতী এখনও পাপ ক'রে যাচ্ছেনা? স্টার হচ্ছেনা? রাষ্ট্রীয় সম্মানও পেয়ে যাচ্ছে। সেই কবে বিনোদিনী আর গিরিশ কি পুণ্য করেছিল? আমার পাপ? একটা পরম আশ্রয়ে ঘুমন্ত শিশুকে খুন করা পাপ হবেনা? কোনটা বড় পাপ? (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৭৮)

অমিয়ভূষণ মনে করেন, পিতার মার্ক্সীয় দীক্ষায় দীক্ষিত বলেই এই কিশোরী অপাপবিদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত বলে হারানের ঘরানায় মার্কসের কদর বেশি। 'Marx-এর জগতে ঈশ্বর নেই। সুতরাং পাপ বলে কিছু থাকেনা, Fraud নেই বলে পাপবোধ থাকে না, মিথ্যা নেই, কেননা যা প্রকাশিত তা সত্য, যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত, তাই সত্য। সুতরাং তরুর মন অপাপবিদ্ধ' (অমিয়ভূষণ, ২০০২: ৯৪)। এক সাক্ষাৎকারে তিনি শরীরী প্রেম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দেন:

> ...মানুষের শরীরটা তার সেই অংশ মাত্র, যা আমাদের চোখে পড়ে। যেমন আইসবার্গের বেলায় হয়। মানুষ, তার শরীর বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সে তার মনও। শরীর নিয়ে লজ্জা করার কিছু নেই।...আমার উপন্যাসে আমি তো জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আলো জ্বালাই, কিন্তু উদ্দেশ্যটা আলো, শুধু আগুনটা নয়।...(অমিয়ভূষণ, ১৯৮২: ৩২-৩৩)

বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবীতে হারান আর তরুর এই অজাচারী যৌনতায় নেই কোন আগুনের উত্তাপ, আছে মানবিকতার আলো। প্রচলিত কোন সংস্কার দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যাবে না। সমালোচক সমীর চক্রবর্তী এ উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন:

> অমিয়ভূষণের sex concept তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেজন্য তথাকথিত মর‍্যালিটি নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না।...'বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবীতে পাপপুণ্য নেই, ঈশ্বর নেই। শুধু নারী ও পুরুষের আদিম সত্তা ভাসমান মনে হচ্ছে ইডিপাস কমপ্লেক্সের মত। এখানে যে অবৈধ মিলন ও তজ্জনিত গর্ভধারণ, তাতো যৌনানন্দের জন্য নয়, মানুষ যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য, প্রাণরক্ষার জন্য। জীবনের প্রথম প্রেমিককেও এজন্য হারাতে

হ'ল। এখানে নায়িকা জননীর বিকল্প হ'য়ে জননী-সাধনা করেছে–এ এক ভয়ংকর সত্যের সরাসরি উন্মোচন। (সমীর, ১৯৯৫: ১৭৫)

সমালোচক সমীর চক্রবর্তীর মত সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীও মনে করেন:

> অমিয়ভূষণ শুদ্ধ জৈবতার শক্তির উপরেই জীব অস্তিত্বের উত্তরণকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন।...সফোক্লিসের 'রাজা ইডিপাস' নাটকে ইডিপাস-এর অজ্ঞানকৃত মাতৃগমন যখন মাতা ও পুত্র উভয়ের কাছেই উদ্‌ঘাটিত হয় তখন যোকাস্ত্রা এবং ইডিপাস-দুজনেরই যে তীব্র অনুশোচনা ও আর্ততার প্রকাশ ঘটেছে তা এখানে অনুপস্থিত। (সুমিতা, ১৯৯৫: ১৫৩)

এই অনুশোচনাহীন পিতা কন্যার অজাচারিতাকে অরোধ্য প্রাণপ্রবাহ সচলতার নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। ফ্রয়েড পিতাকেন্দ্রিক কন্যার প্রগাঢ় আকর্ষণকে ইলেকট্রা কমপ্লেক্স নামে অভিহিত করেছেন:

> Among these tendencies the first place is taken with uniform frequency by the child's sexual impulses towards his parents, which are as a value already differentiated owing to the attraction of the opposite sex–the son being drawn towards his mother and the daughter towards her father. (Freud, 1949: 93)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন:

> But now the paths of the sexs divide. The boy enters the Oedipus phase; he begins to manipulate his penis, and simultaneously has phantasies of carrying out some sort of activity with it in relation to his mother ;…the girl,…attempting to do the same as the boy, comes to recognize her lack of a penis or rather the infreriority of her clitoris, with permanent effects upon the development of her character. (Freud, 1940, 29-30)

তিন চার বছর বয়সী একটি শিশু কন্যা তার অন্তর্মুখী লিবিডো প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে যখন বহির্মুখী-সক্রিয় লিবিডো অনুভূতিতে পৌঁছে, তখন সেই শিশু কন্যার পিতার প্রতি আকর্ষণকেই ফ্রয়েড ইলেকট্রা কমপ্লেক্স নামে অভিহিত করেছেন। যদিও 'পুত্র কন্যা...উভয় শিশুই প্রথমে মায়ের প্রতি তাদের লিবিডো পরিচালিত করে, কিন্তু শিশু কন্যা যখন তার জননেন্দ্রিয়ের ভিন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তার মধ্যে এমন উপলব্ধি আসে যে হয়ত তার মা-ই তার উপস্থছেদন করেছেন। সে-কারণে মায়ের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন শিশুকন্যা বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়' (আজিজুল হক, ১৯৯৮: ২৪১)। এ বিষয়টি তরু ও পিতার সম্পর্ক বিশ্লেষণে আরোপ করার আগে উপলব্ধি করা যাবে, উপন্যাসে অমিয়ভূষণ একবার কেবল 'অয়দিপাস' আর 'রাজকুমারী ইলেকট্রা' প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ইঙ্গিতে তিনি বলে দেন তরু আর হারানের সম্পর্কের ভিতে নেই কোন ইলেকট্রা কমপ্লেক্সের বীজ। বরং চাঁদের মুখে যে বক্তব্য তিনি পুরে দেন, সেখানে মানবিকতাই প্রবল হয়ে ওঠে, যৌনতা সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত:

> অয়দিপাউসরা আমাদের ইতিহাসের আগে, তখন মানুষ আর ভগবান প্রতিবেশী যেন। আর সেনাপতি ফিলিস্ট্রেটাস তো ইতিহাসের মধ্যে আসে এমন মানুষ। গ্রীকদের সঙ্গে পার্শিয়ান যুদ্ধের গল্প থেকে নেয়া। মানুষের বিচার বুদ্ধির বিভ্রাট।...আগে যুদ্ধজয়ের জন্য সেনাপতিকে পুরস্কার, পরে গণতন্ত্রীদের আবার বিচার। তখন যুদ্ধধ্বস্ত নিজেদের কয়েকটি জাহাজের নাবিকদের উদ্ধার না ক'রে চলে এসেছিল বলে মৃত্যুদণ্ড। ও কিরে? চোখ ছলছল। বুঝেছি। সেই সেনাপতির এক মেয়ে ছিল।...তার মেয়েটির বুদ্ধি ছিল কিন্তু। গরাদের ফাঁক দিয়ে রাতের অন্ধকারে দুধেভার নিজের বুক বাবার মুখে তুলে দিয়ে সেই সেনাপতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।... অয়দিপাউসের...মেয়ে অ্যান্টিগোনে শুধু সুন্দরী নয়, সাহসী, দয়াবতী। অন্ধ বুড়ো বাবার হাত ধ'রে নিয়ে বেড়াত। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৭০-৭১)

তরু এই উপন্যাসে সেই সেনাপতি-কন্যার প্রতীক হয়ে ওঠে। দিনের পর দিন পিতার অসহনীয় একাকিত্ব উপলব্ধি করে মায়ের শূন্যতা পূরণে সচেষ্ট তরু পিতা ও সন্তানকে জীবনাধিক করে তোলে। যৌনাবেগ বা বিকৃত যৌনাচার এ সম্পর্কের মূল ভিত্তি নয়। চাঁদকে সে জিজ্ঞেস করে, 'পারুর জন্য দুঃখ যদি চন্দ্রমুখী ভুলাতে পারে, চন্দ্রমুখীর মত কোন বয়স্কার জন্য দুঃখ কি পারুর মত ছোট কেউ ভুলাতে পারে না?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৫৫)। তার ছোট্ট মন দিয়ে সে পিতার বেদনা বুঝতে চেষ্টা করে:

> একদিনে বোঝা যায়না। সাতদিন ধরে দেখে দেখে তরু বুঝল, হারান এখন ডিউটি থেকে ফিরে একদম বাইরে যায়না। বাইরের ঘরে বসে থাকে, না হলে বাড়ির সামনের রাস্তায় অন্ধকারে পায়চারি করে। একা, কি একা! (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৬৩)

হারানের সঙ্গে ঝি হরমতিয়ার শারীরিক সম্পর্কের বিষয়টি সামনে এলে তরু পিতার প্রতি ঘৃণা অনুভব করার পরিবর্তে অদ্ভুত এক মমতা আর উদ্বেগ অনুভব করে। 'পিতার চূড়ান্ত হতাশায় তার বাজারের মেয়েমানুষের ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচাতে আশ্রয় দিয়েছিল নিজের শরীরে। সে গর্ভিণী। লজ্জিতা, অনুতপ্তা বা ভীতা নয়' (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ৮২)। মায়ের স্মৃতি আর ডোমপাড়ার হরমতিয়ার নোংরা ছোঁয়াচ বাঁচাতেই সে নিজেকে পিতার প্রতি আরও বেশি একনিষ্ঠ করে তোলে। পিতার ভয়ংকর একাকিত্ব তরুকে বার বার কাতর করে:

> ভিতরের দিকের বারান্দায় শব্দ হতে সে উঠে গিয়ে জানালায় দেখল হারান পায়চারি করছে। যাবে সে? বলবে গিয়ে ঘুমাচ্ছে না কেন? তার ভয় হলো, যদি সে কেঁদে ফেলে?... বিশ্ব মিত্র সত্যি হচ্ছে না? এই বোধহয় তার পৃথিবী ভেঙে পড়া।...(অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৬৬)

পিতাই তার পৃথিবী। বিশ্বামিত্র স্বরূপ বৈরি কাল তার সেই পৃথিবীকে ভেঙে ফেলছে। তাই সেই পৃথিবীস্বরূপ পিতাকে মায়ের অনুপস্থিতির বেদনা থেকে মুক্তি দিতে, হরমতিয়ার নোংরা ছোঁয়াচ বাঁচাতে, ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত হবার অপমানবোধ থেকে রক্ষা করতে এবং হারানের জীবনের প্রগাঢ় একাকিত্ব দূর করতেই শেষ পর্যন্ত পিতার শয্যায় তরু আত্মবিসর্জন দেয়! এর ভেতর ছিল মমত্ববোধ আর মানবিক টানাপড়েন।

কলকাতা ছেড়ে ছুটিতে বাইরে যাবার পর পিতাকে অবলম্বন করেই এয়োতির চিহ্ন এঁকেছিল সে। এরই মধ্যে মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও বেশ পরিবর্তন হলো তরুর:

> প্রায় আড়াইমাস হ'য়ে গেল। বড় যে দাঁড়া আয়নাটা কেনা হয়েছে, সেদিন স্নানের আগে তার সামনে ব'সে হারান দাড়ি কাঁমাচ্ছে। তরুর স্নান হয়ে গিয়েছে। আয়নায় হারানের সাবানে ঢাকা মুখের পাশে হঠাৎ মুখটাকে দেখা গেল। সে ছাড়া আর কেউ কি হ'তে পারে এতো কাছে? কিন্তু একটু যেন নতুন। তরুর ব্যাকব্রাশ করা চুল যেন আজ সরু সিঁথিতে চেরা আর তাতে সিঁদুর। হারান অবাক হ'ল, তারপর যেন স্তম্ভিত; হাঁ হয়ে আছে মুখ, যেন চোয়াল আটকে গিয়েছে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৭২)

তরুর এই বাহ্যিক পরিবর্তন একদিনের নয়। প্রথমত মানসিক পরিবর্তন এবং পরবর্তীকালে দৈহিক রূপান্তর তরু ও হারানের সহজ স্বাভাবিক জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে। তরুর অজাচারী সম্পর্কের অপরাধ সমাজের দৃষ্টিতে অনৈতিক, অমিয়ভূষণের দৃষ্টিতে নয়। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায় হারান তরুর গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, যেটি অমিয়ভূষণের দৃষ্টিতে পাপ, এক নির্দয়তম অপরাধ। তিনি মনে করেন জীবনের অপ্রতিরোধ্য গতি থামিয়ে দেয়া অন্যায়, অনৈতিক। একইভাবে চাঁদের মা আর তার পিতৃব্যের ইনসেসচুয়াল সম্পর্কে উপ্ত অনাগত সন্তানের ভ্রূণ 'খালাসের' ইঙ্গিতের মধ্যেও অমিয়ভূষণের বেদনাগর্ভ উচ্চারণ চাঁদের মুখে উঠে আসে:

> জানিস কিছুতেই সুখ হয় না। তোকে বলি মদেও দুঃখ যায় না। না হলে তেমন কেন হবে? মা-র মুখ শুকনো, কাকার মুখ শুকনো। ওরা ভগবান মানেনা, তবু নাকি নিঃশ্বাসে তুকে পাপ ঢোকে। সেই পাপ থেকে খালাস হতে দিল্লী যাবে। তারপরে আমি আর ভাই একা। ভাই-এর তবু আমি আছি। আমার? (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৭৬)

অমিয়ভূষণ বলতে চান জীবনের অপ্রতিরোধ্য গতির অবাধচারিতার কথা। তরু বা হারান অথবা চাঁদের মা আর তার পিতৃব্যের অজাচারিতা অমিয়ভূষণের কাছে অনৈতিক কিছু নয়। তাঁর কাছে পাপ হলো ভ্রূণহত্যা, যেটা তরু করতে চায়নি–কিন্তু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চাঁদের মা ও পিতৃব্য। ভ্রূণহত্যা জীবনের গতিকে ব্যাহত করে দেবার এক নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা। পাপ খালাসের জন্য দিল্লীগমন, অনাগত জীবনকে পাপ হিসেবে আখ্যা দেবার এই প্রবণতা নিষ্ঠুর। এই সম্পর্কের মধ্যে নেই কোন ভালবাসা; কাজেই এই একটি কারণেই তরু ও হারানের বিপরীতে চাঁদের মা ও পিতৃব্যের অজাচারিতা অনৈতিক হয়ে ওঠে অমিয়ভূষণের কাছে। পিতা ও অনাগত সন্তানের জীবনরক্ষায় তরুর পাপ স্খলিত হয়ে যায়। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে হারান অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার লড়াইয়ে পরাহত হলেও অনলসম এক অনাগত সন্তানের মাতৃত্বে তরু হয়ে ওঠে প্রবলভাবে অস্তিত্ববান। অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন:

> চাঁদের জননীর ইনসেস্ট ও তার পাপ খালাসের বিপরীতে যদি তরুর ইনসেস্ট অথচ পিতা ও সন্তানকে জীবনাধিক করার প্রবল ইচ্ছাকে রেখে তুলনা করলে কি উপন্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়? (অমিয়ভূষণ, ২০০৯: ৫২৯)

একদিকে জীবনের অপ্রতিরোধ্য গতিকে মুক্তি দেয়া, অন্যদিকে জীবন-বীজকে সমূলে হত্যা করা–এই দুয়ের দ্বন্দ্বে অমিয়ভূষণ প্রথমটিকেই বেছে নেন। এতে সমাজ বৈরি হয়ে উঠলেও অমিয়ভূষণ তাকে গ্রহণ করেননি।

একটি বিশেষ সময়কালে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে প্রভুত্ব-বিস্তার করা কিছু নষ্ট মানুষ কী করে একজন প্রান্তিক-মানুষকে উৎখাত করছে, কীভাবে সেই ব্যক্তিপ্রাণ একা হয়ে পড়ছে এবং সেই একাকিত্ব থেকে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে গিয়ে কেমন করে তারই ঔরসজাত কন্যা পিতার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে–অমিয়ভূষণ সেই প্রান্তিক জনমানসের কথাই বলতে চান উপন্যাসে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাছে নিজের সত্তাকে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দেয়াটাই অনৈতিক, যে কাজটি করতে হয়েছিল নটী বিনোদিনীকে। তাঁর কাছে নতুন কিছু সৃজন মানেই বিদ্বেষ, ঘৃণাহীন ভালোবাসার প্রকাশ। পণ্যবাদী এই সমাজে ভালোবাসার বড্ড অভাব। তাই জীবনকে ভালবেসে তরু যে জীবন-বীজের পরিচর্যা করেছে, আর পাপ বলে সেই একই জীবন-বীজকে যারা খালাসের নামে হত্যা করতে চেয়েছে–এই দুয়ের মধ্যে অমিয়ভূষণের কাছে তরুই শ্রেয়তর। শেষ পর্যন্ত এই টানাপড়েন কাটিয়ে উঠে মাতৃত্বের শুদ্ধ সত্তা লালন করে তরু হয়ে ওঠে অস্তিত্ববান। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ লিখেছেন:

> বুর্জোয়াদের সামাজিক নিয়মকানুন যদি সবই ভাঙার উপযুক্ত হয় তবে পিতাপুত্রীর যৌনসংস্রবের ব্যাপারে যে নিষেধ, যাকে crime বলে, তাই বা মানতে হবে কেন? তা হলে ওটা তরুর কাছে sin বা crime নয়। সে বরং সেরকম নিন্দনীয় conception থেকে abortion কে বড় পাপ মনে করে। (রমাপ্রসাদ, ২০১৪: ৮৩)।

তিনি আরোও লিখেছেন:

> পৃথিবী হিংসা, দ্বেষ, অন্যায়, অবিচার সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে এরকম একটা অস্তিত্ববোধে একসময় আমাদের মন ভরপুর ছিল। কিন্তু যতই পথ হাঁটা হয়ে গেল মানুষের ততই যেন 'প্যানডোরার বাক্সের' থেকে বেরিয়ে এসেছে তার কালো কালো বিষাক্ত নিঃশ্বাস। রাজনীতি, শোষণ আর নিপীড়নের কালো পর্দাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, সবকিছু তার বিধানে পরিচালিত এমন আস্থা হারিয়ে গিয়েছে জীবন থেকে। অনেকেই বিশ্বাস করেন এই জগতে ভগবান নেই।...এ পৃথিবী ভগবানের তৈরি নয়। এখানে...জীবনের সুস্থতাবোধই যেন হারিয়ে গেছে কোথাও। তাই 'বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবীর' নায়িকা তরু আর তার বন্ধু চাঁদ মিথ্ তৈরি করে ভাবে যে পুরনো সুন্দর ভগবানের পৃথিবীটা থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের বর্তমান পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে। বিশ্বমিত্তির নামে একজন তার স্রষ্টা। (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ৯৪)

তরু দাস শেষপর্যন্ত পিতার জন্য চাঁদের প্রতি তার দুর্বলতাকেও বিসর্জন দেয়। চাঁদ স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারত তার জীবনে, হয়ে উঠতে পারতো তরুর শারীরিক-মানসিক জীবনের অংশীদার। পিতার সঙ্গে যৌনতায় তরু কোন যৌনাবেগে কম্পিত হয়নি। অথচ চাঁদ যখন তার বেড়ে-ওঠা শরীর স্পর্শ করতে চায়, তরু আবেগে আপ্লুত হয় তাতে। চাঁদের প্রতি যে আকর্ষণ তরুর, সেটি স্বাভাবিক নরনারীর মনোদৈহিক আকর্ষণ। অন্যদিকে, পিতার সঙ্গে সংঘটিত যৌনসংসর্গ তার মমত্ববোধ উৎসারিত–যৌনাবেগ উৎসারিত নয়। এভাবেই এ উপন্যাসে লেখক তাঁর সৃজিত চরিত্রগুলোর মধ্যকার মনোদৈহিক জটিলতার পর্দা উন্মোচন করেন। সম্পর্কগুলোর একাকিত্ব অনুভব করা যায়। সেইসঙ্গে উন্মোচিত হয় একটি কালের স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি-রাজনীতির স্বভাব বৈশিষ্ট্য। অমিয়ভূষণ তাঁর দর্শনকেও একইসঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

অমিয়ভূষণের উপর্যুক্ত চারটি উপন্যাসে আধুনিক নরনারীর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর চরিত্রগুলো কখনো কালের অভিঘাত আত্মসত্তায় বহন করে অস্তিত্বের টানাপড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয় বিমলপ্রভার মত, কখনো সমাজের প্রতিকূলে অবস্থান নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে প্রবলভাবে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে কিশোরী তরুর মত, কখনো-বা পলায়নপর সত্তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে মনোজাগতিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয় বিলাস বিনয় বন্দনার মত, আবার কখনো-বা বৈরি সভ্যতার চাপে ক্লান্ত হয়ে নিজের ভেতর আশ্রয়ের খোঁজে বিবিক্ত হয় হৈমন্তী সেনের মত।

অমিয়ভূষণের নরনারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার মুখে হেরে যায়নি। বরং বার বার সামলে নিয়ে জীবনের প্রবহমান বৈরি স্রোতে উজান ঠেলে তারা। জীবন থেকে পলায়নপরতাও যে নেই–তা নয়। কিন্তু সেই পলায়নপরতা অমিয়ভূষণের চোখে জীবনবিমুখতা নয়, বরং সমকাল আর জীবন-আভিঘাতস্পৃষ্ট মানুষগুলোর জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়; নতুন এক ঘেরাটোপে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার ইতিহাস এই পলায়নপরতা। *বিলাস বিনয় বন্দনা* আর *বিবিক্তা* উপন্যাসে পলায়নপরতার বিষয়টি বেশ গভীরভাবে প্রকাশিত। এ দুটি উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> অমিয়ভূষণের বিনয়-হৈমন্তীরা যাকে পলায়ন বলে, তাও আসলে পুনরুজ্জীবন। জীবন-মৃত্যু-পুনর্জন্মের ক্রিয়ায় দোলে তারা: বিনয় ও হৈমন্তী (এবং বিলাসও) এক জীবনে বহুজীবন বাঁচে: এই বাঁচার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা, বিভাজন নেই। আসলে আধুনিক জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে, সময়ের মুখোমুখি হয়ে তারা একটা গ্রেট টাইম-এ ঝাঁপাতে চায়।...ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে বারবার সত্তার শুদ্ধতায় আসার চেষ্টা । যাকে বলা যায় সময়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, তাই উপন্যাস দুটির চরিত্ররা করতে চায়: আধুনিক সময়ে ও জগতে এটাই একটা বড় সংগ্রাম। (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৪: ২৯)

অসাধারণ সংযমে, নির্লিপ্তচিত্তে অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। কালের বিধ্বংসী বৈরি সত্তাকে নিজের ভেতর ধারণ করেই তাঁর একেকটি চরিত্র জীবনের জয়গান গেয়েছে।

সহায়কপঞ্জিঃ

অর্ণব সেন (২০০১)। "অমিয়ভূষণ: শব্দের খাঁচায়, বৃত্তের বাইরে", 'বৈতালিক', তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৫ ই মাঘ, কলকাতা। পৃ. ৪২-৫১

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৫)। 'নির্বাস', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৩, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৭)। 'উপন্যাস সম্বন্ধে', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৫, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৮)। 'বিবিক্তা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৬, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৮)। 'বিলাস বিনয় বন্দনা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৬, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার ও এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৯)। 'সাহিত্যিক জীবন মহাশয়', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৭, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার ও এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৯)। 'বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী' *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৭, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৯)। 'লিখনে কি ঘটে', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৭, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০১০)। 'পদ্মাপুরাণ কথা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৮, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ইমতিয়ার শামীম (২০১২)। *কখনো বৃষ্টি শেষে*, মধ্যমা, ঢাকা।

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী (১৪১৭)। *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ* দ্বিতীয় খণ্ড, ভাষা বিন্যাস, কলকাতা।

গৌতম রায় (২০০৩)। "দুঃখ দিনের রক্তকমল", 'নহবত', ৪০ বছর বিশেষ সংখ্যা, একালের বিস্ময় : কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, কলকাতা। পৃ. ৫৬-৬০

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪)। "অমিয়ভূষণের দুটি", 'উত্তরাধিকার' চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১৬-৩০

প্রবাস দত্ত (২০০১)। "বিবিক্তা ও বিবিক্ত লেখক অমিয়ভূষণ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ২০৭-২১১

বাসব দাশগুপ্ত (২০০১)। "অমিয়ভূষণের আলোকে অমিয়ভূষণের বিলাস বিনয় বন্দনা", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ.১৬৮-১৭৭

বিপ্লব মাজী (২০০৮)। 'বাংলা উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন', *বাংলা উপন্যাসের ২০০ বছর*, বিপ্লব মাজী সম্পাদিত, অঞ্জলী পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭)। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বীতশোক ভট্টাচার্য (২০০৬)। *গদ্যগঠন*, বাণীশিল্প, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৭০)। *রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা* (অনূদিত), এম. সি অ্যান্ড সন্স প্রা. লিঃ, কলকাতা।

মননকুমার মণ্ডল (২০১৪)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাস ব্যষ্টি ও সমষ্টি*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

মোসাদ্দেক আহমেদ (১৪২১)। "অমিয়ভূষণের প্রেম ও যৌনচেতনা", 'কালি ও কলম', দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা চৈত্র, ঢাকা। পৃ.২১-২৩

রমাপ্রসাদ নাগ (২০০২)। *স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

রমাপ্রসাদ নাগ (২০১৪)। *অনন্য অমিয়ভূষণ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

রমাপ্রসাদ নাগ (২০০১)। "প্রসঙ্গ : অমিয়ভূষণ, নিঃসঙ্গ মানুষের পথচলা এবং উত্তরণ", 'বৈতালিক', তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৫ ই মাঘ, কলকাতা। পৃ. ২৬-৪১

রাশিদা আখতার খানম (২০১৫)। "দেহ মন সম্পর্ক ও প্যারাডাইম তত্ত্ব", 'দর্শন ও প্রগতি', বর্ষ ২৯: ১ম ও ২য় সংখ্যা, ঢাকা। পৃ. ৩৩-৫৪

শিশিরকুমার দাশ (১৯৯২)। *সফোক্লেসের রাজা ও ইদিপৌস* (ভাষান্তর: শিশিরকুমার দাশ), প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা।

শুভময় মণ্ডল (২০০১)।"নির্বাস: বিন্যাসের বিপর্যয়ের সৌকর্য", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১২৮-১৪৬

শুভময় সরকার (২০০৪)। "অমিয়ভূষণের ছোটগল্প–এক নিজস্ব স্টাইল", 'ঐক্য' ক্রোড়পত্র অমিয়ভূষণ, ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ. ৫৭-৬১

আজিজুল হক, সৈয়দ (১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সমীর চক্রবর্তী (১৯৯৫)। "ব্যক্তি অমিয়ভূষণ", 'উত্তরাধিকার', অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ. ১৬৮-১৭৬

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯৫)। "বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী: অনল-দহিত জীবন", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১৪৪-১৫৭

হুমায়ুন আজাদ (২০০১)। *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Freud, Sigmund (1933). *New Introductory Lectures on Psycho-Analysis*. (Tr. W.J.H. Sprott). The Hogarth Press L.t.d. London

Freud, Sigmund (1940). *An Outline of Psychoanalysis*. (Tr.James Strachey). NewYork.

Freud, Sigmund (1949). *Three Essays On the Theory of Sexuality*. (Tr.James Strachey). London.

সাক্ষাৎকার:

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯৯৪)। "আমাদের দেশে যদি সমালোচক থাকত তবে লোকে বুঝত কোনটা উপন্যাস, কোনটা উপন্যাস নয়...", অনিন্দ্য সৌরভ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, 'উত্তরাধিকার', অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ. ১-৩২

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯৯৫)। "মরণকে শ্যামসমান মনে করতে গেলে হাসি পায়", অনিন্দ্য সৌরভ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, 'উত্তরাধিকার', অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ. ৩৩-৪২

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯৮২)। অরুনেশ ঘোষ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, "সাক্ষাৎকার / ৩" (ক্ষুধার্ত-৩ থেকে গৃহীত), বিজ্ঞাপন পর্ব, দশম বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর, কলকাতা। পৃ. ১৭-৪২

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০২)। ১৯৮৯ সনে রমাপ্রসাদ নাগ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, *স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা। পৃ. ৯৪

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯৯২)। "স্মৃতিচারণ, সাক্ষাৎকার ও পত্রালাপে অমিয়ভূষণ", [১৯৭০ থেকে ১৯৮৬'র নভেম্বর পর্যন্ত চতুরঙ্গ, নবার্ক, বিজ্ঞাপন পর্ব, মনন প্রভৃতি পত্রিকার সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্র থেকে সংকলিত, (গ্রন্থনা: সমীর চক্রবর্তী)], অমিয়ভূষণ মজুমদার: পঁচাত্তরতম জন্মদিন স্মারক পত্রিকা, কলকাতা। পৃ. (পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ নেই)

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাস ও পুরাণের মিথস্ক্রিয়া : বৈশ্য শ্রেণির অস্তিত্বসন্ধান

অমিয়ভূষণ মজুমদারের *মধু সাধুখাঁ* (১৯৮৮) ও *চাঁদবেনে* (১৪০০) উপন্যাসে বৈরি কাল ও বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে অপরাহত দুই ব্যক্তিসত্তার একজন সমতটের চাঁদ এবং অন্যজন পূর্বস্থলীর মদু সাঁ। অষ্টম-নবম এবং ষোড়শ শতকের মত ভিন্ন সময়পট থেকে তুলে আনা এই দুই চরিত্র ঐতিহাসিক না হলেও তারা প্রবলভাবে কালচিহ্নিত। একালে '...কোনো একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা ঘিরে মোটামুটি সংগত পরিবেশে একটি কাহিনি বয়ন করতে পারলেই যে ঐতিহাসিক উপন্যাস হবে–এই ধারণাটি কিছু পুরোনো হয়ে গেছে। জনমন ও জনজীবনের সামগ্রিক রূপ ও গতি পরিবর্তনের সূত্রগুলি নির্ণয় করার চেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে ইতিহাসবোধ' (সুমিতা, ২০১৬: ২৭৫)। এই বোধের আলোকে *চাঁদবেনে* কিংবা *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যাবে, চাঁদ কিংবা মধু–দুজনের কেউই ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়। তাদের স্থাপন করা হয়েছে বিস্তৃত এক ইতিহাসপটে। উপন্যাসে ব্যক্তির সময়বলয় এবং তাদের হয়ে উঠবার ক্ষেত্র নির্মাণে ইতিহাস ও মিথের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। বৈশ্য শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে এ দুই চরিত্রই পুঁজির ধারক, স্বপ্নচারী, টিকে থাকবার লড়াইয়ে অপরাহত এবং প্রগাঢ়ভাবে জীবনবাদী। আলোচ্য অধ্যায়ে উপন্যাস বিশ্লেষণপূর্বক প্রাচীন ও মধ্যযুগের সময়পটে প্রতিস্থাপিত বৈশ্য শ্রেণির অচিহ্নিত দুই ব্যক্তি-মানুষের জীবনবেদ, তাদের সংকট এবং অস্তিত্বসন্ধিৎসাকেই মুখ্য করে তোলা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক কালপটে রূপায়িত বাঙালির জলবাণিজ্য জীবনের কথকতা এই দুই উপন্যাসের মূল বিষয়। চাঁদবেনে চরিত্রের ভেতর গাঢ়ভাবে মিথের বীজ প্রোথিত। অন্যদিকে, *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে মধু চরিত্রের ভেতর মিথের অনুরণন না ঘটলেও চরিত্রটির চেতনা নির্মাণে মিথ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। নৃতাত্ত্বিক লেভি স্ট্রস মনে করেন, মিথ ইতিহাসের ভিত্তি রচয়িতা–ইতিহাসেরই সম্প্রসারণ। মানবমনের আদিমতম মানসরূপের প্রকাশ মিথ এবং এর ভেতরই প্রোথিত থাকে ইতিহাসের বীজ। অমিয়ভূষণের চাঁদ ও মধু–এই দুই ব্যক্তিচরিত্রও মিথ ও ইতিহাসের পটে ছায়া ফেলে হয়ে উঠেছে গভীরভাবে অস্তিত্বসন্ধিৎসু। 'মিথ ইতিহাস রচনার উপকরণ দিয়ে প্রকারান্তরে ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে যায়' (হাসনাত আবদুল, ২০১২: ৩৭)। একারণেই *চাঁদবেনে* উপন্যাসে সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র চাঁদের ভেতর লোকপুরাণচরিত্র চাঁদ সদাগরের বলিষ্ঠ ছায়াপাত ঘটেছে। কিংবা *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসের ইতিহাসসংশ্লিষ্ট 'গোসানিমারী মিথ' মধুর নিয়তিচেতনা ও পরিণামবোধ ঘনীভবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উপলব্ধি করা যাবে, কালের অভিঘাত আর মিথের আন্তঃযোগ *চাঁদবেনে* এবং *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসকে অভিনবত্ব দিয়েছে।

চাঁদবেনে

লোকপুরাণের চাঁদ সদাগরের সংগ্রামশীলতা আর অহমবোধ চাঁদ চরিত্রের মূল প্রবণতা হলেও অমিয়ভূষণ তাঁর চাঁদবেনে চরিত্রকে ইতিহাস আর স্থানের নির্মোকে পৃথক করে তুলেছেন। অমিয়ভূষণের যৌথ নির্জ্ঞানে সংগুপ্ত পুরাণ (কনটেক্সট) আর ইতিহাসকথার মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট সমতটের (প্রাচীন বাংলার জনপদ সমতট নয়; এই

সমতটের অবস্থান সিংহলে) চাঁদবেনে এক প্রাতিস্বিক নির্মাণ। পুরাণের দৈবী-বলয় আর অলৌকিকতার আদল ভেঙে এ উপন্যাসের চাঁদ হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ এক মানবিক চরিত্র, যে দাঁড়িয়ে আছে অষ্টম-নবম শতকের ঐতিহাসিক-কালপটে। দৈবের বিরুদ্ধে নয়, কাল, ভাগ্য আর মানুষের অবচেতনে সংগুপ্ত সর্পিল-অন্ধ আর অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। সমালোচকের ভাষায়:

> পরম্পরালব্ধ অলৌকিক আখ্যান থেকে লৌকিক কথাসরিৎ সাগরে–খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকের ঔপন্যাসিক পটভূমিকায় পৌঁছাতে এবং সেই সুদূর অতীতের মানব মানবীকে তাদের মনসমেত পুনরুপস্থাপনে বাস্তবিকই এক শক্তি পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল লেখককে। ইতিহাস, পুরাণ, জনশ্রুতি ও মিথের কুয়াশায় ঢাকা চাঁদ-আখ্যানকে কল্পনার সংমিশ্রণে, কৃৎরীতির অভিনবত্বে যেভাবে তিনি হাজির করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর শিল্পী প্রতিভারই পরিচয়। (পৃথ্বিশ, ২০০১: ২১৭)

এই উপন্যাস সম্পর্কে অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'পুরোটাই আমার ক্রিয়েশন। বাট বেজ্‌ড অন হিস্ট্রী। বেজ্‌ড অন ফ্যাক্টস' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৭৯)। *চাঁদবেনে* সম্পর্কে লেখকের এই বক্তব্য উপন্যাসে কল্পনা আর ইতিহাসের সপ্রাণ উপস্থিতিকে দৃঢ় করে তোলে। পরবর্তীকালে, *চন্দ্রকান্ত* (১৭৭২ এর সমসাময়িককালে প্রকাশিত) নামক এক ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, 'চন্দ্রকান্ত নামে মল্লভূমনিবাসী একজন গন্ধবণিক সাতখানি তরী বাণিজ্যদ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন' (রমেশচন্দ্র, ১৩৭৩: ২৩৬)। এই চন্দ্রবণিক সমতটের চাঁদবেনে কিনা, সে বিষয়টি নিয়ে এখন আর নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় না থাকলেও, এরকম কারো উপস্থিতি ইতিহাসে ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। সমালোচক উদয়শংকর বর্মা মনে করেন, চাঁদবেনে 'ইতিহাসকথা নয়, পুরাণকথা। বণিকসংস্কৃতির কাব্যিক মানবায়ন। অলৌকিক অন্ধকার এবং মিথোলজিক্যাল রহস্য মিশিয়ে রূপদক্ষ কথাশিল্পীর জীবনকে স্পর্শ করার চেষ্টা।...পৌরাণিক আবহ থাকায় বাস্তবতার প্রশ্নগুলি বড় হয়ে ওঠে না। এমনকি ইতিহাসও পুরাণকে ছাপিয়ে যেতে পারে না' (উদয়শংকর, ২০০৮: ৪৭)। সমালোচক উদয়শংকরের পুরো বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া দুরূহ। কারণ, অমিয়ভূষণ চাঁদকে এক ঐতিহাসিক পটে প্রতিস্থাপিত করেছেন, যার সঙ্গে অমিয়ভূষণের 'কালেকটিভ আনকনশাস' বা যৌথ নির্জ্ঞানচেতনায় সংগুপ্ত লোকপুরাণের অভিজ্ঞানও সংযুক্ত হয়ে গেছে। একজন লেখকের চেতনায় পূর্বসূরি-যাপিত কৌমজীবনের স্মৃতি-ভাবনা-বিশ্বাস-সংস্কার বীজরূপে প্রোথিত থাকে। একে বলা হয় যূথবদ্ধ প্রত্নপ্রতিমা। এ সম্পর্কে C. G. Jung লিখেছেন :

> But This personal unconscious rests upon a deeper layer, which does not derive from personal experience and is not a personal acquisition but is inborn. This deeper layer I call the collective unconscious. (Jung, 1974: 205)

সমালোচক মনে করেন:

> বর্তমানকালেও মানুষের মনে "সামূহিক-নির্জ্ঞান" বা 'collective unconscious' একটি গুণ সক্রিয় থাকায় সুপ্রাচীনকালে মিথের মধ্য দিয়ে আদি মানবগোষ্ঠী যে ভাবে তাদের গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ করেছিলেন–সেই সব মিথের আকর্ষণ আমাদের কালেও প্রবল।...'সামূহিক নির্জ্ঞানের' ('collective unconscious') বিষয়বস্তুকেই আমরা মানবমনের ইতিহাসে আবহমানকাল পুনরাবৃত্ত 'আদিরূপ' বা

> 'আর্কেটাইপ' (Archetype) বলতে পারি।...ইয়ুং তাই প্রাচীন মানবজাতির অপ্রাকৃত মিথ-কাহিনী, লোককথা, লোকগীতি প্রভৃতির মধ্যেই ঐ সামূহিক-নির্জ্ঞানের পরিচয় সন্ধান করেন। (কমলেশ, ১৯৮০: ৪০-৪১)

অমিয়ভূষণ নিজেও এর মধ্য দিয়ে গেছেন। একারণেই তাঁর সামূহিক নির্জ্ঞানচেতনায় সংগুপ্ত লোকপুরাণের চাঁদ সওদাগরের অনমনীয় দার্ঢ্য ও সুদৃঢ় অহমবোধের অনিবার্য ছায়াপাত ঘটেছে *চাঁদবেনে* উপন্যাসের চাঁদ চরিত্রে। কাজেই বলা যেতে পারে, চাঁদবেনে চরিত্র পুরাণকথা আর ইতিহাসকথার মিথস্ক্রিয়ায় রচিত আত্মানুসন্ধানী এক প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্ব। অষ্টম-নবম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কালপটে প্রতিস্থাপিত চাঁদের অর্ন্তমানসে তাই লোকপুরাণের চাঁদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে। সমালোচক মনে করেন:

> অর্থাৎ...লেখক...মিথকে ইতিহাসরূপে তুলে ধরতে চান,...উপন্যাসের নাম যদি হয় 'চাঁদবেনে', উপন্যাসে যদি থাকে মনসামঙ্গলের চরিত্র, তাহলে মিথের অনুষঙ্গ সহজ স্বাভাবিকভাবেই মনে এসে যাবে।...'চাঁদবেনে' উপন্যাসে মিথকে ইতিহাসে রূপান্তর কিংবা ইতিহাস ও মিথের সম্পর্ক স্থাপন কোনোটাই মেলে না। অমিয়ভূষণ...মধ্যযুগের একটি কাল পর্যায়ের বণিক জীবন অবলম্বনে ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা করতে চেয়েছেন। এ উপন্যাস যতটা মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের কাহিনী তার থেকে অনেক বেশীমাত্রায় চম্পাবতী নদীতীরবর্তী চম্পক বা চম্পানগরের বাঙালী বণিক চন্দ্রশেখর বসুর কাহিনী। এ হলো সমতটের বসু বণিকের গল্প। (রবিন, ২০০০: ১৬৫-১৬৬)

অমিয়ভূষণ চাঁদবেনেকে চাঁদ সদাগর থেকে পৃথক এক ব্যক্তিপরিচয়ে উদ্ভাসিত করলেও তাঁর যূথবদ্ধ প্রত্নপ্রতিমায় সংগুপ্ত ঐতিহ্যবোধ থেকে চাঁদবেনে নামটিই উঠে আসে। '...খাঁটি মিথের মধ্যে অন্তঃশীল থাকে যে 'Ideal Eternal History', সেই নির্বস্তুক শাশ্বত ইতিহাস, অপ্রতিরোধ্য ও দুঃসমাধেয় বিরোধের কালাতীত উপাখ্যান চাঁদ সদাগরের কাহিনীর মধ্যে বদ্ধমূল' (অশ্রুকুমার, ২০১৪: ১৬২)। অমিয়ভূষণের চাঁদের ভেতরেও মিথ-ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় এক দুঃসমাধেয় বিরোধের অনুরণন উপলব্ধি করা যাবে।

চাঁদবেনে উপন্যাসে চাঁদ নামটির গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেন:

> ...আমাদের জীবনে Collective Unconscious-এও একরকম মূলছোঁওয়া চরিত্র এবং এরকম বণিক, যদি অন্য একজনের নাম করতাম সেটা বিশ্বাসযোগ্য হত না। সেটা 'চাঁদবেনে' নাম দেওয়াতে সকলের বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এছাড়া আর কিছু নয়, নামটা ধার করা হয়েছে। কারণ আর কেউ নেই ওইরকম চাঁদবেনের মত বেনে যে ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করতে যেতে চায়, যে কালকে অতিক্রম করে যেতে চাইছে। মেডিটারেনিয়ানে বাণিজ্য করবে ভারতবর্ষ, কিন্তু এতদিন আগে যেতে চায়...আমাদের বাণিজ্য তখন কোণঠাসা হয়ে গেছে। তখন আরবীয়রাই কেনে, ক্রেতার বাজার তাদের দখলে। তারা যে দাম দেয় সে দামেই বেচতে হয়। ফলে আমাদের বাণিজ্য নেমে যাচ্ছে...সেই সময়, at the period of time চাঁদ দুহাজার বছর এগিয়ে এল। যা আমি উৎপাদন করব তা আমিই বিক্রী করব। এই 'এগিয়ে এল' করতে গেলে একটা অনৈসর্গিক চরিত্র দরকার। অনৈসর্গিক নাম দিতে হবে একটা। সেইজন্য ওই নামটা রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই বলে নেওয়া হয়েছে, এ চাঁদ সে চাঁদ নয়। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৮১-৮২)

লেখকের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে পাঠক উপলব্ধি করবেন, বাঙালির বাণিজ্যজীবনের ক্রান্তিকাল উত্তরণে এমন এক অপরাজেয় নামের প্রয়োজন ছিল, যা একমাত্র পুরাণের চাঁদ চরিত্রের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। এই বোধ থেকেই অমিয়ভূষণ উপন্যাসে এই নামটি গ্রহণ করেছেন। তবে, পুরাণের দৈবযোগ থেকে এই চাঁদ পুরোপুরি মুক্ত। স্বপ্নচারিতা-কৃতকর্ম-দোষ-গুণ আর নিরন্তর সংগ্রামশীলতায় চাঁদ 'অষ্টবসুদের একজন ছিল বলেই তার নামের শেষে বসু যোগ করা হয়, আসলে সে চাঁদবেনে, এমন জনশ্রুতি আছে; নতুবা তাকে চাঁদসদাগরের কাহিনীর মূল চরিত্র মনে করার অন্য কোনো যুক্তি নেই' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৫)–লেখকের এরকম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে চাঁদবেনে তার পাপ-পুণ্য-স্বপ্ন নিয়ে পুরোপুরি মানবিকরূপে উঠে আসে। তবে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনি উৎস 'লোকপুরাণ' সম্পর্কে লেখক তাঁর 'পদ্মাপুরাণ কথা' প্রবন্ধে যা লিখেছেন, তার সঙ্গে ভাগ্যাহত চাঁদের দৃঢ়চিত্তের আত্মযোগ রয়েছে বলে মনে হওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক নয়:

> কোনো মহাবণিকের কি এরকম দ্বিধা জন্মেছিল মনে যে, চম্পকনগর থেকে গঙ্গা বেয়ে নেমে সাঁওতালি অঞ্চল পার হয়ে অতঃপর কোন পথে সমুদ্রে যাবে? গঙ্গা বেয়ে শিব-সদৃশ কপিল মুনির আশ্রমের পাশ দিয়ে গঙ্গাসাগরে? পদ্মা বেয়ে সমতটের কূলের সমুদ্রে? এমন কি হতে পারে, সেই এক মহাবণিক, যে ভীষণ একগুঁয়েও ছিল, বার বার গঙ্গার পুরনো খাত বেয়ে চলতে গিয়ে সেনরাজাদের নৌবিতানের সংঘর্ষে লোকসান দিচ্ছে, তথাচ পদ্মা বেয়ে চলছে না? এটাই কি চাঁদের ও মনসার কাহিনির উৎস? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫২১) ।

চম্পা নগরের মহাবণিকের এই একগুঁয়েমীপনাতেই সমতটের চাঁদের সাযুজ্য, তার যোগ। আর যে অযোগের কথা অমিয়ভূষণ বলেছেন সেটি হলো, পুরাণে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের বিষয়টি এখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত (যেমন মনসার পূজা প্রতিষ্ঠায় হয়েছে)। এটি উপন্যাস, যেখানে মানবের (চাঁদের) নিরন্তর সংগ্রামশীলতা মানবের কল্যাণেই উৎসর্গীকৃত, দেবীর জন্য নয়। মানবচরিত্রের বিস্তার নিয়েই তাই রচিত এই উপন্যাস। পাপপুণ্যের বিচার এখানে করা হয়নি। চাঁদের কৃতকর্মে উপন্যাসে এক প্রবল মানবীয় পুরুষের রূপকল্প নির্মিত হতে থাকে। অমিয়ভূষণ জানান:

> আমরা এই কাব্যের প্রথমেই স্বীকার করেছি, সমতটের বণিক চন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে পুরাণে বিখ্যাত সেই চাঁদবেনের সংযোগ থাকাই সন্দেহস্থল। আমাদের চন্দ্রবসু তো এক বণিক, যার দোষত্রুটি এমন কিছু কম নয়। সে নটীদের গুণগ্রাহী, তাদের কাউকে বা বন্ধু হিসাবে আলিঙ্গন করে। নিজের বাণিজ্যপ্রয়োজন সিদ্ধি করতে নিরপরাধ তাঁতিগোষ্ঠীকে ধর্মের নামে অলৌকিক সমুদ্রদেবতার গল্প তৈরি করে দ্বীপান্তরে পাঠায়। নিজের মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে চেহারায় ও হাবভাবে মিল থাকায় পরস্ত্রী ও ভৈরবী জেনেও তাকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। সুবর্ণদ্বীপ সুমাত্রা থেকে ভারতে আসতে উপকূল বরাবর চলা যায়। কিন্তু সে অনেক সময়ে মধ্যসমুদ্রের সমুদ্রস্রোত ধরে রাত্রির অন্ধকার, ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্ভবনাকে উপেক্ষা করে মাল্লাদের অকাল সলিলসমাধির ঝুঁকি নিয়ে জাহাজ চালায়। সে ব্রম্ম নামে অপরিপক্ব সভ্যতার এক জাতিকে ধম্মপদ ও ত্রিপিটকের কিছু পেতে সাহায্য করে, হয়তো পালি ব্যাকরণ ও লিপিও শিখায়, শেষপর্যন্ত সে দেশের মরকত-রক্তমণির একচেট্টি অধিকার পেতে। তার জন্য পঞ্চদশী এক ব্রম্ম-রাজকন্যাকেও সে বিবাহ করে।...
>
> সে সুমালি নামে এক অর্ধসভ্যদেশে পঞ্চাশ জোড়া স্ত্রীপুরুষকে মদে বিহ্বল করে পাঠায়, হয়তো, সেই পঞ্চাশ পুংশ্চলী-বেশ্যারা স্বামী-সন্তান নিয়ে বাস করতে বাধ্য হলে একদিক দিয়ে তাদের উন্নততর জীবন

> দেয়া হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য তো সেই আবিসি সাম্রাজ্যের প্রান্তে এক ভারতীয় কলোনি স্থাপন করা, যেখানে কালে কেরলী কার্পাস বস্ত্র তৈরি হবে। আর তাও এজন্য, আবিসি-সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করতে করতে নীলনদ ধরে রোমক সমুদ্রে পৌঁছানো। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৬২)

চাঁদের মত প্রবল জীবনবাদী এক বণিক পুরুষের ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সামষ্টিক এক স্বপ্ন রচিত হয়েছে এখানে। উপন্যাসে চাঁদের অপরাহত অভিযান, সমুদ্রজুড়ে নিরন্তর বিচরণ কিংবা সভ্যতা-অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষার ভেতর পুরাণকথার অন্তরে বাঙালি বণিকের স্বপ্নবীজ প্রোথিত হয়ে গেছে। আমাদের বাণিজ্যগত ক্রান্তিকালের ইতিহাস মুদ্রিত এখানে। লেখক যদিও বলেছেন, ক্রান্তিকাল উত্তরণে উপন্যাসে ভাগ্যের কাছে পরাজিত মানুষের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তবু উপলব্ধি করা যাবে, বিধ্বস্ত হলেও চাঁদ শেষপর্যন্ত অপরাজিত।

এ উপন্যাসের সময়কাল অষ্টম থেকে নবম শতক। এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ বলেন, 'খ্রিস্টিয় অষ্টম কি নবম শতাব্দী।...চাঁদবেনে সেইসময়কার মানুষের কথা, যখন অলৌকিকে বিশ্বাস ও বিজ্ঞানচেতনা দুই-ই রয়েছে–ম্যাজিক ও রিয়ালিটির মত।...উপন্যাসে চাঁদের সঙ্গে সাপের যুদ্ধ নেই,...তার সঙ্গে যদি কারও যুদ্ধ হয়ে থাকে, তবে তা ভাগ্যের ও কালের' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৭৮-৭৯)। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান ঘটবার আগে যখন পাল শাসকেরা শাসন করছিল, কিন্তু তাদের পতন আসন্ন, সেই কালপটেই উপন্যাসটি রচিত। জল-বাণিজ্য-ব্যক্তির সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা এ উপন্যাসের কাল নির্মাণ করেছে। সমালোচকের মতে:

> মহাকাব্যিক কল্পনার উপযোগী মহাসময় ও মহাপরিসরের আভাস তিনি দিয়েছেন পাঠকৃতিতে।...ইতিহাসের আভাস থেকে রূপরেখা মাত্র সম্বল করে কালপ্রবাহকে তিনি বিশিষ্ট খণ্ড সময়ে ধারণ করেছেন এবং ভূমধ্যসাগর থেকে মহাচীন পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরকে রূপান্তরিত করেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষিতে...মহাকালের তরঙ্গবিক্ষোভকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে প্রত্নকথা থেকে কল্পিত বাস্তবে এবং কল্পিত বাস্তব থেকে প্রত্নকথায় বারবার যাতায়াত করেছেন লেখক। (তপোধীর, ১৯৯৯: ৬৫)

সমালোচকের এই বক্তব্য থেকে *চাঁদবেনে* উপন্যাসের সময়কাঠামোর মূল প্রবণতা সম্পর্কে জানা যাবে। ইতিহাসের আভাসমাত্র গ্রহণ করে, অষ্টম নবম শতকের পটে দাঁড়িয়ে লেখক যে বিস্তৃত বাণিজ্যজীবন, বাণিজ্যপথ ও ভূগোলের আদল নির্মাণ করেছেন, সেটি সত্যিই অভিনব। বাণিজ্য জীবনের সংকট রূপায়ণে তিনি উপন্যাসে বস্তুনিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন। এইসব ছবি মূলত সমকালকেই কংক্রিট করে তোলে। চাঁদ কিংবা তার মত বণিকদের বাণিজ্যজীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রতিকূল বায়ু-স্রোত, সমুদ্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে প্রতিযোগী বিরুদ্ধ রাজন্যবর্গের বৈরিশক্তি, সমসাময়িক রাজন্যদের বিরুদ্ধ-মনোভাব কিংবা জলদস্যুর মত অপশক্তির মুখোমুখি হয়ে অনিশ্চিত জীবনের মধ্য দিয়েই সমুদ্রপথে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে, যৌথিক খনিজ বাণিজ্য অঞ্চল থেকে স্বর্ণদ্বীপে যাবার পথে সমতটের বণিক জলদস্যু ইন্দুধবর বাণিজ্য জাহাজ লুট করবার কথা। শুরসেন মন্তব্য করেছিল:

> আমরা জানি, বাণিজ্যপথ চিরদিনই ছায়াপথের মতো। কালো নয়। উজ্জ্বল আলোকিত নয়। আজ যে বণিক, কাল সে দস্যু হতে পারে। বিধিমতো পণ্য-শুল্ক দিলে রাজারা বণিকদের প্রশ্রয় দেয়। বিপদে আশ্রয়দাতাও

> হয়। কোনো কোনো রাজা অধীর হয় বটে। নিজেই একই সঙ্গে রাজা আর বণিক হতে চায়। শুল্কের বদলে জাহাজই কেড়ে নিতে চায়। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২০৫)

বণিকদের অস্তিত্বসংকটের এ এক প্রধানতম দিক। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জলবাণিজ্যের জন্য। কেননা শাসকের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বাণিজ্যজীবন বেঁচে থাকে। বাণিজ্যপথ সুগম রাখতে শাসকের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। রাজন্যবর্গের সীমাহীন অত্যাচারে উপন্যাসে সেকালের বণিকদের টিকে থাকার সংকটময় চালচিত্র উঠে আসে। উপন্যাসে চাঁদের তিনটি জাহাজ রাজনৈতিক পালাবদলে সংকটে পতিত হয়ে লোকসানের সম্মুখিন হয়। সুমালি-আবিসিনিয়া আর জিড্ডায় বাণিজ্য শেষে জাহাজগুলো ইসমাইলিয়ায় পৌঁছলে স্তম্ভিত চাঁদ উপলব্ধি করে, চাঁদের সহযোগী শাসক সৈয়দ আলি মাদানির পরিবর্তে গদি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সহোদর সৈয়দ মুসা তখন অধিকর্তা। কাজেই মুসার নালিশে মাদানি কাঠগড়ায়; যে কারণে চাঁদের মধুলুব্ধা আর মধুলিট ইসমাইলিয়ায় অন্তরীণ হয়ে পড়ে থাকে প্রায় মাসাধিককাল। এইসব অনিশ্চিতি, বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জলদস্যু ভীতি, লাভলোকসানের হিসাব এবং ঝড়-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জলজীবন অস্তিত্বসংকটপূর্ণ বণিকজীবনসংশ্লিষ্ট এক তরঙ্গায়িত সময়কেই তুলে আনে।

সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার ইতিহাসও মুদ্রিত উপন্যাসে। পল্লব সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য, যার সময়কাল দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে নবম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইতিহাসে পল্লব রাজ্যের ভ্রাতৃবিদ্রোহের কথা জানা যায়, যাকে অমিয়ভূষণ এখানে ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই দ্রোহে সমতট জড়িয়ে পড়ে। নন্দীবর্মণের জীবদ্দশাতেই নৃপতুঙ্গ যুবরাজ ছিলেন, যদিও সম্রাট বলে স্বীকৃত নন। সে পথে বৈমাতুর অপরাজিতপল্লবই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নৃপতুঙ্গের শাসক হতে চাইবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই যুদ্ধের সূত্রপাত। উপন্যাসে এই যুদ্ধের উল্লেখ বহিরাঙ্গিক সময়কে চিহ্নিত করে। যে সমতট ছিল মূলত বণিকশ্রেণির প্রাণসম, সময়ের অভিঘাতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার মধ্য দিয়ে সেই সমতট অস্তিত্বসংকটে পতিত হয়। নবম শতকের একটি ঐশ্বর্যশালী উপনিবেশের বাণিজ্যজীবন এভাবেই পুনঃনির্মিত হয়। 'অসংখ্য কুশীলবের পরিসর সন্নিবেশিত হয়েছে এই আখ্যানে। কেননা অমিয়ভূষণকে লুপ্ত সময়ের সম্ভাব্য সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-দার্শনিক অভিজ্ঞান পুনরাবিষ্কার ও পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে' (তপোধীর, ১৯৯৯: ৬৩)। এভাবেই লেখক উপন্যাসে প্রাচীন বণিকজীবনের এক অস্থির সময়পটের আদল নির্মাণ কনে।

আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত ক্রীতদাস ব্যবহারের বিষয়টিও সমকালকেই চিহ্নিত করে দেয়। ক্রীতদাস এ উপন্যাসে 'সময়ের চিহ্ন' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৫)। লেখকের ভাষায়:

> 'লোহিতসাগরের পশ্চিম তীরে যে দেশ, সেখানেই এরকম দাস পাওয়া যায়। তারও দক্ষিণে আরবি বণিকেরা এদের বিনাপয়সায় সংগ্রহ করে। ধরে আনলেই হলো। এরাও নিজেদের মধ্যে সব সময়েই যুদ্ধ করে; গ্রামে গ্রামে, উপজাতিতে উপজাতিতে যুদ্ধ। যুদ্ধবন্দীরা ভক্ষিত হয়। ভক্ষিত হওয়ার চাইতে বিক্রীত হওয়া ভালো। ওদের দেশে রাজাও আছে। নিজে যে উপজাতি, তা ছাড়া অন্য উপজাতীয় প্রজাদের, আরবীয় অস্ত্র, বস্ত্র ইত্যাদির বদলে বিক্রিও করে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৯৯)

সমতট কিংবা বাণিজ্য-জাহাজগুলোতে শ্রমিক হিসেবে ক্রীতদাসপ্রথা ব্যবহারের চল ছিল। এ সম্পর্কে আলোকপাতের মধ্য দিয়ে দাসপ্রথার প্রতি অমিয়ভূষণের প্রবল ঘৃণার অনুরণন টের পাওয়া যাবে। সমতটের স্বেচ্ছা শ্রমদাস এই বন্দিরাই নগরের সম্মার্জনী, বণিকেরা সভ্যতার নির্মাতা হলেও দাসেরা সেই সভ্যতার ধারক, এদের ছাড়া সমতটের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়-'এরা শৃঙ্খল-বাঁধাও নয়, যেন এই জীবনটাকে স্বেচ্ছায় নিয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১০১)–আলোকিত সভ্যতার নিচে শ্রমদাস মানবের এই অন্ধকার অস্তিত্ব একটি বিশেষ কালের কথকতাই নির্মাণ করে।

বহিরাঙ্গিক কাল-কাঠামো নির্মাণে এইসব উপচারের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে রচিত হয়েছে সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক রবিন পালের মত প্রণিধানযোগ্য:

> ...উপন্যাসটিকে আমরা ইতিহাসের একটি কালের চলিষ্ণুচিত্র হিসেবেও দেখতে পারি। মধ্যযুগের বৌদ্ধ-হিন্দু সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী বণিক জীবনের ইতিবৃত্ত হিসেবে এ উপন্যাসের কারুকৃতি অবজ্ঞার নয় মোটেই।...যে "অন্তর্মুখী জীবন জিজ্ঞাসা আর বস্তুময় জীবনসত্যের সমাহার" শ্রীযুক্ত অশ্রুকুমার সিকদার লক্ষ করেছিলেন 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে, তা চাঁদবেনে উপন্যাসেও বর্তমান। এই জীবনসত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন পোতের বর্ণনা দিয়েছেন, আমদানী রপ্তানীযোগ্য পণ্যের কথা বলেছেন, সমুদ্রের বর্ণনাকে বস্তুগত বর্ণনা হিসেবে বিশ্বস্ত ও জীবন্ত করে তুলেছেন, বিভিন্ন দ্বীপ উপদ্বীপের কথা বলেছেন, বঙ্গ ও বঙ্গের বাইরের বণিকদের পার্থক্য দেখিয়েছেন, তাদের প্রাসাদ ও প্রমোদভবনের বর্ণনা দিয়েছেন। রাজধর্মের কথা বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর ধর্ম প্রসঙ্গ। দর্শনচর্চাও গুরুত্ব পায় কয়েকটি গল্পে। কাব্যের কথা আসে ধর্ম ও দর্শনের পিছু পিছু। (রবিন, ২০০০: ১৬৮)

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে একটি কালের সাংস্কৃতিক কাঠামো রূপ পায়।

চাঁদবেনে উপন্যাসে বিবৃত কালক্রম কখনই সুস্পষ্টভাবে রক্ষা করা হয়নি। কালের ভগ্নক্রমই এ উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

> ...এই যে কালানুক্রম ভেঙে ফেলা–এটা একটা কায়দা। আগেরটা পরে পরেরটা আগে। এটা কিন্তু সিনেমার সেই ফ্ল্যাশব্যাক নয়। আমরা যখন সত্যি সত্যি কোনো একটা জিনিসকে হৃদয়ে ভাবি, তখন এভাবেই আসে, নিজের জীবনকে ভাবলেও। পরেরটা আগে আগেরটা পরে। মানে ওই সিকোয়েন্স ধরে, সময়ের ক্রম না ভেঙে আস্তে আস্তে আসে না। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৮০)

উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক সময় নির্মাণে এভাবেই কালের ক্রম ভেঙে ফেলা হয়েছে। চেতনার অতীত ও বর্তমানচারিতা হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসের কাল নির্মাণের মূল বৈশিষ্ট্য। স্মৃতিচারণের বিষয়টি উপন্যাসে মুখ্য হয়ে ওঠে। চাঁদের নানা দুঃসাহসিক কাহিনি অধ্যক্ষের অতীতচারিতায় উঠে আসে। সমালোচক উদয়কুমার চক্রবর্তী মনে করেন:

> সময় নিয়ে যে প্রতিমা (image) এখানে অমিয়ভূষণ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, তা অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। একদিকে জল যার ওপর এই চরিত্রগুলির অবস্থান তা কালদ্যোতক। যে মধুলিট জাহাজে পক্ষধর চলেছেন বিজয়কে নিয়ে, সেই জাহাজ বর্তমান। যে বর্তমান এই জাহাজের মতই ভাসমান। মনে হয়

> এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে কিন্তু আসলে সে এগিয়ে চলেছে আরেক বর্তমানের দিকে যে বর্তমান একসময়ে ভবিষ্যৎ ছিলো। আবার বর্তমান একসময়ে অতীত হয়ে যায়। সময়ের এই প্রবাহকে প্রবাহিত জলের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। (উদয়কুমার, ১৯৯৫: ১২৪)

এভাবেই উপন্যাসের সময়কাঠামো নির্মাণে জল-জীবন ও কাল হয়ে ওঠে একাকার।

শুধুমাত্র বহিরাঙ্গিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক সময়চেতনাই নয়, চাঁদের জীবনচেতনাতেও কাল এক গূঢ় ভূমিকার দাবীদার। চাঁদ কালের প্রতিপক্ষ, কালের সাথেই তার দ্বন্দ্ব। সমুদ্ররূপ কাল অতিক্রমণের আকাঙ্ক্ষায় চাঁদ চরিত্র সংগ্রামী:

> সত্যি এরকম হয় কি যে, কালের এক পৃথক সত্ত্বা আছে, যেমন কোনো কোনো জৈন বলে? কাল ছাড়া কিছু হয় না। কিন্তু ওদিকে দেখো, কাল কখন তোমার সহায়ক হবে, এই প্রত্যাশায় বসে থাকা যায় কি? কাল সৃষ্টি করে। রোমকদের করেছিল। তারা পশ্চিমসমুদ্রকে নিজস্ব মনে করত। এখন নেই। এখন অন্য কেউ সেরকম মনে করছে, তারাও থাকবে না। এদিকে কিন্তু আমরা, আজকের শুরসেন বা চাঁদও, থাকব না। তা হলে কালই বিজয়ী হয়ে গেল। কী আশ্চর্য এই কালের কাছে হেরে যাওয়া। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৯৪)

প্রবহমান কালের ধারায় মানবসভ্যতা খড়কুটোসম। কালের সেই বৈনাশিকতার বিরুদ্ধেই চাঁদের সংগ্রাম। সভ্যতা বিস্তারের মধ্য দিয়ে চাঁদ বেঁচে থাকতে চায় জলজীবনে। ক্ষণস্থায়ী বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের দিকে সে নিরন্তর ধাবিত। ভবিষ্যতকে কেউ কেউ বর্তমানে আনতে চায়, চাঁদ তাদের অন্যতম। তার ভাবনায়:

> বর্তমান, এই রৌদ্র-আতপ্ত আরামদায়ক বর্তমান সব চাইতে স্বচ্ছ মনে হয়, কিন্তু তা সব চাইতে ক্ষণস্থায়ী। সেখানে তিষ্ঠানো যায় না। ফলে কালের দুই প্রান্তই, অধিকাংশই, হয় বিস্মৃতপ্রায়, নয় দুর্জ্ঞেয়। কিংবা অতীত সমুদ্র, ভবিষ্যৎ আকাশ, আর তার মাঝখানে এই ভাসমান জাহাজটাই বর্তমান। কখন অতীত থেকে উচ্ছ্বাস, কখন ভবিষ্যৎ থেকে ঝড় এসে এই বর্তমানকে বিপন্ন করে, বলতে পারো না। আবার দেখো, এই বর্তমান ততক্ষণই দৃশ্যমান, যতক্ষণ আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে থাকি। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৩১)

ক্ষণস্থায়ী বর্তমানের চাইতে দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যৎ চাঁদকে বেশি আকর্ষণ করে। দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যৎকে জানার অদম্য তৃষ্ণাতেই সে কালবৎ সমুদ্র পাড়ি দেয়:

> কাল যেন সমুদ্রবৎ, তাকে সে জাহাজে পার হতে চায়, কাল যেন অলৌকিক যবনিকাবৎ, তাকে সে ময়ূরপঙ্খীর চঞ্চুতে ভিন্ন করতে চায়; যোনকরা ভারতের পশ্চিমসমুদ্রকে তাদের সমুদ্র করেছিল, রোমকরাও রোমকসমুদ্র করেছিল, এখন কোথায় তারা? ন্যায়শাস্ত্র বলছে, আরবরা আরবসমুদ্র করেছে বর্তমানে, তারাও থাকবে না। অথচ সে এখনই সেই সমুদ্রে নিজের চলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হাজার হাজার মানুষকে সমুদ্রে দিচ্ছে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৬২)

বর্তমানকে ধরে রাখা দুরূহ। তা নিয়ত অতীতমুখী এবং বিনাশী। যে কালের গর্ভে মানুষ একসময় হারিয়ে যায়, সেই কালই তার প্রতিপক্ষ। কালের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজয় অমোঘ-এই ভাবনা তাকে রক্তাক্ত করে, কিন্তু হতাশ করে না। বরং প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবার শক্তি যোগায়। *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসেও বেনে মধু কালের

অমোঘ পরিণাম মেনে নিয়েই অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে সে কালের পটে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মধুর নৌকায় যেমন পিছলে নামে স্রোত, স্রোতের মত কাল একাকার হয়ে ওঠে, চাঁদের কাছেও তেমনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ–একাকার। বর্তমানে দাঁড়িয়ে সে ভবিষ্যতে বিচরণ করে, অতীতের বণিকদের সমৃদ্ধ কথকতাও সেখানে স্থান পায়। বাণিজ্যের মাধ্যমে কারো প্রতিশ্রুতি পূরণ তার কাছে বর্তমানে থেকে ভবিষ্যতে পৌঁছে যাওয়া। সমুদ্রবাণিজ্যকেন্দ্রিক বলেই চাঁদের জীবন তরঙ্গায়িত, শতদিবসের আলোড়নে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ। '...ঝড়-ঝঞ্ঝা দূরদিগন্তে সঞ্চরমান হলেই মানুষ সব সময়ে তাকে গ্রাহ্য করে না' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৫)–আর এই গ্রাহ্যহীনতাই চাঁদ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। কালকেন্দ্রিকতা, প্রবলভাবে জীবনবাদিতা, স্বপ্নময়তা, নিয়ত সংগ্রামশীলতা এবং টিকে থাকবার অমিত মনোশক্তি জীবনসংগ্রামে এই চরিত্রের মূল শক্তি। বৈরি সময় ও প্রতিকূলসমুদ্র তথা বিরূপ ভাগ্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তার অন্তহীন বাণিজ্যযাত্রা পরাজয় নয়, বরং তার জয়কেই চিহ্নিত করে।

দৈব আর দুর্দৈবের দ্বন্দ্বে চাঁদের জীবন উচ্চকিত। ভাগ্যকে প্রসন্ন করবার পূজা প্রসঙ্গে তার ভাবনার উদ্রেক হয় মাত্র, আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। মানবজীবনে অন্তঃলীন দুঃসময় বা দুর্ভাগ্য তার কাছে সমার্থক–ভাগ্যান্বেষী চাঁদ বিরূপ ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্দশাকে প্রবল মনোশক্তিবলে গ্রহণ করবার শক্তি রাখে। উত্তরসূরী বিজয়ের অন্তর্মানসেও চাঁদ প্রোথিত করে দেয় তার সেই শক্তিময়-দর্শন: 'বাপা বিজয়, ভাগ্য বলে কিছু না-ও থাকতে পারে। কিন্তু যদি থাকেই বা, সে তো ছদ্মবেশে তোমার সম্মুখের নৌকাটিও হতে পারে। সুতরাং, কারো সম্মুখে যেন চোখে জল না আসে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৮২)। প্রবল প্রাণশক্তিই চাঁদকে সম্মুখ-গমনে প্রেরণা যোগায়।

পিতার হারানো বাণিজ্য-পোতের নাবিকেরা যে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেছিল, তার নেতৃত্ব দেবার অধিকার পেয়ে পিতৃপিতামহের প্রভূত সম্পদ আর প্রেমময়ী স্ত্রী সনকা, সেইসঙ্গে কালদগ্ধ-অভিজ্ঞ নাবিকদের সঙ্গী করে চাঁদের বাণিজ্য জীবনের সূত্রপাত। যদিও সে যাত্রায় সাতখানি বাণিজ্যতরী নিমজ্জিত হবার বিপন্নতা নিয়েই চাঁদ সমতটে ফিরেছিল। উপন্যাসের শুরুতেই সর্বহারা এক ব্যক্তিঅস্তিত্বের রূপকল্প নির্মাণ করে অমোঘ সত্যকে চাঁদের অস্তিত্বের অংশ করে দেন লেখক। সে যাত্রায় চাঁদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রথম ঝড় এসে আছড়ে পড়ে। 'যন্ত্রণাক্ষিপ্ত রাক্ষসীর তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকার'ময় (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৭) সে ঝড়ে, 'কতদিন কতরাত যুদ্ধ করেছিল তার জাহাজগুলি? 'চাঁদ দাঁড়ানোর চেষ্টা করে দেখলে, সে শক্তি নেই ।...জাহাজ ভেসে চলল। একখানি মৃতবৎ ভাসছে, অন্যসবগুলি তলিয়ে গিয়েছে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৮-৩৯)। বহুদিন পর পক্ষধরের মুখে চাঁদের এই গল্প শুনেছিল চাঁদপুত্র বিজয়। অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন, 'মানুষ বিপদে পড়ে, মানুষই তা থেকে প্রাণ পায়–এই দুইয়ের কোন গল্পটি মানুষকে আকর্ষণ করে বেশি?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৯)। সংগ্রামী চাঁদের কাছে বেঁচে ওঠার গল্পটিই আকর্ষণের। মানুষ তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে যখন টিকে থাকে, তখন সেটি অনুপ্রেরণার। সেই অনুপ্রেরণা কিংবা প্রগাঢ় জীবনেচ্ছা চাঁদকে বিধ্বস্ত মধুলিটসমেত গঙ্গার খাড়ি থেকে মধুমতীর খাড়ি পর্যন্ত যুদ্ধ করে টিকে থাকবার শক্তি দিয়েছিল। '...মরা কাঁকড়ার মত বালিতে আধডোবা' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৫১) মধুলিটের গোত্তা খাওয়া শরীর ছিল জনশূন্য। স্বর্ণকায়া

সনকা, অযুতস্বর্ণের পণ্যবাহী সাতটি জাহাজ আর সহস্র মানুষ হারিয়ে ইরাবতীর বদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রান্তের কোনো নিম্নভূমিতে সে ছিল এক মৃতকল্প মানুষ। ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার স্পর্ধাঘন উচ্চারণ তখন কিছুটা স্তিমিত। সে যখন উচ্চারণ করছে, 'ভেবেছিলাম, আমি ভাগ্যজয়ী, ভাগ্যকে গ্রাহ্য করিনি। ভাগ্য প্রতিস্পর্ধা সহ্য করেনা' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৬৭), তখন চাঁদের ব্যথিত এবং স্তিমিত কণ্ঠস্বরই প্রতিধ্বনিত হয়। তবে, এখানেই চাঁদের ভেতর আত্মপ্রকাশ করেছিল জীবনাভিজ্ঞতাজাত এক দর্শনের:

> ...'আমি গন্তব্যহীন পথিক। মৃত্যু বলে কিছু নেই। হয় জীবন, কিংবা জীবন নয়। দুয়ের মধ্যে এমন কাল নেই যে, কারো মৃত্যু অবস্থান করে।'...'জীবন, শেষ অনুপল পর্যন্ত জীবন। তারপরে, যার জীবন, সে থাকে কি? কার মৃত্যু হবে?...যার সঞ্চয় হয়েছে, ব্যয়ে তার ভয় কী?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৫৫)

প্রবল জীবনবাদী এক পুরুষের উচ্চারণ এটি, যার চেতনায় মৃত্যু শব্দের স্থান নেই। জীবিত ব্যক্তি অস্তিত্ববান, যে বেঁচে নেই, তার মৃত্যু হবার প্রশ্নই ওঠে না। হয় জীবন, কিংবা জীবন নয়–'শেষ অনুপল পর্যন্ত জীবন' অস্তিত্ববান চাঁদের এই দর্শনই তাকে ভ্রম্ম নরমুণ্ড শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে অমিয়ভূষণও বিশ্বাস করেন, 'জীবনের অন্তিম মুহূর্তও তো জীবন; ততক্ষণই যন্ত্রণা, ক্লেশ তারই, যার সেই জীবন। সেই অন্তিম মুহূর্তও শেষ হলে সে কি থাকে যে তার আবার মৃত্যু হবে?...মৃত্যুক্ষণের আর জীবনের অন্তিম মুহূর্তের মধ্যে কি কালব্যবধান আছে, যেখানে মৃত্যু দাঁড়ায়?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৬১)। এই দর্শন চেতনায় লালন করেই চারবছর পর কোন্নগর থেকে বংকদ্বীপ পর্যন্ত শিল্পের বিস্তার ঘটিয়ে একটিমাত্র জাহাজে করে সনকাকে নিয়ে সমতটে ফিরেছিল 'মাঝে মাঝে ডুব মেরে আবার ভেসে ওঠা' চাঁদ। ফেরার পথে সময় বাঁচাতে চেনা পথ ছেড়ে দিকহীন এক উত্তাল মধ্যসমুদ্রই হয়েছিল তার অবলম্বন। চাঁদের দর্শনে মৃত্যুর কবল থেকে ফেরার মোহগ্রস্ততা আছে। তার বিশ্বাস, 'রক্তস্রোত বলো, সমুদ্রস্রোত বলো, বিপন্নতার বীজাণু থেকেই যায়।...কিংবা কথাটাকে বিপন্নতার বীজাণু না বলে মৃত্যুর বীজও বলা যায় কি? যে মৃত্যু বীজ আছে জেনেও আমরা যাকে উপেক্ষা করি?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০; ৭২)। মৃত্যুবীজকে এভাবে জীবনে গুঁজেই কিংবা তাকে প্রবলভাবে উপেক্ষা করেই জীবনবাদী চাঁদ পথ চলে।

দৈব আর দুর্দৈবের দ্বন্দ্ব চেতনায় ধারণ করে স্বাপ্নিক চাঁদ বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিচিত্র দ্বীপ ও দেশের মধ্যে সংযোগ রচনায় শিল্প ও সভ্যতার বিস্তার ঘটাতে চায়। পাঠক অনুভব করেন:

> অনন্ত জলরাশির বুকে ভাসমান চন্দ্রবসুর নৌজাহাজের বহর, 'মধুলুব্ধার' মধ্যমাস্তুলে হাত রেখে নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে আছে এক বাঙালি অভিযাত্রী বণিক, দৃষ্টি তার দূরস্থ বন্দর ও দ্বীপের দিকে,–সে স্বপ্ন দেখে হিন্দুস্থান থেকে বাইজেনটিয়াম পর্যন্ত অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের, বাণিজ্যের এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার। মনসামঙ্গলের ধর্মীয় অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে অমিয়ভূষণের উপন্যাসের এই চন্দ্রবসু তার 'সাতখানি পোতের সবগুলিকে খুইয়ে যখন সে সমতটে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে প্রবাদ: চাঁদ বলেই সয়। (পৃথ্বিশ, ২০০১: ২১২)

চাঁদ স্বপ্ন দেখে বাণিজ্যের, কাল অতিক্রমণের, সমুদ্রজুড়ে সংযোগ-পথের, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের, বাণিজ্যের মাধ্যমে শিল্পকে ছড়িয়ে দেবার। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, 'আমরা বণিক। অভিনবকে সংগ্রহ

করাই আমাদের ধর্ম। অভিনবকে ক্রেতার সম্মুখে তুলে না ধরলে তা তো অজ্ঞাতই থেকে যায়। তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন না হলে কী করে তার গুণ যাচাই হবে?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৫)। বণিকেরা অভিনব পণ্যের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে। কাজেই তারা সভ্যতার নির্মাতা এবং প্রচারক–এমনটাই বিশ্বাস চাঁদের। সে বিশ্বাস করে সভ্যতা কিংবা বাণিজ্যবিস্তারে যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন, সেটি ক্ষত্রিয় নয়, বণিকের সাহসেই সম্ভব। তার এইসব মহার্ঘ বাণিজ্যদর্শনের শিক্ষায় ভ্রম্ম রাজাকে সে বোঝায়, 'কোনো জাতিই শুধু অস্ত্রে ও ধর্মে বলশালী হলে বলশালী হয় না। অর্থ, সুতরাং বাণিজ্যের প্রয়োজন' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৫৯)। আর বাণিজ্যই চাঁদের ধর্ম। বাণিজ্য-শিক্ষায় এভাবেই সে ভ্রম্মদের সভ্যতার সংস্পর্শে এনেছিল। সভ্যতা-বিস্তারে চাঁদ যেকোন ধরনের কর্মকাণ্ডে নিষ্কম্প। কাজেই কোন্নগর থেকে তাঁতিচুরির মত নৃশংস কাজ তার ভেতর পাপপুণ্যের ভাবনা জাগায় না। বিখ্যাত কোন্নগর থেকে কার্পাসের বীজ এবং বাঙালি কাটুনি কিংবা তাঁতি চুরিতে তার হাত কাঁপেনি, বরং তার মনে হয়েছে যেন সভ্যতার রপ্তানী হলো, মনে হয়েছে–তার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। বর্বর বংকদেশে বিশ্বকর্মার মত তাঁতীরা যেন শিল্প নিয়ে ফিরছে–এইসব ভাবনা তার ভেতর আনন্দ জাগায়; তার এই কৃতকর্মে তাঁতীগোষ্ঠীর ক্রমবিস্তার পরবর্তীকালে গড়ে তোলে এক মহাজনসম্প্রদায়; চাঁদের দূরদর্শিতা আর স্বপ্নচারিতায় এভাবেই বংকদেশে সভ্যতা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি চিন থেকে কৃষক পরিবার, তুঁতচারা আর চিনাগুটিপালক এনে বংকে তারা রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কাজও সম্ভবপর করে তোলে সে। সুমালি নামক এক অর্ধসভ্যদেশে পঞ্চাশজোড়া মদ্যপ নারীপুরুষ পাঠিয়ে আবিসি সাম্রাজ্যের প্রান্তে এক ভারতীয় কলোনি স্থাপনপূর্বক কালে সেখানে কেরলী কার্পাস বস্ত্র তৈরির স্বপ্ন দেখে চাঁদ। পরবর্তীকালে আবিসি সাম্রাজ্যের এই বাণিজ্য পথ ধরে নীল পেরিয়ে রোমক সমুদ্রে পৌঁছে কুশদ্বীপে ভারতীয় ও ঈশায়ী এবং শৈব মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এক উপনিবেশের স্বপ্নও সে লালন করেছে চেতনায়। চাঁদের এইসব স্বপ্নই তাকে প্রতিনিয়ত বৈরি কাল ও ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

চাঁদের উপনিবেশ গড়বার এই আকাঙ্ক্ষা শেষপর্যন্ত বাস্তবে রূপ পায় খনিজমৃত্তিকাকেন্দ্রিক বাণিজ্য রচনার মাধ্যমে। বণিকসভায় বংকদ্বীপ থেকে সংগৃহীত খনিজ মৃত্তিকা-প্রদর্শনপূর্বক চাঁদ সেই উপনিবেশ গড়বার লক্ষে এক যুগান্তকারী বাণিজ্যের প্রস্তাব দেয়। আর সেটিই যৌথিক বাণিজ্য। সংগৃহীত মৃত্তিকা থেকে থিতানো ধাতু, যাকে চাঁদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে চাঁদি নাম দেয়া হয়েছিল, সেটি বাণিজ্য করবার প্রস্তুতি হিসেবে চাঁদ প্রস্তাব করেছিলো:

> আমাদের জনবল দরকার হবে। চৈনিকরা সে দেশের উৎপন্ন ধাতুই নিয়ে যায়। মনে করুন, আমরাই যদি সে দেশে ধাতু উৎপাদন করি? আপাতত জাহাজের নাবিক ছাড়াও ধাতু খননের, তাকে পরিষ্কার করার জন্যও, মনে করুন, জাহাজ-প্রতি একশোজন করে শ্রমিক নিতে হয়। এবং সে দেশেও আরো ধাতু পরিষ্কারক, কারিগর ইত্যাদি নিযুক্ত করতে হবে, মনে করি।...আমরা তো মূলত পরিবাহক। একদেশে উৎপন্ন পণ্য অন্যদেশে নিয়ে গিয়ে লাভ করি। এমন তো হতে পারে, আমরাই উৎপাদক হচ্ছি, তাও একচেটিয়া। মনে করুন, আমরা সেই দেশে এই ধাতুর একচেটিয়া উৎপাদক। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৮৭-৮৯)

চম্পানগরে চাঁদের স্বপ্নের এই উপনিবেশ গড়বার প্রথম ধাপ হিসেবে তাকে কৌশলী হতে হয়। সমতটে আর্য বণিক আর অনার্য জালিক সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে শান্তিস্বরূপ অনার্যদের চম্পানগরে নির্বাসনদণ্ডের মধ্য দিয়ে যৌথিক বাণিজ্যে শ্রমিক নিয়োগ করে খনিজ বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটায় চাঁদ। এভাবে তার আকাঙ্ক্ষাতে যৌথ ধাতুবাণিজ্যের জন্য সংগৃহীত অনার্য-মানবেরা মিশ্র এক শ্রমিক উপনিবেশ সৃজনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার বিস্তার ঘটায়। ধাতুশ্রমিক-ধাতুকারিগরের জন্মও অনিবার্য হয় চাঁদ কিংবা তার মত বণিকের আকাঙ্ক্ষাতেই। এভাবেই চাঁদের স্বপ্ন এবং কৌশল ক্রমশ একটি নতুন শ্রেণির জন্ম দেয়। এক যুগান্তরের কথকতা চাঁদের হাতে রচিত হতে থাকে।

যৌথিক খনিজ বাণিজ্যে উপনিবেশ স্থাপনে সমতটের আদিবাসী অনার্য মানুষেরা বণিকদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাসিত হয়েছে। কালে কালে সভ্যতার বিস্তারে নির্মমতা ও অমানবিকতার তকমা গায়ে সেঁটে বণিকেরা কাজ করে। *চাঁদবেনে* উপন্যাসে লেখক বণিকের আত্মবিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের নির্দয়তাকে এভাবেই মূর্ত করে তোলেন। চাঁদও এর উর্ধ্বে নয়। উপন্যাসে চাঁদের নিষ্ঠুরতার বিপরীতে লেখক জালিককন্যা, জালিকবধূ, কিংবা ভৌমদেব-অরিমত্ত-ভামহের মত অনার্য মানুষের বেদনার কথকতা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁতি চুরির ঘটনায় যে নির্মম চাঁদকে পাওয়া যায়, যৌথিক উপনিবেশ তৈরিতেও তার ভূমিকা তেমনই ছিল। অনার্য মানুষের সামষ্টিক ত্যাগেই চাঁদের নির্মম কৌশলে বণিকের স্বপ্ন রচিত হয়। যদিও এইসব নির্মমতা চাঁদের আত্মগহনে কোনো ভাবান্তর জাগায় না। কেননা, সে বিশ্বাস করত, বণিকের কৌশল আর দুঃসাহস–দুটোই থাকা প্রয়োজন, সেইসঙ্গে প্রয়োজন ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবের মধুরতা আর চাতুর্য। মধু সাধুখাঁ কিংবা চাঁদ এর সবটুকুই আত্মস্থ করেছে। পরবর্তীকালে চাঁদের এই অভিনব বাণিজ্য সমতটকে সমৃদ্ধ করলেও, চাঁদ নিজের ভেতর সন্তর্পণে বাণিজ্য-কর্কশতা আর অমানবিকতাবোধের অনুরণন গভীরভাবে উপলব্ধি করে। উপলব্ধি করে, পুঁজির ধারক বণিকদের ক্রমাগত শোষণ আর বাণিজ্যে একটি দেশ ইট-কাঠ-পাথরের জঞ্জালে পরিণত হয়। সবুজ হারিয়ে যায়। সমতটেও এমনই এক ঘটনার জন্ম হয়। দশবছরের যৌথিক বাণিজ্যের সাফল্য সমতটকে শস্য নয়, রূপার সোনা দেয়, কেড়ে নিয়েছিল সবুজ। যুগব্যাপী সোনার হেমন্ত নামে সমতটে। এই সোনা সেই অভূতপূর্ব যৌথিক বাণিজ্যের, যা থেকে প্রথম দশ বছরে মিলেছিল একশো জাহাজ রূপা আর অন্য ধাতু তার চারগুণ। সম্পদকেন্দ্রিক এক ধাতুবিশ্লেষক শ্রেণির জন্ম সম্ভব হয়। খনিজবাণিজ্যকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছিল ঠাঠারু আর কারিগরদের বাজার। কিন্তু, স্বর্ণ যেন সবকিছু গ্রাস করছিল। যেন বা 'ইন্দ্রজালেই যেন সোনা স্বর্ণ সমতটে ঢুকে পড়েছে আর বিগত বছরগুলোতে তার বৃদ্ধি হয়ে চলেছে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৭৭)। চাঁদের মানবিকতা হৃত সেই ইন্দ্রজালে। বিরূপ ভাগ্যের কাছে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হলেও চাঁদের ভোগাকাঙ্ক্ষা এতটুকু কমেনি। দময়ন্তীর কাছে তাই 'বাণিজ্যকর্কশতাই...চাঁদের কলঙ্ক' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৭৮)। কখনও কখনও পুঁজির ধারক ও বাহক বণিকদের নিষ্ঠুরতা এবং কেবল অর্থলোলুপতায় বিলীন হয়ে যায় তাদের স্বপ্নময়তা। টিকে থাকবার নগ্ন লড়াইয়ে মানবিকতা হারিয়ে যায় বলেই সম্পদসংগ্রহের লোলুপতা তাদের জীবনে ঊষরতা ডেকে আনে। বণিকদের এই প্রবল ভোগাকাঙ্ক্ষার পেছনে সর্পসম মহাকাম বা লিবিডোর সক্রিয় উপস্থিতিকেই দায়ী করেন অমিয়ভূষণ, যা শেষপর্যন্ত বিপর্যয়ের জন্ম দেয়। উপন্যাসে চাঁদকেও সেই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

চাঁদ বাণিজ্যকর্কশ এক চরিত্র হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তার যুক্তিবাদ অভিনব। সমুদ্রের সর্বজনীনতায় চাঁদের একান্ত বিশ্বাস। বাণিজ্যের নিমিত্তে একে ভাগ করা সমুচিত নয় বলেই সে মনে করে। উপন্যাসে চাঁদ উপলব্ধি করেছে, সমকালীন আরবি বণিকেরা জাহাজ ভাসানোর খরচ আর জাহাজ ডোবার ঝুঁকি একতরফা গ্রহণ করে দেশে দেশে একচেটিয়া পণ্য ছড়িয়ে দিয়ে যে লাভের অংক কষেছে, সেখানে চাঁদের মত বণিকদের কোন অংশ নেই। চাঁদের মতে, আরবি বণিকদের একচ্ছত্র বাণিজ্য-অধিকার অমূলক। প্রকৃতিপ্রদত্ত সমুদ্রে সকলের অধিকার সমান–চাঁদ এ ভাবনায় বিশ্বাসী। শুরসেন মনে করে সে:

> 'ঘুণ বেনে।...কারো কেন চোখে পড়ে না, আরবি জাহাজই একমাত্র ক্রেতা হলে, তা ক্রেতার বাজার হয়? এসব তো সে-ই বলেছে। ক্রেতার বাজার হলে কাঞ্চীর কার্পাসের দাম কমে, চাঁদের চুনিপাথরের দাম কমে, শস্যের দাম কমে, একটা দেশের সব শ্রেণীর উৎপাদন কমে যায় ক্রমশ। ওটাকে অবশ্য তার চরিত্র বলতে পারো। সমুদ্র কেউ নিজস্ব সম্পত্তি করছে, তা তার সহ্য হতে চায় না। কেন হয় না, তা কে বলবে?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৯০-২৯১)

চাঁদবেনে উপন্যাসে রূপায়িত আরবি বণিকদের এই একচেটিয়া বাণিজ্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি ইতিহাসে মেলে। তাদের এই একচ্ছত্র আধিপত্য ভারতীয় সমুদ্র বাণিজ্যকে কুক্ষিগত করেছে। তাদের বাণিজ্যের ইতিহাসে হৃত সমৃদ্ধির আখ্যান উপন্যাসে সন্তর্পণে যুক্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার লিখেছেন:

> উপকূল শহরগুলির সমৃদ্ধির একটি কারণ ছিল বিদেশী ব্যবসায়ীদের বসতি স্থাপন। তারাই ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত এবং পূর্ব দিকের বাণিজ্যেও তারা ধীরে ধীরে অংশ নিচ্ছিল। ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যে ভারতীয় দালালদের হটিয়ে দেবার জন্যে আরব ব্যবসায়ীরা নিজেরাই চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।...সবগুলি বন্দরেই আরব জাহাজগুলি এসে থামত। বন্দর থেকে ভারতে উৎপন্ন পণ্যসমাগ্রী, কিংবা আরো পূর্বদিকের অঞ্চল থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যেসব সামগ্রী নিয়ে আসত, সেগুলি জাহাজে তুলে পশ্চিমী জগতে পাড়ি দিত আরবদের জাহাজগুলি। চীনের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া মারফত উত্তর-ভারতীয় বাণিজ্য কমে এসেছিল, কারণ পারস্যদেশীয় ও আরব ব্যবসায়ীরা তখন নিজেরাই মধ্য-এশিয়ায় যেতে পারত। (থাপার, ২০১৩: ১৮৭)

শুধু রোমিলা থাপারই নন, নীহাররঞ্জন রায়ও আরবদের এই একচেটিয়া বাণিজ্য সম্পর্কে লিখেছেন:

> খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভেই আরবী মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করে।...দেখিতে দেখিতে ইহারা একদিকে স্পেন ও অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, এবং চীনদেশ পর্যন্ত বাণিজ্যপ্রভুত্ব বিস্তার করে। ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্বশায়ী দ্বীপগুলি পর্যন্ত যে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল একসময় রোম ও মিশর-দেশীয় বণিকদের করতলগত সেই সুবিস্তৃত বাণিজ্য-ভার চলিয়া যায় আরব বণিকদের হাতে।...এই সুবৃহৎ বাণিজ্যে উত্তর-ভারতীয়দের যে অংশ ছিল তাহা ক্রমশ খর্ব হইতে আরম্ভ করে। প্রথম পশ্চিম-ভারতের বন্দরগুলি চলিয়া যায় আরবদেশীয় বণিকদের হাতে, এবং পরে পূর্ব-ভারতের। দক্ষিণ-ভারতীয় পল্লব, চোল ও অন্য ২/১ টি রাজ্য প্রায় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহাও চলিয়া যায়। (নীহাররঞ্জন, ১৪০২ : ১৬৩)

উপলব্ধি করা যাবে, আরবি বণিকদের এই একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে অমিয়ভূষণ ভারতের হৃত সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় চাঁদবেনের মত স্বাপ্নিক চরিত্রের রূপকল্প নির্মাণ করেন। যে কাল আপনা থেকেই পথ খুলে দেবে ভবিষ্যতের, কালের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে সেই পথ আগেই টেনে বের করে নেবার মধ্যেই চাঁদের অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার স্বপ্ন নিহিত। সেই প্রথম বণিক, যে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, আরবিরা বন্দরগুলিতে ক্রেতার বাজার তৈরি করছে, দলবদ্ধভাবে চাহিদার কৃত্রিম হানি ঘটাচ্ছে, যার ফলে কৃত্রিম পণ্য বাড়তি হওয়ায় তার মূল্য পড়ে যাচ্ছে। চাঁদের এই উপলব্ধিই তার ভেতর ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করতে যাবার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। পুত্র সাগরকে দিয়ে এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে চাঁদ তাকে পাঠিয়েছিল ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে। ইসমাইলিয়া-জিড্ডা আর সুমালিতে চাঁদের বন্ধুদের সাথে কুশল বিনিময় আর বাণিজ্য ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রতিনিয়ত চাঁদের দ্বন্দ্ব দৈব-দুর্দৈবের সঙ্গে। যার প্রথম সংকট রচিত হতে থাকে সমুদ্রে সাগরের নিরুদ্দেশে। সনকার একবেণীহিয়াসত্তা চাঁদের স্পর্ধিত অহম সম্পর্কে বলেছিল, 'চাঁদের ভালোবাসায় ধরা দেয়া উচিৎ হয়নি। তার দম্ভ আর প্রতিস্পর্ধা দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম।...তার বনে থাকা ভালো ছিল, খড়ুগে, আগুনে, সমুদ্রে ভেসে গিয়ে মৃত্যু ভাল ছিল। কেউ যদি দেবতার সঙ্গে স্পর্ধা করে, তাকে উৎসাহ দেয়া মানুষের স্ত্রীর উচিত হয় না' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৯৯)। দাম্ভিক চাঁদের প্রতি সনকার এই অভিমান ও বেদনাও তাকে ফেরাতে পারেনি। ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার জীবন এক প্রতিস্পর্ধা। বহুবার ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছে চাঁদ ও তার উত্তরসূরি। লেখক জানান, সাগরের মধুকর বহর দ্বারকা পার হয়ে কচ্ছসাগরের পশ্চিমে পৌঁছে সিন্ধি আর আরবি জাহাজের সঙ্গে এক বণিক বিবাদে জড়িয়ে এবং প্রবল ঝড়ে পতিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধ্যক্ষ সুষেনের ভাষায়, '"সেই সুউচ্চ মাস্তুলগুলি যা মেঘকে নিজের চতুর্দিকে ঘুরাচ্ছিল, সেই পালগুলি যা বায়ুকে আঁচলে বাঁধবে মনে হচ্ছিল, এসবই রোষ আকর্ষণ করেছে সেই পুষ্কর প্রভৃতির, মাতরিশ্বা প্রভৃতির। অথবা দৈব। শুধু ভাগ্যই"' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩০৯)। সাগরদত্তকেও হারাতে হলো। ট্র্যাজিক সত্তা রাবণের মত চাঁদকেও ক্রমাগত সন্তান হারানোর বেদনায় নিমজ্জিত হতে হয়েছে। সুষেণের বক্তব্যে চাঁদের কণ্ঠস্বরই যেন অনুরণিত। সতের বছর পর চাঁদের নতুন মধুলিটে সমুদ্রাভিযানে পুত্র বিজয় আর অধ্যক্ষ পক্ষধর ঠিক একই ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছিল, চাঁদের অনুপস্থিতিতে সে ঝড়ে চাঁদের পতাকা নামিয়ে ফেলে অধ্যক্ষ পক্ষধর। দৈবকে প্রণতি জানিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল তার আত্মসমর্পণবার্তা:

> 'নামিয়ে ফেলো, নামিয়ে ফেলো, বেনের পতাকা নামিয়ে ফেলো। মনে মনে বলো, জোরে জোরে বলো, আকাশের কানে বলো, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা মরতে ভয় পাই , জাহাজ পক্ষধরের হাতে, যে খুব সাধারণ, আর মৃত্যুভয় জয় করতে পারেনি'। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৭৪)

উপলব্ধি করা যাবে, মৃত্যুভয়হীনতার দর্শনে বিশ্বাসী বলেই চাঁদের প্রতি ভাগ্য এত প্রতিস্পর্ধী। অধ্যক্ষ পক্ষধর দৈবকে প্রণতি জানিয়েই হয়তো সে যাত্রা বেঁচে যায় বিজয়সমেত। উচ্চশির-মহান কিছুর প্রতি প্রকৃতি প্রতিস্পর্ধী বলেই মান বিসর্জন দিয়ে বা প্রকৃতির কাছে নত হয়েই প্রাণ বাঁচাতে হয়-এমনটাই বিশ্বাস পক্ষধরের। কিন্তু চাঁদের সংগ্রামের দর্শন ঠিক এর বিপরীত।

বিজয়ের নেতৃত্বে নতুন মধুলিট প্রায় বছরখানেক ধরে স্বর্ণভূমি, মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কম্বুজ, আন্নমে যাতায়াত করে–যেন বা ভাগ্যের চোখ কান এড়িয়ে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। তবু শেষ রক্ষা হয় না ভাগ্যাহত চাঁদের। কোন্নগরে পৌঁছে চিত্রার্পিত ভৈরবীর সঙ্গে মাতা সনকার প্রবল সাযুজ্য উপলব্ধি করে অস্তিত্বের টানাপড়েনে বেদনার্ত বিজয় নিরুদ্দেশের পথ বেছে নেয়। বিজয় আত্মার স্বরূপ জানতে চেয়েছিল, অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। জীবনের বিচিত্রমাত্রিকতা উপলব্ধি করার নিমিত্তে সে তাই জীবনসমুদ্রের নাবিক হয়ে নিরুদ্দেশের পথে নামে, আর চাঁদের জন্য রেখে যায় এক পত্র, যেখানে উচ্চশির এক ব্যক্তিত্ববান চাঁদই উচ্চকিত হয়ে ওঠে:

> রামচন্দ্রের কাব্যের পরেও কাব্য লেখা যায়। আমার জননী সীতার মতই দুর্ভাগা। অন্যেরাও বলেছে, অপবাদ-ভয়ে পরিত্যক্তা রাজমহিষী যেন। আমার পিতা রামচন্দ্রের মত ধার্মিক ও বীর নন হয়তো। কিন্তু লক্ষ্য করুন, রাজা রামচন্দ্র দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। আমার পিতা যেন দুই হাতে দুর্ভাগ্যকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমার জননীকে তুলে নিয়েছেন।' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৭৪)

বিজয়ের চোখে চাঁদের এই সংগ্রাম শ্রদ্ধার। রামের সহায়ক ছিল দৈব, তবু সীতাকে সে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আর চাঁদের প্রতি বিরূপ তার ভাগ্য, তবু ভৈরবীরূপী সনকাকে সে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করবার মত উদারনৈতিক। এখানেই তার জয়, দৈবের পরাজয়। উত্তরসূরির চোখে মানুষ হিসেবে তার মহিমা-মানবিকতাই তাকে দৈবের চাইতে বড় করেছে। সনকাকে ভৈরবী জীবন থেকে বের করে এনে আশ্রয় দেয়াই চাঁদের সেই মানবিকতা।

চাঁদের স্বপ্ন, তার উচ্চশির আর প্রবল ব্যক্তিত্ব ক্রমাগত তার পতনকে ত্বরান্বিত করে। আরব বণিকদের কাছে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না করে তার বাহক হওয়া এবং অচেনা বাণিজ্য পথ আবিষ্কারের ভাবনা তার জন্য কোন সুফল বয়ে আনেনি। সেই দুঃসাহসিক অভিযানে তাকে হারাতে হয় ঋদ্ধ জীবন। সেইসঙ্গে মানবিক সম্পর্কের সবগুলো প্রান্ত তার জীবন থেকে হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। উপরন্তু, বাণিজ্যের প্রতি তার প্রবল স্পৃহা এবং ভোগবাদ সমতটবাসীর কাছে তাকে অন্ধ, লোভী, ধৃতরাষ্ট্র কিংবা রাবণের মত স্বগোষ্ঠীহন্তারক অভিধায় চিহ্নিত করে:

> চাঁদ নাকি পিশাচস্বভাব এখন। মাথায় সেই পগ্‌গ নেই। মুখটা আগুনভরা তামার ঘটি কবিরাজের। চোখের গর্ত দিয়ে সেই আগুনের আঁচ। চাঁদের এক দাসী সেই চোখ দেখতে গিয়ে নিজেই নাকি অন্ধ এখন। পিশাচ তো নয়, রাক্ষস। না হলে নিজের তেমন সুন্দর দু-দুটো ছেলেকে তেমন অজানা,...পথে পাঠায়?...সে তো সাপ-কামটে হিলহিল করা সমুদ্র, সে সমুদ্রে কালো ঝড় পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে।...বাঘসিংহ যেমন নিজের বাচ্চা খায়। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৫০)

সমতটে চাঁদের বাণিজ্য-নেশা ততদিনে নিন্দিত। দাম্ভিক-লোভী ও মূর্খ চাঁদের বাণিজ্যলোভের আকাঙ্ক্ষার কাছে সন্তান ও সন্তানসম নাবিকদের আত্মাহুতির বিষয়টি চাঁদের স্বপ্নকে ম্লান করে দেয়। সমতটবাসীর কাছে এ স্বপ্ন তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। উপলব্ধি করা যাবে, এতো নিন্দার পরও পুত্রদের সমুদ্রবাণিজ্যে প্রেরণের মধ্য দিয়ে চাঁদ নিজের স্বপ্ন আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে চেয়েছে। চাঁদ ও মধু সাধুখাঁ'র কালে কালে বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষায় ভিন্নতা এখানেই যে, চাঁদ সভ্যতা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে

তার কৃতকর্মে বেঁচে থাকতে চায়, অন্যদিকে, মধুর ভেতর কেবলই উত্তরসূরীর মধ্যে বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত।

নিরুদ্দিষ্ট পুত্র সাগরের সন্ধানে অন্তর্গহনে হা হা করা আগুন–শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আর ঝড়-ঝঞ্ঝায় সীমাহীন ক্ষতি নিয়ে সাগরের বেঁচে থাকার ক্ষুদ্র সম্ভাবনাকে খড়কুটোর মত আঁকড়ে ধরেই ভাগ্যাহত চাঁদ তার ভাঙাচোরা মধুলিট নিয়ে সমুদ্রে ভাসে। বৈরি ভাগ্যের হাত থেকে সন্তানকে বাঁচাতে চিন থেকে মালদ্বীপ পর্যন্ত ছোটে সে। যেন বা দুভার্গ্যের মুখোমুখি হতে চায় চাঁদ। শেষপর্যন্ত মধুকরের ধ্বংসাবশেষ তাকে সেই দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি করে। অমিয়ভূষণের ভাষায়:

> কুশদ্বীপের এক বনাচ্ছন্ন কূলে অবশেষে মধুকরের সেই উদ্ধত গ্রীবা ও মধ্যমাস্তুলের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। তুঁতে রঙে পিতলের ঔজ্জ্বল্য ঢেকে গেলেও পড়া যাচ্ছিল, সে কঙ্কাল মধুকরের। ধ্বংসস্তূপে দু-এক নরকঙ্কাল, দু-এক টুকরো বা সূক্ষ্ম মণিখচিত কার্পাস পেলেই কি চেনা যায়? তখন অপরাহ্ন হয়। সাতহাঁড়ি ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, একশত নারিকেল সেই সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিল চাঁদ একবুক জলে নেমে। তখন তার চোখদুটি অস্তগামী সূর্যের মত আরক্ত। সেই জীর্ণ মধুলিটেই উঠে এসেছিল সে।...সে বলেছিল, "ধন্যবাদ বন্ধু উসমান, ধন্যবাদ বাপা দায়ুদ।" দ্রুত সে কাণ্ডার মঞ্চে গিয়ে উঠেছিল। যখন উসমান আর দায়ুদ মধুলিট থেকে নেমে যাচ্ছে, তখন কেউ যেন হাহাকার করেছিল, "বাপা সাগর।"...এক জীর্ণ জাহাজে সেই প্রবল বায়ু ও সমুদ্রস্রোতের মুখে যে হাল ধরে, তাকে আদমের সন্তান বলে মনে হয় না। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩১৫)

অমিয়ভূষণ লিখেছেন, চাঁদ বলেই সয়; সন্তান হারিয়ে আদমের সন্তানের ভেতর যে প্রবল বেদনাবোধের জন্ম হয়, তামার মুখোশে সেই বেদনা এঁটে চাঁদ এখানে ভাস্কর্যের মতই বেদনাহীন। এভাবেই বারবার সে অস্তিত্বসংকটে ডুবেছে, দৈবের কাছে পরাভূত হয়েছে, আবার দৈবের কাছে হেরে যাবার সীমাহীন অনিশ্চয়তায় নতুন করে হাল ধরেছে।

শুরসেনের বক্তব্যে অনুরণিত হয় ভাগ্যের বৈরিতায় বেদনা লুকিয়ে চাঁদের অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার কথকতা:

> ভাগ্য বলে কি কিছু আছে? এবার কি ভাগ্যকে প্রলুব্ধ করতে সে তার দরজায় আঘাত দিতে চাইছে? সে কি, অথবা, পালের রশি নিজের হাতে ধরে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়? প্রদীপ নিবিয়ে দাও।...চোখ মুছে নাও। নিঃশ্বাসে সমতা আনো। আমি জানি না। ঈশ্বর আছেন। তাঁর রূপেই বৃক্ষসকল হরিত ও হরিতস্রজ। ভাগ্য? থাকলেও সে যেন পরাজয়ের অশ্রু আর হাহাকারে হৃষ্ট না হয়। দেখো, সে হৃদয়খানিও হয়তো অনুশোচনায় দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩১৫)

চোখের জলেই চাঁদের পরাজয়। কাজেই বেদনা লুকিয়ে ভাঙাচোরা মধুলিট চতুর্থবারের মত মেরামত করে কখনও পুবে, কখনও বা পশ্চিমে আবার কখনও গঙ্গা বেয়ে উত্তরে চলতে চলতে সমতটের পথে ফিরে এসেছিল সে। এ কোন বাণিজ্য নয়, যেন বার বার ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কখনও ঝড়ে সেঁধানো, কখনও জাহাজ মেরামতি, পাল পাল্টে ধুকে ধুকে পথ চলা। শেষ পর্যন্ত রূপনারাণের মুখে হাতিশুড়ো ঝড়ের সাথে মোলাকাত হলো তার। মাল্লাদের সঙ্গে কথোপকথনে চাঁদের ব্যঙ্গ প্রকৃতির প্রতি, "এই বেটা গুঁই, খেলবি না

সোনা-সমেত তলাবি? এতদিনে এক খেলুড়ে পেলাম।" তো ঝড় গজরায়, বিদ্যুৎ আকাশ চেরে, বৃষ্টি, শিলায় পৃথিবী অন্ধকার। আর বেনে ঠা ঠা করে হাসে' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৪৭)। ভাগ্যাহত চাঁদের এই ঠা ঠা হাসি দৈবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন। চম্পানগরে এসে এক বিশাল উল্কাপাতে চাঁদের মধুলিট দু টুকরো হয়ে যায়। কালদগ্ধ চাঁদ এবার ভাগ্যদগ্ধ। দভভপাণির মনে হয়েছিল, 'মৃত্যু ভাগ্যনির্ভর অথবা এরা ইচ্ছামৃত্যু বলে জীবিত, অথবা হয়তো মৃতাবশেষ বলে মৃত্যু হচ্ছে না' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৪৮)। চাঁদের দগ্ধ ঠোঁটে তখনও হাসি ফুটেছিল। সে হাসি দৈবের প্রতি প্রগাঢ় বিদ্রূপ এক। অমিয়ভূষণের ভাষায়:

> বাম গণ্ড ঝলসে যাওয়ায় বাঁ চোখ বুজে বিরূপাক্ষ যেন, কিন্তু কালো কালো ঠোঁটে হাসি ফুটি ফুটি করছে যেন। চন্দ্রশেখর বললেন, 'পক্ষধর, বিনা মেঘের বজ্র হাজার বছরে একবার কারো শিরে মারে ভাগ্য। উল্কা? যাতে জাহাজ দাউ দাউ জ্বলে?' চন্দ্রশেখর সে অবস্থাতেই অট্টহাস্য করে উঠলেন, 'পক্ষধর, ভাগ্য একাঘ্নী মেরেছে, এবার ছদ্মবেশে।'
>
> চন্দ্রশেখর হয়তো বলতে চাইছিলেন, ভাগ্য তাকে শেষ অস্ত্র উল্কাপাত দিয়ে আঘাত করেছে, যা দশ হাজার বৎসরে একবার করে কিনা সন্দেহ। সে যেন কর্ণের একাঘ্নী শেল নিক্ষেপ, যার পরে ভাগ্যই পরাজিত হবে। কিন্তু সেই অট্টহাস্যের ফলেই তার মাথা কাঁধে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু দু-এক মুহূর্তে আবার মাথা তুলতে তুলতে বললেন, 'বিজয় কোথায়? আমার বিজয়?'...
>
> চন্দ্রশেখর? আর কোনোদিনই তাঁকে রূপবান বলবে না কেউ। চন্দ্রশেখর দমিত হন না। বিরূপাক্ষ ও ভৃঙ্গীবৎ হলেও প্রভাতে ও অপরাহ্নে, সায়াহ্নে পাটাতনে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ান।...পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ মধুলিটে সপ্তসাগর চষে বেড়ানো, সে তো মূর্তিমান হাহাকারই। তার উদ্দেশ্য কি ছিল সাগরদত্ত থেকে দুর্ভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা? হায়, দেরি হয়ে গিয়েছিল যেন। তারপর থেকে বিজয়ঘোষ থেকে দুর্ভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেই কি নতুন মধুলিটকে জরাজীর্ণ আর এক মধুলিট অনুসরণ করছিল? যখন ভাগ্য বুঝলে, শ্রমণ বিজয়কে সে কোনোভাবেই সার্থক আঘাত করতে পারবে না, তখনই এই চূড়ান্ত আঘাত তার চিরবৈরীকে? (অমিয়ভূষণ: ২০১০: ৩৪৯-৩৫০)

ভাগ্য কি চাঁদকে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল এখানেই, নাকি উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত আঘাতের জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হবে, অমিয়ভূষণ তার কোন ইঙ্গিত দেননি। আপাতত, শুধু এটুকু জানান, চাঁদ এক মূর্তিমান হাহাকার, জানান উল্কাঘাতে মৃত্যহীন চাঁদের জীবিত সত্তাই বিরূপ ভাগ্যের প্রতি তার চূড়ান্ত আঘাত।

উপন্যাসের 'তরঙ্গ ভঙ্গিল' অংশে সমকালের অভিঘাতে বিধ্বস্ত চাঁদ ও যুদ্ধধ্বস্ত সমতটের অস্তিত্বসংকট অনুরণিত। পল্লবরাজ নৃপতুঙ্গের সাথে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপরাজিতর দ্বন্দ্ব সমতটের দক্ষিণ অর্থাৎ বর্তমান সুবর্ণমুখীর দক্ষিণ থেকে রামেশ্বরম, সমগ্র দক্ষিণ ভারত এমনকি সিংহলের দ্বিতীয় সেনের রাজ্য বর্তমানের ত্রিঙ্কোমালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক উপাদানকে অমিয়ভূষণ এভাবেই উপন্যাসে গুঁজে দেন। ইতিহাস সেই স্রোতধারা, 'যাতে মনুষ্যকুল তার যুদ্ধ, শান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব নিয়ে অসহায়ভাবে ভাসমান' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৫৩)। পঁচিশবছরব্যাপী স্থায়ী পল্লবদের গৃহযুদ্ধে সময়াভিঘাতে অস্তিত্বসংকটে পতিত সমতটের মানুষগুলো ছিল অসহায়ভাবেই ভাসমান। সমতট ঠিক কার আনুগত্য স্বীকার করবে, সেটি নিয়ে দ্বিমত থাকলেও বহুজাতিক এই বণিকসংঘের ক্ষুদ্র উপনিবেশটি যুদ্ধ প্রতিরোধে এক দৃঢ় ব্যূহ তৈরি করেছিল।

চাঁদের সাঁওতালি পাহাড়ের প্রাসাদ হয়েছিল আরক্ষা দুর্গ। কিন্তু কালে বণিকেরা সমতট ছাড়ল। চমৎকার এই উপনিবেশ ক্রমশ ইন্দুধব-অরিমত্ত-শুরসেনের মত বণিকদের মৃত্যুতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

সমতটকে যদি চাঁদের প্রতীক হিসেবে ভাবা যায়, তাহলে তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অস্তিত্বে এই বহিঃশত্রুর আক্রমণ যেন বা দৈবের দুর্বিপাক। কিন্তু সে যেমন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করেছে, সমতটও তেমনি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। যুদ্ধধ্বস্ত সমতটে আত্মোপলব্ধ চাঁদের বাণিজ্যদপ্তরের ভাঙা পতাকাদণ্ড–সমতটের ভগ্নদশা, শুরসেন-দময়ন্তী আর সনকার সঙ্গে বহুদিন পরের সাক্ষাৎ চাঁদের ভেতর বেদনা জাগায়। সে অনুভব করে যুদ্ধ, পুত্রদের মৃত্যু আর চাঁদের অনুপস্থিতি তার আর সনকার ভেতর এক বিশাল ব্যবধানের জনক। বহুদিনপর সমতটে ফেরা ভীষণ নিঃসঙ্গ-বিষণ্ন চাঁদ ভাগ্যের কান এড়িয়ে যেন আত্মস্বীকৃতি দেয়:

> ভূমধ্যসাগর যে আছে, তার প্রমাণ আয়নীয় আর রোমকরা।...সেই ভূমধ্যসাগরে...সলোমনের মত বন্ধু, কৌন্ডিন্যর মত দক্ষ অধ্যক্ষ, তাদের, অতগুলো অভিজ্ঞ নাবিকের মৃত্যুর নিমিত্ত হয়ে আমাকে কি প্রমাণ করতে হয় না, মুনিবর, সেটা আমার নির্বুদ্ধিতা ছিল না? প্রমাণ করা দরকার ছিল, আমি হৃদয়হীন নৃশংস হয়ে বন্ধুর, অধ্যক্ষর, নাবিকদের অকারণ মৃত্যুর কারণ হইনি। ঈশ্বরসৃষ্ট সমুদ্রে অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার প্রমাণ করা, মালাবারি, কেরলি, সিংহলি বণিকদের কাছে অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু আলো, বাতাস, আকাশ, সমুদ্রের ঈশ্বর কাউকে নির্বাচিত অধিকারী করেছেন, তা অপ্রমাণ করা দরকার ছিল। আমরা মৃত্তিকা ভাগ করে আমার বলি,...কিন্তু সমুদ্র? মুনি, সনক, তখন তুমি একমত হয়েছিলে। আমি আমার বন্ধু, অধ্যক্ষ, নাবিকদেরই শুধু সে পথে পাঠাই না, আমার প্রাণসম পুত্রকেও পাঠাই, এটাও প্রমাণ করা দরকার ছিল।
>
> 'তা ছাড়া, সনকা, আমার পরিকল্পনায় কি ভুল ছিল?...সাগর বলেছিল,...অনেক সময়ে পুত্রদের নিজের যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করতে হয়, কে তার জনক। দেখো, আমি ভেবেছিলাম, সুমালিতে ভারতীয় পণ্যকেন্দ্র স্থাপিত হলে, বংকই প্রমাণ, সেখানে আরবি ঈশায়ী সব বণিকই আসত।...তখন ভূমধ্যসাগরের উত্তরকূলে যাওয়া সহজ হত।
>
> কিন্তু কেউ আবার নারীমূর্তিতে সুদক্ষ থাকে। চারুদত্ত সেদিকেই চলেছিল গোড়া থেকে। দক্ষও হয়েছে। নতুবা বিজয় তার ভৈরবীমূর্তিকে জননীর প্রতিকৃতি বলত না।...সেই ভৈরবী এখন প্রস্তরভৈরবী। কেউ যেন স্বর্ণমূর্তি-মাত্র হয়েছিল।
>
> ভৈরবীর বক্ষও কঠিন ছিল। কিন্তু মাথা রাখলে স্নেহে, করুণায় তা পুষ্পস্তবক-হেন কোমল হত, সনকার বুক হত।...সে মনে মনে বলল, 'ভাগ্য কি এত কাপুরুষ, সনক, যে সমাপতনের চেহারায় আসে? সে ঐরাবতের মত আসে না কেন?' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৩৮৩-৩৮৫)

চাঁদের এই অন্তর্কথনে কোন অনুশোচনাবোধ নেই; আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে সনকা অর্থাৎ নিজেকেই যেন জবাবদিহি করেছে সে। চাঁদের সবচে বড় পরাজয় বোধকরি সনকার ভৈরবীতে রূপান্তরীকরণে; উপরিউক্ত বক্তব্যে অনুরণিত সেই বেদনার অভিঘাত। সমুদ্রে হারিয়ে গিয়ে কোন্নগরে বেঁচে ওঠা সনকা চিত্রকর চারুদত্তের সংসর্গে তন্ত্রের ভৈরবী সত্তাকে আত্মস্থ করে। লেখক মন্তব্য করেন, ''কোনো কোনো মতে সনকাকে ফিরে

পাওয়াই তার জীবনে দৈবের প্রথম পদসঞ্চার' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২৬১)। সনকার এই রূপান্তর প্রক্রিয়া পুরো উপন্যাস জুড়ে চলমান। উপন্যাসশেষে চাঁদের অনুপস্থিতির নিঃসঙ্গতায় এবং চারুদত্তের সাহচর্যে আবার সে তার ভৈরবী রূপে ফিরে যায়। যে চারুদত্তের আরাধ্যা ছিল ভৈরবী, সেই চারুদত্তকেই যেন এতদিন পর বোধিসত্ত্বের মত পূজা করেছে সনকা। সনকার এই পরিবর্তমানতাই চাঁদের সবচেয়ে বড় পরাজয়। লেখক এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন:

> আমরা কি অঙ্কস্থিত স্ত্রীকেও চিনতে পারি? সনকাতো সবসময়ই চাঁদের মত পুরুষের কাছে ম্যাজিক। কখনো তাকিয়ে আছে গবাক্ষ দিয়ে, পাতার ছায়া এসে পড়েছে, মৌমাছির ছায়া এসে পড়েছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবতে ভাবতে, সনকা! একটা জিনিস দেখবেন, সবসময় ম্যাজিক করার পর রিয়েলিটিটা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভৈরবী কি ওর সঙ্গে আসত, যদি সে চাঁদকে চিনতে না পারত? তাহলে তো এটা আধিভৌতিক গল্প হত।...পরে বলা আছে যে ভৈরবী হবার সময় সনকা আঁচিলটা পরে নিচ্ছে। পিটুলির সঙ্গে হাঁড়ির তলার কালো রং লাগিয়ে দিলেইতো আঁচিল হয়ে গেল।...(অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫৭৯)

সনকার ক্রমরূপান্তর প্রক্রিয়ার এভাবেই বাস্তব ব্যাখ্যা দেন লেখক। তিনি মনে করেন, *চাঁদবেনে* উপন্যাসে ম্যাজিক অনৈসর্গিক মনে হলেও সেটি একেবারেই রিয়েল। সমালোচক সৌগত মুখোপাধ্যায় মনে করেন, জাদুবাস্তবতায় থাকবে, কল্পনা আর সত্যের সংমিশ্রণে 'আঁকাবাঁকা এবং গোলকধাঁধাময় কাহিনীক্রম; দক্ষ কালপরিবর্তন; স্বপ্ন ও রূপকথার মিলিজুলি ব্যবহার; অভিব্যক্তিবাদী, কখনও পরাবাস্তববাদী বর্ণনা; চমক এমনকী আকস্মিক শক্; বীভৎস আর ব্যাখ্যাতীতের উপস্থিতি' (সৌগত, ২০১০: ৫২৬)। সনকা থেকে ভৈরবী কিংবা ভৈরবী থেকে সনকায় রূপান্তরের চলমান প্রক্রিয়ায় আকস্মিক শক্ বা চমক এবং ব্যাখ্যাতীতের উপস্থিতি এ উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার আভাস দেয়। উপন্যাসশেষে মানবী সনকার প্রস্তরভৈরবীতে রূপান্তরকরণ চাঁদের সীমাহীন পরাজয়কেই চিহ্নিত করে। সাগর-বিজয় এবং আজন্মলালিত সনকাকে হারানোর মত মানবিক সম্পর্কের অন্তর্ঘাত চাঁদকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সনকা-সাগর-বিজয়-শুরসেনকে হারানোর বেদনায় আরোপিত মৃত্যু নিয়ে জীবিত চাঁদ এক রহস্যময় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিরুদ্দেশের পথ বেছে নেয়।

মজ্জমান সমতট যেন এক ডুবন্ত তরী, এবং যুদ্ধ এক ঝড়। ঝড় উত্তরণে সে তাই কাবেরীপত্তনমে ফিরে গিয়েছিল নতুন জাহাজ নির্মাণ করে যুদ্ধঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। পরবর্তীকালে চাঁদের সেই পোতগুলোর সাহসিকতার কথা দভভপাণির বয়ানে জানা যায়:

> চন্দ্রশেখর কাবেরীপত্তনম থেকে বরং দক্ষিণে তাম্রপর্ণীতে। সেখানে পাণ্ড্য বরগুণ ও তাঁর নিজের জাহাজগুলি তৈরি হয়, এবং সেটাই প্রধান ঘাঁটি। তাঁরা পরস্পরকে সহায়ক মনে করেন। চন্দ্রশেখর মনে করেন, সাতখানি জাহাজ রাখাই কুলক্ষণ হয়েছে। সেজন্য তাঁর জাহাজগুলির সংখ্যা এখন দশ। যথা, মধুকর, মধুপ, মধুলুব্ধা, মধুলিট, মধুতৃপ্ত, মধুমক্ষী, মধুভৃঙ্গ, মধুলিপ্সু আর, আর মধুমতী, মধুপায়ী। আর একখানাও তৈরি হচ্ছে। তত বড় ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।...এটার নামকরণ দ্বিরেফ হয়েছে।...কাবেরীপত্তনমের উত্তরে ও দক্ষিণে এক ত্রাসই যেন দেখা দিয়েছে। কেউ বলে অঙ্গারপর্ণ, কেউ বলে কালদীপ্ত। তারা নাকি কুষ্ঠী-হেন, কুদর্শন, দগ্ধানন। ফলে তাম্রপর্ণীর পাণ্ড্য-জাহাজগুলি ছাড়া, পোলার মোহনার নৃপতুঙ্গের জাহাজগুলি ছাড়া, আর কেউ বাণিজ্য করে না পুলিকট থেকে পল্লভরম, কাবেরী মোহনা থেকে অপরাজিত ও আদিত্যর

বণিকেরা বাণিজ্যে বেরোয় না। অশ্ব নিয়ে আরবি জাহাজ, ধান্য নিয়ে কলিঙ্গ ও চালুক্য জাহাজ পূর্ব উপকূলে আর চলে না। (অমিয়ভূষণ,২০১০: ৪১৪-৪১৫)

চাঁদ তার এই নতুন মধুকর বহর নিয়ে পুলিকটের উত্তর থেকে পুলিকটের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত সমুদ্রকে অগম্য করে তোলে। অঙ্গারপর্ণ-কালদীগ্ধ জলরাক্ষস নামে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর শাতনীকের চোখে কালদীগ্ধ তথা চাঁদ যেন:

খয়ের রঙের বর্তুলশ্মশ্রু, উন্নতশির, আয়তচক্ষু, হাস্যময়, কোটিস্বর্ণের সেই বণিক যে ভূমধ্যসাগরে যেতে চেয়েছিল; পরে আবার সেই উত্তপ্ত পিতলের নির্বাক, দৃঢ়, কঠোর, প্রায়ক্রুদ্ধ এক ভাস্কর্য যেন। শাতনীকের সন্দেহ হয়, সেই অতিক্রূরকর্মা অঙ্গারপর্ণই কি চন্দ্রশেখর? নতুবা তেমন ক্রোধ হয় না, যা অমানুষী ছিল। সেদিনের সমতটের আকাশে যে সূর্যাস্ত হয়েছিল, তা পরের দিনের সূর্যোদয়ে মিলেছিল। রাত্রির অন্ধকার দেখা যায়নি। তা তো সেই ভয়াবহ কালদীগ্ধর পঁচিশ জাহাজের পাঁচহাজার মশাল বলেই খ্যাত। সারা রাত্রির যুদ্ধের শেষে বিপর্যস্ত অপরাজিত-বাহিনীর অর্ধাংশ পল্লভরমের দিকে পলায়িত। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪২৯)

লোকশ্রুতি এমন যে, সুবর্ণমুখী চম্পার মোহনা থেকে পুলিকট হ্রদের দক্ষিণপ্রান্তে অঙ্গারপর্ণ ও কালদীগ্ধ নামে এক সমুদ্রত্রাস শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলোকে অগ্নিসাৎ করেছিল। এখানেও তার জয়।

কুম্ভকোণমের যুদ্ধশেষে পক্ষধর-শুরসেন পুত্র শাতনীক আর চাঁদের লক্ষীন্দ্রকে নিয়ে মধুলিট আবারও সমুদ্রে ভেসেছিল। এবারের গন্তব্য তাম্রপর্ণী-ভ্রম্ম অঞ্চল, মালয় হয়ে শ্রীবিজয়রাজ্য। অনুপস্থিত চাঁদের পূর্বনির্দেশেই এই যাত্রা। পক্ষধরের পক্ষে চাঁদের মত মৃত্যুহীনের মৃত্যু বিশ্বাস করা কঠিন। যে মৃত্যুহীনতার দর্শনে বিশ্বাস ছিল চাঁদের, উত্তরাধিকারীর রক্তে সেই প্রবল জীবনময়তার বীজ সে প্রোথিত করে দেয় শেষপর্যন্ত। পক্ষধরের কণ্ঠে চাঁদপুত্র লখাই জানতে পারে তার শক্তির মূলমন্ত্রটুকু:

চন্দ্রশেখর বলেছেন, "মৃত্যু নেই, সুতরাং মৃত্যু ভয় নেই। মন যাকে মানুষের মৃত্যু বলে, তা, আর ভবিষ্যতে যাবে না এমন এক বর্তমান মুহূর্তের চিরস্থায়িতা। কেননা, যখন বলি, কারো মৃত্যু হচ্ছে, সে তো তখন জীবিতই। সে জীবিত থাকতে মৃত্যু আসে না।...এই সেই ন্যস্ত ধন যা শাতনিককে সাক্ষী রেখে তোমাকে দিলাম"। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪৪০)

মূলত, এটিই চাঁদের বেঁচে থাকার শক্তি। বহুবার দৈবের হাতে মার খেয়েও মনোশক্তির বলেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। অস্তিত্বসংকট কাটিয়ে ওঠার এ এক গোপন প্রত্যয়। সমতটের তীরে দাঁড়িয়ে নিজের আরোপিত মৃত্যুর অন্তিম সংস্কার দেখার শক্তিও তার ছিল। শক্তি ছিল তার কুশদাহের ছাই ভাগ্যের মুখে ছিটিয়ে দেবার। সিংহলগামী জাহাজে, আকস্মিকভাবেই জাহাজী মুংলার জবানীতে উঠে এসেছিল জীবিত চাঁদের নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করবার এক রহস্যময় আত্মগোপনের কথা:

বেনে তো ত্যাখন সেতুতে দাঁড়্যে আগুন দেখছিল। মুখে য্যান মিঠে হাসি ফুটল। সকলে কী কী বলে, পরে বুলল, তা মুংলা, এখন এই মদুকর জাহাজটা তোকে দিলাম। অইদক্ক। যে দিক খুশি চল। বললাম, পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ। বুলল, তাই চল, নয় তো উত্তর-পশ্চিম, বা নয়তো সূর্য যেখানে ওঠে। তো, এখন তো আবার দেয়া জাহাজ নিজেই ফিরে নিল!...হঠাৎ পক্ষধর জাড্য কাটিয়ে সোজা হয়ে বসল। সমতটের সেই

> চিতা কি তাহলে নিজের তত্ত্বাবধানে নিজের শেষ সংস্কার করে যাওয়া চন্দ্রশেখরের? জানিয়ে গেলেন, তার সঙ্গে আমাদের আর কারো সম্বন্ধ রইল না? মধুকর নিয়েই বা একা তিনি কোথায় যাবেন? সেই ভূমধ্যসাগরই কি আবার? কিংবা তাকেও পার হয়ে? অথবা একি নিজের খ্যাতি অখ্যাতি প্রতিষ্ঠা সব কিছুকে দগ্ধ করে ভাগ্যর জন্য কিছু ছাই ছুঁড়ে দেয়া? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪৪২-৪৪৩)

চাঁদের এই আপাত পরাজয়ের ভেতর জয়ের বীজ প্রোথিত। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুহীনতায় ভাস্বর হয়ে রইল সে। দৈব বা ভাগ্যের দুর্বিপাকের লক্ষ্য তার 'নশ্বর দেহ'। সেই দেহের অন্তিম সংস্কারের মধ্য দিয়েই যেন সে সমুচিত জবাব দেয় ভাগ্যকে। শেষপর্যন্ত অনন্ত স্বপ্নপূরণে নিরুদ্দেশের সমুদ্রে অন্তর্হিত হবার মধ্য দিয়ে চাঁদ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে হয়ে ওঠে অপরাহত।

অমিয়ভূষণ মজুমদার মনে করেন মানবজীবনে সংঘটিত যুদ্ধ, বাণিজ্য, জীবনযাপন, প্রেম–সবকিছুর পেছনে সক্রিয় এক মহাকাম। মানুষের কর্মের প্ররোচক ও পরিচালক শক্তি এই কাম কুটিল, হিংস্র এবং ঈর্ষাপরায়ণ। এর উপস্থিতি ছাড়া জীবন স্থবির হয়ে উঠবে। আবার আঘাত পেলে সেটি ক্রোধ ও লোভের বিষ উদগীরণ করবে। পল্লবযুদ্ধের পেছনেও এই কাম বা প্রবল ভোগবাদ দায়ী, যার প্রতীক এখানে সর্প। পৃথিবীর শিরায়, গাছপালার ত্বকের নিচে, মানুষের স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত বিশ্বব্যাপী এই শক্তি মৃত্যুকে জয় করে বার বার জীবন দেয়। চাঁদও এর উর্ধ্বে নয়। সমলোচক রমাপ্রসাদ নাগ মনে করেন:

> বণিক চাঁদ সর্পবিষে জর্জরিত হয়। সে বিষ-কে কাল বলা যায়। কাল অর্থে প্রতিকূল সময়। যে সময়ে বাঙালী কৌমজীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগ, মহামারী সুতীব্র কালপ্রভাব। প্রীতিপদ কালকে ধরে রাখার অন্য কোন উপায় নেই। তাই বুঝি তন্ত্রে ফিরে যেতে হয়। আদিম সত্তার কাছে আশ্রয় চাইতে হয়। চাঁদ নিজের কৌমসত্তায় চলে যেতে চেয়েছিল। তার জাগ্রত মনের অগোচরে আর এক অজাগর মনে কৌম পূর্বাভিজ্ঞতা কাজ করেছিল সেই বিষময়ী কালকে শেষ পর্যন্ত বিষহরি রূপে না জানতে পারলে অনেকটাই অজানা থেকে যাবে। নিজের তত্ত্বাবধানে নিজের শেষ সংস্কার সম্পন্ন করে চাঁদবেনে এগিয়ে যান অগ্নিযজ্ঞ থেকে অন্য কোন অগ্নিযজ্ঞের দিকে। (রমাপ্রসাদ, ২০০৩: ৫০)

এভাবেই বিষময়ী কাল আর বিষময়ী লিবিডো চেতনায় লালন করেই চাঁদ ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। লিবিডো বা প্রাকচৈতন্যস্তরে বিরাজমান আবেগবৎ অন্ধ-বিবেচনাহীন এই ষড়রিপু কি দীপ্তিমান কোন পুরুষকে চালিত করতে পারে?–লিবিডো বা এই অন্ধ রহস্যময় শক্তি তাকে ভাবায়। সে কোন অন্ধ শক্তি দ্বারা চালিত হতে চায়নি। তার কাছে এই শক্তি ঘৃণ্য-পিচ্ছিল সর্পসম, যা কেবল অনার্য শ্রেণির আদি আবেগের বিজ্ঞান হতে পারে। কিন্তু স্নায়ুর ভেতর অনুরণিত এই শক্তি থেকে মানুষের মুক্তি নেই। চাঁদ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেও সেটি সাপের মতই নিঃশব্দে তার অস্তিত্বে বিরাজিত। চাঁদের স্বপ্নেও সর্পের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যা তার নিয়ন্ত্রণহীন লিবিডোর প্রকাশ। যে অসহায়ত্বের উপলব্ধি তার বাস্তবে নেই, সেটি অবচেতন থেকে বেরিয়ে স্বপ্নে এসে হানা দেয়:

> সে হেন্তাল বলেই চিৎকার করেছিল। যেন শ্মশান, যেন বা আবিল নদীর ধার, আলোও নয় অন্ধকারও নয়, দিন বা রাত্রি বোঝা যায় না। নদীতীরে বিরলপত্র এক প্রাচীন হিজল গাছ। বন্যায় কিছুদিন ডুবে থাকলে যেরকম ত্বকও পল্লবহীন হয়। জলের দিকে পত্রহীন ডালগুলো ঝুঁকিয়ে সেই অনেক অর্বুদযুক্ত গাছটা, যেন বা

> ডাইনি। সেই গাছের গোড়া থেকে কিছু উপরে এক খোঁড়ল। ভয়াবহ অন্ধকার সেই কোটরে। একটা পাখি আর্তরবে দ্রুত উড়তে উড়তে বেরিয়ে এল, আর একটা সাপ পিচ্ছিল গতিতে ফণা লুকিয়ে সেখানে ঢুকতে উদ্যত। অসহায়ের মত চিৎকার করতে করতে তার ঘুম ভাঙল। সে ভাবল–এরকম স্বপ্ন হতেই পারে। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১৭৯)

দৈবের কাছে চাঁদ অসহায়; তার জীবনে বার বার সেই অন্ধ দৈব দুর্বিপাক নিয়ে আগত। পলায়নপর উড়ন্ত পাখি এখানে চাঁদের জীবনের প্রতীক, যেখানে অন্ধ-সর্পসম লিবিডো এবং বিরূপ ভাগ্য তার ছোবল হানছে। অমিয়ভূষণ মনে করেন, উভয়ই নিয়ন্ত্রণহীন, বিষময়। শুধু এই উপন্যাসেই নয়, অমিয়ভূষণের এই বক্তব্যের অনুরণন শোনা যায় 'পদ্মাপুরাণ কথা' নামক প্রবন্ধেও:

> মনঃতে স্বার্থে টাপ্ করে যে মনসা–তা তো মনই যেন, অথচ মন নয়। তা কি প্রাকচৈতন্য মন? শিব যদি পরম মানস হয়, যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক, মনসাও কি তার অংশ, সেজন্য শিবাত্মজা? পরবর্তীকালে যাকে লিবিদো বলা হবে, সেও তো মনেরই অংশ। সে তো বিষের আধার, অথচ সে না থাকলে কিছুই কি ঘটে? সে জন্যই সজ্ঞান মনের সামনে কি তার প্রতিমা বসিয়ে বলা, হে বিষময়ী, তুমি জগৎপালিনী, বিষহারিণী হও? (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৫২৬)

মূলত কাশ্যপ মুনির ধ্যানে মনসার জন্ম অর্থাৎ ধ্যানে মনসা উপলব্ধ কিংবা মনঃসংশ্লিষ্ট বলেই তার নাম মনসা। মানুষের মনের ভেতর ইদ-ইগো-সুপারইগোর সঙ্গে লেখক একারণেই মনসাকে মিলিয়ে দেখতে চান। অবচেতনের কাম-ক্রোধ-মদ-মাৎসর্য-মোহ-লোভ তাই মনসা বা সাপের প্রতীক হয়ে ওঠে। বাইবেলেও সাপকে এক প্ররোচক শক্তি হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। জোসেফ ক্যাম্পবেল মনে করেন, জীবনের প্রবহমানতার প্রতীক–চিরঞ্জীবের প্রতীক' (ক্যাম্পবেল, ১৯৯৫: ৫৫) সাপ। যদিও এই উপন্যাসে অমিয়ভূষণ সাপকে ব্যবহার করেছেন মহাকামের প্রতীকরূপে। মহাকাম বা ভোগাকাঙ্ক্ষা যখন লোভে পরিণত হয় তখনই সেটি বিপর্যয় ডেকে আনে। চাঁদের জীবনের বিপর্যয়ের পেছনেও তার অবাধ বাণিজ্যলাভের আসক্তি। চাঁদের মত অযুত ঐশ্বর্যশালী বণিকেরা লোভীর মত বার বার সমুদ্রমন্থন করলে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রও বিষ উগরে দেয়। কারণ, 'ঐশ্বর্য আদায়ের শক্তিও সর্পরূপী। হয়তো বেনেদের থেকেই গল্প। সমুদ্রমন্থন তারাই করে। কিন্তু আরো লোভ করে, আরো ঐশ্বর্য আদায় করতে, তাকে বেশি ঘাঁটালে বিষ উগরায়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ২২৩)। যদিও বাণিজ্য শুধুমাত্র চাঁদের লোভ উৎসারিত নয়, সেটি তার স্বপ্নও; এই স্বপ্নই চাঁদকে মানবিক করে তোলে। সমালোচক বীতশোক ভট্টাচার্য মনে করেন:

> ভাগ্যের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধা মানুষের জীবন, চাঁদের জীবনে দুর্ভাগ্য সেই পূজনীয়া সর্পিনীর রূপ ধরে এসেছে, এই মাত্র। না হলে চাঁদের বিনষ্টি কোনো বিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র মনে হতো। অমিয়ভূষণ দেখিয়েছেন চাঁদের বংশ দৈব ও দুর্দৈব পর্যায়ক্রমে এসেছে, ডুবে গিয়ে ভেসে ওঠা আছে তাদের শোণিতের ধারায়, চাঁদের পিতা, চাঁদ এবং চাঁদের সন্তানেরা তাই একই পথের সহযাত্রী, তবু তাঁদের মধ্যে চাঁদের চলন সব থেকে অসহজ। লোহিতসাগরে আরবসাগরে ভূমধ্যসাগরে চাঁদের একের পর এক জাহাজডুবি ও আত্মীয়স্বজনদের মৃত্যুর জন্যে সিমুম তুষারঝড় এবং তাঁর নিয়তিকে অবশ্যই দায়ী করা চলে, কিন্তু সব সমুদ্রে সব বণিকদের জন্যে জলপথ খুলে যাবার বাস্তব স্বপ্ন দেখেছিলেন যৌথিকের প্রবর্তক, আবিষ্কারক ও অভিযাত্রিক যে চাঁদ তিনি নিজে তো এ নিয়তিকে উপার্জন করে নিয়েছেন। (বীতশোক, ২০০৪: ১৭৮)

শুধু অন্ধ কামরূপেই নয়, উপন্যাসে মনসাকে আদিবাসীদের অনার্য দেবীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, চাঁদ যাকে ঘৃণা করে। চাঁদের এই ঘৃণা উপন্যাসে একদিকে যেমন চাঁদ সদাগরের লোকমিথের যোগ ঘটায়, তেমনি, পুঁজির ধারক বৈশ্য শ্রেণির অনার্যের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষমতার দম্ভ চাপিয়ে দেবার আখ্যান নির্মাণ করে। উপন্যাসে লেখকের একটি বক্তব্যে বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে, যেখানে বৈশ্য শ্রেণির মানসভাবনার প্রকাশ ঘটেছে:

> সনকা...দেখল, সব চাইতে কাছের মনসাগাছটার কাছে পাঁচ-ছয়জন মানুষ। প্রদীপ জ্বলছে। ধূপের গন্ধ আসছে। আদিবাসীদের কোনো পূজা হবে এই খোলা আকাশের নীচে। বোধহয় সাপেরই।
>
> ...সনকা বলল, 'দেখো, ওরা হয়তো প্রভুর বা আমাদেরই মঙ্গলকামনা করছিল!
>
> ...কে মঙ্গল করবে, সাপ? সিংহ কিংবা ঈগল হলেও হত।...এসব কি ভালো? সাপ কুটিলতা, ক্রূরতা আর বিষের প্রতীক। মাটিতে মিশে চলে কপট কোমলতা আর বিনীত ভাব দেখিয়ে। মানুষ অসতর্ক হলেই ছুবলে দেবে। পূজা তো মানুষের অনুভূতিকে উদার আর মহৎ করতেই। হয় তা সরীসৃপের ধ্যানে?'
>
> সনকা বলল, 'হয়তো তাহলে সাপ আমাদের দাসদের প্রতীক। তুমি ভেবে দেখো, মূর্খ, মূক মানুষেরও অনুভূতি থাকে, সে অনুভূতি হয়তো মনের অন্ধকারে গতিশীল।...ওরা নিশ্চয় তোমার পরিবারের মঙ্গলকামনাই করবে। আর ওটা আমাদের দরকারও। জানো, তুমি সিংহলে রওনা হলেই ঝড় উঠেছিল। আর আমি তখন পবন ঠাকুরকে বলেছি, তাকে দস্যুর মত দাম্ভিক দেখালেও সে আমারই মত মানুষ। মনে মনে বলেছি, দোষ আমার।...দোষ আমার ভাগ্যের, তাকে তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ করতে পারিনি, তাই মাতরিশ্বা হয়ে বেড়ায়। দেখো, উচাটন করব না প্রতিজ্ঞা করে, পায়ে পাঁয়জোর নেই'। (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ১১৭)

অনার্য মানবের উত্থান চাঁদের মত কেন্দ্রশক্তির কাছে তুচ্ছ। যদিও উপন্যাস শেষে কুম্ভকোণমের যুদ্ধে অনার্যশক্তির উত্থানেই কিছুটা স্বস্তি মেলে সমতটে। কালদীগ্ধ বা অঙ্গারপর্ণ নামে খ্যাত চাঁদ সারাজীবন সর্পসম মহাকামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেও শেষপর্যন্ত মহাকামের সেই বিষই তাকে ব্যবহার করতে হয়েছে। সুবর্ণমুখী-পুলিকট হ্রদের সেই ভস্মসাৎ জাহাজের নাবিকদের মধ্যে যারা বেঁচে ফিরেছিল তারা বলেছিল, 'অঙ্গারপর্ণ ও কালদীগ্ধর মাল্লারা সর্পবাণ ব্যবহার করে, যার স্পর্শমাত্র সমস্ত শরীরের পেশী আড়ষ্ট মৃতবৎ হয়, চোখের দৃষ্টি কমে যেতে থাকে, সে অবস্থায় মৃত্যু হয়' (অমিয়ভূষণ, ২০১০: ৪৩৪)। চাঁদ কি তবে মনসার সেই সর্পপূজার প্রতি মাথা নত করেছিল? সমতট রক্ষায় আর্য বণিকদের কৌশল যখন ব্যর্থ হয়, তখন শ্রমজীবী অনার্য মানুষগুলোর সহায়তাতেই সমতটের ব্যূহ রচিত হয়েছিল। কাজেই আর্য বণিক চাঁদ অনার্য শক্তির প্রতীক সাপকে গ্রহণ করেই সমতটের হয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে লড়ে। এখানে লোকমিথের ঘ্রাণ গাঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারে চাঁদ। যদিও সমালোচক রবিন পাল মনে করেন, এ উপন্যাসে 'চাঁদের দ্বন্দ্ব কিসের সঙ্গে, তা স্পষ্ট নয়। প্রকৃতি বা মানুষ যখন নিয়ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় তখন সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হ'য়ে, কখনো পরাক্রম প্রদর্শন ক'রে একটি চরিত্র যেভাবে শালপ্রাংশু মহাভুজ হয়ে ওঠে তার সেই হয়ে ওঠার কাহিনী নেই এ উপন্যাসে। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের ট্রাজিক মহিমাও এখানে নেই' (রবিন, ২০০০: ১৬৭)। সমালোচকের এই বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া দুরূহ। প্রথমত, চাঁদের দ্বন্দ্ব কিসের সঙ্গে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও সেটি যে কাল ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে, তা উপলব্ধি করা যায়। উপন্যাসে বার বার বৈরি কাল ও বিরূপ ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে চাঁদ অস্তিত্ববান হয়ে

ওঠার মহিমা অর্জন করতে পেরেছে। কেননা, জীবিত থেকেই নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভস্ম ভাগ্যের দিকে ছুঁড়ে দেবার সাহস কালদগ্ধ চাঁদ জীবন থেকেই অর্জন করেছিল। তাই এই উপন্যাসে ভাগ্য আর কালের মুখোমুখি হওয়ার মত সাহসিকতায় চাঁদ অস্তিত্ববান । অন্যদিকে, চাঁদ এক মহান ট্র্যাজিক সত্তা। কেননা সপ্তবহরের সাথে সাথে পুত্র সাগর-বিজয়কেও তার হারাতে হয়েছে, সনকাকে হারিয়ে রূপান্তরিত এক রহস্যময়ী সনকাকে পেয়েও হারিয়েছে, হারিয়েছে সমতটের শৌর্যবীর্যময় জীবন আর শেষপর্যন্ত আরোপ করতে হয়েছে নিজের জীবিত সত্তার ওপর মৃতের মোড়ক। সর্বোপরি, এতগুলো বেদনা বহন করে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। সুতরাং ট্র্যাজিক চরিত্রের মহিমা সে অর্জন করেছে গভীর প্রজ্ঞায়।

অস্তিত্বসংকট কাটিয়ে ওঠার এই নিরন্তর অভিযাত্রায় এভাবেই চাঁদবেনে হয়ে ওঠে বাঙালির ক্রান্তিকালের এক চিরকালীন স্বপ্নজাগানিয়া চরিত্র।

লোকপুরাণের চাঁদ সওদাগরের কাহিনি অবলম্বনে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে নানা সাহিত্যকর্ম। হয়তো-বা এইসব সাহিত্যকর্মের পেছনে সাহিত্যরচয়িতাদের সেই যৌথ নির্জ্ঞানচেতনাই কাজ করেছে। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) চাঁদ সদাগরের কাহিনির নির্যাসে কবিতা লিখেছেন। শামসুর রাহমানের 'চাঁদসদাগর', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৫) 'বেহুলা-নাচানো স্বর্গ', আল মাহমুদের (১৯৩৬) 'সোনালি কাবিন', কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) 'বেহুলা', শওকত আলীর (১৯৩৬) 'শুন হে লখিন্দার' গল্প অথবা শম্ভু মিত্রের (১৯১৫-১৯৯৭) *চাঁদ বণিকের পালা* (১৩৮৪), মন্মথ রায়ের (১৮৯৯-১৯৮৮) *চাঁদ সদাগর* (১৯২৭) নাটক, এবং সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) উপন্যাস *চাঁদবেনে* (১৯৮৪), অভিজিৎ সেনের (১৯৪৫) *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* (১৯৯৫) উপন্যাস এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সাহিত্যের নানাক্ষেত্রে এই চরিত্রটি গৃহীত হবার পেছনে এর অস্তিত্বসংকট-সংগ্রামশীলতা আর স্বপ্নচারিতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অমিয়ভূষণের চাঁদের সঙ্গে সেলিনা হোসেনের চাঁদ কিংবা শম্ভু মিত্রের চাঁদের বাহ্যিক সাযুজ্য না থাকলেও আত্মিক সাযুজ্যের অনুরণন অনুভূত হবে।

অমিয়ভূষণের চাঁদ নবম শতকের যুগপৎ বীর ও ট্র্যাজিক চরিত্র বলেই 'জীবৎকালেই পায় পুরাণ চরিত্রের মহিমা...এ কালের ঔপন্যাসিক ত্রয়োদশ শতক থেকে রচিত হতে শুরু হওয়া মনসামঙ্গল কাব্যের মত এ উপন্যাসে মনসা-বেহুলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনেননি' (বিশ্বজিৎ, ২০১১: ৩৮১)। আর তাই ' চাঁদবেনে উপন্যাসের কাহিনীর যেখানে শেষ, মনসামঙ্গল কাব্যের সেখানে শুরু;' (বিশ্বজিৎ, ২০১১: ৩৮২)। অন্যদিকে শম্ভু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালা* নাটক পুরাণকথা অবলম্বনে রচিত হলেও নাট্যকার সেখানে চাঁদের সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এখানে নিরলস চাঁদ। সজ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত অজ্ঞানের প্রতীক মনসার পূজা করতে হলেও চাঁদ তার অভিযাত্রা থেকে বিরত হয়নি। বরং সব হারিয়ে নতুন উদ্যমে অস্তিত্ববান কণ্ঠে উচ্চারণ করে:

> আয় আয় তোরা। তোরা ছাড়া আমার তো পরিচয় নাই।...আমরা ক'জনা প্রেতের মতন চিরকাল পাড়ি দিয়্যা যাব। আমাদের কেউ নাই, কিছু নাই। নোঙর তো কেট্যে দেছে শিব।–প্রস্তুত সবাই? হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ!

কতো বাঁও জল দেখ। তল নাই?–পাড়ি দেও। এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও–পাড়ি দেও–। (শম্ভু, ১৪০৪: ১২৫)

তবে শম্ভু মিত্রের এই নাটকে 'চাঁদের প্রতিস্পর্ধা "অজ্ঞান", "অন্ধকার" এর বিরুদ্ধে। এখানে প্রত্যক্ষভাবে মনসার দেখা মেলে না। নেই কোনো অলৌকিকতার অমোঘ উপস্থিতি। একইরকমভাবে, 'চাঁদবেনে উপন্যাসে মনসা আছে বিমূর্ত অস্তিত্বে, যে কোনো চরিত্র নয়, এক অনুঘটক' (পৃথ্বিশ, ২০০১: ২৩১)। বরং মনসার পরিবর্তে সর্প মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার। সেই সঙ্গে অমিয়ভূষণ অলৌকিক ঘটনাও তেমন ব্যবহার করেননি। যে ঘটনাগুলোতে দৈবের ব্যবহার করেছেন, তার একটা বাস্তব ভিত্তিও রচনা করে দিয়েছেন। মনসার উদ্ভব মূলত অমিয়ভূষণের মতে মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণের সময়। ক্ষয়িষ্ণু পালবংশ এবং আক্রমণাত্মক সেনবংশের ক্রান্তিকালে আশ্রয় হিসেবে সৃষ্ট এই মনসা। শিবের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের সাধনা করার বিষয়টিও একেই প্রকাশ করে। শম্ভু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালাতে*ও মনসা কামনার প্রতীকে দু এক জায়গায় প্রকাশিত, যেখানে চাঁদের অভ্যন্তরে সক্রিয় মনসার শক্তি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। নাট্যকারের ভাষায়:

মনে-মনে ভাবো তুমি, যেন আজোবধি লড়্যা যাও মনসার সাথে। অথচ দেখ না, যে, মনসা তোমারে অন্তরে অন্তরে কোন রূপ থিক্যা কোন রূপে পালটেয়্যা দেছে? বোঝ না যে মনসার শক্তি চলে শিকড়ে-শিকড়ে আন্ধারে-আন্ধারে–

তোমারি ভিতরে তোমার যে অন্ত্রনালী, সেও কাজ করে যায় তোমারি অজ্ঞাতে। মনসার নিয়মের বশে।...(শম্ভু, ১৪০৪: ১১৮-১১৯)

মানুষের ভেতরের লিবিডো বা মহাকাম এখানে মনসা প্রতীকে প্রকাশিত।

'এই নাটকের শুরু থেকে শেষ অবধি, মিথসুলভ দৈবক্ষম কোনো শক্তির পরিবর্তে একান্তই জাগতিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে চাঁদের সঙ্গে মনসার বৈরিতার চিত্রায়ণ করার জন্য' (চন্দ্রমল্লী, ২০০১: ২১৮)। একালে সেলিনা হোসেনের *চাঁদবেনের* চাঁদ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর এক অস্তিত্ব, যার দ্বন্দ্ব প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে। প্রতিকূল প্রকৃতির কার্পণ্য, মহাজনের শোষণ আর স্ত্রীর অবহেলার সাথে নিরন্ন এক কৃষক চাঁদ প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যায়। সমালোচকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক:

উপন্যাসে কাহিনীর মৌল-উৎসে আছে মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গ; তবে কেবল মনসামঙ্গলের আবহেই চাঁদবেনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মঙ্গলকাব্যের জীর্ণপাতা থেকে লেখকের চেতনার স্পর্শে এখানে ফুটে উঠেছে মুক্তিপাগল এক ভূমিহীন শোষিত ক্ষেতমজুরের জীবনযন্ত্রণা এবং জীবনসংগ্রামের কাহিনী। এ-উপন্যাসে পূজাপ্রার্থী ভয়ঙ্কর এক রাক্ষুসী মনসা নেই; তবে আছে মনসারূপী এক ভূস্বামী শোষক আজু মৃধা। এই আজু মৃধা চম্পাইগঞ্জের মানুষদের শেষ রক্তবিন্দু শোষণ করে দিনে দিনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে, গ্রাস করেছে তাদের ভিটে-মাটি আর সবটুকু শ্রমশক্তি। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের যুগে দেবতা-নিয়ন্ত্রিত সমাজে সবার অলক্ষ্যেই যেমন জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদ...তেমনি চাপাইগঞ্জের অবরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশে ভূমিহীন শোষিত কৃষক-মজুরের ঘরে জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদবেনে–যার কণ্ঠে চাঁদ সদাগরের মতই প্রতিবাদধ্বনি:

> "আমি আজু মৃধার শোষণ থেকে মুক্তি চাই, আমি তাকে ঘৃণা করি, আমি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করি", (বিশ্বজিৎ, ২০১১: ৩৬)।

চাঁদের সংগ্রামশীলতার মৌল শক্তি শ্রম। আর শ্রম দিয়েই যেন সে মনসারূপী আধুনিক অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন মন্তব্য করেন, '...আমার এই চাঁদকে আমি তৈরি করেছি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণমানুষের প্রতিবাদ হিসেবে' (সেলিনা, ২০১৬: ৩৩১)। উপর্যুক্ত উপন্যাস আর নাটক উভয় সাহিত্যকর্মেরই মূল কথা চাঁদের সংগ্রামশীলতা। আর এই নিরন্তর সংগ্রামের বলেই চরিত্রগুলো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। অমিয়ভূষণের সমতটের চাঁদবেনের অস্তিত্বেও অহমবোধের প্রাবল্যই মুখ্য হয়ে ওঠে।

মধু সাধুখাঁ

মধু সাধুখাঁ উপন্যাসে মধ্যযুগের এক বিশেষ কালপরিসরে ভাষারূপ পেয়েছে বণিকশ্রেণির প্রতিনিধি মধু সাধুখাঁ'র মনোজাগতিক টানাপড়েন, মনোদর্শন, ধর্ম-মৃত্যু-পাপ-কাম ও নিয়তিচেতনা। মধু এক জন্মবণিক। পিতামহ, পিতা ও খুড়োর বেনেবৃত্তি তার রক্তে। কালের অভিঘাত ধারণ করেই সে বাণিজ্যজীবনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। মধুর সমকাল তার মতই ক্রূর। অমিয়ভূষণ এই উপন্যাসে সেই ক্রূর কাল আর ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক টানাপড়েনকে যথাযথভাবে ধারণ করতে সচেষ্ট।

ইতিহাস অমিয়ভূষণের প্রিয় বিষয়। 'সময়ের বিভাজনও তাঁর কাছে জরুরী। যে-কারণে কালবৃত্তে মানুষকে ধরতে পারার দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করেছেন' (শীর্ষেন্দু, ১৪০৮: ৭) তিনি। ষোড়শ শতকের বাণিজ্যজীবনসংলগ্ন মধু প্রবলভাবে কালচিহ্নিত। উপন্যাসে পূর্বস্থলী থেকে কামতা অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণের পুরো পথ জুড়ে নদীপারের কোলাজচিত্রের সঙ্গে মধুর জীবনের টুকরো টুকরো ইঙ্গিতবাহী ঘটনা একাকার হয়ে আছে। সেইসঙ্গে ষোড়শ শতকের বণিক জীবনের অন্তরঙ্গ ভাষ্যও রচিত হয়ে গেছে চমৎকারভাবে। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী এ উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন:

> ইতিহাসকে কি অবলীলায় তিনি ধরতে পারেন তার প্রমাণ...মধু সাধুখাঁ (সারস্বত প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)। ১৫৮৬-র বাংলার বণিক সমাজের একটি আশ্চর্য জীবন্ত আখ্যান তিনি নির্মাণ করেছেন। অল্প রেখায় কিন্তু স্পষ্ট আঁচড়ে আঁকা কয়েকটি মানুষ এবং একটি নৌকাযাত্রা। লক্ষ্য বাণিজ্য; কিন্তু তার মধ্যেই সুখ, দুঃখভোগ, সমস্যা, কঠিন সমাধান–সব নিয়ে নিটোল জীবনপ্রবাহ। মানুষগুলি এত সজীব, এত সম্পূর্ণভাবে সময়চিহ্নিত অথচ এত শিল্পময়–যা শিল্পীর হাতে দু-একবারই হয়ে যায় মনে হয়। ছোটো পরিসরে বণিক-বাংলার এত ব্যঞ্জনাময় ছবি আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। (সুমিতা, ২০১৬: ২৭৮)

অমিয়ভূষণ মধুকে ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট কালপটে স্থাপন করে তার জীবনবোধ ও জীবনদর্শনের অন্বেষণ করেছেন। সুনির্দিষ্ট কালপট জড়িয়ে আছে মধুর বেনে নৌকায় সঙ্গি হয়ে থাকা ঐতিহাসিক চরিত্র রালফ্ ফিচ্ বা 'বলা'র সঙ্গে, যার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে মধুর চেতনার রূপরেখা নির্মিত হয়। 'বলা' চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে অমিয়ভূষণ নিজেই লিখেছেন:

> প্রিয় পাঠিকা,...বুঝতে পারছি ঘটনাটা ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের। এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিঙ্গি বলাই সেই ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ্ নিজেই। ইতিহাসের চরিত্রই বটে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২১)

মধ্যযুগকে বাস্তব করে তোলার জন্য অমিয়ভূষণ ইতিহাস থেকে রালফ্ ফিচের চরিত্র গ্রহণ করেন। এ চরিত্রের ঐতিহাসিক পট সম্পর্কে জানা যায়, পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ী রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে টাইগার নামক জাহাজে করে ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের সনদ নিয়ে ভারতে এসে পৌছান। ইংরেজদের ব্যবসা ও ভ্রমণসংক্রান্ত নিরাপত্তার অনুরোধ ছিল এ পত্রে। হরমুজ বন্দরে তিনি গুপ্তচর হিসেবে গ্রেফতার হন। বন্দি হিসাবে পর্তুগিজদের তত্ত্বাবধানে গোয়ায় পৌঁছালে সেখানে বেশ কিছুদিন কাটে অন্তরীণ অবস্থায়। অবশেষে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ছাড়া পাবার পর ফিচ্ ভারতের প্রাণকেন্দ্র আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে যান। গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়ার ভাষ্যমতে:

> আগ্রা যমুনা ও গঙ্গা নদী হয়ে প্রয়াগ, বেনারস ও পাটনার ভেতর দিয়ে তিনি বাংলায় আসেন। ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আগ্রা ত্যাগ করেন এবং ১৮০ খানা নৌকা বোঝাই পণ্যসহ ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'তাণ্ডা' শহরে পৌঁছেন।...তিনি তাণ্ডা থেকে কুচবিহার রাজ্যে যান। ওখান থেকে হুগলি বা পোর্ট পিকেনো পৌঁছেন। হুগলি থেকে সাতগাঁ, বাখরগঞ্জ এবং শ্রীপুর হয়ে তিনি ঈসা খান এর রাজধানী সোনারগাঁ-এ আসেন। সোনারগাঁ থেকে তিনি চট্টগ্রাম বা পোর্ট গ্রান্ডে আসেন।...১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে মালাক্কা দ্বীপে পৌঁছেন এবং ফিরতি পথে তিনি পুনরায় বাংলায় আসেন এবং জাহাজের অভাবে ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। (গোলাম কিবরিয়া, ২০০৩: ১৪৭-১৪৮)

ষোড়শ শতকের পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্কে এ উপন্যাসে বাংলার নদীতে মধুর বেনে নৌকায় তুলে দিয়েছেন অমিয়ভূষণ। ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও লেখক ফিচের পরিবর্তে সেকালের বৈশ্য শ্রেণির অচিহ্নিত একটি চরিত্র মধুকে প্রোটাগনিস্ট চরিত্র করে তুলেছেন। প্রায় সাত আট মাস সময় ফিচ্ মধুর নৌকায় কাটায়। তার সাথে মধুর যাপিত সময়কালের টুকরো টুকরো ছবিগুলোই অমিয়ভূষণ এখানে গ্রহণ করেছেন। সেইসঙ্গে কাহিনির প্রয়োজনে মধুর সাঁইত্রিশ বছরের জীবনকথার সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরিদের কথকতাও যুক্ত হয়েছে ।

সময় রূপায়ণে অমিয়ভূষণ এখানে সরাসরি সন উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের আবহ আর পারিপার্শ্বিকতাও সেই সময়কালকে বিশ্বস্ত করে তোলে। নৌবাণিজ্য, জলপথের অনিশ্চয়তা, জল-দুর্গে মাশুল দেবার অভিজ্ঞতা, রাজন্যকে ভেট দিয়ে বাণিজ্যপথ সুগম রাখা, দাসব্যবসা কিংবা ফিরিঙ্গির-সঙ্গ মধ্যযুগের সময়কে কংক্রিট করে তোলে। সমালোচক জানান:

> জনান্তিকে অমিয়ভূষণ জানিয়ে রাখেন উপন্যাসের সময় হচ্ছে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ...এই যাত্রা পথে ঝড়, ঘাই হরিণী, সতীদাহ নরবলির গল্প, তোপদাগা, বাণিজ্যতরি লুণ্ঠন, সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণের সীমানাভাগ ইত্যাদি উপকরণগুলির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ জলযাত্রা, বাণিজ্যপথের ভূগোল–এমন অনেক উপাদানই আছে যা পাঠকদের মধ্যযুগের বাংলায় ফিরিয়ে দেবে। (সাধন, ১৯৯৫: ১৩৬)

মধ্যযুগের জলজীবনের এইসব অনিশ্চয়তা পার হয়েই মধুকে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে হয়। বলা যেতে পারে, জল ও সময়ের এই টলায়মান জীবনে মধুর বাণিজ্যতরী তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা সেটিই শেষ পর্যন্ত দেখার বিষয়।

লেখক উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক কাল থেকে আরেকটি কালে উত্তরণের কথকতা রচনা করেন। সময়টি ব্রিটিশ উপনিবেশপূর্বকাল। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। ভারতে তাদের আগমন এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতাবিস্তারের আসন্নতা ট্যাবাকু প্রতীকে উপন্যাসে রূপায়িত। মধুকে ছেড়ে যাবার সময় ফিরিঙ্গি একখুঁতি ট্যাবাকুর বীজ দিয়ে যাচ্ছে। এই বীজ সম্পর্কে মধুর পরবর্তীকালের ভাবনা ব্রিটিশ রাজত্ব বিস্তারকেই প্রতীকায়িত করে :

> কী শেখাল ফিরিঙ্গি, এই ট্যাবাকু। পাতাগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এক খুঁতি বীজও দিয়ে গিয়েছে। এক খুঁতি বীজ থেকে সারা পৃথিবী ভরে দেয়া যায়।...ফাইন এই ট্যাবাকু। মদু বেশ ধীরে-ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল। ফুরিয়ে গেলেও ভয় নেই। এক খুঁতি বীজ আছে। এক খুঁতি বীজে সারা দেশ ভরে সবুজ পাতা-মেলা ট্যাবাকু গাছ জন্মাতে পারে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৮, ৪০)

পুরো দেশে ট্যাবাকুর বীজ ছড়িয়ে যাওয়ার অর্থই হলো ব্রিটিশ শাসকের রাজ্যবিস্তারের আসন্নতা। ক্রমশ তাদের শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই এই প্রতীক বিশ্লেষণে সময়ের আরেকটি নতুন মাত্রা উন্মোচিত হচ্ছে ।

বহিরাঙ্গিক সময়ের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক সময়েরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। চেতনাপ্রবাহরীতির এই উপন্যাসে সাত-আট মাসের প্রবহমান অখণ্ড সময়ের ভেতরেই মধুর চেতনার টুকরো টুকরো অনুসময়কে গুঁজে দিয়েছেন লেখক। বর্তমান ও অতীত এখানে জলের মত ঘুরপাক খায়। এ ক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> এই যাত্রায় মদুর জীবন ও অনুভূতির সঙ্গে নিয়তির মত নিয়ত জড়িয়ে রয়েছে বাংলার নানা নদী। নদীজলে যাপিত জীবন এখানে গতিশীল নদীর সঙ্গেই সমীকৃত। এ এক সমান্তরাল রূপক। নদীর একটানা গতি-ঢেউ, পাক ও জলঘূর্ণি মদুর চোখের সামনে সাপের পিঠের মত নিঃশব্দে পিছলে যাচ্ছে; আর তার মাথার ভেতর চলছে ভাবনার চোরাস্রোত। আর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবনদৃশ্য যেন পাক খেয়ে খুলে খুলে যাচ্ছে। এ উপন্যাস নদীর মত প্রবাহিত সময়স্রোতে গাঁথা এক স্তম্ভ যেন–যেখানে মদুর জীবন চিত্রলেখার মত প্রতিচিত্রিত। (মাহবুব, ২০১৫: ১৬৮)

মধুর চেতনা-জল ও সময় এখানে একাকার হয়ে আছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, খোজা ক্রীতদাস বদরকে নিয়ে ভাবনার রেশ ধরে মধুর চেতনায় একের পর এক স্মৃতির ভাসান দিয়ে ওঠার কথা। দু-এক আগের রাতের কথা তার চেতনায় হানা দেয়, যে রাতে বদরকে সে বিছানায় স্ত্রীলোক এলে যেমন বোধ হয়, সেভাবে অনুভব করেছিল। সেই ভাবনার অনুরণনেই একের পর এক মধুর জীবনের পেছনের ঘটনা মূর্ত হয়ে ওঠে:

> আর সন্ধ্যায় নৌকার কোঠার মধ্যে মদু সা ভেবেছিল।...সেদিন মদু সা ভেবেছিল : মৃত্যুকালে পিতামহের বয়স চল্লিশ ছিল। তার পিতা প্রায় দীর্ঘজীবী হতে গিয়েও সাতচল্লিশে গত হয়েছেন।...ভাবনার পিছনে ভাবনা চলে, তারপর ভাসান দেয়। যেমন, কোঠা থেকে বেরিয়ে এল মদু। আলোচ্য বিষয়ের কাছাকাছি

> ডাইনি-ডান ছিল বলেই যেন মনে পড়ল, আকাশ মেঘলা হলে জলে যেমন সূর্যের বিম্ব ফোটে, কাঁপা-কাঁপা, ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু চেনা ঠিক যায়, যেন তেমন করে তার ভাবনার জলে বিবিসাহেবের সফেদ রঙ ফুটে উঠল। তার খুড়িমার মুখেই কথাটা শুনেছিল মদু, দু-দুটো কথাই: রাঁঢ় আর ডান। মেয়েলি ঝগড়ার সুর। কিন্তু কথাটা–বাপের রাঢ় না? মায়ের চেয়ে ভালোবাসো? ডান কোথাকার! (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫)

ঘটমান বর্তমানের ভেতর এভাবেই অতীতের গতায়াত ঘটে। উপন্যাসে মধুর অস্তিত্বসংকটের জায়গাটিও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়। পিতামহের মৃত্যু, পিতার মৃত্যু, তার মৃত্যুভয়, বিবিসাহেবের প্রতি লুক্কায়িত আকর্ষণ, পাপবোধ, নিজের শৈশব-কৈশোর-যৌবন আর এখনকার বাণিজ্যজীবনের অনিশ্চয়তা তার ভাবনাস্রোতের সাথে লুকোচুরি খেলে। চেতনার এই মুহুর্মুহু টানাপড়েনে এভাবেই তার জীবনের অখণ্ড সময় থেকে খণ্ড খণ্ড স্মৃতি বিচ্যুত হয়ে অনু সময়ে পরিণত হয়। মধুর মনে হয়:

> নদীস্রোতের এক কৌতুক আছে–সর্বত্রই জল, জলই তো, আর একটানা গতিও, কিন্তু অবিরত বদলাচ্ছেও যেন; ছোট ছোট পাক, ছোট দু-চারটে ঢেউ, অন্য কোথাও সাপের পিঠের মত নিঃশব্দে পিছলে যাওয়া বা। আর সেদিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মনেও যেন তেমন এক স্রোত চলতে থাকে–এ কথা, সে কথা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, পাক খেয়ে পিছলে গিয়ে।
>
> মাথার উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল মদু। সেখানে সময়।
>
> তাই বলে তার ভুল হবে এমত হয় না। স্রোতে কাঠি গাড়া যায় না বটে। আজ কিন্তু রবিবার, তিসরা সপ্তাহ, মাস জ্যৈষ্ঠ, তা নদী দেখলেই বুঝবে, পন্দরশো আট শক। সময়ের স্রোতে কাঠি গাড়া যেন। এ নদী সে নদী করে সে উজিয়ে চলেছে বলে সময়ের দিক ভুল হবে কেন?
>
> মদু মিটমিট করে হাসল। সাধুর বেটা সাহা, সাউকার, সাধুখাঁ, জাতে কায়েৎ, সাতপুরুষে বেনে; আঁক চিনতে তার ভুল হওয়ার কথা নয়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২০)

মধুর বিপন্ন বাণিজ্য-জীবনঅস্তিত্ব-মৃত্যুচেতনা-নিয়তিচেতনা-পাপবোধ-তার চেতনায় ছোট ছোট ঢেউয়ের মত ঘূর্ণায়মাণ। কালের অমোঘ আহবানে কামতারাজবংশের উত্থান পতনের কথাও মনে পড়ে মধুর। শুক্লধ্বজ, নীলধ্বজ-নীলাম্বর-বরবাঁক তুবরাক খাঁয়েরা-হুসেন শা নরনারায়ণ–এদের প্রত্যেকের কালের গর্ভে হারিয়ে যাবার ইতিহাস মধুকে তার অনিশ্চিত জীবনের কথা, মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। তার মনে হয় বৈরি কালের কাছে জীবন ভয়ঙ্কর অসহায় ও অনিশ্চিত। 'জীবনকো কোই ঠিকানা হ্যায়?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২২)–মধুর এই প্রশ্নেই উচ্চকিত হয়ে ওঠে জীবনের অনিশ্চিতি। যদিও জলের টালমাটাল টান পেরিয়ে মধুর জীবনসম বাণিজ্য-নৌকা নিয়ে এগিয়ে চলে। সমালোচক বীরেন্দ্র চক্রবর্তী এ উপন্যাসের সময়চেতনা সম্পর্কে লিখেছেন:

> ...সময় এখানে মধুর স্মৃতিতেই আবর্তিত, তার মনের সেই স্রোতে যেখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মনেরই ত্রিকালে পাক খাচ্ছে। অথচ পাশাপাশি একটা বস্তুজগৎ আছে তো, পরিবেশ যাকে বলি, স্বতন্ত্র যার অস্তিত্ব। দুইয়ের সংঘর্ষেই সৃষ্টি হয় পরিস্থিতির যার জটিলতায় সময়ও জটিল হয়ে ওঠে। (বীরেন্দ্র, ২০০৪: ১৪৪-১৪৫)

কাজেই মধুর বহির্বাস্তবতা আর অন্তর্বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়ায় এ উপন্যাসের সময়চেতনা ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে।

লেখক এ উপন্যাসে সময়বিন্যাসে রঙের ব্যবহার করেছেন। ধল্লায় দিনের প্রথম আলোয় ঝাঁকবাঁধা নৌকা দেখে মধু বিপদ আঁচ করে। মদুর অন্তশ্চেতনার সেই টেনসন সময়ের ওপর আরোপিত। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, 'তখন বেলা উঠেছে কি না-উঠেছে। মদু একেবারে অবাক হয়ে গেল। দিনের প্রথম আলোয়–আলো তখন শেয়ালি রঙের–নদীর জলে লাল-কালোর ছোপছোপ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৯)। আসন্ন এক রক্তপাত কিংবা অজ্ঞাত বিপদ ভোরের এই রঙে আভাসিত। এমন রঙেরই এক ভোরে বাণিজ্য করতে গিয়ে রাজনীতির এক কূটচক্রে মধুর পিতামহকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল। কাজেই এই রঙের ভোর মধুর কাছে বিশেষ কোন বিপদের বার্তাবাহী। মধু ভাবে:

> আর সেও হয়তো ভেবেছিল ভোর রাতে রওনা হয়ে আড়িয়াল খাঁর বিপদটুকু পার হবে, যেমন তুমি ভাবছ ভোর রাতে। আর সেই ভোরে আকাশ লাল আর জল গলানো সোনার মত ঝলমল করছিল। এই আকাশের মত লাল আর সোনালী, শুধু আরো যেন বেশি উজ্জ্বল আর গলানো সোনার আরো কাছাকাছি। আর সেই গলানো সোনায় কালো-কালো ছাই-এর দাগ যেমত, যেন গা ভাসানো কুমিরের সার এমত কোষার সারি। আর পরও নয় সে, সেদিন যে গিয়েছিল, শেষদিন হলো যার ভাল করে দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে; সে তোমার পিতামহ। আর এমত আচমকাও হতে পারে, গতকাল পড়নি তুমি দিনের আলো ফুটতে-না-ফুটতে টেপুর বহরের মধ্যে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৯)

সময় ব্যবহারে একই রঙের উপস্থাপনে পিতামহের সময়কাল আর মধুর সময়কাল এখানে একাকার। সময়ের এই রঙ উপন্যাসে মধুর জলজীবনের নানা প্রতিকূলতাকে প্রতীকায়িত করে:

> অনেক রকমের আকাশ দেখা আছে মদুর সকালের। টুপ করে আলো নেবার পর যে-অন্ধকার; তারপরে নানা দিন নানা রঙের আকাশ হয়। লালে সোনালিতে মাখামাখি হয়, কখন যেন একবার লালে সবুজে মেশামেশি ছিল। গন্নার মতে তা ঝড়ের কারণ। এখন ঝড় ওঠা কিছু অসম্ভবও নয়। তাও ভয়ের। আবার এমন হয় শেষ রাতের চাঁদ ডুবতে-ডুবতে না অন্ধকার। মেঘের ছায়ায় জল কালো। আর তার মধ্যে খুব ধীরে-ধীরে বেরঙা আলো ফোটে, অবশেষে জলের মধ্যে স্রোতে পাকে ভাঙা-ভাঙা বিবিসাহেবের মুখের মত সফেদ ঠাণ্ডা ঝিকিমিকি সূর্য দেখতে পাওয়া যায়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪০)

প্রহর পাল্টানো এই রঙ সময়ের রূপান্তরকেই প্রতীকায়িত করে। কখনও মধুর জীবন বেরঙা আলোময়, কখনও অন্ধকার, আবার কখনও বা বিবিসাহেবের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়ানো। নৌকাকে যদি মধুর সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে জল ও জলের ঢেউগুলো হয়ে ওঠে মধুর চেতনায় ফিরে ফিরে আসা অতীত স্মৃতি। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, '...কী হতে কী হয়, তা বলা যায় না।...এ-কথায় ও-কথায় সরে-সরে বেড়ালে তা...দেখছ না অন্ধকারে জলের স্রোতও কেমন নৌকার গায়ে ঘা মারছে, পাক খাচ্ছে নৌকার তলায়, (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৮)। নিঃসঙ্গ জলজীবনে মধুর চেতনার এইসব ছেঁড়া ছেঁড়া অংশগুলোর সমন্বয়েই এক অখণ্ড সময়কাল উপন্যাসে বহমান।

সুনির্দিষ্ট সময় ব্যবহারের পাশাপাশি অমিয়ভূষণ এ উপন্যাসে অনির্দিষ্ট কালপর্বও ব্যবহার করেছেন। 'গত একমাসে', 'মাস দু-এক আগে একরাতে', 'পরশু রাতের ঝড়', 'দু-তিন দিন থেকেই', 'দু-দশ বছর–এর মত অনির্দিষ্ট কালের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। এই অনির্দিষ্টতা সময়কালের কংক্রিটনেস থেকে ঘটনাকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে এতে পাঠক-কল্পনার বিস্তার ঘটেছে।

ঋতুর ব্যবহার করেছেন লেখক। আকাশে মেঘা-চাঁদ দেখে মধুর মনে পড়ে, 'তা এখন জ্যৈষ্ঠ শেষ, আষাঢ় আগু। আর কালজানির চরুয়া চরো খাত' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪০)। জলজীবনের অনিশ্চয়তা কাটাতেই মধুকে ঋতুর খবর রাখতে হয়, যা তাকে ঝড়-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জলজীবনের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দেয়। এভাবেই কালের অভিঘাত এবং 'মধু সা ও তার নাওয়ের ধল্লা, বল্লা, গন্না, সাউকারদের নিয়েই গড়ে ওঠে এক স্বয়ম্ভর কৌম,...কথা ও পুরুষমানুষদের নিয়ে মধুসার নাও ভুবনই যেন, কারণ ভাগীরথী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের পর ধরলার স্রোতে ভাসা, যেন তা অনন্ত স্রোতই...সেই নাওয়ে একথা, সে-কথা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, পাক খেয়ে, পিছলে গিয়ে আছড়ে পড়ে' (শুভময়, ১৪০৮: ৫২)। জলের নিচে সময় আর জলের ওপর জীবন। জল-জীবন ও কাল এ উপন্যাসে মধুর অস্তিত্বের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

বৈরি সময়ের ওপর ছায়া ফেলে ফেলেই মধুকে অস্তিত্বের শেকড় শক্ত করে নিতে হয়। মধুর সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে উপন্যাসের শুরুতেই লেখক লিখেছেন:

> মদু সা সাতিশয় হারামজাদা ছিল–সন্দেহ কি?...লক্ষ্য করলে দেখা যায় টিকলো নাকের উপরে চুলের মত সূক্ষ করে টানা রসকলি।...তার নৌকার মাঝি-মাল্লারা হিন্দু, কিন্তু বদর এবং বলা? তার জন্য পাক করে তোপদার, জাতে সে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে বলার সঙ্গে একত্র পানাহার করে, বদরের ছোঁয়া খায়। বদর সম্ভবত মুসলমান, আর বলা ফিরিঙ্গি। মদু সা-ই নাম দিয়েছে, অর্থাৎ সে কানাই আর ফিরিঙ্গি বেটা বলাই। হারামজাদা সন্দেহ নেই। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ১৯)

১৯৮৭ সনের জানুয়ারিতে বীরেন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত এক চিঠিতে মধু সম্পর্কে আলাদা করে কিছু কথা লিখেছিলেন অমিয়ভূষণ, যেখানে মধুর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে:

> মদুর 'পরমাথ্থ' 'ধম্ম' এসব বিষয়ে ঝোঁক ছিল।...ওদিকে মদু...সাতিশয় হারামজাদা অর্থাৎ না-পাকের চাইতে না-পাক, অর্থাৎ non-believer to the power n=হারামজাদা শুধু son of a bitch-র মত হালকা ব্যবহার নয়। ইদানীং তার সঙ্গী এক মুসলমান যার utility নিষ্পাপ নয় বোধহয়, এক ইংলিশ ভ্রমণকারী (যারা শুধু দেশ দেখার জন্য দেশ দেখে কি?) যে জিসাস, ক্রুসিফিকেশন ইত্যাদি নিয়ে, ডাইনি পোড়ানো নিয়ে আলাপ-গল্প করে, যে সম্ভবত পিউরিটান্ত না হোক্ প্রোটেস্টেন্ট। দেখা যাচ্ছে মধু 'লাউসি' শব্দটা উচ্চারণ না করলেও লাউস কাকে বলে জানে। ড্যাম্ কথাটা জানে। বলে, 'ড্যামেট, বোথ। নো উইমেন, ইউ সি।' কাজেই মধু কি করে বা একদম পেগান থেকে যায় ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে!...মদুর মধ্যে একটা self contradiction জন্মানোর সুযোগ থেকে গিয়েছে। তাহলেও সে শেষপর্যন্ত ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে (পান্দর শো আট শককে বিস্মৃত না হয়ে) পেগান থেকে যায়। যেজন্য সে সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি নয়... (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪৪৪-৪৪৫)

অমিয়ভূষণের এই বক্তব্যের কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দেও মধু পেগান, সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি নয়। এবং সে সীমাহীন অবিশ্বাসী; অমিয়ভূষণের কথায় 'সাতিশয় হারামজাদা'। পেগান ধর্ম হলো প্রাক ক্রিশ্চান ধর্ম, যেখানে প্রাকৃতিক শক্তিকে আরাধনা করা হত। সেদিক থেকে পৃথিবীর আদিধর্ম পেগানিজম। কারো কারো মতে, পেগান তাকেই বলা হয় যার মূলত কোন ধর্ম নেই। অন্যদিকে সেমেটিক প্রধান তিনটি ধর্ম হলো খ্রিস্টান, ইহুদি কিম্বা ইসলাম। অমিয়ভূষণ মনে করেন, মধুর পেগান ধর্মবোধের ওপর উটকো কিছু সেমেটিক বোধ ঢুকে গেছে। আর তাই পেগানিজম আর সেমেটিজমের মিথস্ক্রিয়ায় তার ধর্মবোধে স্ববিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছে। কাজেই ব্রাহ্মণ তোপদার তার রান্না করলেও মুসলমান বদর আর ফিরিঙ্গি বলার সাথে পানাহার সংক্রান্ত ছোঁয়াচে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এদিকে কপালে রসকলি আঁকে, অর্থাৎ বৈষ্ণব সহজিয়া মতকে লালন করে, অন্যদিকে কালিমায়ের পুতি বাক্যের ইমেজে শাক্তধর্মও এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কাজেই মধুর ধর্মবিশ্বাস পাঠকের চেতনায় এক মিশ্র বোধের জন্ম দেয়। ধর্ম নিয়ে কথা বলতে চাইলে রালফ্ ফিচ্‌কে সে বলে, 'ধর্মেতে সেঁদিয়ো না, বাপা, ও বড়ি গাড়্ডা। আমরা সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে দিই, মোর গে যা বলি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫)। আবার প্রেমপ্রমত্ত ঘাই আর হরিণ দেখে তার পুনর্জন্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। মুগ্ধ নয়নে ভাবে, 'এমত দৃশ্য দেখিছ আরু? এমত প্রেম, এমত খেলা? অহো, এমন দৃশ্য দেখি মানুষে অমর হয়। আহা অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনর্প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্। হে প্রাণনেতা, আবার প্রাণ দিহ, আবার চক্ষু দিহ, আবার দেখিবা দিহ, আবার' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৭)। একইসাথে সংস্কারময় ও সংস্কারহীন এক উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল মনোভাব মধুর ধর্মবোধকে স্ববিরোধী করে তোলে। মূলত জীবন টিকিয়ে রাখবার নিমিত্তে যেকোন পন্থা অবলম্বনে সে সকল সংস্কারের উর্ধ্বে। মধু মনোজাগতিক টানাপড়েন কিংবা অস্তিত্বসংকট উত্তরণে ধর্ম আঁকড়ে ধরেনি। বরং তাকে নিয়তিবাদী বলা যেতে পারে, যার পেছনের ইতিহাসটুকু ক্রূর, জটিল। পাঠক উপলব্ধি করেন, উপন্যাসে মধুর বংশপরম্পরাগত স্বল্পায়ুসংকটজাত নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রগাঢ় পাপবোধের নেতিবাচকতা, জল ও বাণিজ্যজীবনের অনিশ্চয়তা কিংবা প্রতিমুহূর্তের বিপন্নতা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি-আচার-দর্শনের সঙ্গে স্বদেশ সংস্কৃতির প্রতিতুলনায় দেশের প্রতি স্বাজাত্যবোধ–মধুর অস্তিত্বসংকটের মূল উপচার।।

উপন্যাসে রূপায়িত মধুর বেনেজীবন মধ্যযুগকেই অস্তিত্ববান করে তোলে। বাংলায় ষোড়শ শতকের বাণিজ্যজীবনের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়, 'ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভাব ইত্যাদি বহু গুরুতর বাধা সত্ত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত।...বাংলা হইতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ঔষধ এবং খোজা ও ক্রীতদাস জল ও স্থল পথে ভারতের নানা স্থানে' (রমেশচন্দ্র, ১৩৭৩: ২৩১) আনা নেওয়া করা হত। মধু নিজেও এইসব বাণিজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। দক্ষিণ থেকে চুয়াচন্দন, এলাইচি-লবঙ্গ, শান্তিপুরী শাঁখের চুড়ি, উত্তর থেকে কস্তুরি আর পোস্তদানা, যষ্টিমধু, এন্ডি আর ভোটকম্বল, সন্তরা আর আমলকীর মত বাণিয়াতি পণ্যের সাথে সাথে ক্রীতদাস কেনাবেচার মত অপরিণামদর্শী ব্যবসাও তার পেশা। এই অপরিণামদর্শী ব্যবসার উদাহরণ খোজা ক্রীতদাস বদর, যাকে চার সাল আগে সে কিনেছিল মথুরা থেকে, কিন্তু কোথাও বিকোতে পারেনা বলে ক্রমশ সে নৌকার একটি অংশে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, ষোড়শ শতকে বিয়ের পাত্রী

হিসেবে নৌকায় কেনাবেচার জন্য আনীত 'ভরার মেয়ে'রূপে গণ্য হওয়া অপরিণামদর্শী মেয়েধরা ব্যবসার সাথেও মধু জড়িত ছিল বলে তার জলের জীবন বড়ো অনিশ্চিতের। আর অনিশ্চিতি কাটাতেই, অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> তার এই সরু লিকলিকে নৌকায়, তাকে কোষা কিংবা বাজরা বলো–বার্জ, দুই তোপ আছে।...বাপের কালেই সূত্রপাত। এক অলিখিত অপরিণামদর্শী ব্যবসা। লাভলোকসানের হিসাব করা যায় না, কাল-অকাল নেই, যদি প্রতিভা থাকে বুঝতে পারবে বেনেতি ব্যবসার মধ্যে কোথায় সে-ব্যবসা ঢুকে পড়ে।...ব্যবসা–তা ভালই বলো আর মন্দ। তোপের সঙ্গে লাগোয়া হলে কী করা যায়? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৩)

বেনেজীবনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দুরূহ। অনিশ্চিতি এর প্রবল স্রোতে, আকস্মিক ঝড়ে, অনাকাঙ্ক্ষিত জোয়ার-ভাটা কিংবা জলদুর্গে ক্ষমতাবান সামন্ত প্রভুদের চোটপাটে। জলের এইসব অনিশ্চয়তাই মধুকে নিজের জীবন নিয়ে ভাবায়। জলজীবনে তাই তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই লড়তে হয় কৌশলে। একারণেই হয়তো তার নৌকায় তোপ আছে। জল যেমন অনিশ্চিতের, তেমনি জীবনও। জলজুড়ে শাসকের ভাগবাঁটোয়ারার শাসন। উত্তরে কামতা রাজার নৌশক্তি আর দক্ষিণে মোঘলদের। এদের সন্তুষ্ট করেই পথ চলতে হয় মধুকে। শাসকদের ভাগবাঁটোয়ারার এই চালচিত্রের মধ্য দিয়েই কামতাপুরের ইতিহাস সন্তর্পণে উঠে আসে উপন্যাসে। ত্রয়োদশ শতকে স্থাপিত কামতাপুরা রাজ্য ষোড়শ শতকে খেন রাজবংশের জনৈক নীলধ্বজের সময় থেকে প্রসিদ্ধি পায়। ধরলা নদীর তীরে অবস্থিত রাজধানী কামতানগর থেকে তিনি তার শাসন পরিচালনা করতেন। ইছামউদ্দীন সরকারের মতে:

> ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে হোসেন শাহ কামতা রাজ্য আক্রমণ করলে খেন রাজবংশের পতন ঘটে এবং তিনি 'কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা'র বিজেতা' উপাধি ধারণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি কামতাপুর ধ্বংস করার পর দেশটির পূর্বদিকে বড়নদী পর্যন্ত পদানত করেছিলেন...কিন্তু কামতায় হোসেন শাহের অধিকার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বিশ্বসিংহের প্রতিষ্ঠিত কোচবিহার সাম্রাজ্যের উত্থানের মাধ্যমে এখানকার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। *দরং রাজবংশাবলি* অনুসারে কোচ উপজাতির হরিয়া মণ্ডলের পুত্র বিশ্বসিংহ করতোয়া থেকে বড়নদী পর্যন্ত এলাকার অধিপতি হয়ে বসেন। তিনি নিজেও, অনেকটা দেবী *কামতেশ্বরী*'র নামানুকরণে, নিজেকে কামতেশ্বর হিসেবে অভিহিত করেন (কামতার রাজা) এবং তার রাজধানী ছিল কামতানগর।
>
> বিশ্বসিংহের উত্তরসূরি নারায়ণও ব্যাপকভাবে রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন এবং কামতা রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন। তবে তিনি কামতেশ্বর উপাধিটি ধারণ করেন নি।...(ইছামউদ্দীন, ২০০৩: ২৭১)

অন্যত্র পি. কে. ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন:

> কোচ প্রধান বিশ্বসিংহ হোসেন শাহের উত্তরসূরিদের বিতাড়িত করে কামতা-কোচ রাজ্য (ষোড়শ শতাব্দী) প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে পূর্ব ভারতে একটি উপজাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।...১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী নরনারায়ণের প্রখ্যাত ভাই চিলারায়ের নেতৃত্বে একটি কোচ বাহিনী অহোম রাজ্যের রাজধানী গোড়গাঁও আক্রমণ করে এবং এটি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। এরপর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা সঙ্কোষ থেকে কোচহাজো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে কামরূপ (বর্তমান নাম আসাম) নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে

> চিলারায়ের পুত্র এবং নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব এ অঞ্চলের শাসনকর্তা হন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অতঃপর কামরূপ সাম্রাজ্যর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়, আরও পরে এটি অহোম রাজ্যের এবং অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সঙ্কোষ নদীর পশ্চিমে পূর্ববর্তী কামতা-কোচ (কুচবিহার নামেও পরিচিত) রাজ্যের পশ্চিমাংশে রাজত্বকারী মূল রাজবংশ অবশ্য আরও কয়েক শতাব্দী ধরে এর অস্তিত্ব বজায় রাখে। (পি. কে. ভট্টাচার্য, ২০০৩: ২৭১-২৭২)

উপন্যাসে এই ঐতিহাসিক নামগুলো জলের ভাগবাঁটোয়ার শাসনের মধ্য দিয়ে উঠে আসে। নদীপথগুলোর একেক জায়গায় একেক ক্ষমতাধর শাসকদের তুষ্ট করেই মধুকে পথ চলতে হয়। পূর্বস্থলী-ধুবড়ি-কামতায় স্থানভেদে শাসকগোষ্ঠীর ভিন্নতা লক্ষণীয়। ব্রহ্মপুত্রের এপারে রঘুদেব আর অন্য পারে লক্ষীনারায়ণ, আরো দক্ষিণে শাবাজ খাঁ। কাজেই নদীর স্বভাবচারিতা-বাঁকবদল কিংবা জোয়ার ভাটার মতই মধুকে শাসকদের কথাও মাথায় রাখতে হয়, সাবধানতাও অবলম্বন করতে হয়। কখনও কখনও মধু বাণিজ্যের সাথে সাথে গুপ্তচরবৃত্তিতেও যুক্ত হয়। এক শাসকের গতিবিধির খবর অন্য শাসকের কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেয় সে। সবটাই তার টিকে থাকবার রসদ। এমনকি জলদুর্গের শাসকদের সম্পর্কে ভুল তথ্য অনেক সময় তার মৃত্যুকেও ত্বরান্বিত করে। তখন নৌকার তোপই ভরসা। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> সামনের চিলাপোতার খাল। অনেক পাক, অনেক খালের হিজিবিজি। ঠিক না জানলে ঘুরপাক খাবে। আর ওদিকে সেসব পার হয়ে পাবে দরজা–...কিন্তু মাশুলঘাটা। অনেকসময় হয়রানি হতে হয়।...তখন চিলাপোতার বাঁধানো খালে নৌকা ঢোকে-ঢোকে,...হঠাৎ সামাল-সামাল করে উঠল নৌকা। বাঁধানো খালের বেরনোর মুখে দু খানা নৌকা, ... কিন্তু মাশুল আদায়ের নৌকা নয়। মাঝিমাল্লাদের হাতে লগি, বল্লম।
>
> ... ওরাই তার পরিচয় দিল। হাঁক পাড়ল–কার নৌকা এমত?
>
> কথাটা যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল মদুর–টেপুর নাও, আর কার?
>
> কথাটা কি ভুল বলল সে? নৌকা দুটোর মাল্লারা শুনে যেন হামলে উঠল। চিলাপোতার এই জলদুর্গ কি তাহলে নররাজার অধীনে নেই? চিলার অধীনে যারা যুদ্ধ করছিল, তারা কি রাজাকে ছেড়ে চিলারায়ের ছেলের পক্ষ নিয়েছে তবে? কামতার বদলে ধুবড়ির প্রভাব?
>
> এটাই বিপদ। আগে থেকে বলা যায় না বোঝা যাায়না, কোন মন্তরে বাধা কাটে। আর দেখো, নদীতে নদীতে ফাঁদ। আর তোমাকে ফাঁদ কাটিয়ে-কাটিয়ে চলতে হয়।...
>
> ...তোপ–বলল মদু। তার ইশারায় ভাটার উলটো বৈঠা মেরে নৌকাকে প্রায় থিতু করে ফেলল মাল্লারা। তোপদার সামনেরটা গাদা শেষ করতে-না-করতে মদু পিছনেরটি গেদে ফেলল।...আর একটু উপর নিশান করে তোপ দাগল তোপদার।...দু-পাশের নৌকা থেকে শনশন ভল্লা এসে পড়ল খানকয়েক। একখানা বিঁধল মদু আর ফিরিঙ্গির মাঝে নৌকার ছই-কোঠার গায়ে।...(অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৪-৩৫)

অমিয়ভূষণ ইতিহাসকে বেশ কৌশলে এখানে জড়িয়ে দিয়েছেন। মধ্যযুগের নৌবাণিজ্যের একটি বিশ্বস্ত চিত্র রূপায়িত হয়েছে এখানে। বেনে বা সাউকারকে কতটা সাবধানে তার ব্যবসা পরিচালনা করতে হত সেকালে, তার এক নিখুঁত ছবি এখানে মেলে। মধুর সাউকারি বুদ্ধি তাকে কৌশলী হতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে

শাসকদের জলদুর্গ পার হতে হলে তাদের ভগবান বলে মানাই শ্রেয়। কাজেই সে ভাবে, 'দুই-ই ভগবান তো রঘুদেব আর লক্ষ্মীনারাণ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৯)। একারণেই কোথাও তাকে তোপ দাগতে হয়, কোথাও বা ভেট দিয়েই পরিত্রাণ মেলে। মূল বিষয় হলো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কূটকৌশল আত্মস্থ করবার অভিজ্ঞান। জলে-যাপিত জীবনে মধু সেটি বেশ ভালভাবেই রপ্ত করে নিয়েছে। কাজেই এক ভোরবেলা কুমিরের মত সারি সারি নৌবহরের মধ্যে মধু নিজের নৌকা আবিষ্কার করার পর নৌবহরের সেনানায়ক কর্তৃক আহূত হয়ে তিলমাত্র বিলম্ব না করে সকালে রাজদরবারে খোজা বদরকে ভেট দিয়ে সন্ধ্যায় নৌকায় ফিরেই সে পালিয়ে চলে যায় মানসাই ধল্লার মোহনায়। কিন্তু মুক্তি মেলেনা সহজে। এখানেও দুঁদে টেপু তার জোয়ান ছেলে, ভাইপো আর ভাল্লা-বেঁটে তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত। কাজেই অস্তিত্ব-টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে এদের মন যুগিয়ে চলাই শ্রেয়। কারণ এমনই এক শাসকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার পিতামহ আর ফেরেনি। মধুর কাছে তাই বিরোধী শক্তিগুলোর প্রত্যেকেই প্রায় ভগবান।

শুধুমাত্র জলজীবনের এই অনিশ্চয়তা নয়, বংশানুক্রমিক স্বল্পায়ু তাকে ব্যথিত করে। প্রতিকূল নিয়তি, অর্থাৎ পূর্বপুরুষের ক্ষীণায়ু। অমিয়ভূষণ জানিয়ে দেন, 'মৃত্যুকালে তার পিতামহের বয়স চল্লিশ ছিল। তার পিতা প্রায় দীর্ঘজীবী হতে গিয়েও সাতচল্লিশে গত হয়েছেন। পিতার এই অতিজীবনের ঝুল সামলাতে খুড়োমশায় পঁচিশে মৃত্যুলাভ করেন। তার নিজের বয়স সাঁইত্রিশ হলো। আর (সেই দীর্ঘশ্বাসই আবার) খুড়তুতো ভাই জীবনের দুই দশকও দেখে যায়নি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫)। মনোগহনে এভাবেই মৃত্যর মিছিল বয়ে বেড়ায় সে, আর প্রতিমুহূর্তে সেই মৃতদের একজন হয়ে যাবার আশঙ্কায় কাল কাটায়। স্বল্পায়ু তার ভেতর এক দর্শনের জন্ম দেয়, যেখানে তার মনে হয় 'পুরুষ জীয়ে না' কোথাও। কখনও ঘাইয়ের ছলাকলায় প্রেমপ্রমত্ত পুরুষ-হরিণ বিদ্ধ হয়, কখনও জলদুর্গের অধিকার নিয়ে রাজপুরুষদের অন্তর্কলহেও নদী, জল, রক্ত, পাটাতন গল্প হয়ে ওঠে; পুরুষ সেখানেও জীয়ে না। অথবা, মানুষের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ জেসাস আর হবাকে ছুঁয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় আদিপিতা আদমও জীয়ে না। তার কেবলই মনে হয়, 'দেখো একবার এ-নদী, দেখো একবার রঘুদেব আর লক্ষীনারায়ণ।...রঘু না লক্ষী না, এ-জলও পুরুষকে নিতে পারে। তা নেয়ও' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪১)। 'তার এখন সাঁইত্রিশ। পিতা সাতচল্লিশে গত হয়েছেন। তার শ্মশান-থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তার আগে পিতামহ চল্লিশে। পুরুষ কি জীয়ে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৮)। বংশপরম্পরাগত এই স্বল্পায়ু মধুর মনোগহনে এক অনিশ্চিত জীবন আঁকে। অমিয়ভূষণ ঘাই আর হরিণের প্রতীকে খুব চমৎকার করে বিষয়টি প্রকাশ করেন। শিকার করা দগ্ধ হরিণ আর পিতার অর্ধদগ্ধ দেহ একাকার হয়ে ওঠে উপন্যাসে:

> ক) ...দশ সাল আগে তার পিতাকে দাহ করা হয়েছিল।...এমন জায়গা যেখানে নদী ফেঁপে উঠে শুধু চরই ডোবায় দেহের মত দেখতে কাঠ-কাঠরা ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রেখেই চলে যেতে হয়েছিল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৬)
>
> খ) অবশেষে আকণ্ঠ খাওয়া সত্ত্বেও হরিণের শরীরের অর্ধেকটাই নিবন্ত আগুনের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রেখে নৌকা আবার ভাটিয়ে চলল ধল্লার দিকে। কী হবে আর আধপোড়া ছিটানো-ছড়ানো হাড়মাসে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৮)

পিতার আধপোড়া মৃতদেহ আর হরিণের আধপোড়া হাড়মাস তাকে আবারো মনে করিয়ে দেয়, পুরুষ জীয়ে না। এরই সঙ্গে লেখক সমান্তরাল করে তোলেন কামতার রাজা নীলাম্বরের রাণী বনমালা আর মন্ত্রীর যুবকপুত্র মনোহরের অবৈধ প্রণয়ের গল্প। পরিণামে পৈতেসমেত মনোহরের নরবলি, এবং সন্তানের হাড়মাস প্রসাদ হিসেবে পিতা শশীপাত্র ব্রাহ্মণের গলাধকরণ। শুক্লধ্বজ-নীলধ্বজ-নীলাম্বর-বরবাঁক তুবরাক খাঁয়েরা-হুসেন শা নরনারায়ণ–এদের প্রত্যেকের কালের গর্ভে হারিয়ে যাবার ইতিহাসের সঙ্গে লেখক গোসানিমারী নদীর নামকরণে জড়িয়ে থাকা মিথটি তুলে আনেন। মিথ ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় রচিত হতে থাকে মধুর পরিণামবোধ। ব্যভিচারী সম্পর্ক, ক্ষমতা, অবৈধ প্রণয়–পুরুষকে বাঁচতে দেয় না। মধু মনে করে, 'জল, তরবার, তীর দুর্মদরতি নারীর মত পুরুষের দেহের ও আয়ুর ভাগীদার হয়' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫)। ইতিহাস ও মিথের মোড়কে প্রতিকূল জলজীবন আর প্রতিকূল নিয়তির বোধ এভাবেই তার অস্তিত্বসংকট গাঢ় করে তোলে। মধু এবং তার পূর্বসূরিদের জীবনের ইতিও ঘটেছে জল-তরবারি-তীর আর অতিতর রতিপ্রিয়া রমণীসংসর্গে। কাজেই মৃত্যুময়তা তাকে অস্তিত্বগত টানাপড়েনে পতিত করে। অমিয়ভূষণকথিত সেই লিবিডোর কথা মনে পড়ে। লিবিডো বা মহাকাম আর আদিপাপ সেই ভোগের আকাঙ্ক্ষা-এইসব বিষয়ের পেছনে সক্রিয় থাকে গাঢ়ভাবে। এরই ধারাবাহিকতায় খুব সূক্ষ্মভাবে উঠে আসে মধুর কামচেতনা (লিবিডো)। নারীহীন জলজীবনে খোজা ক্রীতদাস বদর বিছানায় এলে একলহমার জন্য মধুর শরীর প্রগাঢ় কামবোধে জর্জরিত হয়। লাথি দিয়ে পরমুহূর্তে 'টাঁশ-ধরা' মনকে সে সজাগ করে। বলার ট্যাবাকু কিংবা ওয়াইন্ পানের আহবান উড়িয়ে দিয়ে সে উচ্চারণ করে, 'ড্যামেট্, বোথ। নো উইমেন, ইউ সি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২১)। নারীহীন জীবনে হরিণের মাংস আর চর্বিযুক্ত পলান্ন তার অবদমিত কামনাকে জাগ্রত করায় কামতাপুরের ত্রিশ হাত প্রাচির রূপান্তরিত হয় ঘাই হরিণের পরিপুষ্ট পশ্চাৎদেশে। অমিয়ভূষণ উপন্যাসে প্রতীকী পরিচর্যায় কামাতুর মধুর যৌনতৃষ্ণার প্রকাশ ঘটান:

> শরীরে জ্বর-জ্বরই বলা যায়। অতিতর মশলাযুক্ত পলান্ন ও প্রচুর কাবাব মাংস খেয়ে মাঝরাতে তার পিপাসা পেল। উঠে জল খেল সে। আর তখন তার ঠাহর হলো ওটা স্বপ্নের ব্যাপারই, এতক্ষণ যা তার চোখের সামনে ঘটছিল। নতুবা কোন ডানের মন্ত্রেই কামতাপুরের ত্রিশ হাত উঁচু প্রাচির ঘাই-হরিণীর চিকন পরিপুষ্ট পিছনটা হতে পারে না।...এই কামতায় শুক্লধ্বজ, নীলধ্বজ, নীলাম্বর, বরবাক তুবরাক খাঁয়েরা, শেষে হুসেন শা আর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু? বরবাক বা তুবরাক মারের চোটে করতোয়া বেয়ে পালিয়েছিল,...বারো বছরের চেষ্টায় হুসেন শাহ কামতাজয়ী, কিন্তু নিজ বেটা দানিয়েলকে দিল বেঘোরে। তারপর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখো আর একে যৌবন পায়। এক না বলে দুজনা বলা ভাল। মদু, তুমি ধুবড়ির কাছে সেনাপতির ছেলে রঘুকে দেখেছ, আর এখানে ঠাহর করো–রাজার ছেলে লক্ষীকে দেখবে। দুই-ই যুবক। মনে হয় না তারাও ঘাই-এর ডাক শুনেছে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৮-২৯)

কালে কালে পুরুষকে একবার না একবার ঘাইয়ের আহবানে সাড়া দিতেই হয়। যেমন দিতে হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতার হরিণকে কিংবা পুরুষ হৃদয়কে। মধুকেও দিতে হয়েছে। খুড়োর রাঢ় কিংবা রক্ষিতা, যাকে পাবার জন্য এককালে একমাত্র খুড়তুতো ভাইয়ের হন্তারকে পরিণত হয় সে। তার হাতে এখনও সেই দ্বন্দ্বের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে। '...রসাধিক্য হলে হাতের শুকনো ক্ষত এখনও টনটন করে। কী উপায় ছিল বলো, দুজনের একজনার জীবন শেষ সেদিন মাপাজোখা ছিল। বিশ বছর এই ক্ষত সে বয়ে

বেড়াচ্ছে' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫)। এটাই মদুর গোপন পাপবোধ, যা মাঝে মাঝেই হানা দেয় চেতনায়। উপন্যাসে ডান বা রাঢ় হিসেবে চিহ্নিত একটু বেশি ফুটে যাওয়া সফেদগুল বিবিসাহেব আসলে খুড়োর কে ছিল! মধু ভাবে, 'কে এই বিবিসাহেব হয় খুড়োর? নাচওয়ালি? বাঈ? শখের ক্রীতদাসী? তা বলো' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২২)। আর এখন পর্যন্ত এই বিবিসাহেব সা-দের বিবিসাহেব নামে পরিচিত। বছরে এখনও হয়তো কর্তব্যবোধ থেকে তার সঙ্গে ঘুমোতে হয় মধুকে। কেননা, ঘাইসম বিবিসাহেবা তাকে পালাতে দেয় না। আদিপাপের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকেই খুড়োর রক্ষিতাকে করায়ত্ত করবার প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয় হত্যা, রক্ত। কিন্তু পাপের বোধ আপেক্ষিক–নিজেকে এই প্রবোধ দিয়ে সে ভাবে, এক দেশে যা পাপ, অন্য দেশে তা প্রথা। আদম হাওয়ার আদিপাপ ব্যাখ্যায় সে ভাবে, সুন্দরকে (লাল আপেল) ছুঁয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা যদি পাপ হয়, তাহলে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের পর পুনর্জন্ম লাভে সূর্য দেখার আকাঙ্ক্ষাও পাপ। পাপের বোধ তাই আপেক্ষিক, গোলমেলে। বিবিসাহেবকে আত্মীকৃত করার ব্যাপারটা তাই পাপ নয়, যদিও তাকে আত্মস্থ করবার যজ্ঞে খুড়তুতো ভাইকে হত্যা করার পাপবোধজাত অনুশোচনা থেকে সে মুক্তি পায়না।

বলাকে কামতাপুরের রাজা নীলাম্বরের গল্প শোনানোর পর সেকারণেই হয়তো অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন, 'গল্পের উদ্দেশ্য কি অন্য-কিছুর পিছনে রাখা আসলকে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩১)। শেষ পর্যন্ত যে অনিশ্চিত জীবনযাপন এবং পরিণামে মৃত্যুই পুরুষের শেষ পরিণতি–গল্পের পেছনের আসল উদ্দেশ্যই যেন এই বক্তব্যকে মূর্ত করে তোলা। সমালোচক ধীমান দাশগুপ্ত মনে করেন, 'যেমন ফিলম উইদিন ফিলম তেমনি এই উপন্যাসে রয়েছে গল্পের ভেতর গল্প (মূল কাহিনীর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত গল্পকথন: পত্রলেখার গল্প বা বনমালা-মনোহর উপাখ্যান)' (ধীমান, ১৯৮৮: ৭৯)। গল্পের ভেতরের এই মিথিক গল্পই হয়ে ওঠে মধুর কাছে পরিণামসঞ্চারী নিয়তির নিয়ামক। হরিণ যেমন জানেনি তার আসন্ন মৃত্যুর কথকতা, তেমনি হরিণসম পুরুষ অথবা মধুর পিতামহ কিংবা পিতা, খুড়ো, খুড়তুতো ভাইও জানত না তাদের নিয়তি । মধুও জানেনা, তার কেবল মনে হয়:

> সেই ভোরে আকাশ লাল আর জল গলানো সোনার মত ঝলমল করছিল। এই আকাশের মত লাল আর সোনালী, শুধু আরো যেন বেশি উজ্জ্বল আর গলানো সোনার আরো কাছাকাছি। আর সেই গলানো সোনায় কালো-কালো ছাই-এর দাগ যেমত, যেন গা ভাসানো কুমিরের সার এমত কোষার সারি। আর পরও নয় সে, সেদিন যে গিয়েছিল, শেষদিন হলো যার ভাল করে দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে; সে তোমার পিতামহ। আর এমত আচমকাও হতে পারে, গতকাল পড়নি তুমি দিনের আলো ফুটতে-না-ফুটতে টেপুর বহরের মধ্যে?...হরিণটা অবশ্য জানত না কিছুক্ষণের মধ্যে কী হবে। হঠাৎ প্রশ্নটা মনে উঠে মদুকে অবাক করে দিল–পুরুষ হওয়ার ফল, তেমন করে চরের বালিতে দেহের দগ্ধাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে-থাকা? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৯)

পিতা কিংবা পিতামহ অথবা পুরুষের জীবনের এই অনিশ্চিতির ভাবনাই মধুর অস্তিত্বসংকটের মূল কারণ। এমনকি ফিরিঙ্গি বলা তার রোজনামচা মধুকে দিয়ে গেলে জীবনের এই অনিশ্চিতিবোধ মধু বলার ভেতরেও অনুভব করে। তার মনে হয় বলার:

> মৃত্যুভয়ও আছে। নতুবা পাণ্ডুলিপি গচ্ছিত করা কেন? ট্যাবাকুর বীজ না হয় বন্ধুত্ব। কিন্তু পাণ্ডুলিপি? যদি না-ফিরি, আর একজনের হাতে দিয়ো। অকারণ নয়। ঠিকই বলেছ, কখন কি হয় বলা যায় না।...আর ওদিকে মরার ভয়ও আছে। যা দেখেছে তা কাগজে লিখে রাখলে। কিন্তু একবার বুজলে তো আর চোখ হবে না। হ্যাঁ, তা নয়। মানে তোমার দেখা কাগজে লেখা থাকল আবছা অস্পষ্ট। তোমার পরেও তোমার চোখ থেকে গেল। মদু হাসল: এও ধরো, বলাই, তাই হলো, পুনরস্মাসু চক্ষুই হলো না? আবার চক্ষু দিহ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৭-৩৮)

মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার এই মানবীয় আকাঙ্ক্ষাকে অমিয়ভূষণ এভাবেই চিহ্নিত করেন। মধু উত্তরসূরির মাঝে পুনর্জন্ম লাভ করে ফিরে আসতে চায়। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ মনে করেন, '"পুরুষ জীয়ে না" এই ধ্রুবপদ জীবনের মর্মান্তিক সত্য হলেও বুকের গহীনে জীবনের কি এক অনন্ত তৃষ্ণা' (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ৯৭)। যদি মধু আর না-ই ফেরে, ছেলের বেটা, অথবা তার বেটা কিংবা পুতির ঘরের সন্তান হয়ে সে এদেশেই জন্মাতে চায়। আর বলা তার কর্ম-চিন্তা-চেতনা-ভাবনার লিখিত রূপের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। ফিচের মত কৃতকর্মে বেঁচে থাকবার কোন উপায় মধুর নেই বলেই উপন্যাসে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ফিচ্ আর মধুর বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষায় এভাবেই সন্তর্পণে রচিত হয় ভিন্নতা। অমিয়ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মধুকে 'হারামজাদা কি সাধে বলেছি? বলে আবার প্রাণ দিহ, আবার দেখিবা দিহ-এত সত্ত্বেও নিজের পৌত্র অথবা প্রপৌত্র হয়ে এই নদীর দেশেতেই জন্মাতে চায়। নিলাজ নদী, নিলাজ সময় নিলাজ মানুষ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪৪৪)। মধুকে তার এই অন্তহীন জীবনতৃষ্ণাই বাঁচিয়ে রাখে, যদিও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার অনিশ্চয়তা কাটেনা তাতে। কেননা মধু জানে, রাত শেষে যে ভোরের অপেক্ষায় সে কাল কাটায়, সেই ভোরে 'কী রকম আলো ফুটবে কে জানে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪১)

এই উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মধুকে ভিন্নভাবেও অস্তিত্ববান করে তুলতে সচেষ্ট। মধু আর রালফ্ ফিচের পারস্পরিক কথোপকথনে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি-দর্শন-ধর্ম সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা আর চিন্তা চেতনার খোঁজ মেলে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের পারস্পরিক তুলনা কখনো মধু কখনো বা রালফ্ ফিচ্কে আলোড়িত করেছে। এই কথোপকথনে প্রাচ্যের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেই মধু অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে। ষোড়শ শতকে যখন ব্রিটিশ পরাশক্তির রাজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা আসন্ন, তখন মধুর মধ্য দিয়ে অমিয়ভূষণ ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই উঁচু করে তুলে ধরতে চান। প্রাচ্য যে পাশ্চাত্যকে অবলম্বন কওে সভ্যতার পথ দেখেনি সে বিষয়টিকেও প্রকাশ করতে চেয়েছেন তিনি। ফিরিঙ্গি বলা ট্যাবাকু এনেছিল সঙ্গে করে, আর মদু তাতে চন্দন কুচি মিশিয়ে তার মরাপোড়া গন্ধ দূর করেছে। মধুকে বিস্মিত করতে এসে বলাই বরং বিস্মিত হয়ে ফিরে যায়। প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে বিস্মিত করার ক্ষমতা রাখে, একথা অমিয়ভূষণ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। সমালোচক সাধন চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, মধু তথা বাঙালিকে কখনই জাতীয়তাবোধের ধারণা পাশ্চাত্যের কাছে শিখতে হয়নি:

> আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে জাতীয়তাবোধ দেশকে ভালোবাসা কিংবা দেশীয় ঐতিহ্যের কদর বুঝতে পেরেছিলাম–এই মিথটি অমিয়ভূষণ সযত্নে ভেঙে দেন এই উপন্যাসে। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, পাপবোধ বিভিন্ন প্রসঙ্গে, এমনকি...রীতি-নীতিতে লেখক দুই চরিত্রের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেন তথাকথিত নব-জাগরণের জন্য

> বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হয়নি।...অমিয়ভূষণের মতে 'আনন্দমঠ' আর 'গোরার' জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণত ইওরোপিয় মডেলের ধ্যানমূর্তি-সঞ্জাত; মধুর তা সম্পূর্ণ দেশজ। তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু কলেজের মধ্য দিয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক চিন্তা, উদার মানবিকতাবাদ, জাতীয়তাবোধ–গাল ভরা শব্দগুলো কী শিখেছিলাম? সবই আমাদের ঐতিহ্যে ছিল। পাপ-পুণ্য থেকে শুরু করে ভাষা-সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি। (সাধন, ১৯৯৫: ১৪০, ১৪২)

হয়তো একারণেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কারগুলো মধুকে নতুন করে ভাবায়। সতীদাহও এমন এক ঘটনা। উপন্যাসে সতীদাহ নিয়ে মদুর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা যাবে তার মনোভাবনায়। জলপথে চলতে গিয়ে দাহের জন্য আনিত ভীত এক নারীকে দেখে তার মনে হয়েছে, 'সতীকে এনেছে, এনে ফেলেছে, তেলে-সিঁদুরে-কান্নায়-ভয়ে আচ্ছন্ন ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত রোগীর মত বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের এক যুবতী। আর আত্মানম্ জ্যুহোমি সো আ হা, হা হা হা আঁ আঁ আঁ আঁ। আঁ-আঁ করছে আগুন, আগুন আকাশ বাতাস একসঙ্গে ডুকরে-ফুকরে হাহাকার করে উঠল' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৪)। শব্দচয়নে এখানে বীতশ্রদ্ধ বিরাগভাজন মধুকেই পাই (প্রসঙ্গত মনে পড়ে ত্রৈলোক্যনাথের *কঙ্কাবতী* কিংবা *অন্তর্জলী যাত্রা*'র সতীদাহ দৃশ্যকল্পের কথা)। কিন্তু সতীদাহকে যখন ফিরিঙ্গি তাদের দেশের উইচ হান্টিং রিচুয়ালের সঙ্গে একাকার করে দেখতে চায়, মধু কিন্তু তখন যথেষ্ট পরিমাণ ইতিবাচক। বলে, 'সতী আরু ডান পৃথক বিষয়' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৪)। আরো বলে, তা আংলিশ-পো এক দেশেতে যি হয় প্রথা অন্য দেশেতে সি কৌতুক।...আমার দেশে স্ত্রীলোক পুড়ে সতী, তোমরার দেশেতে ডান' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৮)। সমালোচক সাধন চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'নদীতীরে সতীদাহের হঠাৎ দৃশ্যে ফিরিঙ্গি ভয়ে পালিয়ে নৌকায় ফিরে গেলে, মধু যেন তক্কে-তক্কে ছিল–''আমার দেশে স্ত্রীলোক পুড়ে সতী, তোমরার দেশেতে ডান।" অর্থাৎ ইওরোপের ডাইনি পোড়ানো বা প্রাচ্যের সতীদাহের প্রভেদ নেই। কুসংস্কার সব দেশেই আছে' (সাধন, ১৯৯৫: ১৪০)। সমালোচক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া দুরূহ। শুধু কুসংস্কার বলাটাই মধুর উদ্দেশ্য ছিলনা। কারণ এর পরপরই অমিয়ভূষণ মন্তব্য করন, 'তার কি দেশপ্রেম ছিল? অথবা মধু সা কিছুতেই হার মানার লোক নয়?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৮)। উপলব্ধি করা যাবে, মধু নয়, অমিয়ভূষণ নিজেই হার মানতে চাননি। মধুর শেকড় চারিয়ে গেছে এই দেশের সংস্কৃতির গভীরে। কাজেই সতীদাহপ্রথা কুসংস্কার হলেও সেটি সংস্কৃতির অংশ। ফিরিঙ্গি তার শেকড় সম্পর্কে কথা বললে মধুর শেকড়ে টান পড়ে। সে অস্তিত্বসংকটে পতিত হয়। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজের সংস্কৃতির পক্ষে কথা বলে সে তাই অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে চায়। সতীদাহ তার কাছে নেতিবাচক হলেও ফিরিঙ্গির সামনে মধু সতীদাহকে এক ইতিবাচক ধারণায় পরিণত করে। এভাবেই মধু শেকড়ের কাছে ফিরে গিয়ে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান বিষয় হলো ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দ্রোহ প্রকাশে দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলোকে চাঙ্গা করে তোলা। অমিয়ভূষণ নিজেও এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক শক্তির চক্রান্তে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে আমাদের, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই চক্রান্তের নাম সাংস্কৃতিক বোমা। কেনিয়ান লেখক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো লিখেছেন:

> এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হলো মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজের উপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়োভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা। (থিয়োঙ্গো, ২০১০: ১৫)

অমিয়ভূষণ একে রোধ করতে চান। তাই জাতীয়তাবোধ, দেশজ ঐতিহ্যকে বার বার উপন্যাসে আঁকড়ে ধরেন তিনি। ফিরিঙ্গিকে গোসানিমারী নদীর মিথের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ভেতরেও নিহিত ছিল আমাদের ঐতিহ্যকে সামনে নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা। মধুর হয়ে উঠবার জগতে ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং মিথ একাকার হয়ে গেছে। সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন, অমিয়ভূষণের 'যোগ জাতির স্মৃতিলোকের সঙ্গে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বহুদূরের অতীতের বাণভট্টকে, তাঁর কাদম্বরীকে, লেখক নিজেই মদু সা-র গল্প বলার মধ্যে দিয়ে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।...সরল পিছুটান-বর্জিত ঐতিহ্যবিস্মৃত আধুনিকতা অমিয়ভূষণের নয়' (সত্যেন্দ্রনাথ, ২০০৯: ২৪৩)। ব্যক্তির নির্জ্ঞান চেতনাতেই ইতিহাস-মিথ ও ঐতিহ্য একাকার হয়ে মিশে থাকে। কোন এক সংকটকালে সেই বোধের জাগরণ ঘটে। ফিরিঙ্গির সঙ্গে কথোপকথনে মধুর এই বোধের প্রকাশ ঘটেছে।

সাত-সমুদ্র তের নদী ডিঙিয়ে বলা এদেশে এসেছিল শুধুই দেশভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে!–মধুর সন্দেহ থেকে যায়। কাজেই বলা সম্পর্কে তার মনে হয়, ধর্মপ্রচার এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে উপনিবেশ স্থাপনের গোপন আকাঙ্ক্ষাও হয়তো বলা লালন করেছে তার ব্যক্তিচেতনায়। তার সাহস নিয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও জ্ঞানগম্যি নিয়ে মধুর ভীষণ অবজ্ঞা ছিল। পর্তুগিজ আর ইস্পেনি হার্মাদদের ভেতর পৃথিবী ভাগের কথা শুনে মধু বিদ্রূপ করে হেসে বলে, 'গোটা পৃথিবী নাকি দু-ভাগে ভাগ করা: একভাগে পর্তুগিজ, আরটি ইস্পেনি হার্মাদদের।...আংলিশদের, ভাগে নবডংকা।...মাইরি, বলা, আমাদেরকে একদম ভাবল না তোমরার ফাদার পোপা' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৩)। নৌপথে প্রায় একশ বছর ধরে পর্তুগাল ও স্পেনের পৃথিবীকে নিজেদের করে নেবার ইতিহাস এখানে মুদ্রিত। ইংরেজ এই অভিযানে কোন অংশই পায়নি। স্পেন ও পর্তুগালের এই ভাগাভাগিতে যেখানে ইংরেজের ভাগ নেই, সেখানে ভারতকে কোনভাবেই গণ্য না করার বিষয়টি মধুকে হাসায়। ভারতকে তুচ্ছজ্ঞান করার এই মূর্খতা তার কাছে কৌতুককর।

তবু কখনও কখনও মধু নিজের মনেই ফিরিঙ্গির দেশের সঙ্গে নিজের দেশের তুলনা করেছে। যিশু খ্রিস্টের মানবিকতা তাকে স্পর্শ করে। শুরু থেকেই যিশুর বিশ্বমানবতাবোধের প্রতি অমিয়ভূষণের মুগ্ধতা উপলব্ধি করা যাবে। *মধু সাধুখাঁ*-র মত *বিলাস বিনয় বন্দনা* উপন্যাসেও যিশুর প্রতি তাঁর সমবেদনার প্রকাশ লক্ষণীয়। কাজেই ফিরিঙ্গির দেশের হলেও যিশুর বিশ্বমানবতা মধুর কাছে মহান। এখানেই মধুর অস্তিত্বসংকট তার ভেতর স্ববিরোধিতার জন্ম দেয়। অস্তিত্বসংকটের কারণে তার মনে হয়, এদেশে পুরুষ জীয়ে না, হয়তো সে দেশে জীয়ে; (যদিও ফিচের ভেতরেও সে মৃত্যুভয় দেখেছে)। সে দেশেতে ঘাই হরিণী নেই, নেই নানা শাসকের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। একই নদীর নানা তীরে রঘুদেব-লক্ষ্মীনারায়ণ-শাবাজ খাঁর ভিড় নেই, বরং একজন শাসকের প্রাধান্যই সে দেশে শ্রেয়তর; হোক না সে 'রাঁড়ী'। অন্যদিকে, বিচক্ষণ বেনে মধু উপলব্ধি করে, তামাক কিংবা বার্জা অথবা ব্রডসাইড কি লাউস–যে শব্দই হোক, এদেশে এই শব্দগুলো কিংবা শব্দ

ব্যবহারকারী মানুষগুলোর আসন্নতা ক্রমশ হয়ে উঠছে অনিবার্য। একটা কালান্তরের ইঙ্গিত মিলছে। অন্ধকারের পর বিবিসাহেবার সফেদ মুখ চেয়ে যে ভোর আসছে, সমালোচক তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সেই ভোরের এক চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> নানা রঙের ভোরের বিকল্প বর্ণনা পেরিয়ে অনুচ্ছেদ শেষ হচ্ছে যে-সূর্যোদয়ে, তার উপমা হলো সাহেব-বিবির সাদা মুখ: যুগাবসানের আঁধারের পর শ্বেতাঙ্গ সকাল।
>
> এর পরে যতবার অন্ধকার উল্লেখ আছে, তাকে আর মামুলি বা একমাত্রিক মনে করা শক্ত।...'কারণ আকাশে যেন জোছনা ডোবার পর অন্ধকার হয়ে গেলো।... এখন পাড়ের বন যেন অন্ধকারের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আরেকদিন আসছে, তার আভাস দিচ্ছে যেন, যদিও এখনো ছায়া-ছায়া আর সবুজও নয়।' যে বন সবুজ নয়, তার ভেতর কিসের সম্ভাবনা? মধুর মৃত্যু? গোটা দেশের বিলোপ? 'আরেকদিন'– তার আভাস অস্পষ্ট; নতুন যুগ কি ধ্বংসের না সৃষ্টির?...ভারতের পরাধীনতা এবং ব্যক্তি মধুর মৃত্যুকে একই অন্ধকারের মধ্যে বিধৃত করে অমিয়ভূষণ ইতিহাস শেষ করেন। (তীর্থঙ্কর, ২০০১: ১৯৬-১৯৭)

সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ অবশ্য সফেদ বিবিসাহেবা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'সাদা রঙ আমাদের মনে পবিত্রতার দোলা জাগায়' (রমাপ্রসাদ, ২০০২: ৯৭)। যে বিবিসাহেবাকে করায়ত্ত করার স্মৃতিতে মধুর চেতনায় খুড়তুতো ভ্রাতার রক্তের দাগ লেগে আছে, খুড়িমা যাকে রাঁড় বা ডান আখ্যা দিয়েছে, কিংবা বিবিসাহেবা যেখানে ঘাই–এর প্রতীক হয়ে ওঠে, সেখানে সাদা বোধকরি আর শুভ্রতার নামান্তর থাকে না। সে ক্ষেত্রে সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগের সঙ্গে একমত হওয়াটা দুরূহ।

নদীগুলোকে নতুন করে চিনতে চায় বলেই মদু ধুবড়ি-কালজানি-রায়ডাক-তোরসা-মানসাই এ পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও মনে হয় মধু তার পিতার দাহের থান খুঁজে দেখতে চলেছে, কখনো মনে হয় গোসানিমারীর মন্দিরে তার মানত আবার কখনো বকুল আতর বিক্রির উছিলায় রাজদরবারে যাবার সম্ভবনাও এই যাত্রার উদ্দেশ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু নিশ্চিত করে কিছুই বলার উপায় নেই। মদুর নিজের জীবনের অনিশ্চয়তার ঘ্রাণ যেন তার জলযাত্রায় আরোপিত। কিন্তু তার যাত্রা থেমে থাকে না। কারণ মধু জানে:

> জলেরও নেশা আছে। মদ যেমন এ-ভাঁড় থেকে ও ভাঁড়ে সমান নেশা। জলেরও তাই এ-নদীতে কিংবা অন্যে।...তা ফিরিঙ্গির দেশ হয়তো ভালো সাউকারির পক্ষে। রাঁড়ী হলেও রাজা একজনাই। কিন্তু কী করা যাবে এ দেশেই যদি সাইকারি করতে হয় তাকে। অন্য দেশ হয়তো অন্য রকম। কিন্তু কী করবে পুরুষে? কারণ কি ভালোই এদেশ, এই নদী? এ নদী আর সে নদীতে কেমন নেশা নয়? এই নৌকা আর গন্নাও। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪০)

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মধুর রক্তে বহমান এই জলের নেশা তার রক্তে; উত্তরাধিকারসূত্রে এই নেশা সে ধারণ করে। কাজেই এই জলজীবনের অনিশ্চয়তা তাকে কখনও কখনও অস্তিত্বসংকটে ফেললেও এই নদীতেই আবার ভোর হবার আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত হয় তার জীবনে। উপন্যাসের শেষের বাক্যগুলোতে মধুর আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই প্রবলভাবে সে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে চায়:

> দেখো একবার এ-নদী, দেখো একবার রঘুদেব আর লক্ষীনারান। কী কাণ্ড, আকাশটা নীলচে সবুজ হবে কেন? লাল না, সোনালি না, কালো না।...আর রঘু না, লক্ষী না, এ-জলও পুরুষকে নিতে পারে। তা নেয়ও।...অবশ্য তোমার এক পুতি আছে, মদু।... আর যদি না-ই ফেরে সে, তাদের মধ্যে কি বীজ বেঁচে থাকে না? বটের বীজ কত ছোট।... ধোঁয়াটে জলে পাক ধরছে এখনও। আলো ফুটেও ফুটছে না। কী রকম আলো ফুটবে কে জানে! সে জানে...অন্ধকার অবশ্যই কখনও-কখনও টেনে নিয়ে পাকে ফেলে আড়িয়াল খাঁর। পিতামহর সময় থেকেই হচ্ছে।
>
> কিন্তু এখন, এই তো সময়, সূর্য কেমন দিনটাকে-বা আনো। আবার সূর্যকে দেখিবা দিহ। আর এখনই শেষ রাতের অন্ধকার কাটবে আর জলের মধ্যে সাদা সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে নাকি হাসি-হাসি আর সফেদ।...আর ভগবান, ভগবান, যদি মত হয়, ছেলের বেটা কিংবা তস্য বেটা হয়ে এদেশেতেই যেন জন্মাই যদি তেমন-কিছু ঘটে যায়।
>
> কারণ যেমত অন্ধকার হয়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪১)

এভাবেই মধু যুগ ও জলের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েও শেষপর্যন্ত উত্তরসূরির বীজের ভেতর দিয়ে এই জলজীবনে ফিরে আসতে চায়, অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে।

চাঁদবেনে ও *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে চাঁদ ও মধুর বেনেজীবনের অস্তিত্বসংকট জলজীবনকেন্দ্রিক হলেও উভয়ের জীবনদ্বন্দ্ব ও অস্তিত্বসন্ধানের স্বরূপ ভিন্ন। চাঁদের লড়াই জলজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত এবং কাল ও দৈবের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ে টিকে থাকার পেছনে চাঁদের ঐকান্তিক এক স্বপ্ন বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। চেতনায় কাল ও জলের অন্তর্ঘাত ধারণ করে এক সভ্যতার শিল্প অন্য সভ্যতায় পৌঁছে শিল্প ও সভ্যতার বিস্তার ঘটানোর ভেতরেই চাঁদের স্বপ্ন নিহিত। এই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সে কালে কালে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে চায়। অন্যদিকে মধু সাধুখাঁ'র রয়েছে এক প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষা। জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে হলেও সে বার বার এই বাংলায় ফিরে আসতে চায়। টিকে থাকার জন্য যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে সে দ্বিধাহীন। স্বদেশপ্রেম, জীবনের অনিশ্চয়তাজনিত চেতনা এবং জলজীবনের বিপন্নতা মধুচরিত্রের অস্তিত্বসংকটের মূল। এই তিন বৃত্তেই আবর্তিত তাঁর জীবন।

দুটো উপন্যাসেই বৈশ্য শ্রেণিমানসের পরিচয় লিপিবদ্ধ। বেনেজীবন যে কাল কিংবা জলের অনিশ্চয়তায় প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চিত এবং তরঙ্গায়িত, সেই জীবনে টিকে থাকার লড়াই যে জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে টালমাটাল–সেটি দুই উপন্যাসেই সমানভাবে রূপায়িত। জলজীবনের প্রতিমুহূর্তের অনিশ্চয়তা কিংবা বিপন্নতা এই দুই বেনে পুরষের সত্তায় প্রবল জীবনতৃষ্ণার বীজ প্রোথিত করে দেয়। একারণেই চাঁদ কিংবা মধু মৃত্যু পর্যন্তই অনুপল জীবন–এই বিশ্বাসকে চেতনায় লালন করে প্রতিমুহূর্তের লড়াইয়ে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে।

সহায়কপঞ্জি

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৭)। 'মধু সাধুখাঁ', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৪, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০১০)। 'চাঁদবেনে', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৯, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০১০)। 'পদ্মাপুরাণ কথা', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৮, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৪)। *চোখের দুটি তারা: দুই বাংলার কবিতা*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

ইছামউদ্দীন সরকার (২০০৩)। "কামতা/কামতাপুরা", *বাংলাপিডিয়া* দ্বিতীয় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ২৭১

উদয়শংকর বর্মা (২০০৮)। *উপন্যাসের অন্য ভুবন*, কবিতীর্থ, কলকাতা।

উদয়কুমার চক্রবর্তী (১৯৯৫)। "জলকুবের চন্দ্রশেখর", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১১০-১৩৪

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮০)। *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার: তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ক্যাম্পবেল, জোসেফ (১৯৯৫)। *মিথের শক্তি* (বিল ময়ার্সের সঙ্গে কথোপকথন), খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (২০০৩)। "ফিচ, রালফ", *বাংলাপিডিয়া* ষষ্ঠ খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ১৪৭-১৪৮

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত (২০০১)। *মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৯)। "চাঁদবেনে: প্রত্নসময় ও আখ্যান", 'দিবারাত্রির কাব্য', সপ্তম বর্ষ: প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, উপন্যাস সংখ্যা ২, কলকাতা। পৃ. ৬৩-৭৫

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (২০০১)। "প্রাক-ঔপনিবেশিক সাক্ষাৎ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১৯৩-১৯৮

ধীমান দাশগুপ্ত (১৯৮৮)। 'মধু সাধুখাঁ : একটি দৃশ্যকাব্য', *মধু সাধুখাঁ*, বাণীশিল্প, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪০২)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

থিয়োঙ্গো, নগুগি ওয়া (২০১০)। *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড*, দুলাল আল মনসুর অনূদিত, সংবেদ, ঢাকা।

পি. কে. ভট্টাচার্য (২০০৩)। "কামতা-কোচ বিহার", *বাংলাপিডিয়া* দ্বিতীয় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ২৭১-২৭১

প্রসূন ঘোষ (২০১৬)। "আধুনিক উপন্যাসে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য: অন্বেষণ ও পর্যালোচনা", '*কোরক*', শারদ সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৩৪৩-৩৮৮

পৃথ্বিশ সাহা (২০০১)। "চাঁদবেনে: বিম্বে-প্রতিবিম্বে", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ২১২-২৩৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১১)। 'চাঁদবেনে', *কথানির্মাতা সেলিনা হোসেন*, ফজলুল হক সৈকত ও জান্নাতুল পারভীন সম্পাদিত, নবরাগ প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ. ৩৫-৪১

বীতশোক ভট্টাচার্য (২০০৪)। *কথাজিজ্ঞাসা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

বীরেন্দ্র চক্রবর্তী (২০০৪)। *জীবন ও যাপন*, আলোচনা চক্র, কলকাতা।

মাহবুব সাদিক (২০১৫)। *সাহিত্যে শিল্পপ্রতিমা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

রবিন পাল (২০০০)। *উপন্যাসের উজানে*, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা।

রমাপ্রসাদ নাগ (২০০৩)। "চাঁদবেনে: অলৌকিক সর্পগুলি এবং উদ্যত এক পেখম চিত্র", 'নহবত', ৪০ বছর বিশেষ সংখ্যা, একালের বিস্ময় : কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, কলকাতা। পৃ. ৪১-৫০

রমাপ্রসাদ নাগ (২০০২)। *স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৩৭৩)। *বাংলা দেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

থাপার, রোমিলা (২০১৩)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কৃষ্ণা গুপ্তা অনূদিত, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৪০৮)। "একক অমিয়ভূষণ", 'শিলোঞ্ছ', কার্তিক-দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৬-৯

শম্ভু মিত্র (১৪০৪)। *চাঁদ বণিকের পালা*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শুভময় মণ্ডল (১৪০৮)। "হে প্রাণনেতা, আবার প্রাণ দিহ, দেখিবার চক্ষু দিহ...", 'শিলোঞ্ছ',কার্তিক-দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৪৯-৫৪

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০০৯)। *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৫)। "জাতীয়তাবোধ: প্রাচ্য, প্রতীচ্য এবং অমিয়ভূষণের 'মধু সাধুখাঁ'", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ১৩৫-১৪৩

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১৬)। *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সেলিনা হোসেন (২০১৬)। "মঙ্গলকাব্যের আলোকে নতুন গল্প", 'কোরক', শারদ সংখ্যা, কলকাতা। পৃ. ৩৩১-৩৩৪

সৌগত মুখোপাধ্যায় (২০১০)। "ম্যাজিক রিয়েলিজম", *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, নবযুগ, ঢাকা। পৃ. ৫২৪-৫২৬

হাসনাত আবদুল হাই (২০১২)। "ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং মিথ", 'শালুক', বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১৪ ফেব্রুয়ারি, জনান্তিক, ঢাকা। পৃ. ২৬-৪১

C.G. Jung (1974). "Archetypes of the Collective Unconscious", *Twentieth Century Criticism : The Major Statements*, ed. William J. Handy and Max West Brook, New York.

সাক্ষাৎকার:

- অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০০৭)। 'কথা বলতে বলতে', (সাক্ষাৎকার, তাপস ঘোষ, মুজিবর রহমান, প্রচেতা ঘোষ এবং সুবিমল মিশ্র: ১৯৯৪) *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৪, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার ও এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পৃ. ৪৪৪

উপসংহার

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য বিষয় সময়চেতনা এবং ব্যক্তির অস্তিত্বসংকট। তাঁর উপন্যাসে সৃষ্ট ব্যক্তিমানুষ গভীরভাবে কালসংলগ্ন। অষ্টম শতকের বৈশ্যজীবন থেকে শুরু করে আধুনিক কালের নরনারীর মনোদৈহিক বিকলনের মধ্য দিয়ে তাঁর রচনায় নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে কালের অভিঘাত, ব্যক্তির অস্তিত্বসংকট ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন। কখনও বহমান সময়ের পটে, কখনও বা ইতিহাস-সময়ের পটে প্রতিস্থাপন করে এইসব ব্যক্তিমানুষ ও গোষ্ঠীজীবনের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক চালচিত্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে উপন্যাসে তুলে এনেছেন অমিয়ভূষণ। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জীবনের এই সংকট তাদের জীবনসংকটের নামান্তর। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে তাদের কালসৃষ্ট বৈরি সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে বারবার, অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার পথ খুঁজে নিতে হয়েছে ক্রমাগত। অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে এভাবেই ব্যক্তি ও সমষ্টির অস্তিত্বসন্ধিৎসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তাদের অস্তিত্বসংকটের পেছনে বৈনাশিক কালের প্রখর অভিঘাতকেই নিয়ামকশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উদ্বাস্তু জীবনের দুঃসহ বেদনা অমিয়ভূষণ আত্মজীবনেই অনুভব করেছেন। এর গভীর প্রভাব পড়েছে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের চরিত্রের ওপর। রাজনৈতিক পালাবদলের নেতিবাচকতা তাঁর মতো সংবেদনশীল মানুষকে শেকড়বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় কাতর করেছে। অমিয়ভূষণের এই ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে সময় ও অস্তিত্বসংকট দুইয়েরই ছায়াপাত ঘটেছে। উপন্যাসপাঠে অনেক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীজীবনের ওপর এই বিষয়টিরও ছায়াপাত উপলব্ধি করা যায়।

উপন্যাসে সচেতনভাবেই লেখক বিচিত্রমাত্রিক সময়ের ব্যবহার করেছেন। কাহিনিকাল এবং কথনকালের মিথস্ক্রিয়ায় নির্মিত তাঁর উপন্যাসের সময়কাঠামো। যদিও তিনি সময়কে সব ক্ষেত্রেই চিহ্নিত করেননি। নানা চাবিশব্দ থেকে লেখকের অভিপ্রেত সময়কে খুঁজে নিতে হয়েছে। কখনও প্রাচীনকাল, কখনও মধ্যযুগ, কখনও বা আধুনিককালের প্রচ্ছদপট উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসে। খণ্ড খণ্ড কাল (পিরিয়ড) ব্যবহার করে একটি অখণ্ড প্রবহমান কালের পটে (টাইম) প্রতিস্থাপিত মানবের সংকট ও সংগ্রামের চিত্রচ্ছবি রচনা করতে চেয়েছেন এই লেখক। আবার ব্যক্তির অস্তিত্বসংকটযুক্ত বহির্জাগতিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক সময়ও প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। সময়ের এই বিচিত্রমাত্রা তার উপন্যাসকে অভিনবত্ব দিয়েছে।

অমিয়ভূষণের উপন্যাসে ব্যক্তির অস্তিত্বসংকট জীবনসংকটের নামান্তর। পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্লেষিত হয়নি এখানে। বরং, বৈনাশিক কালের মুখোমুখি দাঁড়ানো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারছে, নাকি উন্মূল হয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে, অথবা নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক নতুন বোধে উচ্চকিত হয়ে উঠছে–এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই অমিয়ভূষণ চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্ট ব্যক্তির জীবনবেদ ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসার কথকতা।

উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতক পর্যন্ত এক বিস্তৃত মহাকাব্যিক কালপটের প্রচ্ছদ উন্মোচিত হয়েছে অমিয়ভূষণের *নয়নতারা* (১৯৬৬), *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭) এবং *রাজনগর* (১৩৯১) উপন্যাসে। এক বৃহৎ

সময়পটে দাঁড়িয়ে অমিয়ভূষণ কালান্তরের কথা বলতে চেয়েছেন। মানবচিত্তে কালান্তরের সংকট এবং কাল অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে খোলস পাল্টে নতুন কালে উত্তরণের সংগ্রাম-বেদনাই তাঁর এইসব উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। নীলবিদ্রোহ, সামন্ততন্ত্রের বিলোপ, পুঁজিবাদী শ্রেণির উত্থান, ব্রিটিশ শাসকের নিগ্রহ, দেশভাগ, উদ্বাস্তুজীবন, স্বদেশী আন্দোলনের উত্থান–তরঙ্গক্ষুব্ধ এক টালমাটাল কালের পটে দাঁড়িয়ে অমিয়ভূষণ সামষ্টিক মানুষের রূপান্তরের চালচিত্র আঁকতে চেয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যক্তির নিরন্তর সংগ্রামের রূপাবয়ব চিত্রিত হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে।

কালের বৈনাশিক প্রভাব কেবল কেন্দ্র নয়, প্রান্তিক জীবনের অস্তিত্বসংকটকেও ত্বরান্বিত করেছে। *দুখিয়ার কুঠি* (১৯৫৯), *মহিষকুড়ার উপকথা* (১৯৮১), *হলং মানসাই উপকথা* (১৩৯৩) এবং *সোঁদাল* (১৩৯৪) উপন্যাসে অরণ্যবাসী-আদিপ্রাণ মানবের শেকড়বিচ্ছিন্ন জীবনের বেদনা, যন্ত্রসভ্যতার ক্রমঅগ্রসরমানতায় অরণ্য ও কৃষিসভ্যতার ক্রমবিনষ্টি, আদিপ্রাণ মানবের নৈতিক অবক্ষয় কিংবা কৃত্রিম সভ্যতার মুখোশে ক্লান্ত ব্যক্তির অরণ্যের অন্তরাল-জীবন খুঁজে নেবার মধ্য দিয়ে একটি যান্ত্রিক কালের অভিঘাত ঘোষিত হতে থাকে। তবে, এর মধ্য দিয়ে অমিয়ভূষণ আরণ্যক মানবের অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার ইতিবাচকতারও ইঙ্গিত দেন। অসুস্থ সভ্যতার শুশ্রূষার চাবিকাঠি যে এইসব আরণ্যক মানবের হাতে, অমিয়ভূষণ সে বিষয়টিকেই উপন্যাসশেষে প্রতীকায়িত করেন। এইসব উপন্যাসে অভিপ্রেত সময়টি লেখক চিহ্নিত করেন কোন একটি বিশেষ সনের উল্লেখ করে কিংবা কোন বিশেষ অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। শেষোক্ত উপন্যাসগুলোতে জোতদার-কৃষকের দ্বন্দ্ব, কৃষকশ্রেণির অস্তিত্বসংকটের ধারাবাহিকতা রূপায়ণে উপন্যাসে উঠে-আসা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের আভাস একটি বিশেষ কালকে চিহ্নিত করে। এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে অভিসন্দর্ভে।

চাঁদবেনে (১৪০০) কিংবা *মধু সাধুখাঁ* (১৯৮৮) উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে বৈশ্য শ্রেণির অস্তিত্বসংকট। অষ্টম-নবম শতক এবং ষোড়শ শতকের পটে দাঁড়িয়ে একটি বিশেষ জীবনের বাস্তবতাযাপনে চাঁদবেনে ও মধু সাধুখাঁ–এই দুই চরিত্র হয়ে উঠেছে অস্তিত্বসন্ধিৎসু। অনিশ্চিত বেনেজীবনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রতিমুহূর্তের লড়াইয়ে এই চরিত্রদ্বয় নতুন এক দার্শনিকবোধে আপ্লুত হয়। *চাঁদবেনে* উপন্যাসের চাঁদের জীবন সমুদ্রবাণিজ্যকেন্দ্রিক বলেই তা তরঙ্গায়িত। কিন্তু লেখক মনে করেন ঝড়-ঝঞ্ঝা দূর-দিগন্তে সঞ্চরমান হলেই মানুষ সবসময় তাকে গ্রাহ্য করে না, আর এই গ্রাহ্যহীনতাই চাঁদ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। সমতটের চন্দ্রশেখর বার বার ভাগ্যের কাছে নিগৃহীত, যে নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেতে সে ইতিহাসের এক বৈরি সময়পট ও প্রতিকূল সমুদ্র তথা বিরূপ ভাগ্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অন্তহীন বাণিজ্যযাত্রা করেছে। বাণিজ্যপথের সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে সভ্যতা বিস্তারের স্বপ্ন চেতনায় লালন করে বেদনা আর অন্তর্ঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। তবু, শেষ অনুপল পর্যন্তই জীবন–এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ চাঁদবেনে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে চায়।

অন্যদিকে, মধ্যযুগের মধু সাধুখাঁও অস্তিত্বসন্ধিৎসু। বংশানুক্রমিক স্বল্পায়ুকে সে অতিক্রম করতে চায়, আর সে কারণেই নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যে বার বার ফিরে আসতে চায় মধু। অনিশ্চিত জলজীবন, মৃত্যুচেতনা-নিয়তিচেতনা, পাপবোধ, বেনেসত্তার নানা কথকতা তার চেতনায় ছোট ছোট ঢেউয়ের মতোই ঘুরপাক খায়।

ইতিহাস-কালের অমোঘ অভিঘাতে কামতা রাজবংশের উত্থানপতনও মধুর মনে পড়ে। শুক্লধ্বজ, নীলধ্বজ, নীলাম্বর, বরবাক-তুবরাক খাঁয়েরা, হুসেন শা, নরনারায়ণ–এদের প্রত্যেকের কালের গর্ভে হারিয়ে যাবার ইতিহাস মধুকে তার অনিশ্চিত জীবনের কথা, মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। কাল, জল আর জীবনের অনিশ্চয়তা গ্রথিত হয় একই সূতোয়। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কথকতায় কাল আর জল হয়ে ওঠে সমার্থক।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে কেবল বহিরাঙ্গিক সময়সূত্রই ব্যবহৃত হয়নি, এর পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সময়পট। অমিয়ভূষণের *নির্বাস* (১৯৫৯), *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী* (১৯৫৭), *বিলাস বিনয় বন্দনা* (১৩৮৯) এবং *বিবিক্তা*-র (১৯৮৯) মত উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে নরনারীর মনোদৈহিক জটিলতার স্বরূপ। সভ্যতার ক্রমআগ্রাসনে ব্যক্তি এইসব উপন্যাসে বিবরলালিত, নিঃসঙ্গ। প্রতিদিনকার জীবন এখানে সভ্যতার মতোই কৃত্রিম। অমিয়ভূষণের ব্যক্তিমানুষেরা সভ্যতার এই কৃত্রিমতা ছিঁড়ে ফেলতে চায়; সভ্যতা তাদের ভেতর সংশয়-অনৈতিকতা ও মিথ্যাচারের জন্ম দিয়েছে, যা ব্যক্তির চেতনায় অস্তিত্বসংকটকে ফেনিয়ে তোলে। *নির্বাসের* বিমি, *বিলাস বিনয় বন্দনা* উপন্যাসের ত্রয়ীচরিত্র, *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবীর* তরু কিংবা তার পিতা হারান দাস নিজেদের ভেতর লালন করেছে আধুনিক কালের অবক্ষয়। এই অবক্ষয় তাদের ভেতর অস্তিত্বসংকট আর স্মৃতিকাতরতার জন্ম দিয়েছে। একান্ত ব্যক্তিকতার কারণেই উপন্যাসগুলোতে বহিরাঙ্গিক সময়ের পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক সময়ের বিন্যাস ঘটেছে। উপন্যাসশেষে এইসব উপন্যাসের ব্যক্তিচরিত্রের কেউ কেউ সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার গাঢ় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে, কেউ স্বপ্ন দেখেছে সন্তানের মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তুজীবনে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার, কেউ বা আত্মহননের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের ভারে বিলীন হয়েছে। সময়ের গাঢ় অভিঘাত এভাবেই আধুনিক ব্যক্তিমানুষের অন্তঃকরণে এঁকে দেয় কালচিহ্নিত ক্ষত।

কাল ও কালের অভিঘাতস্পৃষ্ট মানবের অস্তিত্বসংকট অমিয়ভূষণ রচিত কথাসাহিত্যের একটি মূল প্রবণতা। তাঁর উপন্যাসে কালের অভিঘাতে শুধু মানবঅস্তিত্বেই সংকটের জন্ম হয়নি, বরং সমাজের রূপ-রূপান্তর, ব্যক্তির অস্তিত্বজিজ্ঞাসা, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক দ্বন্দ্বেরও রূপায়ণ ঘটেছে। সমকাল-ইতিহাসকালের মতো বহিরাঙ্গিক সময় এবং মনস্তাত্ত্বিক কালের পটে ব্যক্তির জীবনবেদ-জীবনদর্শন এবং অস্তিত্বসন্ধিৎসু সত্তা প্রকাশমান। অখণ্ড সময়ের পটে প্রতিস্থাপনপূর্বক ব্যক্তির জীবনসংকট এখানে নতুনরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে, যা একটি কালের রূপান্তরকেই চিহ্নিত করে। অমিয়ভূষণ নিজেই ছিলেন প্রবলভাবে কালচিহ্নিত মানুষ। তাঁর মননসৃষ্ট মানব কালান্তরের অভিঘাতে প্রোজ্জ্বল। কাল ও ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ায় জারিত তাঁর কথাসাহিত্য একারণেই বেঁচে থাকবে অনেককাল। অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

পরিশিষ্ট : ক

অমিয়ভূষণ মজুমদার : জীবনপঞ্জি

১৯১৮ জন্ম। ২২ মার্চ (৮ চৈত্র, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) কোচবিহার শহরের মাতুলালয়ে; বাংলা মতে শুক্রবার, ইংরেজি মতে শনিবার। পিতা অনন্তভূষণ মজুমদার, মাতা জ্যোতিরিন্দু দেবী। পিতৃনিবাস পাবনা জেলার সারা থানার অন্তর্ভুক্ত পাকুড়িয়া গ্রাম।

১৯২৬ দেশজুড়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সূত্রপাত। বাবা-মা, ভাই-বোনসহ স্টিমারে পাকুড়িয়া থেকে পাবনা যাওয়ার পথে ঝড়ের পদ্মায় আতঙ্কিত রাত্রিযাপন। এই রাতের বিভীষিকাময় স্মৃতি তাঁর ভেতর এক প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছে।

এসময় পাবনায় মহাকালী পাঠশালায় পিতা তাঁকে ভর্তি করেন। কিছুদিন পড়বার পর স্প্লিন পাংকচারের মতো কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনে ভর্তির তিন-চার মাস পরে বছরশেষে বাড়ি ফেরেন। ট্রপিক্যাল হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে তিনি ইংরেজ ডাক্তার কর্নেল নেপিয়ার ও নার্স-এর সংস্পর্শে আসেন, যা তাকে পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তোলে।
ঠনঠনের কালীবাড়ি আক্রান্ত, ঢাকাতেও দাঙ্গা। দাঙ্গার এই হিংস্রতা তাঁর চেতনায় গাঢ় অভিঘাতের জন্ম দিয়েছে।

১৯২৭ মামা রমেশনারায়ণ চৌধুরী অমিয়ভূষণকে পাবনা থেকে কোচবিহারে এন জেনকিন্স স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করেন। গ্রাম থেকে শহরে এসে তিনি আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছেন।

১৯২৯ পিতা অনন্তভূষণ, মাতা জ্যোতিরিন্দু দেবীসহ পুরো পরিবার কোচবিহারে চলে আসে। চল্লিশ বছর বয়সে পিতা অনন্তভূষণ চাকরিতে যোগদান করেন।

১৯৩১ ক্লাস এইটের ছাত্র অমিয়ভূষণ। *ল্যামটেলস্ ফ্রম শেক্সপিয়র*, *রোমিও জুলিয়েট*, *টুয়েলফ নাইট*, *ম্যাকবেথ চিলড্রেন্স গারল্যান্ড অব ভার্সেস* এবং রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ* এবং *কথাকাহিনী* পড়ে সাহিত্যবোধের জাগরণ। এ বছরই ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত। দেশজুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের মতো প্রতিরোধ আন্দোলনের অনুরণন স্বচেতনায় উপলব্ধি, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ জন্মে।

১৯৩৪ জেনকিন্স স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস।

১৯৩৫ টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় আই. এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অপারগতা। কুড়িগ্রামে স্বাস্থ্যগত কারণে দিদির বাড়িতে অবস্থান। এখানে অবস্থানকালেই ব্যাবিট ও ব্যাডেনব্রুক্স পাঠ।

১৯৩৭ কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ পাস। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি। অসুস্থতার কারণে কোচবিহারে ফিরে গিয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি। এখানেই হার্ডি'র জুড্ দি অবস্কিয়োর, লরেন্সের সনস এন্ড লাভারস, স্তাঁদাল, টলস্টয়ের ছোটগল্প, হেনরিক সিংকের লেখা, সালমা লাগেরলাফ- এর লেখার সাথে পরিচয়।

১৯৩৯ ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ পাস করেন। ডাকবিভাগে চাকরি পান এবং সেইসূত্রে রাজশাহী বিভাগের মহাদেবপুরে যান।

১৯৪০ গৌরীদেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯৪৩ *মন্দিরা* পত্রিকার ১৩৫১ এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় তাঁর প্রথম রচনা *দি গড অন মাউন্ট সিনাই* নাটকটি প্রকাশিত হয়। কোচবিহারের পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠে বাবা অনন্তভূষণ পাবনার নীলকুঠিতে ফিরে যান।

১৯৪৪ প্রথম সন্তান অম্লানজ্যোতি-র জন্ম। পাকসি রেল কলোনির পোস্ট অফিসে বদলি হন।

১৯৪৫ *পূর্বাশা* পত্রিকায় প্রথম গল্প *প্রমীলার বিয়ে* প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬ কলকাতার নরমেধযজ্ঞের ঢেউ আছড়ে পড়ে পাবনায়। ফলে নিশ্চিন্তের জগত ছেড়ে ৪৬-এর শেষদিকে মা এবং পরিবারের স্ত্রী ও শিশুদের কোচবিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

১৯৪৭ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। অমিয়ভূষণ বদলি হয়ে কোচবিহারে আগমন। বাবা অনন্তভূষণও পাকুড়িয়া ছেড়ে পুনরায় কোচবিহারে ফিরে আসেন।

১৯৪৮ দ্বিতীয় পুত্র আনন্দজ্যোতির জন্ম। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ।

১৯৪৯ আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৫১ অপূর্বজ্যোতি মজুমদারের জন্ম।

১৯৫৩ *নীল ভুঁইয়া* চতুরঙ্গ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ। প্রথম কন্যা মীনাক্ষীর জন্ম।

১৯৫৫ প্রথম উপন্যাস নীল ভুঁইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

১৯৫৭ আথেনা মজুমদারের জন্ম। *গড় শ্রীখণ্ড* প্রকাশিত।

১৯৫৯ *দুখিয়ার কুঠি* এবং *নির্বাস* প্রকাশিত।

১৯৬০ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার। ছয় মাসের জন্য চাকরিচ্যুতি (সাসপেন্ড)। কন্যা এণাক্ষী মজুমদারের জন্ম।

১৯৬২ *পঞ্চকন্যা* গ্রন্থাকারে প্রকাশ। পুত্র অনির্বাণজ্যোতি মজুমদারের জন্ম।

১৯৬৩ উদ্বাস্তু প্রকাশ।

১৯৬৫ কণিষ্ঠপুত্র অপরূপজ্যোতির জন্ম। *দীপিতার ঘরে রাত্রি* গল্প সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

১৯৬৬ *নীল ভুঁইয়া* উপন্যাসের পরিবর্তিত সংস্করণ *নয়নতারা* প্রকাশিত।

১৯৭২ পিতা অনন্তভূষণ মজুমদারের মৃত্যু। তুফানগঞ্জে 'বাংলা ভাষা দিবস এবং শহিদ স্মরণ দিবস' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত এবং ভাষণ দান।

১৯৭৩ *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসের জন্য ত্রিবৃত্ত পুরস্কার লাভ।

১৯৭৬ ডেপুটি পোস্টমাস্টার হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৭৯ কৌরব পত্রিকায় আত্মজীবনীমূলক রচনা *আমার সম্বন্ধে* প্রকাশিত।

১৯৮০ সমতট পুরস্কার লাভ।

১৯৮১ *মহিষকুড়ার উপকথা* ও *বিলাস বিনয় বন্দনা* প্রকাশিত।

১৯৮২ ২৪ জানুয়ারি ছোট ছেলে অপরূপজ্যোতি নিরুদ্দেশ হন। মাতা জ্যোতিরিন্দু দেবীর মৃত্যু।

১৯৮৩ *রাজনগর* উপন্যাস প্রকাশ।

১৯৮৪ কথাসাহিত্যিক হিসেবে অমিয়ভূষণকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহিত্য পুরস্কারে' সম্মানিত করা হয়।

১৯৮৫ ৪ ফেব্রুয়ারি স্ত্রী গৌরীদেবীর মৃত্যু।

১৯৮৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার লাভ। ২৬ জুন রবীন্দ্রসদন থেকে বঙ্কিম পুরস্কার গ্রহণ করেন। সাহিত্য অকাদেমি *রাজনগর* উপন্যাসের জন্য অমিয়ভূষণকে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত করে।

১৯৮৮ *মধু সাধুখাঁ*, *ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর*, *এই অরণ্য এই নদী এই দেশ* প্রকাশিত হয়।

১৯৮৯ *বিবিক্তা* প্রকাশ।

১৯৯৩ *চাঁদবেনে* প্রকাশিত। কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগদান ও ভাষণ প্রদান।

১৯৯৪ গল্পসমগ্র ১ প্রকাশ।

১৯৯৬ একমাত্র প্রবন্ধ-*গ্রন্থ লিখনে কী ঘটে* আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত।

১৯৯৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শরৎস্মৃতি পদক' লাভ। *বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী* প্রকাশিত।

১৯৯৯ মালদা বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান ও ভাষণ প্রদান।

২০০০ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ। কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কারে সম্মানিত। *ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প* প্রকাশ। কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন মেলায় যোগদান।

২০০১ ৮ জুলাই সকাল ১১.৪০ মিনিটে অমিয়ভূষণ মজুমদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : খ

অমিয়ভূষণ মজুমদার : গ্রন্থপঞ্জি

উপন্যাস

নীল ভুঁইয়া	চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৫৫ প্রকাশক: নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা। উৎসর্গ: 'আমার সব গল্পের দিদিমা কালোদি-কে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম'।
	নয়নতারা (নীল ভুঁইয়া-র পরিবর্তিত সংস্করণ)। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৬৬ প্রকাশক: ভারবি, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ প্রকাশক: অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা। প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন।
গড় শ্রীখণ্ড	প্রথম প্রকাশ: পূর্বাশা পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ: ১৩৬৩ (মার্চ, ১৯৫৭) প্রকাশক : সৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা। ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৭ প্রকাশক: অরুণা বাগচী, অরুণা প্রকাশনী। যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬, প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন। উৎসর্গ: 'আমার সবচাইতে পরিচিত পুরুষ চরিত্র বাবাকে উৎসর্গ করলাম'।
দুখিয়ার কুঠি	প্রথম প্রকাশ: গণবার্তা পত্রিকা, শারদীয় ১৩৬৪ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৬ (এপ্রিল ১৯৫৯) প্রকাশক: নিওলিট পাবলিশার্স, ২১৩ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৮৯ প্রকাশক: অরুণা বাগচী, অরুণা প্রকাশনী । প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন। উৎসর্গ: 'আমার গল্পের আদি পাঠক আমার মাকে'।
নির্বাস	গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৫৯ প্রকাশক: নিওলিট পাবলিশার্স। প্রচ্ছদ: খালেদ চৌধুরি। উৎসর্গ: 'অধ্যাপক শ্রীমান নবকুমার নন্দী চিরজীবিতেষু'। দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৬ প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। প্রচ্ছদ: অজয়গুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বাস্তু	প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৩৬৯ প্রকাশক: গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রয়ী প্রকাশনী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, প্রচ্ছদ : দেবল বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসর্গ: 'শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুহৃদবরেষু'।
মহিষকুড়ার উপকথা	প্রথম প্রকাশ: শারদীয়া ঘরোয়া পত্রিকা, ১৩৮৩। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৮১। প্রকাশক: আরতি চক্রবর্তী, অন্বেষা, ৮৯ এ, এন কে ঘোষাল রোড,কলকাত। উৎসর্গ: 'অম্লান আনন্দ ও অপূর্ব-কে'। প্রচ্ছদ: শ্যামল দত্ত রায়।
বিলাস বিনয় বন্দনা	প্রথম প্রকাশ: শারদীয় ঘরোয়া ১৩৮২ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: মহালয়া ১৩৮৯ প্রকাশক: আরতি চক্রবর্তী, অন্বেষা। উৎসর্গ: 'মীণাক্ষী আথেনা ও এণাক্ষীকে'। প্রচ্ছদ: মদন সরকার।
মধু সাধুখাঁ	প্রথম প্রকাশ: সারস্বত প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৮৮ প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪-এ, টেমার লেন, কলকাতা। উৎসর্গ: 'শ্রীমান সুখেন্দ্র চক্রবর্তী চিরজীবিতেষু'। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: হিরণ মিত্র।
রাজনগর	প্রথম প্রকাশ: চতুরঙ্গ, ১৩৭৯-৮১ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৯১ প্রকাশক: অরুণা বাগচী, অরুণা প্রকাশনী। উৎসর্গ: 'শ্রীমান অপরূপজ্যোতি মজুমদার'। প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন।
ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর	প্রথম প্রকাশ: এক্ষণ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ গ্রন্থাকারে প্রকাশ: ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ প্রকাশক: সন্ধ্যা সাহা, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডলরোড, কলকাতা। প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী। উৎসর্গ: 'আমার পুত্র অপূর্বজ্যোতিকে'।
এই অরণ্য এই নদী এই দেশ	প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ ১৩৯৫ প্রকাশক: রণধীর পাল, সাহিত্য সংস্থা, ১৪/১ টেমার লেন, কলকাতা। প্রচ্ছদ: গণেশ বসু। উৎসর্গ: 'আথেনা মজুমদারকে দিলাম'। (১৩৯৩ এ শারদীয় সপ্তাহ পত্রিকা সংখ্যায় প্রকাশিত হলং মানসাই উপকথা এবং ১৩৯৪ এ শারদীয়া প্রতিক্ষণ পত্রিকা সংখ্যায় প্রকাশিত সোঁদাল

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসদ্বয় একত্রে গ্রন্থিত হয়ে ১৩৯৫ এ এই অরণ্য এই নদী এই দেশ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়)।

বিবিক্তা

প্রথম প্রকাশ: সমতট, বিশেষ সংখ্যা হিসেবে ১৯৭৮ এ।
গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৯
প্রকাশক: প্রদীপ ভট্টাচার্য, রক্তকরবী, ১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী।
উৎসর্গ: 'অনুজপ্রতিম শ্রীবিকাশ বাগচিকে স্নেহ নিদর্শন'।

চাঁদবেনে

প্রথম প্রকাশ: চতুরঙ্গ ও বসুধারা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।
গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ, ১৪০০
প্রকাশক: আনন্দরূপ চক্রবর্তী, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা।
প্রচ্ছদ: আনন্দরূপ চক্রবর্তী।
উৎসর্গ: 'স্নেহভাজন নির্মাল্য আচার্যকে'।

বিশ্ব মিত্তিরের পৃথিবী

প্রথম প্রকাশ: শারদীয় যুগান্তর, ১৩৯১
গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ১৯৯৭
প্রকাশক: প্রদীপ ভট্টাচার্য, রক্তকরবী, ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা।
প্রচ্ছদ: অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।
উৎসর্গ: 'কন্যাসমা অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীকে'।

তাসিলার মেয়র

প্রথম প্রকাশ: বারোমাস ১৩৮৭-১৩৯০
গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: ১৪১৪
প্রকাশক: দে'জ পাবলিশিং, সুধাংশুশেখর দে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

ছোটগল্প সংকলন

পঞ্চকন্যা

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৩৬৯, (অক্টোবর ১৯৬২)
প্রকাশক: অশোকানন্দ দাশ, নিউ স্ক্রিপ্ট, এ-১৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা।
সংকলিত গল্প: যে সাগ্নিকা, সাদা মাকড়সা, মধুছন্দার কয়েকদিন, দুলারহিন্‌দের উপকথা, ওগো মুগ্ধা।
প্রচ্ছদ: নীতিশ মুখোপাধ্যায়।
উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দেবী অশেষ শ্রদ্ধাস্পদেষু'।
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন, ১৯৯০
প্রকাশক: তৃষ্ণা খাঁ, বাক্‌শিল্প, ১৭ সি তেলিপাড়া লেন, কলকাতা।
দ্বিতীয় সংস্করণে সংকলিত নতুন গল্পগুলি হলো: তন্ত্রসিদ্ধি, বেতাগ,

Dhaka University Institutional Repository

বাইতোড়, সরসুনা প্রভৃতি, তুলাইপাঞ্জার রোয়া, অন্বেষণ।

দীপিতার ঘরে রাত্রি

প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৭২ (এপ্রিল, ১৯৬৫)
প্রকাশক: সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী।
উৎসর্গ: 'শ্রীমতী গৌরী দেবী মজুমদার করকমলেষু'।
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন, ১৯৯০
প্রকাশক: তৃষ্ণা খাঁ, বাক্‌শিল্প, তেলিপাড়া লেন, কলকাতা।
প্রচ্ছদ: সুবোধ দাশগুপ্ত।
সংকলিত গল্প: অঘটনা, দীপিতার ঘরে রাত্রি, প্রমীলার বিয়ে, কলঙ্ক, সুনীতি, পদ্মিনী, রানী ইন্দুমতী, ইতিহাস, শহিদ, গারদ, ভদ্রলোকের বাড়ি, ভূকম্পন, পলদহ,তাঁতী বউ।

শ্রেষ্ঠ গল্প

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৬
প্রকাশক: অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪-এ টেমার লেন, কলকাতা।
প্রচ্ছদ: রবি দত্ত।
উসর্গ: 'এরকম তোমার ইচ্ছায়। দেখতে কি পাও, শুনতে কি পাচ্ছ? অপেক্ষা করো'।
সংকলিত গল্প: তাঁতী বউ, দুলারহিনদের উপকথা, অ্যাভলনের সরাই, উরুণ্ডী, এপ্‌স এন্ড পিকক্, সাইমিয়া ক্যাসিয়া, শ্রীলতার দ্বীপ, পায়রার খোপ, মৃন্ময়ী অপেরা, মাম্‌কা।
দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি, ১৯৯৪। প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা।
প্রচ্ছদ: দেবব্রত ঘোষ।
তৃতীয় মুদ্রণ: অক্টোবর, ২০০০
সংকলিত গল্প: তাঁতী বউ, দুলারহিনদের উপকথা, অ্যাভলনের সরাই, উরুণ্ডী, এপ্‌স এন্ড পিক্‌ক, সাইমিয়া ক্যাসিয়া, শ্রীলতার দ্বীপ, অন্বেষণ, পুকুরে মুক্তো।

গল্পসমগ্র ১

প্রথম প্রকাশ: ১১ মাঘ ১৪০১
প্রকাশক: আনন্দরূপ চক্রবর্তী, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩
সংকলিত গল্প: দূরভাষিত, হনিডলার্ক, গল্প, চার্জ, একটি দহের গল্প, অধ্যাপক মোহিত স্যারের উপাখ্যান, রিচুয়াল, রাজীব উপাখ্যান, নির্মল সিংঘির অপমৃত্য, ম্যানইটার, অর্পিতা সেন, টাইগন-লিটিগন, একটি শিকারের কাহিনী, সুশোভনার কাহিনী, ডাউন কিউল প্যাসেঞ্জারে, একটি মাঝারি মানুষের গল্প, মিস্টার ফন্‌টি, অসমাপ্ত।
সম্পাদনা: বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, দেবব্রত ভট্টাচার্য, আনন্দরূপ চক্রবর্তী।

ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, ২০০০
প্রকাশক: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, ২-ই, নবীন কুণ্ড লেন, কলকাতা।
প্রচ্ছদ: অজয় গুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ: 'অনির্বাণজ্যোতি মজুমদার'।
সংকলিত গল্প: ম্যাকডাফ সাহেব, মৃন্ময়ী অপেরা, ততঃ কিম্, বেতাগ বাইতোড়, সরসুনা প্রভৃতি, নেই কেন সেই পাখি, পায়রার খোপ, অমৃত্যুর সন্ধানে, মামকাঃ, অন্ধকার।

তন্ত্রসিদ্ধি — প্রথম প্রকাশ: শিলিগুড়ি বইমেলা, ১৯৮৮

প্রবন্ধ সংকলন

লিখনে কী ঘটে — প্রথম প্রকাশ: লা পয়েজি, ১৩: ৩-৪ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৯
গ্রন্থিত: ডিসেম্বর, ১৯৯৬
প্রকাশক: দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা
প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী
সংকলিত প্রবন্ধ: উপন্যাস সম্বন্ধে, উপন্যাসের গল্প, ঔপন্যাসিক ও জীবনদর্শন, সাহিত্য ও নীতি, সংস্কৃতিবিষয়ক প্রস্তাব, সাহিত্যিক জীবন মহাশয়, সাহিত্যের ধারণা, সংবিত্তি, রমণীরত্নের সন্ধানে, পদ্মাপুরাণ কথা।
উৎসর্গ: 'স্নেহাস্পদ কল্যাণ চৌধুরীকে'।

অমিয়ভূষণ মজুমদার : অগ্রন্থিত রচনাপঞ্জি

উপন্যাস

সুরাকসিন — এষা, ১৯৬৬-৭০
উপন্যাসটি নিউ ক্যালকাটা নামে ঘরোয়া পত্রিকায় ১৩৮০ সনে প্রকাশিত।

দোম আন্তনিও — ঘরোয়া, শারদসংখ্যা ১৩৭৯

মতিঘোষ পার্ক ভানুগুপ্ত লেন — ঘরোয়া, শারদসংখ্যা ১৩৮১

বিনদনি — সপ্তাহ, শারদসংখ্যা ১৩৯২

উত্তরপুরুষ (কুমার টপাদার) — উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শারদসংখ্যা ১৩৯৪; (অমিয়ভূষণ লিখিত ১৯৭২ এর একটি ডায়েরিতে ১১ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে 'সুকুমার তপাদার' শিরোনামে কিছু নোট পাওয়া যায়। 'সুকুমার তপাদার, 'কুমার টপাদার'–এসবই আসলে এক অন্য উপন্যাস, যেটি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সে উপন্যাসের নাম 'উত্তর পুরুষ'।)

মাকচক হরিণ — দৈনিক বসুমতী, শারদ সংখ্যা ১৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাজেডির সন্ধানে	দৈনিক বসুমতী, শারদ সংখ্যা ১৪০১
অতিবিরল প্রজাতি	দৈনিক বসুমতী, শারদ সংখ্যা ২০০০ (অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র একাদশ খণ্ডভুক্ত রচনাপঞ্জি অনুসারে এর প্রকাশকাল ১৪০৯)
ভুলি নাই	তিস্তা-তোরষা শারদ সংকলন, ১৪০৪
রামী রজকিনী	জারি বোবাযুদ্ধ, শারদ সংখ্যা ২০০০
কালকা মেল' '৯২–এক উপন্যাসের সন্ধানে	চতুরঙ্গ, ১৪১৪-১৪১৫
সরসিজা	পূর্বাশা, ১৩৬৩ (এই উপন্যাসটি প্রথম কিস্তির পর আর প্রকাশিত হয়নি।)

ছোটগল্প

নন্দরানী	চতুরঙ্গ, ১৩৫৩
সান্যালদের কাহিনী	পূর্ব্বাশা, ১৩৫৪
সহযাত্রী	–/– (গল্পটি পাওয়া যায়নি। রমাপ্রসাদ নাগের তথ্যানুযায় ('অমিয়ভূষণ ট্রমা চিহ্নিত এপিক', কলকাতা ২০০৮, পৃষ্ঠা ২২): এটি অয়ন পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৫৮) প্রকাশিত হয়।
প্রাচীন	ক্রান্তি (নবপর্যায়), ১৩৬১
অহেতুক	অনুক্ত, ১৩৬৬
ইনফরমাল ডিনার	নতুন সাহিত্য, ১৩৬৬
একটি বিপ্লবের মৃত্যু	নতুন সাহিত্য, ১৩৬৮
অণঘমিত্রা	কালান্তর / নতুন সাহিত্য, ১৩৬৯
একটি অ্যাবসার্ড কলম	সংহতি, – (গল্পটি পাওয়া যায়নি। সংহতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রকাশকাল জানা যায়নি। প্রাসঙ্গিকভাবে জানা যায় যে, গল্পটি ১৯৭০ এর আগে ছাপা এবং সেকালেই এর কপি দুর্লভ ছিল।)
দি ক্যাসল	দর্পণ, ১৩৬৭
বণিক লক্ষেশ্বর	পূর্বপত্র, ১৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লব	জয়শ্রী, ১৩৬৯
একটি খামারের গল্প	গণবার্তা, ১৩৬৯
ভটওলা	এক্ষণ, ১৩৬৯
স্বর্গভ্রষ্ট	চতুরঙ্গ, ১৩৬৯
প্রতিক্রিয়াশীল	জয়শ্রী, ১৩৭০
অনির্বচনীয়া	পূর্ব্বাশা, (নবপর্যায়) ১৩৭০
আয়নায়	পূর্ব্বাশা (নবপর্যায়), ১৩৭১
একটি গৃহত্যাগের গল্প	গণবার্তা, ১৩৭২
বিস্মিতা	অমৃত, ১৩৭২
ফ্রয়লাইন	দর্পণ, ১৩৭২
কমিউন	জয়শ্রী, ১৩৭২
নাথিং ডুইং	চতুরঙ্গ, ১৩৭৩
ইলেকট্রনিক্স	অনুক্ত ১৩৭৫
মধুরার ফ্ল্যাট এবং মিউজিয়াম	আধুনিক সাহিত্য, ১৩৭৫
প্রতিমা ও পুতুল	চতুরঙ্গ, ১৩৭৮
রাংতার আলো	কালপুরুষ, ১৯৭৮
স্বর্ণসীতা	অমৃত, ১৩৮৩
বক্সরুম	(দৈনিক) আজকাল, ১৯৮১
উপন্যাস লেখা	পরিচয়, ১৩৮৫
চলিয়াছ	পরিচয়, ১৩৮৭
সুধীরবাবু	উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৩৮৮

Dhaka University Institutional Repository

অনেক বেবুন	উত্তরায়ণ (উত্তরায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রিত পাঠ পাওয়া যায়নি।) ---
অরণ্যে রোদন	দাবী (মুদ্রিত পাঠ পাওয়া যায়নি।) -----
অবতংস	কালান্তর, ১৩৮৮
অন্তরীক্ষ	কৌরব, ১৩৮৮
চাটুজ্যে মজুন্দার	দৈনিক উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৩৯০
ও মধুপুর	বিজ্ঞাপনপর্ব, ১৩৯১
মেওয়া ও কিতাবসকল	চতুরঙ্গ, ১৩৯১
সাত একর	সপ্তাহ, ১৩৯১
কার্তিক গণেশ	উত্তরপ্রবাসী, ১৯৮৬
নীল আকাশ সবুজ পাহাড়	মনন, ১৯৮৬
গঙ্গা হরিণ চিতা ইত্যাদি	সংবিত্তি, ১৯৮৬
অ্যাকশন	শুভশ্রী, ১৩৯৩
একটি কুয়োর গল্প	লাল নক্ষত্র, ১৩৯৩
নীলকমল	(দৈনিক) বর্তমান ১৩৯৩
নক্ষত্রের যুদ্ধ	(দৈনিক) যুগান্তর, ১৩৯৪
মাকচক	ঘরোয়া, ১৩৯৪
ভাইরাস	কবিতীর্থ, ১৩৯৪
পুকুরের মুক্তো	যুগান্তর, ১৩৯৫
কার্মনগঞ্জ	এখন বোবাযুদ্ধ, ১৯৮৮ (‘এবং এই মৃগ’ গল্পটি এই পরিবর্তিত শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।)
গুদরু পহেলোয়ান	এলাটিন বেলাটিন, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

জেঠিমা, পিকুনি, কুইনি	কিশোর সমতট, ১৯৯২
এক মন্দভাগ্য বাস	কথাশিল্প, ১৩৯৯
বৃত্তান্ত সাতেকরী	লাল নক্ষত্র, ১৪০১
কালো কুয়োর রোমশ সাপ অথবা এক রিডার ফ্রেন্ডলি গল্প	বসুমতী, ১৪০২
ট্যাঁশ গল্প অথবা কুন্তীকর্ণ সংবাদ	উত্তরাধিকার, ১৪০৭

অগ্রন্থিত কবিতা

রাজার ঝিয়ারী অচেতন ঘুমঘোরে	মন্দিরা, ১৩৫১

অগ্রন্থিত আত্মকথন/ স্মৃতিচারণ

প্রথম পরিচ্ছেদ	জেনকিন্স স্কুল পত্রিকা, ১৩৬১
নীল আকাশ	ভিক্টোরিয়া কলেজ পত্রিকা, ১৯৬৯
খামখেয়ালি শহর	কোচবিহার গুড়িয়াহাটি ক্লাব স্মরণিকা, ১৯৭৬
আমার সম্বন্ধে	কৌরব, ১৯৭৯
রাসমেলা	কোচবিহার রাসমেলা স্মরণিকা, ১৯৮০
নিজের কথা	লাল নক্ষত্র, ১৯৮৬
মানসপথিকের ডানায়	সপ্তাহ, ১৯৮৬
লিটল ম্যাগাজিন ও আমি অথবা সঞ্জয়, বীরেন্দ্র ও আমরা	কৌরব, ১৯৮৮
আমার বাল্যের দুর্গোৎসব	চকমকি, ১৯৯০
কবি সঞ্জয়, পূর্ব্বাশা ও আমরা	পূর্ব্বাশার কথা (গ্রন্থ), ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মনে এল	ত্রিপথী, ২০০৩

নাটক

দ্য গড অন মাউন্ট সিনাই	মন্দিরা, ১৩৫১ (রচনাসমগ্রের প্রথম খণ্ডে একটি খসড়ামাত্র ছাপা হয়েছিল। মুদ্রিত পাঠটি হস্তগত হলে সেটি দ্বিতীয়বারে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।)
মহাসত্ব	চতুরঙ্গ, ১৩৬০
প্রতিমা বাসবদত্তা	উত্তরায়ণ, ---- (নাটকটি পারিবারিক পত্রিকা উত্তরায়ণে আনুমানিক ১৩৬১-৬৩ সনের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রিত নাটকের দু-একটি পৃষ্ঠা মাত্র পাওয়া গেছে।)
বিয়োগ	উত্তরায়ণ, ১৩৬১
রাঙাদি	উত্তরায়ণ, ১৩৬১
মধুরার ফ্ল্যাট মিউজিঅম	চতুরঙ্গ, ১৩৭৫

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

রবীন্দ্র উৎসব	কুচবিহার রামভোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যা, ১৯৬১
কেন লিখি	কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা, ১৩৬৬
সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব	উত্তরসূরী, ১৩৭০
কেন লিখি	প্রবন্ধটি পাওয়া যায়নি।
অনুমান করি	ত্রিবৃত্ত, ১৩৭৪ ('সংস্কৃত বিষয়ক অনুমান' নামে [গল্প কবিতা, ১৯৭১] পুনর্মুদ্রিত)
জর্ন্যাল থেকে	অনুক্ত, ১৩৭৬ ('সাহিত্য ও নীতি' শিরোনামে লিখনে কী ঘটে প্রবন্ধ সংকলনে মুদ্রিত। প্রবন্ধ সংকলনে অন্তর্ভুক্তির সময় শিরোনামের পরিবর্তন হয়েছিল, অথবা আগেই তা পরিবর্তিত শিরোনামে অন্যত্র পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল–জানা যায়নি।)

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কোচবিহারের ভাষা এবং সংস্কৃতি	কোচবিহার জেলা প্রদর্শনীর মুখপত্র: স্মরণিকা ১৯৬৮
শরৎচন্দ্রের উপন্যাস: ত্রিশ বছর পরে	উত্তরসূরী, ১৩৭৪
প্রাচীন কোচবিহারের ভাষা এবং সংস্কৃতিচর্চা	রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ১৩৭৬
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	আধুনিক সাহিত্য, ১৯৬৯
উদ্বেল সেই দয়ার সাগরকে	উত্তরণ, ১৯৭০
জীবন মহাশয়	নিষাদ, ১৯৭০
জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি-১	রাহু, ১৯৭০
দৃশ্যকাব্য	নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট, ----
জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি-২	চতুরঙ্গ, ১৩৭৭
স্বপ্নভঙ্গ	উত্তরসূরী, ১৩৭৮
অগ্নিবলয়	ত্রিবৃত্ত, ১৩৭৯
জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি-৩	সমতট, ১৯৭২
শ্রীকান্তে কী ঘটে	কালপুরুষ, ১৯৭৮
কেন লিখি	লা পয়েজি, ১৯৭৯
ঔপন্যাসিক ও জীবনদর্শন	লা পয়েজি, ১৯৮০
সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি	জার্নাল অব ডুয়ার্স কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, ১৯৯১
উপন্যাসের ভাষা	সমতট, ১৯৮১
শিল্পের আনন্দ	লা পয়েজি, ১৯৮৩
উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে	দ্রোহ, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার আধুনিকতা ও দুরূহতা বিষয়	অন্যস্বর, ১৯৮৬
প্রসঙ্গ রাজনগর	উত্তরদেশ, ১৯৮৭
ভালো ফিল্ম	কোচবিহার সিনে লুক, ১৯৮৮
গরবাচেভ নীতি ও পৃথিবীর শান্তি	কোচবিহার জেলা যুব উৎসব স্মরণিকা, ১৯৮৯
উপন্যাস কে লেখে	(অপ্রকাশিত)। 'উপন্যাসের গল্প' প্রবন্ধের নতুন শিরোনামে লেখক কর্তৃক পুনঃ-পরিকল্পিত রূপ।
উপন্যাসের ভবিষ্যৎ	(অপ্রকাশিত)
বনিক ও আমরা	---, কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির স্মরণিকা
একটি চিঠি	মিতালি, ১৯৯৪
সাহিত্য প্রস্তাব	বিকল্প, ১৯৯৯
এবার অবতার হও মা	কোচবিহার ঋষি অরবিন্দ ক্লাব স্মরণিকা, ১৪০৩
শিল্পের বন্ধনমুক্তি ও শিল্পীর স্বাধীকার	তিস্তা তোরষা, ১৪০৬
জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি-৪	সমতট, ২০০৮
বাংলা সাহিত্য ও দুর্নীতি	(অপ্রকাশিত?)
বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য	উত্তরসূরী, --- (প্রবন্ধটি পাওয়া যায়নি। প্রকাশকালের উল্লেখকালের উল্লেখ নেই।)
স্মাগলিং হোর্ডিং প্রভৃতি	উত্তরসীমান্ত বঙ্গ, ---
সাহিত্য নিবন্ধ	প্রবাহ তিস্তা-তোরষা, ১৪০৭
সাহিত্যের অগ্রগতি	প্রবন্ধটি পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : গ

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা

প্রাথমিক উৎস

অমিয়ভূষণ মজুমদার ২০০২, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ১, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৩, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ২, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৫, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৩, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৭, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৪, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৭, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৫, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৮, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৬, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৯, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৭, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১০, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র*, ৮, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১০, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৯, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১২, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ১০, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১৪, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ১১, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সহায়কপঞ্জি

ক. বাংলা গ্রন্থ

অর্চনা মজুমদার ২০০৫, *রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অর্ণব সেন ২০১৪, *শৈলী ভাবনায় কথাসাহিত্যের কয়েকজন*, প্রথম প্রকাশ, দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা

অমর ভট্টাচার্য ২০১৪, লাল তমসুক, দ্বিতীয় মুদ্রণ, গাঙচিল, কলকাতা

অরবিন্দ পোদ্দার ১৯৭৫, *বঙ্কিম মানস*, তৃতীয় সংস্করণ, গ্রন্থবিতান, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১১, *বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অলোক রায় ২০০৯, *বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

অশীন দাশগুপ্ত ১৯৮১, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

অশ্রুকুমার সিকদার ১৯৮৮, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

২০১৪, *চোখের দুটি তারা*, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০১৩, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রথম প্রকাশ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আলী আসগর ২০০৭, *সময় প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

আহমদ রফিক ২০১৫, *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা*, তৃতীয় মুদ্রণ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

ইমতিয়ার শামীম ২০১২, *কখনও বৃষ্টি শেষে*, প্রথম প্রকাশ, মধ্যমা, ঢাকা

উদয়শংকর বর্মা ২০০৮, *উপন্যাসের অন্য ভুবন*, প্রথম প্রকাশ, কবিতীর্থ, কলকাতা

উর্বী মুখোপাধ্যায় ২০১৬, *অমিয়ভূষণের উপন্যাস প্রসঙ্গে*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮০, *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার: তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা*, প্রথম প্রকাশ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী ১৪১৭, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ভাষাবিন্যাস, কলকাতা

কার্তিক লাহিড়ী ১৯৮৪, *সৃজনের সমুদ্র মন্থন*, প্রথম প্রকাশ, অন্বেষা, কলকাতা

কুমার দীপঙ্কর মণ্ডল ২০১৩, *নকশাল আলোয় পাঁচ উপন্যাস*, ভাষাচিত্র, ঢাকা

ক্যাম্পবেল, জোসেফ ১৯৯৫, *মিথের শক্তি* (খালিকুজ্জামান অনূদিত), প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ক্ষেত্র গুপ্ত ১৯৯৮, *তারাশঙ্কর অনুসন্ধান*, প্রথম সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা

১৯৯৬, *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি*, তৃতীয় প্রকাশ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ২০০৮, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১৯৯৬, *রবীন্দ্রনাথ-বাংলা কথাসাহিত্য: নানা দর্পণে*, প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১৯৯১, *বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি,কলকাতা

১৯৮৪, *রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৪, *বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প*, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত ২০০১, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

জয়া চ্যাটার্জী ২০১৬, *দেশভাগের অর্জন*, প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

২০০৩, *বাঙলা ভাগ হল*, প্রথম বাংলা সংস্করণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

তপোধীর ভট্টাচার্য ২০১০, *উপন্যাসের বিণির্মাণ*, প্রথম প্রকাশ দিপাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা

২০০৯, *উপন্যাসের সময়*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

১৪১২, *উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

২০০৪, *আধুনিকতা: পর্ব থেকে পর্বান্তর*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

২০১০, *সময় অসময় নিঃসময়*, প্রথম প্রকাশ, একুশ শতক, কলকাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৮৭, *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা* প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা

১৩৮৯, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', দ্বিতীয় মুদ্রণ, *তারাশঙ্কর রচনাবলী* সপ্তম খণ্ড, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

থাপার, রোমিলা ২০১৩, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ (অনুবাদ: কৃষ্ণা গুপ্ত), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

দেবেশ রায় ২০০৩, *উপন্যাস নিয়ে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৬, *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, প্রথম বর্ধিত দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো — ২০১০, *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড*, (অনুবাদক: দুলাল আল মনসুর), প্রথম প্রকাশ, সংবেদ, ঢাকা

নিতাই বসু — ১৯৯৯, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নির্মল দাশ — ২০০১, *উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ*, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, সাহিত্যবিহার, কলকাতা

নিরুকুমার চাকমা — ১৯৯৭, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় — ১৪০২, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৯২, *উপন্যাস রাজনৈতিক: বিভূতিভূষণ*, প্রথম প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

১৯৯১, উপন্যাস রাজনৈতিক, প্রথম প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

বদরুদ্দীন উমর — ২০০০, *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, দ্বিতীয় বাংলাদেশ সংস্করণ, ঐতিহ্য, ঢাকা

বিনয় ঘোষ — ১৪০২, *বাংলার নবজাগৃতি*, চতুর্থ মুদ্রণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা

২০০০, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব প্রথম প্রকাশ, বুক ক্লাব, ঢাকা

১৯৯৯, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*, পঞ্চম মুদ্রণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৯৯, *পথের পাঁচালী*, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা

১৪০৫, *আরণ্যক*, চতুর্দশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা

১৩৯৩, 'তৃণাঙ্কুর', *বিভূতি রচনাবলী*: দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

১৩৯২, 'অপরাজিত', *বিভূতি রচনাবলী*: তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ — ১৯৯৭, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বীতশোক ভট্টাচার্য — ২০০৬, *গদ্যগঠন*, প্রথম প্রকাশ, বাণীশিল্প, কলকাতা

২০০৪, *কথাজিজ্ঞাসা*, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

বীরেন্দ্র চক্রবর্তী — ২০০৪, *জীবন ও যাপন*, প্রথম প্রকাশ, আলোচনা চক্র, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু — ১৯৭০, *রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা* (অনূদিত), প্রথম প্রকাশ, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লিঃ, কলকাতা

১৩৮৫, *মহাভারতের কথা*, দ্বিতীয় প্রকাশ, এম. সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল — ১৯৯২, *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী — ২০০৭, *কথাশিল্পের কথামালা: শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর*, প্রথম প্রকাশ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

১৯৯৮, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মননকুমার মণ্ডল — ২০১৪, *আধুনিক বাংলা উপন্যাস ব্যষ্টি ও সমষ্টি*, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

মহাশ্বেতা দেবী — ২০০৩, 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* নবম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৩, 'অরণ্যের অধিকার', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* নবম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

মাহবুব সাদিক — ২০১৫, *সাহিত্যে শিল্পপ্রতিমা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

২০১১, *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মেসবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী জোবাইদা নাসরীন — ২০০১, *নিজভূমে পরবাসী*, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ উৎস প্রকাশনী, ঢাকা

মৃণালকান্তি ভদ্র — ১৯৯৯, *অস্তিবাদ: জাঁ পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য*, তৃতীয় মুদ্রণ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

রবিন পাল ২০১১, *উপন্যাস: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

২০০০, *উপন্যাসের উজানে*, প্রথম প্রকাশ, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা

রবীন্দ্র গুপ্ত ১৯৯৫, *উপন্যাস জিজ্ঞাসা*, প্রথম প্রকাশ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৯, *রবীন্দ্র রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১৪০৯, 'রক্তকরবী', *রবীন্দ্র রচনাবলী* অষ্টম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী কলকাতা

রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৮৭, *তারাশঙ্কর ও রাঢ়-বাংলা*, প্রথম প্রকাশ, নবার্ক, কলকাতা

রমাপ্রসাদ নাগ ২০০২, *স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

২০১৪, *অনন্য অমিয়ভূষণ*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৭৩, *বাংলা দেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), প্রথম সংস্করণ, রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

শম্ভু মিত্র ১৪০৪, *চাঁদ বণিকের পালা*, পঞ্চম সংস্করণ, এম, সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

শামসুদ্দিন চৌধুরী ১৪০৪, *উপন্যাসের উপচার*, প্রথম প্রকাশ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

শামীমা হামিদ ১৪০৮, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম: শব্দ ব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহরীতি*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শিশিরকুমার দাশ ১৯৯২, *সফোক্লেসের রাজা ওইদিপৌস* (ভাষান্তর: শিশিরকুমার দাশ), দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৫, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, সপ্তম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯৯৪, *বঙ্কিমচন্দ্র*, দ্বিতীয় সংস্করণ, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

শৈলেশরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯৮৮, *অস্তিবাদের মর্মকথা*, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

সঞ্জীব ঘোষ ১৯৮৬, *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে*, প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

সতীনাথ ভাদুড়ী — ১৩৭৯, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী* (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৭১, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা

১৯৮৬, *উত্তরপ্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ রায় — ২০০৯, *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুচিত্রা পাল — ১৯৯৮, *রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর*, প্রথম প্রকাশ, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় — ১৯৫৮, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

সুবোধ ঘোষ — ১৩৫৫, *ভারতের আদিবাসী*, প্রথম প্রকাশ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, কলকাতা

সুবোধ দেবসেন — ২০১০, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, প্রথম প্রকাশ, বর্ণ গ্রন্থন, কলকাতা

সুমিত সরকার — ২০১৩, *আধুনিক ভারত*, চতুর্থ মুদ্রণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী — ২০০৩, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

২০১৬, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুস্তক বিপনি,কলকাতা

২০১০, *উপন্যাস বহুরূপে*, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

সৈয়দ আকরম হোসেন — ১৩৮৮, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা

১৯৯৭, *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক — ১৯৯৮, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৌগত মুখোপাধ্যায় — ২০১০, *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, প্রথম সংস্করণ, নবযুগ, ঢাকা

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — ২০১১, *রাজনীতির অভিধান*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

স্বরাজ গুছাইত ১৯৯৭, *বিনির্মাণ ও সৃষ্টি: আধুনিক উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

হাসান আজিজুল হক ১৯৯৮, *অতলের আঁধি*, প্রথম প্রকাশ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ ২০০১, *নারী*, তৃতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

খ. ইংরেজি গ্রন্থ

Bakhtin, M. M. 1994. *The Dialogic Imagination*, (translated by Caryl Emerson and Michael Holquest), Ninth Paperback printing, University of Texas Press, America.

Childs, Peter 2000. *Modernism*, Routledge, London

Eliot, T.S. 1965. *Selected prose*, [Ed. John Hayward], Reprinted in peregrine Books, penguin, London

Forster, E. M. 1988,. *Aspects Of Novel,* Reset and Reprinted from theAbinger Edition 1976, Penguin, London

James, William 1896. *The Principles of Psychology*, Henry Holt and Co, New York.

Freud, Sigmund 1933. *New Introductory Lectures on Psycho-Analysis*. (Tr. W.J.H. Sprott). The Hogarth Press L.t.d. London

1940. *An Outline of Psychoanalysis*. (Tr. James Strachey). NewYork

1949. *Three Essays On the Theory of Sexuality*. (Tr. James Strachey). London

C.G. Jung (1974). "Archetypes of the Collective Unconscious", *Twentieth Century Criticism :The Major Statements*, ed. William J. Handy and Max West Brook, New York.

Dhaka University Institutional Repository

গ. বাংলা প্রবন্ধ

অনিন্দ্য সৌরভ ২০০১, "দুখিয়ার কুঠি: ছিন্নমস্তা সভ্যতা ও বিলীয়মান কৌম-সমাজ", 'বৈতালিক', তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৫ ই মাঘ, কলকাতা

২০০৩, "মহিষকুড়ার ইতিবৃত্ত", 'জলার্ক', পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল, কলকাতা

অর্ণব সেন ২০১১, 'অমিয়ভূষণ: উপন্যাসে কল্প-বাস্তবতা', *বাংলা আখ্যান: বহুমাত্রিক পাঠ*, প্রথম প্রকাশ, বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী সম্পাদিত, রত্নাবলী, কলকাতা

২০০৩, "অমিয়ভূষণ : উপন্যাসের রূপরেখা", 'নহবত', ৪০ বছর বিশেষ সংখ্যা, একালের বিস্ময় : কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, কলকাতা

২০০১, "অমিয়ভূষণ: শব্দের খাঁচায়, বৃত্তের বাইরে", 'বৈতালিক', তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৫ ই মাঘ, কলকাতা

অমর পাত্র ২০১২, 'নকশাল আন্দোলন: ভাবে ও বি-ভাবে গৌরকিশোর ঘোষের সাহিত্য', *মননে সৃজনে নকশালবাড়ী*, প্রথম সংস্করণ, প্রদীপ বসু সম্পাদিত, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা

অমরেন্দ্র গণাই ১৪০৬, 'ছোটগল্পের বিভূতিভূষণ', *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা ১-২ , ৩৫ বর্ষ, সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত, কলকাতা

অলোক রায় ২০০১, "রাজনগর: আকাশগঙ্গার সন্ধান", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

অশ্রুকুমার সিকদার ২০১২, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: আদি উপন্যাস', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, তৃতীয় মুদ্রণ, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ইছামউদ্দীন সরকার ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

ইরাবান বসুরায় ১৯৯৪, "নয়নতারা ও রাজনগর", 'উত্তরাধিকার' চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

উদয়কুমার চক্রবর্তী ১৯৯৫, "জলকুবের চন্দ্রশেখর", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা

গুণময় মান্না ১৩৯৪, 'ঢোঁড়াইচরিত মানস: একটি পুনর্মূল্যায়ন', *সতীনাথ ভাদুড়ী: স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে*, প্রথম পুস্তক সংস্করণ, দিলীপন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, জলার্ক, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭, 'তারাশঙ্করের নাগিনী কন্যার কাহিনী', *তারাশঙ্কর অন্বেষা*, প্রথম প্রকাশ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রমা প্রকাশনী, কলকাতা

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া* ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

গৌতম রায় ২০০৩, "দুঃখ দিনের রক্তকমল", 'নহবত', ৪০ বছর বিশেষ সংখ্যা, একালের বিস্ময় : কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, কলকাতা

চারু মজুমদার ১৯৬৯, 'দেশব্রতী' পত্রিকা, ২১ আগস্ট ১৯৬৯, উদ্ধৃত: *মননে সৃজনে নকশালবাড়ী*, প্রথম সংস্করণ, প্রদীপ বসু সম্পাদিত, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।

জহর সেন মজুমদার ২০০১, "নয়নতারা, অমিয়ভূষণ ও উপন্যাসের দ্বন্দ্ববীজ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

জুনান নাশিত ২০১২, 'নতুন কালের প্রতিভূ: 'করালী'', *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা: মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ*, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা সংস্করণ, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, রেডিয়ান্স প্রকাশনী, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য ১৯৯৫, "উপন্যাসের প্রতিবেদন: বিশেষ পাঠ 'দুখিয়ার কুঠি' ", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা

১৯৯৯, "চাঁদবেনে: প্রত্নসময় ও আখ্যান", 'দিবারাত্রির কাব্য', সপ্তম বর্ষ: প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, উপন্যাস সংখ্যা ২, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৬, "'গড় শ্রীখণ্ড': বিকীর্ণ মৃত্যুর পটে জীবনের শিল্পরূপ", 'প্রতর্ক', শারদীয়া প্রথম সংখ্যা, অমিয়ভূষণ : গড় শ্রীখণ্ড সংখ্যা, কলকাতা

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ২০০১, "প্রাক-ঔপনিবেশি সাক্ষাৎ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

তুষার পণ্ডিত ২০০১, "কালের মন্দিরা বাজে", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

দেবাশিস মল্লিক ২০০৪, "মহিষকুড়ার উপকথা: নিম্নবর্গের সংস্কৃতি সন্ধান", 'ঐক্য' ক্রোড়পত্র অমিয়ভূষণ, ডিসেম্বর, কলকাতা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯, 'তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেশকাল', *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রত্নাবলী, কলকাতা

ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৯৪, "ঐতিহ্যের আধুনিক আত্মনির্ণয়: মহিষকুড়ার উপকথা", 'উত্তরাধিকার' চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮, "মধু সাধুখাঁ : একটি দৃশ্যকাব্য", *মধু সাধুখাঁ*, বাণীশিল্প, কলকাতা

নীহাররঞ্জন রায় ১৯৯২, *'গ্রীক ও ভারতীয় কাল-চেতনা সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য'*, *ইউরোকেন্দ্রিকতা ও শিল্পসংস্কৃতি: গাঙ্গেয় পত্র সংকলন* ১৩, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০১০, 'ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীক্ষাভূমি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: শতবার্ষিক স্মরণে*, প্রথম প্রকাশ, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা

১৯৯৪, "অমিয়ভূষণের দুটি", 'উত্তরাধিকার' চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

১৩৯৪,'জাগরীর বাস্তব', *সতীনাথ ভাদুড়ী: স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে*, প্রথম পুস্তক সংস্করণ, দিলীপন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, জলার্ক, কলকাতা

পি. কে. ভট্টাচার্য ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

পৃথ্বিশ সাহা ২০০১, "চাঁদবেনে: বিম্বে-প্রতিবিম্বে", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

প্রবাস দত্ত ২০০১, "বিবিক্তা ও বিবিক্ত লেখক অমিয়ভূষণ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

প্রসূন ঘোষ ২০১৬, "আধুনিক উপন্যাসে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য", 'কোরক', শারদ সংখ্যা, কলকাতা

বাসব দাশগুপ্ত ২০০১, "অমিয়ভূষণের আলোকে অমিয়ভূষণের বিলাস বিনয় বন্দনা", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

বিজিতকুমার দত্ত ২০০১, "মহিষকুড়ার উপকথা: ভিন্নপাঠ", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

বিপ্লব মাজী ২০১২, 'বাংলা উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন', *বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর*, পুনর্মুদ্রণ, বিপ্লব মাজী সম্পাদিত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০১১, 'চাঁদবেনে', *কথানির্মাতা সেলিনা হোসেন*, প্রথম প্রকাশ, ফজলুল হক সৈকত ও জান্নাতুল পারভীন সম্পাদিত, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা

বেগম আকতার ২০০৮, 'দিবারাত্রির কাব্য: মানিক-মানসের আলোছায়া', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: শতবার্ষিক*

কামাল — *স্মরণে*, প্রথম প্রকাশ, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা

২০১২, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-র উপন্যাসায়ণ', *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা: মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ*, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা সংস্করণ, মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত, রেডিয়ান্স প্রকাশনী, কলকাতা

ভবেশ দাশ — ১৯৯৩, "অমিয়ভূষণের গড় শ্রীখণ্ডেই আছি", কোরক, বর্ষ ১৬, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা

মৃণালকান্তি ভদ্র — ২০০২, 'গড় শ্রীখণ্ড: প্রমত্তা পদ্মা', *বিংশ শতাব্দীর সমাজবিবর্তন: বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

রণজিৎ গুহ — ২০১৪, "কতিপয় সমাপ্তি", 'দেশ', বই সংখ্যা, ৮১ বর্ষ ৭ সংখ্যা, হর্ষ দত্ত সম্পাদিত, কলকাতা

রমাপ্রসাদ নাগ — ২০০৩, "চাঁদবেনে: অলৌকিক সর্পগুলি এবং উদ্যত এক পেখম চিত্র", 'নহবত', ৪০ বছর বিশেষ সংখ্যা, একালের বিস্ময় : কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, কলকাতা

২০০১, "প্রসঙ্গ : অমিয়ভূষণ, নিঃসঙ্গ মানুষের পথচলা এবং উত্তরণ", 'বৈতালিক', তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৫ ই মাঘ, কলকাতা

রাণা মুখোপাধ্যায় — ১৪০৮, "রাজনগরের পাঠক অথবা পাঠকের রাজনগর", 'শারদীয় শিলীন্ধ্র', ৩৫ বছর পূর্তি সংখ্যা ৩-৪, কলকাতা

রাশিদা আখতার খানম — "দেহ মন সম্পর্ক ও প্যারাডাইম তত্ত্ব", 'দর্শন ও প্রগতি', বর্ষ: ২৯ ১ম ও ২য় সংখ্যা, ঢাকা

শিবনারায়ণ রায় — ১৯৯৪, "এই অরণ্য, এই নদী, এই দেশ", 'উত্তরাধিকার', চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় — ১৪০৮, "একক অমিয়ভূষণ", 'শিলোঞ্ছ', কার্তিক-দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা

শুভঙ্কর ঘোষ — ২০০১, "দুখিয়ার কুঠি: অনন্য অমিয়ভূষণের ক্যাজুয়াল ফসল", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

শুভময় মণ্ডল — ২০০১, "নির্বাস: বিন্যাসের বিপর্যয়ের সৌকর্য", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

১৪০৮, "হে প্রাণনেতা, আবার প্রাণ দিহ, দেখিবার চক্ষু দিহ...", 'শিলোঞ্ছ', কার্তিক-দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা

শুভময় সরকার — ২০০৪, "অমিয়ভূষণের ছোটগল্প–এক নিজস্ব স্টাইল", 'ঐক্য' ক্রোড়পত্র অমিয়ভূষণ,

ডিসেম্বর, কলকাতা

সমীর চক্রবর্তী ১৯৯৫, "ব্যক্তি অমিয়ভূষণ", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা

সাধন চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫, "জাতীয়তাবোধ: প্রাচ্য, প্রতীচ্য এবং অমিয়ভূষণের 'মধু সাধুখাঁ', 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা

সুকান্ত সেন, অভিজিৎ রায় ও সিলভানুস লামিন ২০০৭, 'পটভূমি', *সমতলের আদিবাসী অধিকার ও অধিকারহীনতা*, বারসিক, ঢাকা

সুমিতা চক্রবর্তী ২০১২,'হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, তৃতীয় মুদ্রণ, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

২০০১, "অমিয়ভূষণ মজুমদার ও আদিবাসী-চেতনা", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

১৯৯৫, "বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী: অনল-দহিত জীবন", 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, কলকাতা

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৪, "'গড় শ্রীখণ্ড' : জনৈক পাঠকের ডায়েরী থেকে", 'উত্তরাধিকার', চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

সেলিনা হোসেন ২০১৬, "মঙ্গলকাব্যের আলোকে নতুন গল্প", 'কোরক', শারদ সংখ্যা, কলকাতা

সৈয়দ আকরম হোসেন ২০১৩, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা', *তোমার সৃষ্টির পথ*: প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, নান্দনিক, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক ২০১২, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, তৃতীয় মুদ্রণ ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সৌগত মুখোপাধ্যায় ২০১০, 'ম্যাজিক রিয়ালিজম', *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, প্রথম নবযুগ সংস্করণ, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, নবযুগ, ঢাকা

স্বপন সেন ২০০১, "অমিয়ভূষণ: স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত লেখক", 'দিবারাত্রির কাব্য', নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, কলকাতা

হাসনাত আবদুল হাই ২০১২, "ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং মিথ", 'শালুক', বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১৪, জনান্তিক, ঢাকা

হাসান ফেরদৌস ২০১৪, 'আদিবাসী, আমাদের প্রথম মানব', *আদিবাসী আছে?...আছে!*, প্রথম প্রকাশ, সায়েমা খাতুন ও মাহমুদুল হক সুমন সম্পাদিত, সংবেদ, ঢাকা

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০২, 'ঢোঁড়াইচরিত মানস: অনন্যতার সন্ধানে', *বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন: বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ঘ. ইংরেজি প্রবন্ধ

Marx, Karl 1853).'British Rule in India' New York Daily Tribune, June 25, 1853, available at: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/06/25.htm, accessed on: October 12, 2016.

ঙ. পত্রিকা

উত্তরাধিকার ১৯৯৪, চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, সম্পাদক: অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক, কলকাতা

১৯৯৫, পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, সম্পাদক: অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক, কলকাতা

ঐক্য ২০০৪, ডিসেম্বর, সম্পাদক: গৌরীশংকর সরকার, কলকাতা

কালি ও কলম ১৪২১, দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা চৈত্র, সম্পাদক: আবুল হাসনাত, ঢাকা

কোরক ১৯৯৩, শারদীয় সংখ্যা, সম্পাদক: তাপস ভৌমিক, কলকাতা

২০১৬, শারদ সংখ্যা, সম্পাদক: তাপস ভৌমিক, কলকাতা

জলার্ক ২০০৩, পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল, সম্পাদক: মানব চক্রবর্তী, কলকাতা

দর্শন ও প্রগতি ২০১৫, বর্ষ ২৯: ১ম ও ২য় সংখ্যা, সম্পাদক: লতিফা বেগম, ঢাকা

দিবারাত্রির কাব্য ২০০১, নবম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, সম্পাদক: আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা

১৯৯৯, সপ্তম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, উপন্যাস সংখ্যা ২, সম্পাদক: আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা

দেশ ২০১৪, ৮১ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, সম্পাদক: হর্ষ দত্ত, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

নহবত — ২০০৩, ৪০ বছর বিশেষ সংখ্যা, একালের বিস্ময় : কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, সম্পাদক: সুবোধ বসু রায় ও অন্যান্য, কলকাতা

পঁচাত্তরতম জন্মদিন স্মারক পত্রিকা — ১৯৯২, সম্পাদক: সমীর চক্রবর্তী, কলকাতা

প্রতর্ক — ১৯৮৬, শারদীয়া প্রথম সংখ্যা, অমিয়ভূষণ : গড় শ্রীখণ্ড সংখ্যা, সম্পাদক: তাপস ভট্টাচার্য, কলকাতা

বিজ্ঞাপনপর্ব — দশম বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর, সম্পাদক: রবিন ঘোষ, কলকাতা

বৈতালিক — ১৪০৮, তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৫ ই মাঘ, সম্পাদক: গৌতম রায়, কলকাতা

লা পয়েজি — ১৯৮১, পঞ্চদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, বার্ণিক রায়, কলকাতা

শালুক — ২০১২, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১৪ ফেব্রুয়ারি, সম্পাদক: ওবায়েদ আকাশ, ঢাকা

শিলীন্ধ্র — ১৪০৮, ৩৫ বছর পূর্তি সংখ্যা ৩-৪, সম্পাদক: কমল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা

শিলোঞ্ছ — ১৪০৮, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সম্পাদক: কালীকুমার দাস, কলকাতা

সহস্রাব্দ — ২০০৬, পঞ্চম বর্ষ, জানুয়ারি-জুন, সম্পাদক: সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা

চ. সাক্ষাৎকার

অনিন্দ্য সৌরভ — ১৯৯৪, "আমাদের দেশে যদি সমালোচক থাকত তবে লোকে বুঝত কোনটা উপন্যাস, কোনটা উপন্যাস নয়...", 'উত্তরাধিকার', অমিয়ভূষণ মজুমদার সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা–অক্টোবর-ডিসেম্বর, কলকাতা

অনিন্দ্য সৌরভ — ১৯৯৫, "মরণকে শ্যামসমান মনে করতে গেলে হাসি পায়", 'উত্তরাধিকার', অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, কলকাতা

অরুণেশ ঘোষ — ১৯৮২, "সাক্ষাৎকার / ৩" (ক্ষুধার্ত-৩ থেকে গৃহীত), বিজ্ঞাপন পর্ব, ১০ বর্ষ ২ সংখ্যা, অক্টোবর, কলকাতা

গীতাংশু কর সৈয়দ জামাল — ২০০৩, "অমিয়ভূষণের সঙ্গে তিনঘন্টা", (জুলাই ১৯৮১-তে প্রকাশিত 'এই সময়' পত্রিকা-তরফে), *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ২, (গ্রন্থনা: তরুণ পাইন অপূর্বজ্যোতি মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

তাপস ঘোষ, মজিবর রহমান, প্রচেতা ঘোষ এবং সুবিমল মিশ্র — ১৯৯৪, "কথা বলতে বলতে", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* ৪, (গ্রন্থনা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার ও এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেবব্রত চক্রবর্তী — ১৪০৮, পৃথ্বীশ সাহা রচিত "স্বগত অমিয়ভূষণ মজুমদার" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত নকশাল সম্পর্কে অমিয়ভূষণ মজুমদারের বক্তব্য, শারদীয় শিলীন্ধ্র, ৩৫ বছর পূর্তি সংখ্যা ৩-৪, কলকাতা (মূল সাক্ষাৎকার: নবার্ক, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৬)

রমাপ্রসাদ নাগ — ২০০২, "১৯৮৯ সনে অমিয়ভূষণের সঙ্গে কথোপকথন", *স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সমীর চক্রবর্তী (গ্রন্থনা ও সংকলন) — ১৯৯২, "স্মৃতিচারণ, সাক্ষাৎকার ও পত্রালাপে অমিয়ভূষণ", ১৯৭০ থেকে ১৯৮৬'র নভেম্বর পর্যন্ত চতুরঙ্গ, নবার্ক, বিজ্ঞাপন পর্ব, মনন প্রভৃতি পত্রিকার সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্র থেকে সংকলিত", ' অমিয়ভূষণ মজুমদার : 'পঁচাত্তরতম জন্মদিন স্মারক পত্রিকা', কলকাতা

সৌরভ ঘটক, জয়ন্ত চক্রবর্তী, শুভ্র চট্টোপাধ্যায় — ২০০৬, "–অধিদৈবতের প্রস্থান : প্রয়াত অমিয়ভূষণের শেষ দীর্ঘতম জবানবন্দী–", 'সহস্রাব্দ', পঞ্চম বর্ষ জানুয়ারি-জুন, কলকাতা